

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষষ্ঠ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা) .

[শ্রীগোবিন্দ ৪৬৭ গোবিন্দ হইতে ৪৬৮ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৬০ ফাল্গুন হইতে ১৩৬১ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৪ মার্চ হইতে ১৯৫৫ ফেব্রুয়ারী]

রক্ষণভিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

ত্রিদণ্ডেশ্বরী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশ্রদ্ধা কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডেশ্বরী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

(ত্রিদণ্ডেশ্বরী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদ্য বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (ভগলী)

বার্ষিক ভিত্তি—৪২ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকচার্য্য-বর্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবাদান্ত (মহাপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম, এ, বার, এট, এল,

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

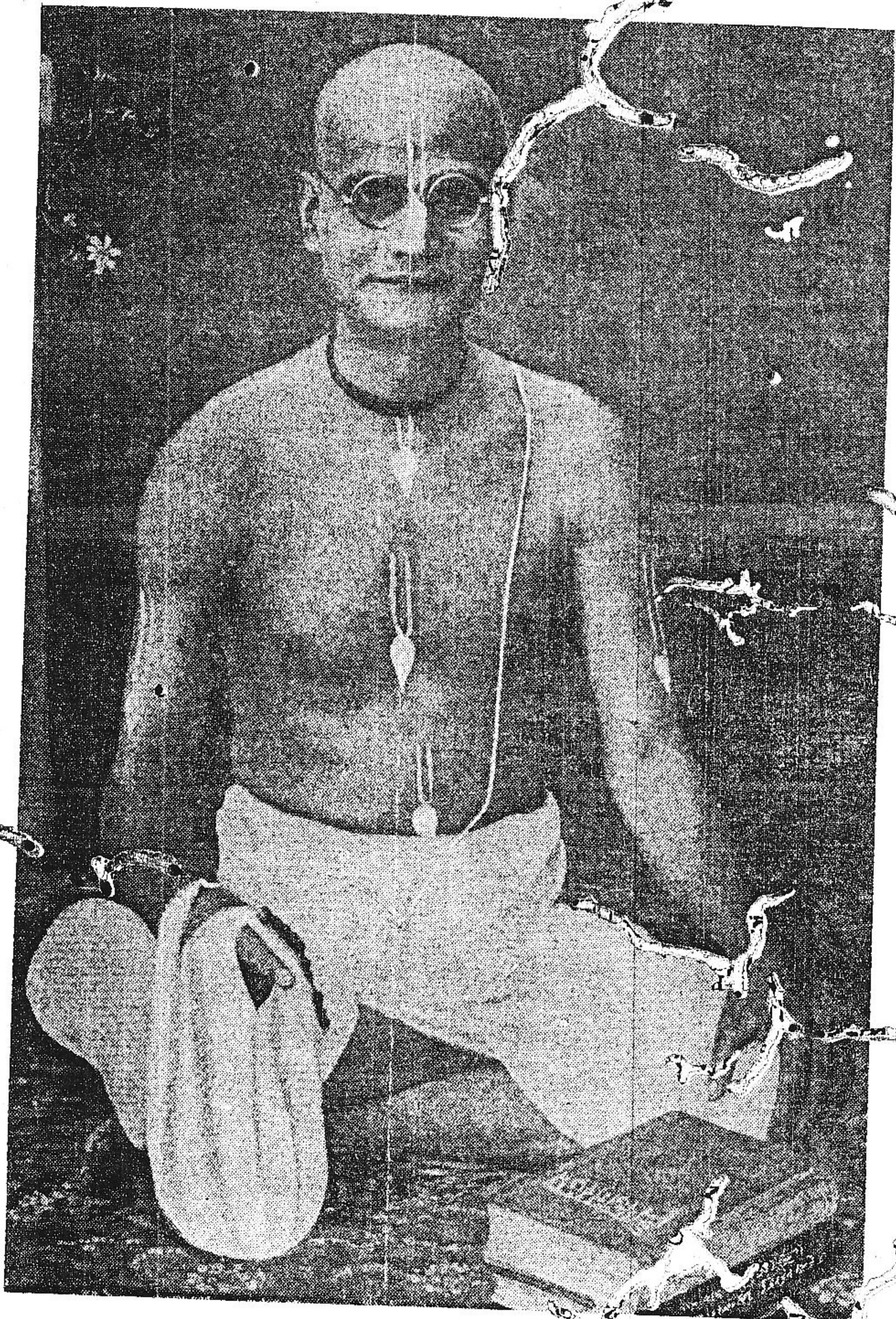
পণ্ডিত শ্রী ত বৃন্দাবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন

—:(*) :—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসঙ্করসেবক ব্রহ্মচারী কর্তৃক চুঁ চুঁড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত



শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকচার্য্য
ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশ্রদ্ধান কেশব মহারাজ

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রিকা
১। অঞ্জলি প্রদান—পোষ্টকার্ডে	২৪০
২। অনুবৃত্তি [পদ্য]	৮৩১২
৩। অন্তহীন বর্ষ	১২৪৭৬
৪। অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ [সমালোচনা] ২১৩, ৩১১৩, ৪১১৫৫, ৬২৩৩	
৫। অপ্রাকৃত [জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ]	১০১৩৬৫
৬। অবধূত কাহিনী	১০১৩৭৫
৭। আচার ও প্রচার [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১২৪৪৮
৮। আচার্য্য	৯১৩৫৬
৯। আর্তি-কুমুম—পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্টাদশ বিরহ-বাসরে [পদ্য]	১০১৩৯৬
১০। আর্তি-নিবেদন—শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে দীনার [পদ্য]	৭১২৬৫
১১। আমিষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ	৬১২২২
১২। আসাম প্রদেশে প্রচার [গোলকগঞ্জ, ধুবড়ী, কাছাড়ী হাট, খ্যাকশেয়ালী, গৌরীপুর, অভয়াপুরী, চোকাপাড়া ও বঙ্গাইগাঁও] ৪১১৫৮, ৫১১৯৯, ৬১২৩৯, ৭১২৭৯	
১৩। ইন্দ্রকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ [শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৭ অধ্যায়]	৮১২৮১
১৪। ইন্দ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতির বঙ্গানুবাদ	৮১২৮৩
১৫। ইন্দ্রকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ [পদ্য]	৮১৩০৬
১৬। উদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব—শ্রী	৫১১৯৬
১৭। একের প্রকাশ [পদ্য]	১২৪৭০
১৮। ত্রিকান্তিক ও ব্যভিচারী [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২১৪৪
১৯। কুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ- গোস্বামি-বিরচিতম্]	৪১১২১
২০। কুঞ্জবিহারী-দ্বিতীয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৪১১২৩
২১। কৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিতম্]	২১৪১
২২। কৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	২১৪৩
২৩। কৃষ্ণস্তুতিঃ—শ্রী [জরাসন্ধ-কারারুদ্ধ-রাজগণ-ভাষিতা]	৭১২৩১
২৪। কৃষ্ণস্তুতির বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৭১২৪২
২৫। কেশবজী গোড়ীয় মঠ—শ্রী	১০১৩৯৫
২৬। কেশবাচার্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৫১১৮৪
২৭। সীতেশোভা বা সমকতত্ত্বচন্দ্রিকা (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)	১০১৩৬৮
২৮। গুরু-শিষ্য-কাহিনী—শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, [পদ্য]	১১১৪১১

- ১৯। গোড়ীর বেদান্ত চতুষ্পাঠী—শ্রী
- ২০। গোড়ীর বেদান্ত সমিতির প্রচার (মঞ্জুবা)—শ্রী [অশোকনগর
কলৌনীতে, ২৪ পরগণা জেলায়, মেদিনীপুর জেলায়—
হিহাদল, মলুবসান, গেওখালি, কল্যাণপুর, পিছলদা,
মজুমদারডো, চিন্তিপুর, কামারপোতা ইত্যাদি] ১৩৯, ২১৭, ৩১১৯
- ২১। গোড়ীর বিজ্ঞান দশমী
- ২২। গোরাঙ্গ-স্তব-কল্প—শ্রী [শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস
গোয়ামি-প্রভুরেণ বিরচিতঃ] ৩৮১
- ২৩। গোয়ামি-স্তব-কল্পতরুর জাহ্নবদ—শ্রী
- ২৪। চতুর্থাঙ্গ ও উজ্জ্বলত
- ২৫। চৈতন্য চরিত—[শ্রীধাম চন্দ্র]
- ২৬। চৈতন্যষ্টকম—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ রূপ-গোয়ামি-বিরচিতম্]
- ২৭। চৈতন্যষ্টকের বিজ্ঞানবাদ—শ্রীশ্রী
- ২৮। জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব—শ্রীশ্রী
- ২৯। জিহ্বাবেগ
- ৩০। জ্ঞানকথা
- ৩১। জীর্ঘমহারাজের দেহত্যাগ
- ৩২। তোষণীরা কথ্য [জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ]
- ৩৩। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রী পরমধর্মেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়ানন্দ ব্রহ্মচারী]
- ৩৪। দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যান—শ্রী
- ৩৫। দীনার প্রগতি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবমহারাজ
শ্রীগুরুপাদপদের ষট্‌পঞ্চাশত্তম শুভাবির্ভাব-বাস [পত্র]
- ৩৬। দীনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি—শ্রীবাসপূজা-বাসরে [পত্র]
- ৩৭। দীনের আবেদন—[পত্র]
- ৩৮। দীনের কৃপা-প্রার্থনা—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে [পত্র]
- ৩৯। দীনের নিবেদন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোয়ামি-প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-বাসরে
- ৪০। দীনের প্রার্থনা—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী
শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্টাদশ-বার্ষিক
বিরহ-বাসরে [পত্র]
- ৪১। দুই বন্ধুর লিপা
- ৪২। দেব-দেবীর পূজা ও বলিদান
- ৪৩। নন্দোৎসব—শ্রীশ্রী [পত্র]
- ৪৪। নরোৎসব-প্রভোরষ্টকম—শ্রীশ্রী [শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-
ঠাকুর-বিরচিতম্]

- ৫৫। নরোত্তম-প্রভোরষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী
 ৫৬। নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রী
 ৫৬ ক। নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [উৎসব-পঞ্জীসহ]
 ৫৭। নবদ্বীপ পঞ্জিকার শ্রীরাধাষ্টমীর পারণ
 ৫৮। শঙ্ক-সংস্কার [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]
 ৫৯। পঞ্জিকা-প্রশস্তি
 ৬০। পরলোকে বিদ্যালতা ঠাকুরাণী
 ৬১। পিছলদা পাদ-পীঠ—শ্রী
 ৬২। প্রগতি-কুসুমাজলি—শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের
 শ্রীরঞ্ণে [পত্র]
 ৬৩। প্রাকৃত শব্দ ও অপ্রাকৃত নাম
 ৬৪। প্রার্থনা-পঞ্চক [পত্র]
 ৬৫। বন্দনা-গান—পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্
 ভক্তিপ্রেজ্ঞান কেশব মহারাজের [পত্র]
 ৬৬। বর্তমান জগৎ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু
 ৬৭। বর্ষোদ্ঘাত [জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]
 ৬৮। বাউল মতের বিচার [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]
 ৬৯। বামনদেবের উপাখ্যান—শ্রী
 ৭০। বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুরের উপাখ্যান—শ্রী
 ৭১। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর [জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ]
 ৭২। বিষ্ণুমঙ্গল
 ৭৩। বৈদিক আর্য্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]
 ৭৪। বৈষ্ণব দর্শন [জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ]
 ৭৫। ব্যাসপূজা-প্রশস্তি—পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮ শ্রী ঔ বিষ্ণুপাদ
 শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রেজ্ঞান কেশব মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে
 ৭৬। ব্যাসপূজা প্রশস্তি—শ্রীল প্রভুপাদের অশীতিতম
 শুভাবির্ভাব-বাসরে, শ্রীশ্রী [পত্র]
 ৭৭। ব্যাসপূজার নিমন্ত্রণ পত্র—শ্রীশ্রী
 ৭৮। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জবত—শ্রী
 ৭৯। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীশ্রী মথুরাধামে উর্জ্জবত পান
 —শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]
 ৮০। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ও উর্জ্জবতের নিমন্ত্রণ পত্র—শ্রী
 ৮১। ভক্তি-কুসুমাজলি—প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে [পত্র]
 ৮২। ভক্তি-পুষ্পাজলি—ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
 গোস্বামী মহারাজের অশীতিতম আবির্ভাব-বাসরে
 ৮৩। ভক্তি-প্রসূনাঙ্গলি—শ্রীশ্রীগৌরমুন্দের আবির্ভাব-বাসরে [পত্র]

- ৮৪০। অক্ষয়পন্থ নব-দুর্বাদল—শ্রীব্যাসপূজা-পুণে [পত্র] ১২।৪২৭
- ৮৫। বানু আচার্য—শ্রীশ্রী [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ১১।৪০৮
- ৮৬। জিজ্ঞাসা [জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ] ৮।২৮৪, ৯।৩২৫
- ৮৭। ভাগবত—শ্রীমদ [জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুর] ৩।৮৬
- ৮৮। ভীষ্মকৃত-ভগবৎস্তুতিঃ [শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়] ৯।৩২১
- ৮৯। ভীষ্মকৃত ভগবৎস্তুতির বঙ্গানুবাদ ৯।৩২৩
- ৯০। ভেকাশ্রয় বা বাস-বৈষ গ্রহণ ২।৬৯
- ৯১। ভেকাশ্রয় [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ২।৪৮
- ৯২। ভ্রম-সংশোধন ৪।১৫৪
- ৯৩। মংস-মাংস ভোজন [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ৪।১২৮
- ৯৪। মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ৬।২০৯
- ৯৫। মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন—শ্রীমন্ ১।২৪, ২।৫৩, ৩।১০৩, ৪।১৪৮, ৫।১৭৮, ৬।২৩০, ৭।২৭১
- ৯৬। মায়াবাদের জীবনী ১।১৯, ২।৬০, ৩।১১৭, ৪।১৩৯, ৫।১৭৫, ৬।২১৫, ৭।২৫৬, ৮।৩০৮, ১১।৪১৬
- ৯৭। মায়াবাদের স্বরূপ ৯।৩৪৫
- ৯৮। মুকুন্দাষ্টকম্—শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্] ৬।২০১
- ৯৯। মুকুন্দাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী ৬।২০৩
- ১০০। বিশ্বনাথদাস গোস্বামীপ্রভু—শ্রীশ্রী [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ৮।২৮৮
- ১০১। রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র ও উৎসব-পঞ্জী] ৪।১৪৫-১৪৬
- ১০২। রাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্ [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিতম্] ১১।৪০১
- ১০৩। রাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী ১১।৪০৩
- ১০৪। রাধাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামি-পাদেন বিরচিতম্] ৫।১৬১
- ১০৫। রাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী ৫।১৬৩
- ১০৬। রাধাষ্টমী ব্রতোৎসব—শ্রী ৭।২৭৮
- ১০৭। রাধা-পরিণত জগৎ [জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ] ৪।১২৪
- ১০৮। শ্রীকৃষ্ণ-বিবেক ৫।১৮৫, ৬।২১৭, ৭।২৬০, ৮।২৯৪
- ১০৯। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু—শ্রী [জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ৯।৩৩০
- ১১০। ষষ্ঠবর্ষারম্ভে নবেদন ১।৩৭
- ১১১। সজ্জনতোষক পত্রিকার উদ্দেশ্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ১।৮
- ১১২। সাউডী-শালায় ভিতে গলদ [সমালোচনা] ৮।৩১৭, ৯।৩৫৩
- ১১৩। স্বধামে শ্রীযতিরাজ ব্রহ্মচারী ১।৩৪
- ১১৪। স্বপ্নবিলাসামৃতাষ্টকম্ [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর-বিরচিতম্] ১০।৩৬১
- ১১৫। স্বপ্নবিলাসামৃতাষ্টকের বঙ্গানুবাদ ১০।৩৬৩

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

স বৈ পুংনাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরা ক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাসু যঃ

নোৎপাদিষ্যদযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৬ষ্ঠ বর্ষ } বঙ্গাব্দ, ২৫ গোবিন্দ, ৪৬৭ গৌরাক্ষ
রবিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬০ ; ইং ১৮৮৩ ১ম সংখ্যা

শ্রী শ্রী চৈতন্য ষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্মৃটমভিযজন্তে দ্ব্যতিভরা-

দক্ষসাদৃশং কৃষ্ণং মথবিধিভিরুৎকীৰ্ত্তনময়েঃ ।

উপাস্ত্যথা প্রাহর্ষমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১ ॥

ব্রিহৎ তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহলাদন-পদং
জয়ে দয়াধৈঃ সম্যগ্ বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ ।
উদধণ্মাতো দ্যুতিহর-দুকূলাক্ষিত-কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

অপ্যায় কস্তাপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হস্তা মধু মুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
কুটিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদায়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩ ॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমস্বরভাব-প্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দেবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ।
ভজন্তঃ যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

গতির্ঘঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালং কুববন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্বি পরমহংসাশ্রম-পদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং
দৃশোদ্বারা যন্তং বমতি ঘন-বাস্পানু-মিষতঃ ।
ভুবি প্রেমস্তুঙ্গং প্রকটয়িতুমুল্লসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬ ॥

তনুমাধি কুববন্ নবপুরট-ভাসং কটি-লসৎ-
করকালহারস্তুকণ-গজরাজাক্ষিত-গতিঃ ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিফাং দিশতি নিজনির্ম্মালাকৃতিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যন্ত পরিভো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।

পদালম্বঃ কন্ধ্যা প্রণয়তি নহি প্রেম-নিবহং
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিভরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥
 শচীসূনোঃ কীর্তিস্তবক-নবসৌরভা নিবিড়ং
 পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পণ্যকমিদম্ ।
 স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সারাজে প্রণয়িত্বাং
 দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাসিং সুখয়তু ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচর্চকের বঙ্গানুবাদ

কলিযুগে পণ্ডিতগণ নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাহাকে উপাসনা করেন যিনি
 কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন এবং
 চতুর্থাশ্রমীদিগেরও উপাস্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ যাহাকে কীর্তন করেন, সেই
 চৈতন্যাকৃতি সঙ্কীৰ্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ১ ॥

যিনি শান্তিপুৰ-ধামের পথে পথে ও প্রতি তক্তের গৃহে পাপীজনের
 আনন্দ কর নিজ চরিত্র অর্থাৎ হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে 'প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ-
 চন্দ্রের ন্যায় হউক' এইরূপ জয় ঘোষণা দ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোক
 অপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-বর্ণ যসনে যাহার কটিনেশ
 সুশোভিত, সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সার্বভৌম অঙ্গুগ্রহ
 করুন ॥ ২ ॥

যিনি উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রস বা শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি আশ্বাদন
 করিবার নিমিত্ত বৃষভানু-নন্দিনীর অপার মাধুর্য্য-ভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি
 অঙ্গীকার করত স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি রাধাভাব-হ্যঙ্গি-
 সুবলিত শ্রীগৌরানন্দদেব আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ৩ ॥

যিনি অমুরতাবাপন্ন তামসিক দেবোপাসক ব্রাহ্মণ্যের অল্পপাস্ত্র হইলেও
 জগতে সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবভাবাপন্ন ভূম্বর-কুলের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন
 এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুর-মূর্তিতে যিনি জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ
 করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সাতিশয়
 দয়া করুন ॥ ৪ ॥

যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের

নিস্তারকারী যিনি নবদ্বীপের মহিমা বিশেষ-রূপে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি
~~নবদ্বীপ~~ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া ভুবনপূজ্য ঐ বংশ উজ্জল
 করিয়াছেন এবং যিনি পরমহংসাশ্রম সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিশিক্ষা দ্বারা
 ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ষতিরাজ-বন্দিতপদ শ্রীনবদ্বীপ-
 চন্দ্র আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন ॥ ৫ ॥

যিনি প্রথমতঃ শ্রীমুখদ্বারা হরিনাম-রূপ অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত
 অশ্রু বিসর্জনচ্ছলে নরনদ্বারা ঐ রস যেন উদ্গীরণ করিতেছেন, এবং জগতে
 প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বাঁহার কলেবর সর্বদা উল্লসিত, সেই চৈতন্যাকৃতি
 নাম-প্রেম-প্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সর্বিশেষ দয়া করুন ॥ ৬ ॥

তপ্ত-কাঞ্চনের জায় বাঁহার শ্রীঅজকাস্তি, বাঁহার কটিদেশ করঙ্গ-রূপ অলঙ্কারে
 সুশোভিত, তরুণ গজরাজের জায় বাঁহার প্রশস্ত গমন এবং যিনি স্বয়ং প্রীতি-
 পূষক ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মালাদি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও প্রপঞ্চ-
 জয়ের বিষয় নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি অখিল লোক-
 শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে সাতিশয় অমুগ্রহ করুন ॥ ৭ ॥

বাঁহার দ্বৈত-হাস্ত-সহকৃত কৃপাকটাক্ষ সকলের শোক-হরণ করিয়া থাকে,
 বাঁহার মনোহর বাক্যাবলী জগতের কল্যাণ বিস্তার করে, বাঁহার শ্রীপাদপদ্ম
 আশ্রয় করিলে সর্বজন কৃষাঃপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি সর্বলোক-
 ভূষণপহারী মঙ্গলায়তন শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীশচীনন্দনের কীর্ত্তি-কুসুমাবলীর মনোহর সৌরভ-পরিপূর্ণ এই পদ্মাপটক
 যিনি প্রীতমান পাঠ করেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীশচীন্দ্র কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে আশ্রয়
 দিয়া তাঁহাকে সুখী করেন ॥ ৯ ॥

বর্ষোদ্‌যাত

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ—শ্রীমায়াপুরে শ্রী-ভুলীলাশক্তিমান
 শ্রীশ্রীগৌরহরির জয়গান

প্রেমময়-ভ্রমু মদীয়ার শচী-ভুলাল অমল প্রেমের প্রস্রবণ । তাঁহা হইতে
 অনেক স্বধূনী নিঃসৃত হইয়া ত্রিভুবন-ময় ভাসাইয়াছেন । শ্রীকৃপ-মন্দাকিনী
 সুর-সরিতের ধারা-বিশেষ পুনরায় গোড়ামণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম
 শ্রীগৌর-শশধরের নিত্যধাম যোগ (পীঠ) মায়াপুরকে বিস্মৃতির অতল জলধি

হইতে উত্তোলন করিয়াছেন। 'ভূশক্তি প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী' শ্রী-শক্তি পরব্যোমেশ্বরী নারায়ণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও লীলা-শক্তি যোগমায়া (মায়াপুর) নীলাদেবী—এই শক্তিত্রয়-সমন্বিত বৈকুণ্ঠনাথ প্রপঞ্চে অবতারণ করিয়া বৈকুণ্ঠের নিত্য প্রকট-বিহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের পরমোপরিস্থিত ঐশ্বর্য্য-শিখিল-ধামরূপ গোলোক; সেই গোলোকের পতি ব্রজেন্দ্র-নন্দন বার্ষভানবী সহ মিলিততনু হইয়া ভক্তিয়েশ্বর-মায়া সুপীঠ নবদ্বীপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক যে প্রেমের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন সেই বিশ্বস্তরের বর্ণনাময়ী প্রকট-নীলা নিত্যকাল জয়যুক্ত থাকিলেও জীবের দুষ্কৃতিবশে ছরধিগম্য ছিল।

মঙ্গলাচরণমুখে গৌরভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদের জয়গান

শ্রীগৌরজন বার্ষভানবী দয়িতের নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করুণা-ময়ের নিজজন বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া সেই শ্রীগৌরজন্মের শুদ্ধ প্রেমধাম জীবন-প্রাপক্ষিক বুদ্ধি অপসারিত করিয়া প্রেম-নয়নের গোচর করিয়াছেন। শ্রীগৌর-জন্মের অমলতত্ত্ব বিকৃত সমাজের হস্ত হইতে মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত-গ্রন্থসমূহে এবং অমুগত জনগণের হৃদয়ে স্মরণ করাইয়াছেন। করুণারত্নাকর শ্রীগৌর-জন্মের ও তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় হউক। ইহাদের জয় হইলেই জগতের একমাত্র কল্যাণোদয় হয়।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌর-জন্মস্থান

শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকীর্ত্তন

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধভক্তগণের উপাস্ত্র বিগ্রহ শ্রীমায়াপুর-স্থানটির নিত্যধাম নিরূপণ করিয়াছেন। জীবগণ স্ব স্ব বিষয়কার্য্যে বাস্ত হওয়ায় শ্রীধাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরজ তত্ত্বের বিকৃতভাবে আলোচনা করিতে গিয়া ক্রোধের বিষয়কে বা স্থানান্তরকে শ্রীগৌরধাম বলিয়া মনে করিতেন। বিষয়ী জীবগণ যদিও ধামবাস, শ্রীগৌর-কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব পরিচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, বাস্তবিক তাহা না হইয়া যোগমায়ার অনুকম্পা লাভে বন্ধি হইয়া মায়ার রাজ্যে অনেকেই বিপথে গমন করিতেন। যাহাদের স্মৃতি আছে তাঁহারা এই মায়ার কবল হইতে উন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের আদর করেন। যাহাদের সে সৌভাগ্য নাই, তাহাদিগকে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ-বিমুখ প্রতীপ বলিয়াই জানি। তাহাদের প্রতি শ্রীগৌরহরির আদৌ কোন দয়া নাই বলিয়াই জানিতে হইবে।

সজ্জনের তোষণই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

কৃষ্ণপ্রসার নামে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দুর্ভাগা জীবগণ আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার উদ্দেশে শ্রীপত্রিকার অবতারণা হয়। শ্রীমুক্তিভিনোদ ঠাকুর বিষয়-কথা মুক্ত করাইয়া সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন। সঙ্গই প্রচারের উদ্দেশ্য। অপ্রাকৃত কথা অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় করায়; প্রাকৃত বিষয়-কথা বিষয়ীর আনন্দপ্রদ। শ্রীসজ্জন-তোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা প্রচারিণী, হরিনাম বিধায়িনী, শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারিণী ও দুঃসদ বর্জনকারিণী; তজ্জন্তই শ্রীপত্রিকা হরিজন-তোষণী। শ্রীপত্রিকা-সেবন-মূত্রে আমাদের ইহা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক আছে। (আমরা বিগত পাঁচ বর্ষকাল অতিক্রম করিয়া বর্তমান বর্ষ বর্ষেও শ্রীমুক্তিভিনোদ ঠাকুরের অমল পাদপদ্মাসুসরণে শ্রীপত্রিকার সেবাকার্য্যে ব্রতী আছি।) সজ্জন-বিরোধী সম্প্রদায় আমাদের ঐকান্তিকতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের দূষণ-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ থর্ব্ব হইতেও পারে। আমরা কন্মারূত জ্ঞানারূত অন্ত্যভিলাষ-যুক্ত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ সকল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা যাহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারা আমাদের পত্রিকার সহিত সমরুচিবিশিষ্ট নহেন। আমরা তাঁহাদের মনস্তৃষ্টি করিতে গিয়া সজ্জনের তোষণ কার্য্য হইতে কখনই বিরত হইব না।

বর্তমান বর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনার প্রস্তাব

বর্ষপ্রারম্ভে বিগত বর্ষের সজ্জন-সমাজের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমরা বর্তমান বর্ষে অগ্রসর হইব। সজ্জন-সমাজে যে-সকল বিপত্তি সমুদিত হইয়াছে ও যে-সকল শ্রীগৌর-সেবাসুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছে, উভয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

সজ্জন-সমাজের বিরোধী চেষ্টাসমূহের বিবরণ

প্রতীপ দল হস্মি-বিরোধ, হরিজন-বিরোধ ও হরিসেবা-বিরোধোদ্দেশে প্রবলা চেষ্টার ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহৃদয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের তাদৃশ ঘণিত চেষ্টা ন্যূনাধিক প্রতিকূল হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহিমা থর্ব্ব করিবার মানসে গতবর্ষে তাহাদের অনেকগুলি চেষ্টা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। তাহারা বলেন,—শুদ্ধভক্ত কন্মকলাধীন, প্রতিষ্ঠাশা পরায়ণ, যোবিৎ-সজ্জ শৌক-বর্ণাস্তগত; প্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধি অকর্তব্য, বৈষ্ণবের শৌক পরিচয়, উপাধি-নামাদি পরিহার করিয়া অপ্রাকৃত পরিচয় অনাবশ্যক, বদ্ধজীব

বৈষ্ণবানুগত্যের অযোগ্য, গুরুদেবের ভূজা পূজা অকর্তব্য, বৈষ্ণবের পরীক্ষা নিষিদ্ধ, বৈষ্ণবের জন্ম-মহোৎসব অবৈধ, শুদ্ধভক্তি প্রচার অন্তায়, ভাড়াটে ভূতকগণের ধর্মপ্রচার বৈধ, বর্ণাশ্রমাধিকারীর কৃত্রিম পারমহংস ধর্ম অনুষ্ঠান, থিয়সফি মতবাদিগণই প্রকৃত বৈষ্ণব, মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম, জড় বিচার দ্বারা কৃষ্ণভজন প্রভৃতি অসংখ্য অবৈধ কুশিক্ষা প্রচারিত হউক ।

সদুদ্দেশ্যের নামে অসৎ-কর্মের তালিকা

তাহাদের বর্ণসাক্ষ্যভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শৌক্রেবর্ণ মধ্যে বিবাহ-বিধি প্রবর্তনের অবৈধ চেষ্টা, বৈষ্ণবের পূর্বাশ্রম উল্লেখ জাতি-সামান্য-জ্ঞান, শৌক্রে-বর্ণগত বৈষম্য প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের ছলনা, বংশ-পরম্পরাক্রমে গুরুগিরি-ব্যবসা প্রবর্তনই সদাচার বলিয়া কাপট্য প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ, মন্ত্র দিয়া অর্থ গ্রহণ, সভার সদুষ্ঠানের নামে নিজ-ভোগ-লাভপর্যায় অর্থসংগ্রহ, কন্যা-পুত্রাদির বিবাহোপলক্ষে শিষ্য-নামধারীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, দেবালয় স্থাপন করিয়া নিজের ও অসতের উদরো-পন্থ-বেগের সহায়তা, শ্রীধাম নির্দেশের নামে জড়ীয় অর্থপ্রসূ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ভজন বলিয়া প্রচলন করিবার বেগ আমরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত । ~~কৃষ্ণভজনই~~ একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার ছলনায় অবাত্তর ফলকামনা কখনই সজ্জনের ধর্ম নহে। গোপভাবে তাদৃশ কপটতার উৎসাহ প্রদান কোন সজ্জনই অঙ্গর করেন না । শ্রীপত্রিকা উপরিনিখিত অবৈধ অত্যাচার দমন ও প্রশমনের জন্য নানা হিতজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা

শ্রীপত্রিকায় আমরা এ বর্ষে দিন দিনই নানা শুদ্ধভক্তি-সমৃদ্ধির সন্দেশ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব, আশা করিতেছি । শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় নিজজন শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের (ষষ্ঠ বার্ষিকী) সেবা গ্রহণ করুন ।

—জগদগুরু ঔ বিম্বপাদ শ্রীশ্রীল সুরস্বতী ঠাকুর

সজ্জনতোষণী* পত্রিকার উদ্দেশ্য

নিত্যধর্মালোচনাই পত্রিকার উদ্দেশ্য

পাঠকবর্গের মধ্যে বোধকরি অনেকেই সজ্জনতোষণীর উদ্দেশ্য অবগত নন। উদ্দেশ্য না জানিলে কেহই কোন কার্যের সম্বন্ধে যত প্রকাশ করিতে পারেন না। অতএব সজ্জনতোষণীর উদ্দেশ্য সমুদায় প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি।

সজ্জনতোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) সাংসারিক অনিত্য সংবাদ লইয়া আলোচনা করিবেন না। সেই সমুদায় সংবাদ নানাবিধ অনিত্য সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে। জীবের নিত্যধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

জীবের স্বরূপে সংসার নাই—সংসার-নির্বাহ ধর্ম নহে

জীবের বিশুদ্ধ অবস্থায় সংসার নাই। জড়বদ্ধ অবস্থাতেই জীবের সংসার। জড়ের সহিত জীবের যে অনিত্য সম্বন্ধ, তাহাতেই সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। সংসারই জীবের উপাধি বা বিরূত ধর্ম। বিশুদ্ধ চিন্তাত প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। জীব চিদ্রূপ, অতএব শুদ্ধ চিন্তাই জীবের নিত্যধর্ম। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের সেই নিত্যধর্মের বিকারস্বরূপ একটি উপাধিক ধর্ম আজকাল জৈবধর্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। তাহাতেই জীবসকল সাংসারিক বহুবিধ ব্যাপারকে ধর্ম বলিয়া থাকেন।

জীবের ধর্ম নিত্য এবং ধর্ম-বিরুদ্ধ অবস্থা অনিত্য

যে-ধর্ম উপাধিক ধর্মকে উদ্ধমুখী করিয়া বিশুদ্ধ নিত্যধর্মের অন্তর্গত করিতে সমর্থ সেই ধর্মকে আমরা ধর্ম বলি। যে-ধর্ম উপাধিক ধর্মকে স্থিরতর রাখিতে বা উদ্ধমুখী করিয়া বিষয়ে মগ্ন করিতে চায়, তাহাকে আমরা অনাত্ম্য বা অনিত্য ধর্ম বলি। অতএব অনাত্ম্য বা অনিত্যধর্মকে পরিত্যাগপূর্বক ধর্মকে আমরা দুইটী অবস্থায় লক্ষ্য করি অর্থাৎ জৈবধর্মের বিশুদ্ধ অবস্থা এবং জৈবধর্মের বিশুদ্ধ অবস্থার উদ্দেশ্যক একটি অবস্থা-বিশেষ।

* শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তোষণীর উদ্দেশ্য ও শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্যে কোনও ভেদ নাই। আমরা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' উল্লেখের পর বন্ধনী মধ্যে (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) কোনও কোনও স্থলে ব্যবহার করিলাম।—সঃ

ধার্মিক ব্যক্তি ও ধর্মের জন্য চেষ্টিত ব্যক্তিগণ—সজ্জন

জৈবধর্মের বিস্তৃত অবস্থার নাম—ভগবৎ-প্রেম। তাহাই জীবের চরম প্রযোজন। বন্ধাবস্থার অবস্থিতে হইয়াও ষাঁহার সেই ধর্ম উদয় হয়, তিনি কৃতকৃত্য।

ষাঁহাদের সেই বিমল ধর্ম উদিত হয় নাই, কিন্তু তাহা উদিত করিবার জন্য সমস্ত জীবন, চেষ্টা নিযুক্ত হয়, তাঁহারাও ধন্য; যেহেতু অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারাও কৃতকৃত্য হইবেন। সেই মহাজনগণকেই আমরা সজ্জন বলি। তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। অতএব এই পত্রিকার নাম—সজ্জনভোষণী।

ত্রীপত্রিকায় কি বিষয় প্রকাশিত হইবে ?

ভগবৎপ্রেম প্রচার করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রেমের আনুকূল্যে জন্ম পূর্বতন প্রেমাস্বাদক মহাপুরুষদিগের জীবন-চরিত্র এবং তাঁহাদের রচিত সঙ্গীত ও গ্রন্থাদি এই পত্রিকায় আলোচিত হইবে। প্রেমিক ভক্তগণ যেখানে যে-সকল তৎপ্রচার সম্বন্ধে * কার্য করেন, সে-সমুদায় এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ত্রীপত্রিকায় জীবের বহির্মুখ-প্রবৃত্তি—কর্ম ও জ্ঞান পরিত্যক্ত

—হইয়া অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি—ভক্তিই আলোচিত হইবে

পার্থিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা, সমাজ, নীতি, বর্ণাশ্রম-ধর্ম, বৈরাগ্য ও সমস্ত সুখ-দুঃখ-জনক শারীরিক ব্যাপারও জীবের বদ্ধদশাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সেই সমস্ত ব্যাপারে দুইটি প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়, অর্থাৎ বহির্মুখ-প্রবৃত্তি ও অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি। যখন ঐ সকল ব্যাপারগুলি জীবের বিমল ভগবৎ-প্রেমের সহকারী হইয়া থাকে, তখন তাহাদের অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। যখন উহারা ভগবৎ-প্রেমের সাহচর্য স্বীকার না করিয়া স্বয়ং একটা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার হইয়া পড়ে, তখন উহাদের প্রবৃত্তি বহির্মুখ। অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি যে ব্যাপারে লক্ষিত হয়, সে ব্যাপারকে 'ভক্তি' বলি। বহির্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে সেই সেই ব্যাপারই স্থলতা-প্রযুক্ত কর্ম ও স্থলতা-প্রযুক্ত 'জ্ঞান' নাম প্রাপ্ত হয়। এই পত্রিকায় ভক্তিরই আলোচনা হইবে। জ্ঞান ও কর্মের আলোচনা হইবে না।

* সহজিয়ারা 'প্রচার-প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হইলেই প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইল মনে করে। কিন্তু ইহা ঠাকুরের নির্দেশ—প্রতিষ্ঠা নহে; ইহাকেই বলে হরিকীর্তন।

অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ও অপধর্ম বা

— ছলধর্মের নিরাস্য করাই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

আমরা যে-স্থলে বৈষয়িক বাপার লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব, সে-স্থলে ভক্তিরই আলোচনা হইতে থাকিবে। কখন কখন নিষেধমুখে অনর্থ ও পাপাদির বিচার করিব, কখন বা ভক্তি-সংস্থাপনের জন্য অন্যান্য ধর্ম লইয়া বিচার করিব। আমরা কখনই অন্যান্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিব না।

ভক্তির নাম করিয়া অনেকস্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেইসকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয়লাভ হয় না। অতএব আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে জীবের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধভক্তি ও ছলধর্মের পার্থক্য বিচার করিতে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন

আমাদের পবিত্র ভক্তসমাজে যে-সকল অনর্থ স্বার্থপরতাকে আশ্রয় করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধন করিবার বিশেষ যত্ন পাইব। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেইসকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐসকল কীট ধর্মপুষ্পের কেবল সৌন্দর্য হরণ করিতেছে এমত নয়, উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, প্রভু গিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও বা উষরক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে, কোথাও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথাভূত বৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎসম্বন্ধে প্রভুদিগের হৃদয়-অনুসারে আজকাল যে উচিত কার্য্য বোধ হয়, তাহার অনুমোদন করা এই পত্রিকার তাৎপর্য্য।

আমরা ভরসা করি যে, সমস্ত সাধু-ভক্তবৃন্দ, তথা দেশ-ভিত্তিকী ও জীব-হিতৈষী মহাত্মগণ আমাদের পত্রিকা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন এবং আমরা সময়ে সময়ে যে-সকল মঙ্গলময় প্রস্তাব করিব, তাহার বিশেষ আলোচনা করিবেন।

— জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পঞ্চক (৩)

(ক)

প্রভুপাদ !

তুমি মোর বেদ-বিধি, তুমি মোর অষ্টসিদ্ধি,
তুমি মোর জপ-তপ-ধ্যান ।
তুমি ধর্ম, তীর্থস্থান, পুণ্য-কর্ম-যজ্ঞ-দান,
তুমি মোর মন্ত্র-ব্রত-জ্ঞান ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবের মুখে শুনি, তব পদ দুইখানি,
জীবের দুর্গতি নাশ করে ।
তোমার কৃপায় মিলে, কৃষ্ণপ্রেম অবহেলে,
যায় জীব ভবান্বিত তরে' ॥ ২ ॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, অক্লোষ পরমানন্দ,
বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার ।
ওপদ আশ্রয় যার, কি ভয় তাহার আর,
শমন শাসন অতিচার ॥ ৩ ॥

কবে হ'বে দয়া মোরে, বাঁধিয়া করুণা ডোরে,
রাখিবোগো করিয়া কুকুর ।
কাঁদিয়া গোপাল কহে, হ'বে মোর ইষ্ট যাহে,
কর তাই অহঙ্কার চূর ॥ ৪ ॥

(খ)

প্রভুপাদ !

তোমার যুগল পদ, সর্ব জীব সুসম্পদ,
সেই হয় সর্বধর্মসার ।
তোমাতে যে নাহি সেবে, কৃষ্ণ-ভক্তি নাহি লভে,
ভজন-সাধন বৃথা তার ॥ ১ ॥

তোমার চরণ-জলে, (যেবা) স্নান করে কুতূহলে,
ভবব্যাদি তার মুক্ত হয় ।
তব পদরেণু শিরে, মনোস্থখে যেবা ধরে,
ধন্য সেই নাহিক সংশয় ॥ ২ ॥

বিষয় বিবেতে জলে', তোমার' নিকটে গেলে,
তাপ-জ্বালা সব দূরে যায় ।

প্রভু তব করুণায়, কত পাপী তরে' যায়,
হেন প্রভু কেবা কোথা পায় ॥ ৩ ॥

ভারিতে পতিত জীবে, আসিয়াছ এই ভবে,
ধর নাম—পতিত-পাবন ।

কবে প্রভু এ গোপালে, টানি ল'বে পদ-তলে,
কবে পাব ওরাজা চরণ ॥ ৪ ॥

(গ)

প্রভুপাদ !

তুমি প্রভু দীনবন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু,
শ্রীচরণে দেহ মোরে স্থান ।

অসতের সঙ্গে মিশি',— আমি স্বীয় ইষ্ট নাশি',
কর প্রভু মোরে পরিত্রাণ ॥ ১ ॥

জ্ঞানের বিকাশ বধি', তব পদে অপরাধী,
নিষ্কপটে না ভজি তোমায়ে ।

কামের দাসত্ব করি', নানা স্থানে ঘুরে মরি'
(সদা) ডুবে রহি কামনা-সাগরে ॥ ২ ॥

যেথা কৃষ্ণোত্তর ভাষ, সেখানেতে কন্দি বাস,
ভুলি' তব শ্রীচরণ-সেবা ।

অতীব কুটীল মতি, তোমাতে না হৈল রতি,
মোর সম হতভাগ্য কেবা ॥ ৩ ॥

এ বড় দুঃখের কথা, জনম গোড়ানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ এ পাপ জীবনে ।

যখন জনম হৈল, কেন প্রাণ নাহি গেল,
এ গোপাল দহে পাপাণ্ডনে ॥ ৪ ॥

(ঘ)

প্রভুপাদ !

দশানেতে তৃণ ধরি', অঞ্জলি মস্তকে করি',
কবে ঘাব প্রভু ! তব পাশ ।

তব অশ্রুগত সঙ্গে, চরণ সেবিত্ব সঙ্গে
কবে মোর পুরিবেক আশ ॥ ১ ॥

দিব্য চিস্তামণি-ধাম, মায়াপুর হেন স্থান,
সে ধামে বসিব আমি কবে ।

তোমার অধরাযুত, সেবনে অমল চিত্ত,
অপরাধ কবে দূরে যাবে ॥ ২ ॥

মানব-জনম পেয়ে, তব পদ না ভজিয়ে,
ভবাবধে হাবু ডুবু খাই ।

উদ্ধারিতে এই দীনে, অনন্ত করুণা-গুণে,
তোমা সম বন্ধু কেহ নাই ॥ ৩ ॥

দয়ালের শিরোমণি, মোরে অতি হীন জানি',
(কবে) চরণ-নিকটে দিবে স্থান ।

তব পাদপদ্ম-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
এ গোপাল লইল শরণ ॥ ৪ ॥

(৬)

প্রভুপাদ !

মায়ার দাসত্ব করি', মায়ার পিছনে ঘুরি',
বোহ-মদে মত্ত নিশিদিন ।

নানা অভিলাষ করি', কাম-বিষে জরজরি',
হইয়াছি পশু-সম হীন ॥ ১ ॥

তব পদ না সেবিয়া, অনর্থে জড়িত হৈয়া,
পরমার্থ ভুলি' স্বার্থ আশে ।

বৈষ্ণবের বেশ ধরি', নানা কপটতা করি',
আনন্দিত লোক-সর্ববনাশে ॥ ২ ॥

গিয়াছিনু আশা ক'রে, দিব্যধাম গৌর-পুরে,
পূজিবারে চরণ ছু'খানি ।

কিন্তু মায়ার করি' জোর, বাধি' গলে মায়ার ভোর,
(পুনঃ) ভব কূপে ফেলিলেক আনি ॥ ৩ ॥

প্রভু, তুমি কৃপা করি', এ দাসেরে কেশে ধরি',
টানি লহ চরণের পাশ ।

তবে তু অনর্থ যাবে, মায়া, দূরে পলাইবে,
এ গোপালের পূরে মন-আশ ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উপাখ্যান

পূর্বকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কৃষ্ণবেঙ্গা নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্রপল্লীতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাস ছিল। ইনি রামদাস নামক কোনও ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ছুরদৃষ্টক্রমে ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণবেঙ্গা নদীর পর-পারস্থিত চিন্তামণি নামক একটি বেণ্ডার কুহকে পড়িয়া তাহার কামে আসক্ত হন। ইঁহাকে কেহ কেহ শিহুনমিশ্র বলিয়াও অভিহিত করেন। কিছুদিন পরে ঠাকুরের পিতা পরলোকগমন করিলে, তাঁহার শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হয়। জমিদার-বাড়ীতে, মহাসমুদ্রে শ্রাদ্ধের ঘটাই হইল; নানাদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী-সকল আসিয়া শ্রাদ্ধ-সভায় শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন; ভাটেরা শোত্র, বন্দনা, পাঠ করিতে লাগিল; শ্রীগীতা, মহাভারত ব্যাখ্যা হইতে লাগিল; সহস্র সহস্র কাজাল, দীন, দুঃখী আসিয়া শ্রাদ্ধবাসরে ভোজন করিতে লাগিল। ‘দয়তাং ভুজ্যতাং’ শব্দে চতুর্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরোহিতগণ বজ্রে স্বাহা-স্বধা বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিতে লাগিলেন—অগ্নিদেবের লেলিহান জিহ্বা চৌদিক্ বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; পট-মণ্ডপ নানা পতাকা, বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইল; সবেমাত্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ভোজনে বসিয়াছেন; অর্দ্ধমাত্র ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইয়াছে; ঠাকুরের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। এহেন পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ-বাসুরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—চিন্তামণির চিন্তায় বিভোর। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, উন্নতভাবে লুচি, মগু, মালপোয়া উৎকৃষ্ট উপকরণাদি একটি বস্ত্রে বাঁধিয়া সেই পুটলী কন্ধে বহন করিয়া,—চিন্তামণির বাটীর দিকে ছুটিলেন। তাঁহার আর বাস্তব জ্ঞান নাই—এমনি কুহকিনী মায়ার মোহ; তিনি কোন একটি কৰ্ম্মচারীর প্রতি শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট কার্য্যাদির ভার দিয়া, দ্রুতবেগে কৃষ্ণবেঙ্গা নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলা অবসান হইতেছে, সূর্য্যদেব রক্তিম আকার ধারণ করিয়াছেন। সহসা জীবমুন্দের আয়ুহরণ করিয়া সূর্য্যদেব অন্তাচলে গমন করিলেন; দৈব-দুর্যোগবশতঃ এমন সময়ে আকাশে নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইল। ঘন-ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হইল; অকস্মাৎ বিজলী চমকিয়া উঠিল,—ঝড়, বৃষ্টি, শিলাপাত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে বৃক্ষসমূহ বায়ুবেগে সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল, বজ্রনির্ঘোষে সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ঠাকুরের এ-দুর্যোগেও ক্রম্বেপ

নাই—তিনি খাবার পুঁটলীটি সম্বন্ধে বগলে করিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সর্বনাশ! তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কোনও নৌকা নাই—এবল ঝড়ের ভয়ে সকলেই নদীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাতে দিনমণি অস্বস্তিত; কি-প্রকারে নদী পার হইবেন ভাবিতেছেন; কিছুই কুল-কিনারা পাইলেন না। এমন সময়ে দেখিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠের মত কি একটা তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি ‘জয় ভগবান্ তোমার কি দয়া!’ লিখা তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। নদীর উত্তাল তরঙ্গে তিনি জীবনের মায়া-সমতা পরিত্যাগ করত অতি কষ্টে নদীর পরপারে পৌঁছিলেন।

ঠাকুর ক্রমশঃ চিন্তামণির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, চৌদিকে প্রাচীর, ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই পথ নাই। তিনি চিন্তামণি! চিন্তামণি! শব্দে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কবাটে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তাঁহার কোন শব্দই ভিতরে প্রবেশ করিল না, তাঁহার চীৎকার বিফল হইয়া গেল। এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীর গাত্র হইতে লম্বমান একটা দড়ি ঝুলিতেছে। ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ‘জয় ভগবান্’ বলিয়া ঐ দড়ি অবলম্বনপূর্বক প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। তখন ঝড়, বৃষ্টি, শিলাঘাতে ঠাকুরের সুখের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; মস্তক ঘুরিতেছিল, তিনি বাহু-জ্ঞানহারা হইয়া, সশব্দে গৃহের অভ্যন্তরে পড়িয়া মুচ্ছিত হইলেন। ভিতরে চিন্তামণি শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—“শীঘ্র বাহিরে যাইয়া দেখদেখি, কিসের শব্দ হইল?” সে বাহিরে আসিয়া একটা মৃতবৎ দেহ পড়িয়া আছে—দেখিতে পাইয়া ভীতস্বরে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুরাণী! ঠাকুরাণী!! শীঘ্র এদিকে এস, একটা মড়ার মত কে ভিতরে পড়িয়া আছে। এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি দ্রুত দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, সত্য-সত্যই মৃতবৎ কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া নাড়াচাড়া দিয়া দেখিল,—সে বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর। তখন ভিতরে যাইয়া চিন্তামণি ও তাহার দাসী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঠাকুরের সর্ব শরীরে শেক দিতে লাগিল। সিন্ধু বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন শুক বস্ত্র পরিধান করাইল। এইরূপ বহু-শুশ্রূষার কলে ঠাকুরের জ্ঞান কিছু ফিরিয়া আসিল। তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত লোচনে চিন্তামণিকে দেখিতে পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—‘চিন্তামণি! আমি কোথায়?’

চিন্তামণি ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল—“ওরে ড্যাকুরা বামুন! আজ না তোমার

পিতৃশ্রাব ? এহেন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির দিনে এখানে মরিতে আসিয়াছিম কেন ?” সমুখস্থ পুঁটলোট খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে অনেক মিঠাই মণ্ডা রহিয়াছে। এইসব কাণ্ড দেখিয়া চিন্তামণিও অবাক হইয়া গেল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, চিন্তামণি কিছু গরম দুগ্ধ পান করাইয়া ঠাকুরকে স্তম্ভ করিল। তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয় গিয়াছে। দিগ্য় চান্দ্রর আলোকে জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে। চিন্তামণি ঠাকুরকে বলিল—“তুমি একরূপ দুর্যোগে কিরূপে এখানে আসিলে ?” ঠাকুর সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলে, চিন্তামণি বলিল—“চল দেখিয়া আসি, কি প্রকার দড়ি প্রাচীরে ঝুলিতেছে।” পরীক্ষা করিয়া চিন্তামণি শিহরিয়া উঠিল। উহা দড়ি নহে, একটি প্রকাণ্ড সর্প প্রাচীরের একটি গর্তে মুখ দিয়া ঝুলিতেছে। তারপর নদীর তীরে যাইয়া দেখিল, সেটা কাষ্ঠ নহে, একটি মৃত মানুষ জলে ভাসিতেছে। সেইজন্য ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিষম দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তাহাকে পুনরায় সুগন্ধি তৈল দ্বারা গরম জলে স্নান করাইল।

তখন এইসব দেখিয়া চিন্তামণি আবেগভরে ঠাকুরকে সন্মোদন করিয়া বলিতে লাগিল—“ঠাকুর ! তোমার প্রেম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে সত্য। তুমি প্রকৃতই প্রেমিক পুরুষ ; কিন্তু তুমি তাহা নিতান্ত অযোগ্য স্থানে অর্পণ করিয়াছ। আমি ঘৃণিতা বেণু, পতিতা ; আমার চাচা স্পর্শ করিলে সকলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও পতিত হইয়াছ। এই ভালবাসা, প্রেম যদি শ্রীভগবানে অর্পিত হইত, তবে সার্থক হইত।” চিন্তামণির এইপ্রকার বহু উপদেশ শুনিয়া বিলম্বমূল ঠাকুরেবু সহসা ভগবদন্তগ্রহে জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি ঐ বজ্রনীতে আর স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে বাস্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ-দোলা-কোঁর্তনে সমস্ত বজ্রনী অতিবাহিত করিয়া, প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে গুরু-জ্ঞান করিয়া তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ‘হা শ্যাম-সুন্দর ! হা শ্যামসুন্দর !! তুমি কোথা’—এইভাবে আত্মনাদ করিতে করিতে ছুটিলেন। পূর্ব্বের শুভ-সংস্কার—হু তাহার জাগিয়া উঠিল, তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সরীসৃপ-সম্মূল অরণ্য প্রভৃতি ভীত না হইয়া উন্নতের জায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে একটি পুষ্করিণীতে জল-পান করিবার নিমিত্ত গমন করিলে, ঠাকুর দেখিতে পাইলেন—একটি পরমাসুন্দরী যুবতী জল ভরিবার জন্য তথায় আগমন করিয়াছে। ঠাকুর বিলম্বমূল যুবতীর ঐরূপ লাবণ্য দেখিয়া পুনরায় মোহিত হইলেন। ভক্তিপথের কোটা কণ্টকরূপ

বহু বিয় আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া ভীষণ পরীক্ষাও করেন। তাঁহার রূপা হইলে তবে জীব এই দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ঠাকুর ঐ যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যুবতীটি একটা পুরুষ পিছনে আসিতেছে দেখিয়া সুভয়ে ঘোমটা দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে বাইরা তাহার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

জনৈক বণিক তাহার স্বামী। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে, ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলেন এবং করযোড়ে বিনয়-নম্রভাবে বণিক ঠাকুরকে বলিলেন,—“আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার মত ব্রাহ্মণকে অতিথি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। বলুন আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি?”

তখন বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুর বণিককে বলিলেন,—“তোমার স্ত্রীকে অদ্ব রজনীতে আমার সেবায় নিয়োগ করিবে—এই আমার অভিপ্রায়।”

বণিক একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—“ঠাকুর! ফল দুগ্ধাদি আহাৰ করিয়া এই ছুফ-ফেননীভ-কোমল শস্যের আপনি শয়ন করুন, আমি অন্তঃপুরে বাইরা আমার পত্নীকে আপনার অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছি।”

বণিক অভ্যন্তরে গিয়া স্ত্রীর বনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আমি তোমার স্বামী। আমার আজ্ঞা পালন করিলে, তোমার কোনই দোষ হইবে না। স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলে স্ত্রীর সতীত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে; তুমি নানাবিধ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া, সাজসজ্জা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।” বণিকপত্নী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে গমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুরের নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি বণিক-বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“মাতঃ! তোমার মস্তকস্থিত দুইটি লোহার কাঁটা আমাকে প্রদান কর।” প্রার্থনামত বণিক-পত্নী দুইটি কাঁটা উন্মোচন করিয়া যেমন ঠাকুরকে দিয়াছেন, অমনি ঠাকুর ঐ কাঁটা দুইটি লইয়া নিজের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ঠাকুরের চক্ষু হইতে অবিরত দর দর করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে ক্রক্ষেপ না করিয়া অতি দ্রুতগতিতে ‘হে বৃন্দাবনচন্দ্র! তুমি কোথায়, বলিতে বলিতে বৃন্দাবনের দিকে ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন।

কতকদিবস পরে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলে, আহাৰ নিদ্রা পরিত্যাগ করত একান্তভাবে আৰ্ত্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার সেই নিদারুণ আৰ্ত্তি দেখিয়া আর কি থাকিতে পারেন? ঠাকুর অন্ধ হইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে, খুঁজিতে খুঁজিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, ভগবান্ বালকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ভগবানের হস্তস্পর্শ-সুখ অনুভবে, ঠাকুরের আর আনন্দের সীমা নাই। রোমাঞ্চ, কম্প, হর্ষ ইত্যাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারসমূহ তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইল, বিব্রমঙ্গল ঠাকুর অজ্ঞপ্তভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সহসা বালকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত ছিনাইয়া লইলেন। তাহাতে ঠাকুর দুঃখ পাইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—“হে দয়াল ঠাকুর! ‘আমার হস্ত’ হইতে তুমি জোড় করিয়া ছুটিয়া পলাইলে সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে যদি তুমি পলাইতে পার, তবে জানিব তুমি বীর পুরুষ।” তখন বালকৃষ্ণ তাঁহার পদহস্ত ঠাকুরের চক্ষুতে বুলাইবা মাত্র বিব্রমঙ্গল ঠাকুর স্ব-চক্ষে তাহার সম্মুখে অতীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইয়া স্থূললিত কণ্ঠে তাঁহার স্তব করিলেন :—

“মধুরং মধুরং বপুৰশ্চ বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুশ্চিত মেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥”

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেম নিমীলিত নেত্রে মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবানের হস্তস্পর্শে বিব্রমঙ্গল ঠাকুরের চৈতন্য হইল। ক্রমে তিনি সিদ্ধ দশায় উপনীত হইলে নিম্ন-লিখিত কবিতাটী বর্ণন করিয়া তাঁহার জীবনের পূর্বাবস্থায় অদ্বৈতজ্ঞানের যে বিষময় ফল তাহার পরিচয় প্রদান করেন।

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাশ্রাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।

হঠেন কেনাপি বয়ঃ শঠেন দাসীকৃত্য গোপবধুবিটেন ॥

অর্থাৎ—অদ্বৈত মার্গের পথিকগণদ্বারা উপাশ্রয়, আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও, আমি কোন গোপবধু-লম্পট, শঠ কর্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীগন্তুভিবিজ্ঞান ভাশ্রম মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৯ পৃষ্ঠার পর)

ত্রেতাযুগে অদ্বয়বাদ ও তাহার পরিণতি

‘বশিষ্ঠ’

অদ্বৈতবাদিগণ ত্রেতাযুগে অদ্বৈতচিন্তার অধিষ্ঠান বশিষ্ঠাদি-হৃদয়ে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-জনক দশরথ পুত্রাকাজক্ষায় যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি তৎকর্তৃক আহৃত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

“বশিষ্ঠাদি আইলেন যত জ্ঞানীমুনি।”

—কীর্তিবাসী রামায়ণ

বশিষ্ঠও ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ছিলেন, এ বিষয়ে আরও কোন সন্দেহ বা সতভেদ নাই। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণই তাহার ঋষ্ট প্রমাণ। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার সম্বন্ধে অন্তান্ত যে-সমস্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

বাল্মীকিঞ্চ মহাযোগী বাল্মীকাদভবৎ কিল।

অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োঋষী ॥

রেতঃ সিধিচতুঃ কুন্তে উর্ধ্বশ্রাঃ সন্নিধৌ দ্রুতম্।

রেবত্যাং মিত্র উৎসর্গমরিষ্ঠং পিপ্ললং ব্যধাৎ ॥”

(ভাঃ ৬:৮।৫-৬)

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথম অর্থাৎ ৫ম শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদের (তিনি বৈষ্ণব হইলেও অদ্বৈতবাদিগণ বলেন তিনি তৎসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য্য) নিরপেক্ষ টীকায় প্রকাশ—

বাল্মীকাং বাল্মীকিবরুণশ্চৈব পুত্রোহভবৎ। এতৌ বরুণশ্রাসাধারণৌ পুত্রৌ। তথোৎসর্গাদয়ো মিত্রশ্রাসাধারণাঃ। তথোরেব সাধারণৌ ধৌ পুত্রৌ চাহ, অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ঋষী মিত্রাবরুণয়োঃভবতাম্ ॥”

অর্থাৎ স্বামীপাদ ভৃগু ও বাল্মীকি মুনির বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ‘অসাধারণ’ পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য ব্রহ্মজ্ঞানী বা মায়াবাদী ছিলেন বলিয়া সাধারণ পুত্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ ঋষ্ট শ্লোকে বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। উক্তশ্লোকে দর্শন করিয়া তৎসান্নিধ্যে বরুণের রেতঃ স্থলিত হয় এবং

ঐ বেতঃ কুম্ভমধ্যে স্থাপিত হইলে বরুণের বশিষ্ঠ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং বশিষ্ঠ উর্বশীর সন্তান বলিয়া পরিচিত হইলেন। এজন্তও হয়ত শ্রীধরস্বামীপাদ তাঁহাকে সাধারণ পুত্র বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকিবেন। বশিষ্ঠ-মুনি জ্ঞানপথে বিচরণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে নির্ভেদ ব্রহ্মের কথা শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেছিলেন। দশরথ-গৃহে স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার স্বরচিত যোগবশিষ্ঠ গ্রন্থে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তমূলক তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কুলগুরু হইলেও তাঁহাতে ঐ প্রকার মায়াবাদ জ্ঞানাবস্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে রূপা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনে বশিষ্ঠ তাঁহার মঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাইলেন—অদ্বৈত-চিন্তা-শ্রোত শ্রবণ হইয়া পড়িল। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

স্মরণ

মধ্ব-সম্প্রদায়ে একটা প্রবাদ আজ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে যে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের জ্ঞানিগণ বেদান্তের অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের আদিভাষ্যকার লক্ষাপতি দশাননকেই জানেন; সুতরাং রামকুলপতি রাবণকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাবণের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

“পুন্সস্যবংশীয় জন্মৈক ঋষি ব্রহ্মাবর্তে পরিত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল বাস করেন। রক্ষ বংশের কোন কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অর্দ্ধরক্ষ অর্দ্ধ অর্ঘ্য কহা যাইতে পারে।”

উক্ত বাক্য হইতে মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রবাদটীও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, রাবণ একজন রাক্ষস হইলেও ধোর নী পাদী ঋষি ছিলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ‘লঙ্কাবতার-সূত্র’ হইতেও জানা যায় যে রাবণ একজন অদ্বৈতবাদী ও শূত্রবাদী ঋষি। এতদ্ব্যতীত রাবণের ক্রিয়া-কলাপ হইতে স্পষ্টই প্রতীক্ষমান হয় যে, সে একজন প্রধাম অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্মের শক্তি অপহরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃশক্তি-রূপে স্থাপন করিবার চেষ্টাই অদ্বৈতবাদিগণের মূল মন্ত্র। পরব্রহ্ম রামচন্দ্রের শক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিবার চেষ্টা রাবণাত্তঃকরণে পরিদৃষ্ট হয়। মায়াবাদী রাবণ তাঁহার শিষ্যানুচর-বর্গের সাহায্যে মায়াসীতা হরণ করিবার যোগ্যতামাত্র দেখাইয়াছিল। ভগবৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে পারিলে সেই শক্তির আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত। মায়াবাদ মন্ত্র ‘সোহহং-তত্ত্বরূপ রাবণের

নীতা সম্পর্কে রামচন্দ্রের পদবী-গ্রহণ করিবার বাসনা নষ্ট হইয়া যাইত। তাই দেখা যাইতেছে, উক্ত প্রবাদ শুধু প্রবাদ নহে,—প্রকৃত্য সত্য; এবং রাবণ সত্য-সত্যই অদ্বৈতবাদী। পরম ভক্ত হনুমান রাবণ-হৃদয়ে ভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ মুষ্ঠাঘাত করায় তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান লোপ হওয়ায় মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরে রামচন্দ্রের বেদ-ধ্বনিরূপ বাঁণে নির্বাণ-দশকশীর্ষ ছিন্ন হইয়া গেল। দশানন তখন শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করিয়া নিজ সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ত্রেতাযুগেও ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মায়াবাদী রাক্ষসের বিনাশ ও অদ্বৈতবাদী ঋষির উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে ত্রেতা-যুগেও মায়াবাদের বিনাশ সাধিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

দ্বাপরযুগে অদ্বৈতবাদ ও তাহার পরিণতি “শুকদেব”

শ্রীল ব্যাসদেব-জাবালি কথ্য বীটিকাকে দত্তক-রূপে গ্রহণ করেন। (তৎ-এক-কালে পুত্র ও কথ্য উভয়ই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল।) তিনি উহার সহিত বহুকাল তপস্বী করেন। পরে পুত্র কামনায় ব্যাসদেব বীটিকাতে বীৰ্য্যাধান করেন। ফলে গর্ভসঞ্চার হইয়া দ্বাদশবর্ষ গর্ভাবাসে থাকার পর ভগবদাদেশে-ও ব্যাসের অরুরোধে মাতার ক্লেশ নিবারণ করিয়া মায়া-মুক্তাবস্থায় শুকদেব ভূমিষ্ট হইলেন। ভূমিষ্ট হইবামাত্র শুকপক্ষীর আয়, ভগবানের স্তুত করার দরুণ তিনি শুক নামে পরিচিত হইলেন। শুকের এইপ্রকার জন্মকাহিনী ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে বিষদ্রুপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯।১।২৫ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের টীকা আলোচ্য—

“বিচিন্ত্য মনসা চক্রে ভাষ্যাং জাবালিকথ্যকাম্”। বীটিকাখ্যাং দদৌ তস্মৈ মোহপি বৈখানাসাশ্রমী। ততশ্চ ব্যাসস্তয়াসহ বহুকালং তপস্তপে, তদন্তে তস্তাং বীৰ্য্যমাধত্ত। সা চ গর্ভবতী একাদশসু বর্ষেষু ব্যতীতেষপি ন প্রসূতে স্ম। অথ দ্বাদশে বর্ষে ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * অতো গর্ভান্নিসৃত্য প্রণম্য বহুস্তবানং স্বং দৃষ্ট্বা ভগবানাহ—“ব্যাস! স্বদীয় তনয়ঃ শুকবল্লনোক্তং ক্রতে বচো ভবতু তচ্ছ ক এব নাস্মেতি।”

এই শুকদেবই অভিসপ্ত পরীক্ষিৎ মহারাজাকে ভাগবত উপদেশ করিয়া-ছিলেন। হরিবংশোল্লিখিত ব্যাসপুত্র শুক—অন্য শুক। ইনি ছুরণী হইতে জাত এবং ছায়াশুক নামে খ্যাত। পরীক্ষিতের সহিত এই

শুক্রে কোন সংশ্রব নাই। বীটিকাহৃত শুক নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। ইনি নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকিলেও ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীশ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের শুক তপস্যা হইতে নিরন্তর অরিয়া শুক ভগবদ্ভজ্ঞানের সরল সহজ ভক্তিতত্ত্বে আনয়ন করেন। শ্রীশুকদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নিজের বেক্সপ পরিচর প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

“ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।

অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোক-লীলয়া।

গৃহীত-চেতা রাজর্ষে আখ্যানাং যদধীতবান্ ॥ (ভাঃ ২।১।৮-৯)

অর্থাৎ পরীক্ষিত মহারাজকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্বয়ংই বলিতেছেন,—হে রাজর্ষে! আমি নিগুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলাধারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে আমি দ্বাপর যুগে আমার পিতা দ্বৈপায়নের নিকট এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছি।

সুতরাং শুকদেব নিগুণ ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্যাসের কৃপায় তৎপথ হইতে উত্তমঃশ্লোক ভগবৎ-লীলা আলোচনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। এবং ভগবৎলীলা-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণকর জানিয়া পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবতোপদেশ করিয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন নাই; কারণ, ইহাতে পরীক্ষিতের বা অথ কাহারও মঙ্গল হইবে না। শ্রীশুকদেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য।

কংস-নাশ

অশুর-কুলতিলক কংশ উগ্রসেন রাজার ঔরসে ও পঞ্চায় গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উগ্রসেন দেব-ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কারাকান্দ রাখিয়া কংশ নিজেই তাঁহার স্থানে রাজত্ব করেন। উহার খুল্লতাত দেবক-দুহিতা দেবকীর সহিত বিগুহ-সদ্র বশুদেবের বিবাহ হয়। ‘বিগুহ-সদ্রে ভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশ হইবে’ এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মাস্তিক কংশ ভগবদ্বিগ্রহ বিনাশের কৌশল কল্পনা করিয়া দেবকী-দেবীকে কারাকান্দা করেন। মায়াবাদিগণ বিগ্রহ বিরোধী। ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত আকার নাই, ইহাই তাহাদের দর্শন শাস্ত্রের বিচার। শরীর পরিগ্রহ করাই মায়ায় ধর্ম, ইহা শরীরের শারীরিক সিদ্ধান্ত; এবং তাঁহার যে-কোন উপায়ে হউক বিনাশ সাধনই মোক্ষ। দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংশের ন্যায় প্রাকৃত বা মারিক (?) শরীর

পরিগ্রহ করিয়া আবিভূত হইতেছেন—এইরূপ মনে করিয়া কংশ তাঁহার বিনাশ সাধনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ কখনও মায়িক শরীর পরিগ্রহ করেন নাই বা করেন না—ইহা কংশের অজ্ঞাত। “অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর” ইহাও তাহার জ্ঞান নাই। মায়াবাদী কংশের ভগবদ্বিগ্ৰের প্রতি অশ্রুয়া দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাকে ও তাহারই শিষ্যানুচর প্রলম্ব, তৃণাবর্ত, অর্ঘ্য-বক-পুতনাদি অশুর গণকে বিনাশ করিয়া জীবিত্রাহের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই। কংশ ও প্রলম্বাশুর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও মায়াবাদী নাস্তিক। কৃষ্ণ ও বলদেব তাহাদের বিনাশ করিয়া তদ্বুগীয় জীবসমূহকে নাস্তি, মায়াবাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

“দৈবকীমগৃহীং কংশ নাস্তিক্য-ভগিনীং সতীং।”

“প্রলম্বো জীবচৌরস্ত শুদ্ধেন শৌরিণা হতঃ।

কংশেন প্রেরিতো দুষ্টঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ রূপধক ॥” (কৃঃ সঃ ৪।৩০)

অর্থাৎ বলদেব নাস্তিক্যের প্রতিমূর্ত্তি কংশের ভগিনী দেবকীদেবীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেই কংশের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদস্বরূপ জীবচৌর দুষ্ট প্রলম্বাশুর শুদ্ধ সৌরি বলদেব কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

উক্ত শ্লোকে ‘জীবচৌর’ শব্দের সার্থকতা এই যে, বিগ্রহ স্বীকার করাই অধিষ্ঠাত্র্যের অবস্থা এবং তাহাই জীবস্বরূপ। এই স্বরূপের অর্থাৎ বিগ্রহের অপনোদন বা অপহরণই চৌরত্ব। উক্ত অশুরগণের বিগ্রহ বিনাশ ও জীবত্ব হরণ করাই তাহাদের স্বরূপগত স্বভাব ছিল, বলিয়া উহারা মায়াবাদী নাস্তিক এবং জীবচৌর। অথবা জীবত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই ব্রহ্ম; সূতরাং অদ্বৈতবাদী জীবচৌর হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম উহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাহাদের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাপর যুগেও অদ্বৈতবাদের বিনাশ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।

যুগত্রেয়ে অদ্বৈতবাদের পরিণাম

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—তিন যুগেই ভগবদিচ্ছাক্রমে মায়াবাদের অভ্যুত্থান ও বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। উক্ত যুগত্রেয়ে আরও অনেক ঋষি ও রাক্ষস বা অশুর অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উক্ত দুই শ্রেণীর ভিতরে যাহারা প্রধান ছিলেন, তাহাদেরই জীবনী উল্লেখ করিয়া কলাকল

নির্দেশপূর্বক আপনাদের সমক্ষে মায়াবাদের জীবন্তীর আভাসমাত্র ব্যক্ত করিলাম। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী ঋষিগণকে পরমকৃপা করিয়া বৈষ্ণবধর্মের আনয়ন করিয়া নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এবং মায়াবাদী অসুর ও রাক্ষস-গণকে কৃপাবশতঃ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এইজন্যই স্বয়ং ভগবান্ ‘মুক্তিপদ’ নামে পূজিত হন। এস্তলে অসুরগণ রাখিতে হইবে প্রগৈতি-হাসিক যুগের মায়াবাদ বা নির্বিশেষবাদ বর্তমান যুগের শঙ্কর প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ বা নির্বিশেষবাদ এক নহে। বর্তমান মায়াবাদ অত্যন্ত আধুনিক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও ব্যাস-বিরুদ্ধ। ভগবান্ অদ্বৈতবাদী অসুরগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া যে সাযুজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত আশ্চর্যিক ও ক্লেশকর গতি হইলেও আত্যন্তিক নির্বিশেষরূপ মিথ্যা অবস্থা নহে। আচার্য্য শঙ্করের ‘মুক্তি’ কাল্পনিক ও মিথ্যা অর্থাৎ ইহার পারমার্থিক সত্যতা নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী দাক্ষিণাত্য বিপ্রেয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রূপেশ্বর কন্ঠস্থিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। সেই সময় হইতেই তাঁহারা বঙ্গদেশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। “কিংবদন্তী এই, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সনাতন গোস্বামীর অনেকগুলি সহোদর ছিল। তাহাদের মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ এই তিনজনের মধ্যে বল্লভ শ্রীরাম-উপাসক। অপর জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয় শ্রীরূপ, সনাতন শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা তিনজনই মালদহ জেলার অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে একত্র বাস করিতেন। রামকেলি গ্রাম গোড়-রাজধানীর নিকটবর্তী। গোড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন সাহ, সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অলৌকিক কার্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া জ্যেষ্ঠ সনাতনকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যপালন কার্যের ভার অর্পণ করিলেন। এবং মধ্যম ভ্রাতা রূপ গোস্বামীকে তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীকে ‘সাকর মল্লিক’, রূপগোস্বামীকে ‘দবিরথাস’ এবং কনিষ্ঠ বল্লভকে ‘অনুপম মল্লিক’ উপাধি প্রদান করেন। অনুপম মল্লিকও বাদশাহের অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি যে কি

কার্য করিতেন, তাহা বিদিত নহে। তাঁহারা গোড়েশ্বরের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া রামকেলি গ্রামের উন্নতি সাধনপূর্বক নিজদের জাতিবর্গকেও এই স্থানেই আনয়ন করেন। রামকেলি গ্রামে সনাতন গোস্থানী 'রূপসাগর' নামে অপর একটি সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া লেন। এই জলাশয় দুইটী অত্যাশি এই দুই নামে খ্যাতি অর্জন করিতেছে। সনাতন ও রূপ ভ্রাতৃদ্বয়কে যদিও রাজ-কার্যাত্মরোধে বাহিরে অহিন্দু-ভাষাপন্ন দেগা যাঁহিত, তথাপি তাঁহারা অন্তরে প্রগাঢ় বৈষ্ণব-ভাবাশ্রিত ছিলেন। তাঁহারা রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর বিজ্ঞাচাম্পতির নিকট বহু বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং রাজকাব্যে ব্রতী হইয়াও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। সময় পাটলেই শাস্ত্র-গ্রন্থ আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা বিশেষ শাস্ত্রাত্মবান্গী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আশ্রমে বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের সমাগম হইত। ভ্রাতৃদ্বয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগকে বিশেষ সম্মান ও সাহায্য করিতেন।

তাঁহারা অহিন্দু সংসর্গে থাকিয়াও বর্ণাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই। অনেক সময় তীর্থ-যাত্রার অভিলাষ করিলেও রাজকার্যাত্মরোধে অনবসর থাকার দরুণ তাঁহাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইত না। সেইজন্য তাঁহারা জলাশয়ের চতুর্দিকে বিবিধ পুষ্প-কানন প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া অর্চনাদি সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। গোড়েশ্বর বাদশাহ হুসেনশাহ তাঁহাদের কার্য-নিপুণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক ভূসম্পত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও সাধারণ লোকের জ্ঞান তাঁহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ধর্ম্মানুশীলন পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা ধার্ম্মিক ও দাতা বলিয়া চারিদিকে ঘোষণা হইল। বহুদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে কাক-ভক্তগণ সমবেত হইয়া তাঁহাদিগের গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিতে ক্রটি করিতেন না।

এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে, সনাতন গোস্থানী কোন একদিন রাত্রি-যোগে নিদ্রাবস্থায় একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এক পরম সুন্দর নবীন সন্ন্যাসী সনাতন গোস্থানীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—“আর কাল-বিলম্ব করিও না, সত্ত্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোভীষ্ট পূরণ সেবা-কার্যে মনো নিবেশ কর। মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। আহাৰাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণ জীবের জ্ঞান জীবন যাপনে পরমায়ু বিনষ্ট করিও না। ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি

কার্য্য পল্ল, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্মেও হইয়া থাকে। তাহার কৃষ্ণসেবার
 সুযোগ পায় না ও করিতেও সমর্থ নহে বলিয়াই তাহার হীন। তুমি অতি-
 সঙ্কর শ্রীন্দাবন যাইয়া লুপ্ততীরের উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর।” এই
 প্রকার কয়েকটি কথা বলিয়াই সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই
 সনাতন গোস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং প্রাতঃকালে শব্দা পরিত্যাগ করিয়াই
 তিনি স্বপ্নবৃত্তান্তটি রূপগোস্বামীকে জানাইলেন। শ্রীরূপ ইহা শুনিয়া
 আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“শুনিয়াছি নদীয়া জেলায় নবদ্বীপের
 অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর নগরীতে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
 অবতীর্ণ হইয়াছেন। বোধ হয় তিনিই স্বপ্নে দর্শন দিয়া ঐ প্রকার আদেশ
 করিয়াছেন। আমরা বিষয়াক-কূপে পতিত। পতিতপাবন প্রভু কি আমাদের
 উদ্ধার করিবেন?” এই প্রকার বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত
 হইতে লাগিল। স্বপ্ন দর্শনে সনাতন গোস্বামীর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল।
 হুই ভাই জনহীন স্থানে যাইয়া পরামর্শ করিয়া দৈন্ত-বিনয় উক্তিভে পরিপূর্ণ
 একখানি পত্র মহাপ্রভুকে লিখিলেন। কিন্তু পত্র পাইয়াও উপযুক্ত সময়ের
 অপেক্ষায় মহাপ্রভু কোনরূপ উত্তর প্রদান করিলেন না। সনাতন গোস্বামীও
 পত্রের উত্তর না পাইয়া পুনঃ পুনঃ কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। অবশেষে
 মহাপ্রভু ঐ সকল পত্রের উত্তরস্বরূপ নিম্নলিখিত লোকটি লিখিয়া প্রেরণ
 করিলেন।—

“পরব্যসিনি নারী ব্যাপি গৃহকর্ম্মতঃ।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তনবদুঃসারনম্ ॥”

—উপপতি-অনুরক্ত রমণীর যেমন গৃহকর্ম্মে অত্যাগ্রহ থাকিলেও অন্তঃকরণে
 সর্ব্বক্ষণই নূতন নূতন সঙ্গরস আশ্বাদন করিয়া থাকে।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন।
 সনাতন গোস্বামী লোকমুখে মহাপ্রভুর গতিবিধি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।
 মহাপ্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া
 পুনর্বার নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, এই সংবাদও ভ্রাতৃত্বের অবিদিত
 রহিল না। পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বঙ্গদেশে গিয়া শ্রীকৃন্দাবনে গমন করিবেন,
 এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের
 জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। ঠিক এই সময়েই মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে
 পদার্পণ করিলেন।

রামকৈলিভে-মহাপ্রভু

মহাপ্রভু রামকৈলি গ্রামে পদার্পণ করিলে বাদশাহ হুসেন সাহের একজন কোতোয়াল যাইয়া বাদশাহকে প্রভুর আগমন বার্তা জ্ঞাপন করিলেন । “রামকৈলি গ্রামে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি সর্বক্ষণ—
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম
রাম হরে হরে । এই ষোল নাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করেন; তাঁহার সঙ্গে
অসংখ্য লোক; সকলেই তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য, তাঁহাকে দেখিলে রাজাদ্রোহের
আশঙ্কা হয় ।”

কোতোয়ালের কথা শুনিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে সন্ন্যাসী কেমন ?
তাঁহার আচার ব্যবহার বা কিরূপ ? কোতোয়াল উত্তর করিলেন,—এই প্রকার
সন্ন্যাসী আমি আর কখনও দেখি নাই । ইহঁার সৌন্দর্য্য কোটি কন্দর্পকেও
পরাসিত করিয়াছে । অঙ্গকাস্তি তপ্ত-হেমসদৃশ উজ্জ্বল । শরীর প্রকাণ্ড—
আজানুলম্বিত ভুজ-দ্বয় । নাভি পুগভীর, সিংহ-তুলা-কটীদেশ, হংসের ন্যায় গ্রীবা,
নয়নযুগল কমল-দলের ন্যায় বিশাল । কোটি চন্দ্রও তাঁহার বদনের সম তুল্য
হয় না । অধর রক্তিমাত, দন্তরাশি মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল ও পুগঠিত ।
নাসিকা তিলফুলের গ্রায়, স্পীণ-বস্ত্রঃস্থল চন্দনে লিপ্ত । কটিতে অরুণবর্ণ বসন,
চরণযুগল পদ্মের তুল্য, পদ-নখসমূহ দর্পণের গ্রায় নিশ্চল । দেখিলে মনে হয়—
কোন রাজার ছেলে বা স্বর্গের কোন দেবতা । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল নবনীতের
স্বায় কোমল—মুহুমুহু কঠিন ভূমিতলে পতিত হইতেছে ! কি আশ্চর্য্য, সেই
পতনে পাষণ্ড চূর্ণ হয় । কিন্তু তাঁহার অঙ্গে একটিও ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়
না । ক্ষণে ক্ষণে শ্বেদ ও কম্প হইতেছে ; সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে ধরিয়া
রাখিতে সমর্থ নহে । নয়নে নদীর স্রোতের গ্রায় বারিধারা বহিতেছে । যখন
মূচ্ছা হয়, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত থাকে না । আবার চেতনা পাইলে দুই
বাহু ভুলিয়া হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীৰ্ত্তন করেন । তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য
লক্ষাধিক লোক সমাগত হইয়াছে । যে আসিতেছে সে আর গৃহে ফিরিয়া
যাইবার নামটি করে না । যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম ।”—এই
বলিয়া কোতোয়াল নিরস্ত হইল ।

গৌড়েশ্বর তাঁহাকে বিদায় দিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কয়েকদিন
পূর্বে এক ককিরের মুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম, তবে কি সেই মহাপুরুষ অস্ত
ভাগমন করিয়াছেন ? এই প্রকারে ভাবনার পর কেশবখান নামক এক হিন্দু

কর্মচারীকে হিচ্ছানা করিলেন—“কেশব! আমি যাহা শুনিলাম, রামকেলিতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক, তুমি কি তাঁহার বিষয় কিছু জান? কেশবখান অতীব সজ্জন; তিনি জানিতেন, গোড়েশ্বর হিন্দু-বিরোধী, সুতরাং তাঁহার নিকট প্রকৃত কথা না বলাই ভাল। সেজন্য সত্যকথা গোপন করিয়া বলিলেন—“একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, বৃক্ষতলে বাস করেন, ভিকাই তাঁহার জীবিকা। তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুই চারিজন লোক আসিয়া থাকে।”

কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল।

প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন।

তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই-চারি জন ॥

রাজারে প্রবোধি' কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাঞ।

চলিবার তরে পড়কে কহিল যাঞ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।:৭১-১৭৪)

গোড়েশ্বর কেশবখানের মনের ভাব বুঝিয়া লইয়া বলিলেন,—“তুমি গোপন করিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি সাধারণ ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দুগণ যাহাকে নারায়ণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তিনিই আজ সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়াছেন। আমি গোড়ের রাজা, তিনি অনন্ত বিশ্বের রাজা। নচেৎ লোকে আপনার থাইয়া তাঁহার আজ্ঞা বহন করিবে কেন? তোমরা কি আপনার থাইয়া আমার আজ্ঞা বহন করিয়া থাক? যাও, কোতোয়ালকে আমার আদেশ জানাইয়া দাও—কেহ যেন তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীন প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত

বিশুদ্ধ সান্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-স্বতোৎসবাদি যাবতীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিন্যাস’-গতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেবই ইহা সংগ্হ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীগুরুপাদপদ্মের বটপক্ষাশতম শুভাবির্ভাব-বাসরে

দীনাব প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব সঙ্গে তাঁর ভক্তসম
বন্দি আমি সবার চরণ ।

জয় জয় শচী-সুত সঙ্গে জয় অবধূত
জয় জয় গৌর-ভক্তগণ ॥১॥

সবার চরণ-ধূলি মস্তকে নইনু তুলি
সবে মিলি কৃপা কর মোরে ।

হরি-গুরু-ভক্ত প্রতি থাকে যেন রতি-মতি
—এই বর দেহ অভাগীয়ে ॥২॥

গোলোকের পতি যেই শচী-সুত হৈল সেই
রাজ্য পায় কোটি নমস্কার ।

গৌর-প্রের্ত মহাজন মোর গুরুদেব হন
তাঁর পদে নমি বারবার ॥৩॥

গৌরাজের অঙ্গকান্তি তাঁর অঙ্গে হয়ে ভাস্তি
কিবা শোভা করেছে ধারণ ।

সেই রূপ দরশনে বিমোহিত ভক্তগণে
হেন ছার কি দিবে তুলন ॥৪॥

মুদীর্ঘ ললাটোপরি উর্দ্ধপুণ্ড তাহে ধরি
অপরূপ রূপে শোভা পান ।

তিল-ফুল-জিনি নামা তাহাতে তিলক ভূষা
করিয়াছে অতি সুশোভন ॥৫॥

বক্তৃপদ্য-সম আস্ত্র তাহে মৃদু-মন্দ হাস্ত
ভক্তগণ-মন সদা হরে ।

কেমনে সে রূপ দেখি বিধি দিল দুটী আঁখি
কোটি আঁখি নাহি দিল মোরে ॥৬॥

আত্মানুশ্রিত করে দণ্ডখানি শোভা ধরে
 হস্তে শোভে শ্রীনামের মালা ।
 ফুলমালা গলে দোলে সুশোভিত বক্ষঃস্থলে
 দশদিক করিয়াছে আলা ॥৭॥
 ক্ষীণ কটিদৈশোপরি ডোর-কৌশীনাদি ধরি
 বহির্ববাসে গৈরিক বসন ।
 ঢল ঢল আঁখি দুটী তারা-সম রহে ফুটি
 গুরু-প্রেমে পূর্ণিত নয়ন ॥৮॥
 শাদপদ্মের কিবা শোভা বর্ণিতে পারিবে কেবা
 আমি ত অভক্ত হীন ছার ।
 সে রূপের মধুরিমা কেবা দিতে পারে সীমা
 ভক্তগণ নাহি পায় পার ॥৯॥
 কলি-জীব উদ্ধারিতে গোলোক হ'তে এ ধরাতে
 আবির্ভূত হইয়াছ তুমি ।
 আপনি আচরি কন্থ শিখাইতে জৈবধন্য
 ভ্রমিতেছ গোড়-ব্রজ-ভূমি ॥১০॥
 স্নাতুল চরণে তোমার দিয়ে কুসুমের হার
 সতত পূজিতে চাহে হিয়া ।
 আর্তিপুষ্প কোথা পাই ভকতি-চন্দন নাই
 তোমার পূজিব কি দিয়া ॥১১॥
 কি আছে সম্বল মোর অহু মায়াতে ঘোর
 সেবাশূন্য মুই অভাজন ।
 শুকতি-কুস্তম মোরে যদি দাও কৃপা ক'রে
 তা' দিয়ে পূজিব যুগল চরণ ॥ ১২॥
 ভক্ত-মুখে শুনি (তুমি) সর্ববশুণে শুণী
 অধম তারিতে আসিয়াছ ভবে ।
 হাই যদি হয় গুণো-দয়াময় !
 মোর-পূজা তুমি অবশ্যই ল'বে ॥১৩॥

তোমার চরণ দুটি পৃথিব বলিয়া ।

বলদূরে আছি আমি প্রতীক্ষা করিয়া ॥১৪॥

অভাগীয়ে পূজা-অধিকার দিয়া ।

কৃতার্থ করগো নারকীর হিয়া ॥১৫॥

নারকী দেখিয়া কেহ ঘণায় না চায় ।

দয়াল ঠাকুর তুমি রাখ রাজ্য পায় ॥১৬॥

ওগো দয়াময় ! মোর এই বাঞ্ছা হয় ।

তোমার শ্রীপদে সদা মতি যেন রয় ॥১৭॥

কে কোথায় আছি সব পাতকীর দল ।

ভয় নাই, ভয় নাই—এসেছে দয়াল ॥১৮॥

তোদের উদ্ধার লাগি এলো মোর প্রভু ।

কোন পতিতেরে ঘণা নাহি করে কভু ॥১৯॥

সর্ব মিলি যাই চল সেই নদীয়ায় ।

যাইয়া পড়িব লুটি সেই রাজ্যপায় ॥২০॥

তা' হলে অবশ্য তাঁর করুণা হইবে ।

সংসার-সমুদ্র হতে অবশ্য তারিবে ॥২১॥

কৃপা কর গুরুদেব শ্রীচরণ দিয়া ।

এ অধমে উদ্ধারহ করুণা করিয়া ॥২২॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিণী অভাগিনী

—শ্রীউষারাগী দেবী (ভক্তিপ্রভা)

কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

পরিব্রাজকার্চ্য-বর্ষ্য ১০৮ শ্রী ঔ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদুত্তাপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে

ব্যাসপূজা-প্রশস্তি

অগ্নি শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব । ব্যাসপূজা, গুরুপূজা বা গৌর-পূজাতে

কোন ভেদ নাই । গুরু-কৃপা ব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা পাওয়া যাইবে না ।

শ্রী বগবৎ-সেবা ছাড়িয়া নিজের স্বতন্ত্রতা-বশে সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া নিত্যই

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। এই দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-সেবা বাতান্ত আর অন্য কোন উপায় নাই। জীব প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা তাঁহার সেই সেবা লাভ করিতে পারে না; কারণ তিনি জড়াতীত। তথাপি তিনি স্বয়ং আমাদের জায় জাবের প্রতি দয়া করিয়া শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও সেবা প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য আশ্রয়-বিগ্রহ বা সেবক-ভগবানরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভগবানকে পাইতে হইলে সেবক-ভগবানের কৃপার একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপা পাইতে হইলে সর্বাবস্থায় তাঁহাকে ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ জ্ঞান করিতে হইবে; কারণ তত্বতঃ তিনি তাহাই। তাঁহাকে মর্ত্যবুদ্ধি করিলে অপরাধ হইবে এবং উদ্ধারের আর উপায় থাকিবে না। তাই উপনিষদ বলেন :—

যশ্চ দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তন্মৈত্রে কথিতা হৃদ্যা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার ভগবান পরা ভক্তি রহিয়াছে অর্থাৎ শ্রীভগবানে যেমন ভক্তি ঠিক তেমনই শ্রীগুরুদেবেও যাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার হৃদয়েই শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যসকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই গুরু-সেবকই মহাত্মা, তিনিই সর্ব-প্রকার মঙ্গলের অধিকারী।

আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়ান্নাবমন্ত্যত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যা-বুদ্ধ্যাস্ময়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ (ঙাঃ ১১।১৭।২০)

গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুকে সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না; গুরু সর্বদেবময়।

শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা-কামনাই মুক্তি-কামনা; এবং তাঁহার নিত্য সেবা-লাভই মুক্তি। কারণ, তাঁহার আশ্রুগত্যে ভগবৎ-সেবা করিলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার সেবা যেরূপ গ্রহণ করেন, অন্য কোনও প্রকারে সেরূপ সেবা গ্রহণ করেন না। “গুরু ছাড়ি’ গৌরান্ধ ভজে, সে পাপী নরকে যজে ॥”—ইহাও স্মরণ রাখা দরকার। সেবাকাজী সাধক কি করিয়া তাঁহার কৃপা পাইবেন? কি করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিবেন?—যদি নিষ্কপটতা, দীনতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, শ্রদ্ধা, শরণাগতি প্রভৃতি গুণের দ্বারা সর্বদা চেষ্টান্বিত না থাকেন? গুরু-সেবার জন্য চিত্তের স্থিরতা সর্বদাই প্রয়োজন। চঞ্চল-চিত্তে গুরু-সেবা হয় না।

সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা হওয়া চাইই; তাহা ব্যতীত শ্রীগুরুপদাশ্রয় পাওয়া যায় না।

শ্রদ্ধাষ্ট প্রেম-ভক্তির বীজ ও সোপান । যে-পর্যন্ত তাঁহাতে নিগূঢ় শ্রদ্ধার উদয় না হয় এবং তাঁহার ভজননিষ্ঠা না হয়, সে-পর্যন্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয় না ।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে পরাং জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেচ্ছিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ (গীঃ ৪।৩৯)

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মে ও তাঁহার উপদেশে বিশ্বাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেচ্ছিয় ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই মুক্তিরূপ পরম শান্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হন ।

বিশ্বাস না থাকিলে গুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা থাকে না । শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কর্ম-জ্ঞান-যোগের যতই প্রসার করুন না কেন, তিনি কোনও মতেই কর্মকান্ড এড়াইতে পারিবেন না । তাঁহাকে মারা-কারাগারে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে শ্রদ্ধা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শরণাগতির ভাব আবির্ভাব হয় । ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের চিন্তা না করিয়া, একান্তভাবে সেবাই শরণাগতের লক্ষণ । শরণাগত শিষ্যকে গুরুদেব সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন । রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ অত্যাভিলাষ প্রভৃতি বহির্জগৎ বৃত্তি যাহাতে তাহাকে বিচলিত করিতে না পারে, সে-জগৎ তাহার নিকট গুরুদেব সর্বদা উপদেশও হরিকথা কীর্তন করিয়া থাকেন এবং শিষ্যকে নানা প্রকার সেবায় নিয়োজিত করাইয়া রাখেন ; কারণ মন একটু ফাঁক পাইলেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় ।

লব্ধ্বা সুহৃৎ ভিমিদং বহুসম্ভবান্তে, মাতুয়মর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তুর্গং যতেত ন পতেদহুমৃত্যু-ষাবৎ, নিশ্চেষসায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্মৃৎ ॥

(ভাঃ ১।১৮২৯)

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ । এই জীবন অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ ; অতএব ধীর ব্যক্তি যে-পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল পর্যন্ত ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করিবেন । ‘বিষয়’ সর্বপ্রকার জন্মেই লাভ করিতে পারা যাইবে । ইহার জন্য সময় নষ্ট করার দরকার নাই । বর্তমান যুগে আমরা অভিনব যন্ত্রাদির দ্বারা যতই ভোগায়তন বৃদ্ধি করি না কেন, সেই অনাদি কালের সূর্য্য, বরুণ, পবনদেব ছাড়া আমাদের যেরূপ কোন কোশলই কার্য্যকারী হয় না, সেইরূপ আমরা যত রকমেরই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলি না কেন, শ্রৌত-পথ ছাড়া প্রকৃত মঙ্গলের পথ নাই ।

হে পতিতপাবনী মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি ! তুমি কতই দয়ালীনা !

তোমার দয়ার অন্ত নাই, তোমার মহিমা অসীম। তুমি এই অতিমর্ত্য মহা-পুরুষকে আমাদের উদ্ধারের জন্য আনিয়াছ; তোমাকে অসংখ্য নমস্কার।

হে অতির-নিত্যানন্দ বর! আপনি আচার্য্য-রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অহর্নিশ হরি-কীর্তন ও হরি-সেবা আচার ও প্রচার করিয়া কত পতিতকে উদ্ধার করিলেন, তাহার সীমা নাই। কিন্তু আমি এতই দুর্দশা-গ্রস্ত যে, তাহা আমার একটুও অনুভূতির বিষয় হইল না;—ইহা আমারই দূরদৃষ্টির ফল। আপনি নিজে প্রকাশিত না হইলে কেহ নিজের শত চেষ্টায় আপনাকে জানিতে পারে না।

বিষ্ঠাভোজী শ্রীকর যেমন তুলসীর মহিমা অনবগত, সেইরূপ আমিও শতত অনর্থগ্রস্ত বলিয়া আপনার মহিমা জানিতে অক্ষম। হে পতিতপাবন গুরুদেব! আমাকে অহৈতুকী কৃপা করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত আমার গতি নাই।

নিত্য-সেবাকাজী—শ্রীমধববিজয় ব্রহ্মচারী

স্বধামে শ্রীযতিরাজ ব্রহ্মচারী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৩শে পৌষ ১৩৬০, বৃহস্পতিবার শেষরাত্র ৪।০ ঘটিকায় শ্রীগৌর-তৃতীয়া তিথি নিষ্ক্রান্ত হইবার মুখে শ্রীপাদ যতিরাজ ব্রহ্মচারী প্রভু ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি ঐকান্তিক-ভাবে মাত্র ২ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয়ে থাকিয়া ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীঅনঙ্গমোহন সেবকখণ্ড নির্মাণ-কার্যে স্থপতি-বিচা কার্যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেরও প্রচুর সংস্কারকার্য তিনি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার শেষ জীবনের সেবার আদর্শ।

তিনি বাংলাদেশের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থবংশে উদ্ভূত হইয়া ‘শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাল্যজীবনেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া তাঁহার খুল্লতাতে নিকটেই প্রতিপালিত হন। বিষয় সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় সংসারের বিষময় ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে অনুভব করিয়া তাহা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। এবং ‘অতিমর্ত্যপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয়ে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্তব্য’ ইহা নিজ জীবনের আদর্শে প্রদর্শন করেন।

কৃত্তিককৃত্য সমাপন করিয়া গত ১লা অগ্রহায়ণ তিনি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

হইতে নবদ্বীপ হইয়া আসামদেশে চলিয়া যান। তথায় গিয়া কিছুদিন পরে ভগবৎসেবাহীন জীবনে অধিকদিন শরীর বহন করার আবশ্যক নাই মনে করিয়া অতি অল্প বয়সেই (২৮ বৎসর) ইহধাম পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার বিরহে বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি।

পরলোকে বিদ্যালতা ঠাকুরাণী

বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার বনগ্রাম সহরের অন্তর্গত দত্তপাড়ায় পরম-পূজনীয়া শ্রীমতী বিদ্যালতা ঠাকুরাণী বাস করিতেন। গত ২৫শে কার্তিক ১৩৬০, বুধবার শুক্লা পঞ্চমীতিথিতে অনুমান ৮৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত শিষ্য-শিষ্যাগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার গ্রাম বিদুষী ভক্ত মহিলা বর্তমানযুগে অতীব বিরল। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও নানাপ্রকার কাব্য-কবিতা বহু পারমাধিক্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সজ্জনতোষণী পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিতও তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং উক্ত সমিতির প্রকাশিত শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকাতেও তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সেও প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ২য় বর্ষ, ২ম সংখ্যা ৩৩৭ পৃষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে ‘গোলোকগত পরমহংসদেব শ্রীগৌরকিশোর দাস’ শীর্ষক কবিতা-প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শেষ জীবনের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ-সম্বলিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। তিনি চিরদিনই নিরপেক্ষভাবে ভগবদ্ভজন করিয়াছেন এবং কোন প্রকার নব্য কালনিক শিক্ষাকে বহুমানন করেন নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রধান প্রধান প্রত্যেক শিষ্যই এই বিদুষী মহিলার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সাধারণ ধনী গৃহস্থ-পরিবারে জীবন অতিবাহিত করিয়া মহিলা-বর্গের কি-প্রকারে ভগবদ্ভজন সম্ভবপর, তাহা আমরা এই ভক্তিমতী বিদুষী মহিলার আদর্শ হইতে জানিতে পারি। তিনি সর্বদাই শ্রীধাম মায়াপুরে ষাভায়াত করিতেন। এবং জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত স্নেহদৃষ্টিতে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ধর্ম প্রচারের প্রথম অবস্থায় এই সর্বোত্তমা মহিলা তাঁহাকে

অর্থাদির দ্বারা এবং নিজ আচার-প্রচার দ্বারা প্রচুর সহানুভূতি করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্ত এই বিদুষী মহিলার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। তাঁহার জ্ঞান ভজন-পরায়ণা মহিলা বৈষ্ণবের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি সেই পরলোক হইতে আমাদের প্রতি আশীর্বাদ করুন—ইহাই তাঁহার হ্রিচরণে প্রার্থনা।

তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুগত নামধারী নব্য কাল্পনিক সহজিয়া শিক্ষার কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না। এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে একই গুরুপরম্পরার অন্তর্গত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। আমরা প্রমাণস্বরূপে তাঁহার স্বরচিত কবিতার কিসদংশ উদ্ধার করিলাম।—“ভক্তিবিনোদ জয় বল সর্বজন। শ্রীগৌরকিশোর জয় পতিত-পাবন ॥ এই দুঁহার পাদপদ্ম মোর প্রাণধন। মন্দমতি জীবাধম এই অকিঞ্চন ॥ এই দুই আচার্য্যের শিক্ষা মাত্র জানি। নব্য কাল্পনিক শিক্ষা কভু নাহি মানি ॥ শুদ্ধ নামপরায়ণ আদর্শ বৈষ্ণব। তাঁহার ভজনরীতি অলৌকিক সব ॥”

তীর্থ মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারিলাম, গৌড়ীয় মিশনের একজন তত্ত্ব শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৫ই পৌষ, ১৩৬০. রবিবার ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূর্বজীবনে অনেক উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছেন এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র শিক্ষার সার বুলিয়া জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবার নিযুক্ত হন। শ্রীল ঠাকুরের গোলোক গমনের পর গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে থাকিয়া সাধন-ভজন করেন। তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুগত নামধারী কোন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়কেই ভক্তিপথের পথিক বলিয়া প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সাউডীর ইঁচড়েপাকা প্রাকৃত সহজিয়াগণকে চিরদিনই শ্রীল ঠাকুরের বিদ্রোহী বলিয়াই জানিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ নির্দেশানুসারে তাঁহার প্রকটকালেই তিনি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন। এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সর্বপ্রথম ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৈরিকবসন পরিধানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তিনি ইংরাজী ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে

তাঁহার ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান গান্ধীৰ্য্যের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে তিনি বিলাতে লণ্ডন সহরে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন এবং ভারতে সর্বত্রই তাঁহার প্রচার-বৈশিষ্ট্য সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।

শেষ জীবনে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার অপারমার্খিক বিচার-দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করিয়া অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতেন। এই বেদনাই তাঁহাকে শেষ জীবনে নির্বাক করিয়া নির্জনে অবস্থিত করাইয়াছিল। এবং তাহাতেই ক্রমশঃ স্বপ্নপিশুর ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার জীবনী হইতে কংস-শাসিত জগতে অকুরের অবস্থিতির কথা স্মরণ করিতেছি।

ষষ্ঠ-বর্ষারম্ভে নিবেদন

প্রতি বৎসর আমরা শ্রীমন্নহাপ্রভুর জন্মতিথিকে অবলম্বন করিয়া ফাল্গুন ১ম) সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকি। এবৎসর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেও, ষড়্-বর্ষে ষড়্-গোস্বামিগণের পাদপদ্ম স্মরণ হইতেছে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি বর্তমান ফাল্গুন সংখ্যা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু এই বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রথম দিবসে, অতঃপাশ্বেই আমরা শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা-মুখে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্ম স্মরণের সৌভাগ্য-লাভ করিলাম। অতঃপাশ্বেই আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইলেন।

বর্তমান বর্ষে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের 'বর্ষোদ্ঘাত'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে তিনি শ্রীমন্নহাপ্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়গান করিয়া বর্ষের মঙ্গলাচরণ করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার দ্বারাই শ্রীমন্নহাপ্রভুর জয়গান করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর জয়গান-কল্পে আমরা তাঁহার একটি অপূর্ব প্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যার অষ্টম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। প্রবন্ধটির নাম—'সজ্জন তোষণী পত্রিকার উদ্দেশ্য'। সজ্জনতোষণীর উদ্দেশ্য ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য একই। সুতরাং ঠাকুরের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া জীবন অতি-বাহিত করাই তাঁহার প্রকৃত জয়গান। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় ঠাকুরের আদেশ-নির্দেশ সর্বতোভাবে পালন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলাম। বর্তমান বর্ষে আমরা তাঁহার নির্দেশ বাহাতে সর্বতোভাবে অনুসরণ করিতে পারি,

ভজ্ঞ্য অমৃত পরিক্রমা-মুখে শ্রীশ্রীসিংহদেব পল্লীতে উপস্থিত হইয়া প্রহ্লাদ-মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ অস্বাভাবিকরূপে উৎপীড়িত হইয়াও ভগবানের শ্রবণ-কীর্তনরূপ উত্তম অনুশীলন পরিত্যাগ করেন নাই। আজ আমরা শ্রীসিংহ-পল্লীতে আসিয়া শ্রীল প্রহ্লাদ-মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মেও কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তিনি তাঁহার প্রিয়জনসহ বর্ত্তমান বর্ষে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আমরা প্রার্থনা করি,—আমাদের পাঠকবর্গ এবং শ্রোতৃমণ্ডলীও শ্রীশ্রীসিংহদেব ও শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের কৃপা-আশীর্ব্বাদে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠে সর্ব্বতোভাবে মগ্নললাভ করিবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য নিরূপণ করিতে গিয়া বাহা আমাদিগকে কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে শ্রবণ করাইয়া দিতেছি,—“ভক্তির নাম করিয়া অনেকস্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়াসমূহ আচরিত হয়। সেইসকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয়লাভ হয় না। অতএব আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে জীবের মঙ্গলের জন্য ‘শুদ্ধভক্তি ও ছলধর্ম্মের পার্থক্য’ বিচার করিতে যত্ন পাইব।” এই বাক্যে ‘শুদ্ধভক্তি ও ছলধর্ম্মের পার্থক্য’ স্পষ্টরূপে দেখাইবার নির্দেশ আছে। কারণ সাধারণ ব্যক্তিকে অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতে কোন কথা বলিলে তাহা তাহার সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা শুদ্ধভক্তির ‘জয়লাভের’ জন্য শ্রীল ঠাকুরের এই নির্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিব।

নবীন অপসম্প্রদায়ের তালিকা

বর্ত্তমান সময়ে কয়েকটি নবীন অপ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা তাহাদের কথা স্পষ্টরূপেই আলোচনা করিব। ইহাতে দুর্ভাগ্যক্রমে কাহারও ক্রিয়াকলাপ ও জীবন-বৃত্তান্তের প্রতি কটাক্ষপাত হইবার খুবই সম্ভাবনা। তথাপি আমরা তাহা হইতে বিরত হইব না। সংক্ষেপতঃ পঞ্চানন তেলীর নবীন সহজিয়া মত, গুরুভোগী সম্প্রদায়, গুরুত্যাগী সম্প্রদায়, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়, ভজন-খাজা সম্প্রদায়, জাতিভজা সম্প্রদায়, গোষ্ঠীভজা সম্প্রদায়, নেশায় মজা সম্প্রদায়, ‘যত যত তত পথ’ সম্প্রদায়, ভাত-কাপড়-সর্ব্বস্ব সম্প্রদায়, বামন-বোষ্টম সম্প্রদায়, ভবঘুরে সম্প্রদায়, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়, ধর্ম্মে উদ্ধাস্ত সম্প্রদায়, আখেরের ব্যবস্থাকারী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু আধুনিক সম্প্রদায়ের কথা আমরা আলোচনা করিব। উক্ত সম্প্রদায় ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রাচীন অপসম্প্রদায় ধর্ম্ম-জগতে আধিপত্য

বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের শিক্ষার গৌরবও নিতান্ত কম নহে। তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে লোক-বল, ধন-বল, রাজনৈতিক-বল, সামাজিক-বল প্রভৃতি কলির প্রাবল্যহেতু অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হওয়া বা ব্রহ্মে লয় হইয়া যাওয়া, কর্ম-জ্ঞানাদি সমস্ত উপাসনার একই কল, নারীজাতির হিতৈষণা এবং ঘর-পাগলা সম্প্রদায় লইয়া বহু সম্প্রদায় চলিতেছে।

অমরা শ্রীল ভক্তি বনোদ ঠাকুরের আদর্শ ও শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসদেবের “ধর্ম-প্রোক্ষিতকৈতব” এর আদর্শ গ্রহণ করিয়া বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সর্ববাদিসম্মত শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণ-যুক্তি দ্বারা পূর্বোক্ত ছলধর্ম, অপধর্মসমূহের হেয়তা ও অনুপাদেয়তা প্রদর্শন করিব। এই অপসম্প্রদায়গুলি সর্বতোভাবে উৎসাদিত না হইলে দেশের প্রকৃত গঙ্গল হইবে না। আমরা সমস্ত জনসাধারণকে এ-বিষয়ে যত্নবান হইতে এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে সর্বতোভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করি। উক্ত অপসম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে। অনমতি বিস্তরেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-মঞ্জুষা

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সর্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা প্রচার করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। যদিও এই সমিতির আবির্ভাব দিবস হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচারকার্য করিয়া আসিতেছেন, তথাপি বর্তমান বর্ষ হইতে উহা আরও প্রবলভাবে অঙ্কিত হইবে। উক্ত সমিতি ২৪ পরগণার অন্তর্গত হাবড়া অঞ্চলে ‘অশোকনগর কলনীতে’, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাইকুণ্ডি, মহিষদল রাজকলেজ, মহিষদল বাজার, তাজপুর, মলুবসান, গৌঁওখালি, কাশীনগর হাইস্কুল, কল্যাণপুর, এড়াশাল, পিছলদা, মঙ্গলামাডো হাইস্কুল ও বিষ্ণুপুর গ্রামে ছায়াচিত্রযোগে, বক্তৃতা-মুখে ও শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা দ্বারা সর্বত্র প্রবলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। আমরা সময় সুযোগ পাইলে ও পত্রিকার স্থানাতাব না ঘটিলে উক্ত প্রচার-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব।

এ বৎসর শ্রীব্যাসপূজা উক্ত বিষ্ণুপুর গ্রামে ও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়-মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

পোষ্টকার্ডে অঞ্জলি প্রদান

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

শ্রীচরণকমলেশু—

শ্রীশ্রীভাগবত-চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবনতিপূর্বক নিবেদন—

শ্রীপাদ মহারাজ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে কয়েকখানি পত্র দিয়াছি । আমি অপরাধী ব'লে শত্রোত্তর পাইলাম না । কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ বড়ই-দয়ালু “যে যত পতিত, সে ততই কৃপাপাত্র”— এই আশায় বসে আছি । আমি যেন একদিন আপনাদের শ্রীপাদপদ্মের চির বিঘ্ন-বিনাশন ধূলিতে অভিষিক্ত হইয়া আমার হৃদয়ের কলুষ দূর করিয়া আপনাদের পতিতপাবন নামের মহিমা জগতে দেখাইতে পারি— এই আশীর্বাদ করিবেন ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা তিথিরাজ আমাদের সম্মুখে আসিতেছেন । সেই অপ্রাকৃত তিথিরাজের পূজার সহিত যিনি আমার পথ-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁহাকে পূজা করিতে হৃদয়ে আশা পোষণ করিতেছি । কিন্তু নীচজাতি, নীচ ব্যবহার দ্বারা বেষ্টিতা হইয়া আমার দ্বারা সেই পূজা কিরূপে সম্ভব ? তথাপি ‘বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার’ আশায় তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া এই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি,— তিনি আমাকে ক্ষমাপূর্বক এই আশীর্বাদ করুন যেন আমি নিষ্কপটচিত্তে আমার সর্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে পারি । আমি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদানপূর্বক এই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি,— তাঁহারা এই আশীর্বাদ করুন যেন আমি শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবে করিতে পারি । আমার ভজন-সাধন কিছুই নাই । শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই আমার একমাত্র জীবাত্ম-স্বরূপ হউক । শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

—সেবাহীনা কাম্বালিনী শ্রীনলিনীবালা দাসী *

মতিগঞ্জ তাঁত ফ্যাক্টরী,

বনগাঁও । বাং ৮।১১।১০৬০

* এই পত্র-লেখিকা জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যা । ইঁহার স্বামী শ্রীল পূর্ণানন্দ ব্রজবাসী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি শ্রীল কেশব মহারাজের নিকট গত বৎসর ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করায় ইনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া “সহধর্ম্মিণীর আদর্শ প্রদর্শন করেন । সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁহার স্বামী “ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ” নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়াছেন । যেমন স্বামী তেমনই স্ত্রী । —সম্পাদক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৪ টাকা, মাগাসিক ২।০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১।০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ছি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ কেবল পাঠান হয় না। ইচ্ছামূলক আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সমালোচনা আদরণীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী শ্রীদামোদরার্টকম্

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলত, কাণ্ডিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈকুণ্ঠমাত্রেয়ই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১।০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯ নয় টাকা।

গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডেশ-কুণ্ডল-

শচন্দ্র-পদ্মঘণ্ড-গবব-খণ্ডনাস্ত-মণ্ডলঃ ।

বল্লবীষু বন্ধিতাত্ম-গুণ্ডভাব-বন্ধনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥২॥

নিত্যনব্য-রূপ-বেশ-হৃদ-কেলি-চেষ্টিতঃ

কেলিনম্ম-শম্বদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।

স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্ভিত্তেন্দ্র-নন্দনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৩॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ

ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ ।

নিত্যকালশ্রুত-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৪॥

নীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ-কংস-বৎস-ঘাতক-

স্তম্বদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ ।

বীৰ্য্যশীল-লীলয়াত্ম-যোষবালি-নন্দনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৫॥

কুঞ্জ-রাসকেলি-সৌধু-রাধিকাদি-তোষণ-

স্তম্বদাত্ম-কেলি-নম্ম-ভক্তদালি-পোষণঃ ।

প্রেম-শীল-কেলি-কীৰ্ত্তি-বিশ্ৰুতি-নন্দনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৬॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সংপথঃ

স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।

গোপিকাস্ত্র নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ

স্বাভিষদাস্তদোহস্ত মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৭॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকামিষ-লন্ধি-ভবিতঃ

প্রেমবাম্য-বম্য-রাধিকাস্ত্র-দৃষ্টি-হবিতঃ ।

রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ

স্বাষ্টি দাস্তদোহস্ত মে স বলবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৮॥

অষ্টকেন যন্তনেন রাধিকাসু-বল্লভং

সংস্তুবীতি দর্শনেহপি সিন্ধুজাদি-দুর্লভং ।

তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে

রাধিকাসু-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥৯॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার কান্তিচ্ছটা নব-জলধর, দলিত কজ্জল ও ইন্দ্রনীলমণিকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কম, উদয়োনুখ সূর্য্য ও বিদ্যুৎ হইতেও দীপ্তিমান, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কপূর ও কুঙ্কমযুক্ত চন্দনে চর্চিত, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥১॥

যাঁহার গণ্ডরয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুণতার সহিত মনোহরমূর্ত্ত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডল চন্দ্র ও পদ্ম-সমূহের গর্ব্ব থর্ব্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনা-সমূহে স্বীয় নিগূঢ় ভাব অর্থাৎ প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥২॥

যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিত্য নূতন, যিনি ক্রীড়া-কালীন সুখদায়ক সুহৃদ্বর্নে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলি-কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥৩॥

প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোক-পালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্ত দান করুন ॥৪॥

যিনি ইন্দ্র ও কালিরের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গর্ব্ব-খণ্ডনাদি-রূপ কেলিসুখা-ধারা-বর্ষণ দ্বারা স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তথা যিনি স্বীয় শৌর্য্য-

বীৰ্য্যাদি দ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আনাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৫॥

যিনি কুঞ্জ মধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা শ্রীরাধিকার সখীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং ষাঁহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীৰ্ত্তিরাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৬॥

যিনি রাসলীলা-সমূহ দ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সংপথ প্রদর্শন করিতেছেন, ষাঁহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্থথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় নয়ন কোণের বক্ষিম দৃষ্টি দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৭॥

শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত ব্যাকুল হন, প্রেমোৎপন্ন বাম্যভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতা বশতঃ পরম রমণীয় শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া ষাঁহার আনন্দ-সাগর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম স্নগন্ধি ও পরম সুখ-জনক চন্দন-লেপ-সদৃশ, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৮॥

যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করেন, লক্ষী প্রভৃতির পক্ষেও ষাঁহার দর্শন সুদুল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সহ আনিজিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিবৃত্ত করেন ॥৯॥

ঐকান্তিক ও ব্যভিচার

ঐকান্তিকতা কাহাকে বলে ?

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥” একটি মাত্র অন্ত ষাঁহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভূত। একটি বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীয় নানাভেদ বিপরীত-ভাব প্রকাশ করে।

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন ।

বহুশাখা ছনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ (গীঃ ২।৪১)

হে অর্জুন ! এক মাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে ; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে । লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে ।

ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন । ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার ; লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্ত । অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না । যেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষয় জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার । অদ্বয় জ্ঞান ভগবান, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয় । ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে ।

পঞ্চোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যভিচার

আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্তবাদ অবলম্বন পূর্বক এক মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন । বহুবীশ্বর বাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে । ঐকান্তিকতার অভাবে এক-জ্ঞানের পরিবর্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহুলক্ষ্যে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুত্বকে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে 'ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয় ; সেই কালে কৃষ্ণেতর বাহুদর্শন-জন্ম পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না ।

বহু-ঈশ্বরবাদিগণ অসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন সেবক যেমত বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুবীশ্বর-বাদের প্রশ্রয় দেন না । ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয়—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না । উপাস্তবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না । অজ্ঞুরাগের অভাব হইতে ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহুবীশ্বরের প্রবর্তন । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রাদীশাদপেতস্ত বিপর্য্যয়োহস্বতিঃ’ । (ভাঃ ১১।২।৩৭)

উপাস্তৃ বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অধর-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভয় হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অন্তর্যামী ঐকান্তিকতা বিস্তরণ করাইয়া ভয়রূপ ব্যাভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্তৃ বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

বহু ঈশ্বরবাদী ব্যাভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যাভিচার-ক্রমে কামনামুসারে নিজ নিজ কাম, পুষ্টি-ভৃত্য, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্তন করেন তাহারা বহুঈশ্বর বাদী ও ব্যাভিচারী। ভগবৎ-ভক্ত হইতেই বিমুখতাক্রমে বাহ্যিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়।

কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অধর-জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যাভিচারি-সম্প্রদায় এই বৃত্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে সম্মত হইয়া না। ব্যাভিচারীর দল বলেন কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজকের মতভেদ আছে। গণেশ পূজা করিলে অর্থনৈতিক অবশ্যজাবী, কিন্তু কৃষ্ণ পূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যাভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই স্থায় ব্যক্তিগত জড় স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা, কিন্তু পঞ্চোপাসকী ব্যাভিচারী

এহলে বিচার্য্য বিষয় এই যে—কৃষ্ণ বস্তুটী জড়ের অন্ততম নহে। কৃষ্ণ-দাস্ত্রে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যাভিচারিদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের স্থায় হের-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ পূজকের স্বার্থ পর্যালিখিত। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণ-শরণের স্বার্থ বিলোপ সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্ত-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ব্যক্তিগত স্থানিত স্বার্থ নহে।

উপাস্ত্রের বহুত্বে ভোটাধিক্য হইলে ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ 'পঞ্চাইতী শাসনে' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক ; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অমুরাগের স্বরূপ ধাহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু—ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অগ্নের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা পরায়ণ, আবার তাঁহার স্বভাবাতীতীয় শ্রদ্ধা উদ্দেশ্যের অমুকুল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। 'সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি ধাহার হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদয়-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত ; ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

পাঁচ মিশালী মত পরিভ্যাগ করিয়া ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে কৃষ্ণের অল্প বস্তুতে জীবের অমুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুবীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সংপথে আনয়নের জন্ত, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্ত যত্ন করেন, কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণের দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলে আদর পাইতে পারে ; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্টা ছাড়িয়া দেন, তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

—জগদ্বন্ধু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর

ভেক-ধারণ

আশ্রম-চতুষ্টয় ও তাহার লক্ষণ

কোন মহাত্মা বৈষ্ণব এই বিষয়ে আমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলি এখানে না দিয়া কেবল উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

‘ভেক’-শব্দে ভিক্ষুদিগের আশ্রমকে উদ্দেশ্য করে। মানবের আশ্রম শাস্ত্র ও যুক্তিমত চারিটি মাত্র—গৃহস্থাশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখুন বা শাস্ত্রের চক্ষেই দেখুন, উক চারিটি আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম মানব-জাতির সম্ভব নহে। আশ্রমের সংখ্যা লঘু করিতেও পারিবেন না। এইসমস্ত আশ্রম-তত্ত্বের বিচার ‘শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত’-গ্রন্থে [২য় বৃষ্টি, ৪র্থ ধারায়] সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিব। বিবাহ করিয়া সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণই গৃহস্থ আশ্রমে স্থিত। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করত নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণই সন্ন্যাসাশ্রমী। ব্রহ্মচর্য ও বাণপ্রস্থ ইহাদের মধ্যবর্তী। ব্রহ্মচারিগণ দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইতে পারেন অথবা একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। বাণপ্রস্থ আশ্রমে স্ত্রী কোন কোন স্থলে সঙ্গে থাকিতে পারেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নামই ভিক্ষু-আশ্রম। সন্ন্যাসীবাক্তি আর এজীবনে স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারেন না। তিনি ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন।

ভেক-ধারিগণের আশ্রম নিরূপণ

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ আশ্রমে অবস্থিতি করেন? আমরা যতদূর শাস্ত্র ও শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এইপর্য্যন্ত স্থির করিয়াছি যে, নিঃসঙ্গ বৈষ্ণবগণ ভিক্ষুদিগের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে যখন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তখন তাঁহাদের আশ্রমের নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের চিহ্নই কোপীন। তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন। অতএব তাঁহারা ভিক্ষুদিগের আশ্রমে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের অনুশীলন করেন।

ভেক-ধারণে বা সন্ন্যাসে কোন্ বর্ণের অধিকার?

এখানে বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণবদিগের ভেকধারী ব্যক্তিগণ সকল বর্ণ হইতে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন—ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ কি না? আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-বর্ণ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী

নন। শাস্ত্রবাক্য সর্বদা নির্মল। বেদসিদ্ধ শাস্ত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণের যে লক্ষণ করিয়াছেন, সেই সেই লক্ষণ যদি কোন পুরুষে না থাকে, তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৃথা। বৃথা শ্রম (অন্তরেজ্রিয়ের বশীভূততা), দম (বাহ্যেজ্রিয়ের দমন) ইত্যাদি গুণগণ না থাকিলে সন্ন্যাসাশ্রম-গত পুরুষ অতি শীঘ্রই লাম্পট্য ও ভোগবাজার দ্বারা উক্ত পবিত্রাশ্রমের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া উঠিবে। অতএব ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকার নাই।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ থাকিলে সন্ন্যাসের অধিকার কলিকালে স্বভাব হইতে বর্ণ-নিরূপণ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়াছে। এখন কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব। এখানে ব্রাহ্মণজাতি হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী পাওয়া চলিত। কিন্তু স্বভাব-গতিকে অন্যান্য বর্ণ হইতে উক্ত আশ্রমের অনেক অধিকারী পাওয়া যায়। এই নিগূঢ় শাস্ত্রবিচার হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাসাদি মহাজনগণকে ভিক্ষুদিগের আশ্রম গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনধিকারীর পক্ষে ভেক বা সন্ন্যাস নিষিদ্ধ

সেই সময় হইতে এই ভেক-ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রের বা পদ্ধতির কোন দোষ নাই। বাহারা ঐ পদ্ধতি প্রথমে প্রচলিত করেন, তাঁহাদেরও দোষ নাই। কিন্তু সমস্তই কালের দোষ! জন্মমাত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস যেরূপ গর্হিত, অনধিকারী অপর বর্ণের নরগণের পক্ষেও ভেকধারণ তদ্রূপ গর্হিত,—ইহাতে সন্দেহ নাই। অধিকার লাভ করিয়া সকল ব্যক্তিই ঐ আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত সকলকেই গৃহস্থ-ধর্ম্যে থাকা কর্তব্য।

অবিবাহিত গৃহীর লক্ষণ

কি কি বিষয়ে ভেকধারণের অধিকার জন্মে, তাহা বিচার করা কর্তব্য। মানব যাত্রেই গৃহস্থ হইবার অধিকার আছে। গৃহস্থ হইলে স্ত্রী পরিগ্রহ করা যায়, কিন্তু স্ত্রী পরিগ্রহের সম্বন্ধে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্ত্রী পরিগ্রহ না করিয়াও অক্ষম ব্যক্তিগণ অন্যান্য গৃহস্থের সাহায্যে গৃহস্থ হইয়া থাকিতে পারেন।

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাসলাভের অধিকার নির্ণয়

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যে কয়েকটি অবস্থা উদয় হওয়া আবশ্যক, তাহা বলিতেছি।—

১। শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য—এই চারিটি ধর্ম উদয় হইলে ভিক্ষু-দিগের আশ্রমে অধিকার হয়। তিতিক্ষা (দুঃখাদি সহনের অভ্যাস) ও বৈরাগ্য (সমস্ত নশ্বর বস্তুতে অবস্ত জ্ঞান) এই দুইটি সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম।

২। নশ্বর বস্তু ও অবিনশ্বর বস্তুকে পৃথক্ করিয়া জানার প্রয়োজন।

৩। অবিনশ্বর বস্তু লাভের সম্যক্ উপায় লাভ।

এই তিনটি গুণ যে শরীরে উদয় হয়, সে শরীর সন্ন্যাস লিঙ্গ গ্রহণ করিবার অধিকারী।

সন্ন্যাস ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের পার্থক্য

সামান্যতঃ সন্ন্যাস-ধর্ম হইতে বৈষ্ণব সন্ন্যাসের একটু ভেদ আছে। সামান্য বার্ণিক সন্ন্যাসীদিগের শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য সদস্য জ্ঞান ও ব্রহ্ম-লাভের উপায় মাত্রই প্রয়োজন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদিগের কেবল ঐ সকল গুণ থাকিলেই ভেকের অধিকার হয়, এমত নয়। আদৌ ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজন ও অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন ভাগবতী রতি উদ্ভিত হয়, তখন বিরক্তি বলিয়া একটা ধর্ম বৈষ্ণবকে আশ্রয় করে। তাহা করিলে বৈষ্ণবের আর নিরর্থক কর্মের গৃহস্থায়ণ ভাল লাগে না। তখন বৈষ্ণব আপন অভাব খর্ব করিবার মানসে কৌপীনাди ধারণ ও ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্বাহ করেন। ইহার নাম—বৈষ্ণবদিগের ভেক। ১০ যিনি সরলতার সহিত ভেক ধারণ করেন, তিনি জগতের পূজনীয়। এবং প্রকার ভেক গ্রহণ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ভাবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন, কেহ বা স্বয়ং ঐ প্রকার লিঙ্গদ্বারা নিজেই হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভেক অতিশয় পবিত্র পদ্ধতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকের সহিত সেই পদ্ধতিকে বারম্বার দণ্ডবৎ করি।

স্বয়ং ভেক বা সন্ন্যাস গ্রহণ অবিধি ও দৌরাভ্য বিশেষ

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসাশ্রমের জ্ঞায় ভেকাশ্রমও আজকাল অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। অধিকার বিচার একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাহার ভেক লইতে ইচ্ছা হইল, সে ক্ষণমাত্রের মধ্যে মস্তক মুণ্ডন পূর্বক কৌপীন ধারণ করিয়া বসিল। আজকাল বৈষ্ণব-সমাজে ভেক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা দৌরাভ্য প্রচলিত হইয়াছে। সমস্ত সরল বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যথার্থ কৃপাপাত্র সাধুগণ ঐ সকল দৌরাভ্যের

অনুমোদন করা দূরে থাকুক, তাহা দেখিলে চক্ষুকে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করেন।

ভেক ও সন্ন্যাস সম্পর্কে বর্তমান দৌরাভ্যের বিচার

১। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কোপীন ধারণ করিয়া যগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাহাদের এরূপ আশ্রম-সাক্ষ্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত-প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ ধারণ দ্বারা কি লাভ হইবে? কেবল বৈষ্ণবধর্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফলভোগ করিবেন।

২। আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্বাশ্রমের স্নানিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চল না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত পুরুষ কখনই থাকেন না; দেবসেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐসমস্ত কার্যের মূলীভূত তত্ত্ব।

৩। নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও স্ত্রীলোভ অত্যন্ত বর্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাভ্য থাকায় নঃস্তু নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে। ফলকথা, ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্মের কলঙ্ক-স্বরূপ।

অবৈধ ভেক ও সন্ন্যাসে বৈষ্ণব-ধর্মের অবমাননা ও অধঃপতন

ফলকথা এই যে, অবিবেচনা ও মন্দ উদ্দেশ্যই এই সকল দৌরাভ্যের জনক-জননী। ভেক গ্রহণ করার পূর্বে সকলেই বিশেষ সতর্কতা-সহকারে আপন আপন অধিকার পরীক্ষা করিবেন। ভেক গ্রহণ করিলেই হয়, তাহা নয়। ভেক 'যথাবিধি' গ্রহণ করিতে পারিলে সর্বার্থসিদ্ধি হয়। অযথা-বিধি ভেক গ্রহণ করিলে নিজের অধঃপতন ও বৈষ্ণব-ধর্মের অবমাননা হয়।

অধিকার-বিচার করার জন্য ঠাকুরের আবেদন

আমরা কৃতাজ্ঞাপূর্বক জগতের নিকট এইপ্রকার আবেদন করি,—হে মহোদয়গণ! অধিকার বিচারপূর্বক কার্য্য করুন। অধিকারই সকল-বিষয়ের মূল। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

স্বৈ স্বৈধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

রিপর্য্যয়ন্তু দোষঃ স্মাদ্ভ্যয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

নিজনিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ। তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ। অতএব, অধিকার বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না। যে পর্য্যন্ত বিরক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত গৃহধর্ম পালন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করুন। বিরক্তি হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করুন। একাদশ-স্কন্ধে ভগবান্ বাল্যোছেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাস্তু নির্বিঘ্নঃ সর্বকর্ম্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গহর্যন্ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

যে-পর্য্যন্ত গৃহ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, সে-পর্য্যন্ত আমার কথাতে জাতশ্রদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মফলে নির্বেদ লাভ করুক। সমস্ত কামকে দুঃখাত্মক জানিয়া ও তাহাদের শেষ ফলকে মন্দ বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে ও তাহাদিগকে আমার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া স্বীকার করুক। এবং আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করুক।

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর নিজ গৃহে অবস্থান নিষিদ্ধ

হে সাধুগণ! ইহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের লক্ষণ। “কটিং কৃত্বা বনং ব্রজেৎ”—এই বৈষ্ণবী তন্ত্র হইতে স্থির হয় যে, ভেকধারণ করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা বৈষ্ণবের লক্ষণ নয়। ভেকধারণ করিয়া বিচরণ-করণ-সময়ে যে লক্ষণ, তাহা ভগবদুপদেশ দৃষ্টি করুন।

“আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ মরাদিষ্টানপি স্বকান্।” (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর পারমহংস্য বৈষ্ণবাশ্রম

পুনশ্চ—“সলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি-গোচরঃ ॥” (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে গুণদোষ দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করিবে। তখন সমস্ত লিঙ্গের সহিত আশ্রম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিসকলের অতীত যে পারমহংস্য বৈষ্ণবাশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করিবে। এই বাক্যদ্বারা বৈষ্ণবাশ্রমকে পঞ্চমাশ্রম মনে করিবেন না। যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক এবং সেই আশ্রমের লিঙ্গতে নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন। এবিষয়ে আর অধিক কথা আপাততঃ বলিব না। আবশ্যকমত পরে এবিষয়ের অনেক আলোচনা হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মকে পঞ্চ

হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

সেই অপার করুণাময় শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে তখন যাহা বলাইবেন, আমরা তাহাই বলিব। বৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক অচ্যুত নিরন্তর হইলাম।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পঞ্চক (৪)

(ক)

প্রভুপাদ !

মায়া'র সংসার ত্যজি'

কৃষ্ণ-প্রেম-রসে মজি',

কবে হ'বে-মায়াপুরে বাস।

তব রাগা শ্রীচরণ,

কবে, হ'বে দরশন,

কবে মোর পুরিবেক আশ ॥

কবে দু'টি বাহু তুলি',

গৌর-নিত্যানন্দ বলি',

বেড়াইব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

কবে গিয়া মায়াপুরে,

স্মান করি' গঙ্গানীরে,

শ্রীপ্রসাদ খাইব মাগিয়া ॥

আপন আপন করি'

যার লাগি কেঁদে মরি,

সেই ধন, পুত্র-পরিজন,

কহিয়া মায়া'র কথা,

দেয় তারা প্রাণে ব্যথা,

বাধা দেয় সেবিতে চরণ ॥

সুখা'ব বৈষ্ণবগণে,

প্রভু ! তব শ্রীচরণে

(কবে) মন-প্রাণ দিব উপহার।

এ দীন গোপাল কয়,

কবে হ'বে ভাগ্যোদয়,

কবে পাব সেবা-অধিকার ॥

(খ)

প্রভুপাদ !

আমি অতি অভাজন, নাহি মোর বিত্যাগন ;

তব পদ সম্বল আমার ।

জীব উদ্ধারিতে তুমি, নিত্যানন্দরূপে স্বামী,

এই সে প্রপঞ্চে অবতার ॥

চরণের ধূলি তব, হয় মোর বৈভব,

(তব) নাম-সুধাপানে মোর আশ ।

শুদ্ধসত্ত্বময় তুমি, অতি হীনজন আমি,

তুমি প্রভু,—আমি তব দাস ॥

জীবের দুর্দশা হেরি', তত্ত্বগণে সঙ্গে করি',

নাম শিক্ষা দেহ সবতনে ।

পাষাণ্ডে দলন করি', কল্মসকল রূপ ধরি',

কৃষ্ণ-প্রেম দেহ হীন জনে ॥

তুমি প্রভু গুণমণি, আমারে পতিত জানি',

চরণের তলে দেহ স্থান ।

তোমার চরণ তলে, লুটায় গোপাল বলে,

কৃপা বারি কর বরিয়ণ ॥

(গ)

প্রভুপাদ !

কৃষ্ণ-নাম চিন্তামণি, গোলোক হইতে আনি',

করিতেছ জীবে বিতরণ ।

নাম-নামী একতর, হয় নিত্য শুক সত্ত্ব,

এই শিক্ষা পায় জীবগণ ॥

কৃষ্ণ-বস্তু চারি মর্শ্ব, নাম-রূপ-গুণ-কর্শ্ব,

এই সত্য করিছ প্রচার ।

অনন্ত মহিমা তব, তব তত্ত্ব কি জানিব,

জড় বুদ্ধি হয়ত আমার ॥

মায়াবদ্ধ জীব আমি, সংসার মরুতে ভ্রমি,
হিতাহিত জ্ঞান নাহি মোর ।

কেমনে অনর্থ যাঁবে, কৃষ্ণ-নামে শ্রদ্ধা হ'বে,
হ'য়ে আছি সদা আত্ম-চোর ॥

নাম সে পরম ধন, তাহে মোর নাহি মন,
পুরীষের কীট হ'তে হীন ।

যেবা মোর নাম লয়, তার পুণ্য ক্ষয় হয়,
(তাই) এ গোপাল কান্দে নিশিদিন ॥

(ঘ)

প্রভুপাদ !

অনুগত যেই জন, তা'রে দেহ শ্রীচরণ,
তোমার শরণ লইনু আমি ।

মায়াময় এ সংসার, পুত্র-মিত্র-পরিবার,
এই সব রক্ষা কর তুমি ॥

আপনার জানি যাহা, সঁপিলাম পদে তাহা,
এবে কৃপা কর প্রভু মোরে ।

আমি বড় অপরাধী, নাহি জানি সাধনাদি,
ঘৃণা নাহি কর দীনঘোরে ॥

দেহ-কর্ম্ম-বাক্য-মন, করি' সব সমর্পণ,
তব রাজ্য চরণের তলে ।

তোমার চরণে আমি, শরণ লইনু স্বামী !
বাঁধিয়া রাখহ মোরে বলে ॥

সকলের প্রভু তুমি, এই বর মাগি আমি,
কিঙ্কর করিয়া লহ মোরে ।

তোমার সেবাতে মন, থাকে যেন অনুক্ষণ,
পালহ গোপালে এই বরে ॥

(৬)

প্রভুপাদ !

মফট বৈরাগী সাজি' গোরা ছাড়ি' লোক ভজি,

মোহে মত্ত বিষয়ে আসক্ত ।

অন্তরেতে কু-বাসনা, বাহে নিষ্ঠা লোক জানা,

নামে-মাত্র তব অনুরক্ত ॥

মহাপ্রবঞ্চক আমি, স্থগিত-প্রতিষ্ঠা-কামী,

অনিত্য স্থিতে সদা মত্ত ।

সাধুসঙ্গ পরিহারি', নরকেতে বাস করি,

ভোগাশায় প্রমত্ত এ চিত্ত ॥

হারায়ৈ সুকৃতি যত, তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে রত,

ভুলিয়াছি আমি কৃষ্ণ-দাস ।

জ্ঞান-কর্ম-মারাবাদে, আশ্রয় করেছি সাধে,

পরিয়াছি গলে মায়া-ফাঁস ॥

আমি কৃষ্ণ-বহিস্মুখ, কৃষ্ণদাস্ত্রে মহাসুখ,

কভু নাহি করি আশ্বাদন ।

অনন্ত শক্তি-বলে, (প্রভু) রক্ষা কর এ গোপালে,

এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চন ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণরত্ন

নারমা (মেদিনীপুর)

শ্রীদক্ষ-যজ্ঞের উপাখ্যান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রজাপতি দক্ষের শিব নিন্দা

প্রজাপতি দক্ষ সভাস্থ দেববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“হে দেবগণ ! আমার কনিষ্ঠ জামাতার গুণ শ্রবণ কর । ইনি বয়সে পিতারও জ্যেষ্ঠ । কোন গুণ নাই, কেবল সিদ্ধি সেবনে নিপুণ, আচার ভ্রষ্ট, শৃঙ্খল-মসানে ভূত-প্রেত সঙ্গে ভ্রমণ করেন । ইঁহাকে স্পর্শ করিলেও পুণ্য ক্ষয় হয়; ইঁহাকে

ব্রাহ্মণ বলা যায় না, কেন না, ইনি বেদাচার শূন্য ; ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না—কেন না, জটা ও ভস্ম গায়ে মাখেন ; বৈশ্যও বলা যায় না—কেন না, ইঁহঁর কোন ব্যবসায় কিছা কোন চাষ-বাসও নাই ; শূদ্রও বলা যায় না—কেন না, ব্রাহ্মণ সকল ইঁহাকে প্রণাম করে—নাগের পৈতাও গলার আছে । ইঁহাকে গৃহী বলা যায় না—কেন না, ইনি ভিক্ষা মাগিয়া খান, অতিথি সেবা করেন না । সন্ন্যাসীও বলা যায় না—কেন না, সতী-বি আবার তাঁহার গৃহিণী ; ইঁহাকে ব্রহ্মচারীও বলা যায় না—কেন না, ডাকিনী, শাকিনী, ভূত-প্রেত সঙ্গে ইনি বিহার করিয়া থাকেন । একি মহাপাপ হু ! আহা আমার এমন সুন্দরী কন্যা, তাহাকে মকট-লোচন বানরের হস্তে সমর্পণ করিলাম” ।

সতীর দেহত্যাগ ও অভিশাপ

এইরূপ শিব নিন্দা অবশেষে সতীর দেহ ক্রোধে অগ্নিময় হইয়া উঠিল । তিনি আরক্ত লোচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“পিতঃ ! আপনি মতিচ্ছন্ন হইয়া কাহাকে কি বলিতেছেন ? ভগবন্মায় আপনার জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে । তাই আপনি এরূপ বিকারী রোগীর ন্যায় প্রলাপ বকিতেছেন । যিনি সদাশিব, যিনি জগতের মঙ্গল-নিদান, তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া একি বিপরীত বলিতেছেন ? যাঁহার শত্রু-মিত্র নাই, যিনি সম, নিরহঙ্কার, আপনি সেই জগৎ-পূজ্য আমার পতিকে নিন্দা করিতেছেন ! আমাকে এখন লোকে দাক্ষায়ণী বলিলে, তাহা আর সহ করিতে পারিব না । আপনার প্রদত্ত এই শরীর আমি যোগবলে এখন-ই ত্যাগ করিব । আপনি যে মুখে শিব-নিন্দা—বৈষ্ণব-নিন্দা করিলেন—অচিরেই তাহা ছাগমুণ্ডে পরিণত হইবে ।” এই বলিয়া সতী নিদারুণ দুঃখে উত্তরমুখিনী হইয়া যোগাসনে বসিলেন । তাঁহার মস্তক হইতে বিষম ধূম উদ্গীরণ হইতে লাগিলে যজ্ঞের চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল । দেখিতে দেখিতে সতীর দেহে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল । তিনি মূচ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন । এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া যজ্ঞস্থ সকলেই হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল । সতীর রক্ষক নন্দী-ভৃঙ্গী এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কৈলাসে উপস্থিত হইয়া বিহ্বল মূলে যোগাসনে উপবিষ্ট সদাশিবকে সেই নিদারুণ বার্তা জানাইয়া বলিলেন—“সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ।”

দক্ষ-যজ্ঞ নাশ

এই নিদারুণ সংবাদে শিব, রুদ্ধরূপ ধারণ করিলেন । প্রলয় কালীন

হর-কোপানলে ত্রিভুবন-ভস্মীভূত হইয়া যায় ;—এখন যেন তিনি অকালেই এই ভীষণ সংহার-লীলা ধারণ করিলেন। বোম্-বোম্-বোম্-শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যেন সকলের কর্ণ-কুহর ফাটিয়া বাইতে লাগিল ; ক্রোধে তাঁহার জটাজাল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ; আর বন্ধা নাই। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া একটি জটা ছিড়িয়া ভূমি তলে, নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটা হইতে একটি বিকট অদ্ভুত-ফিমা-কার মহাবীরের সৃষ্টি হইল। তাহার মস্তক আকাশে উঠিল, ভীষণ ক্রকুটী দংশিত-বিকাশে জীব-জন্তু ভীত হইয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ভীষণ পদ-প্রহারে ভূমিতল ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, যেন অকালেই প্রলয়ের সূচনা হইল। দুইটী চক্ষু কোটী সূর্যের ন্যায় যেন জ্বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ মূর্তি শিবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল প্রভো ! আমাকে কেন সৃষ্টি করিলেন—আমি আপনার কি কার্য সাধন করিব ? আমার নাম কি, আমি পৃথিবীকে এখনই রসাতলে প্রেরণ করিতে পারি—কি আজ্ঞা হয়, আদেশ করুন।

শ্রীশঙ্কর তাঁহার হস্তস্থিত ত্রিশূলটী তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন—“তোমার নাম বীরভদ্র। তুমি আমার অংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যাও বৎস এই ভীষণ ত্রিশূল দিয়া দক্ষ-যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাহাকে সংহার কর।” এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বীরভদ্র ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া ভূত, প্রেত, পিশাচ ও প্রমদগণ সঙ্গে বিকট চীৎকার করিতে করিতে দক্ষালয় অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরভদ্রের পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল, ক্ষিতি টলমল করিতে লাগিল ; বোধ হইতে লাগিল পৃথিবী যেন অচিরেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এদিকে দক্ষের যজ্ঞস্থলে আহূত দেববৃন্দ ও নিমন্ত্রিত সকলেই প্রমাদ গণিলেন, তাঁহারা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন—ধূলিতে চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল, কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। বীরভদ্রের দল যজ্ঞের চতুর্দিক ঘেরিয়া ফেলিল, কাহারও পলাইবার অবকাশ নাই। চতুর দেবগণ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্র ময়ূরের রূপে, যমরাজ কাক-রূপে, নানা দেবতা নানাভাবে যজ্ঞ হইতে অদৃশ্য হইলেন। কতকগুলি পেটুক ভোজনের লালসায় যজ্ঞস্থলে থাকিল, তাহাদের দুর্দশার আর সীমা নাই। বীরভদ্র আসিয়াই প্রধান পুরোহিত ভৃগুদেবের লম্বা শাশ্রু সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিল ; পুষা-দেবতাগণ শিব-নিন্দা কালে দন্ত বিকশিত করিয়া হাস্য করায় বীরভদ্র মুঠাঘাতে তাহাদের দন্ত-সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা চক্ষু-কোণ দ্বারা নিন্দায় উৎসাহিত করিয়াছিল,

বীরভদ্র তাহাদের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিল। বীরভদ্র প্রস্রাব করিয়া যজ্ঞানল নির্বাপিত করিয়া দিল। অপর দিকে কতকগুলি ভূত-প্রেত পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, পাকশালায় মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিল। হী-হী করিয়া কাহারও বস্ত্র ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও নখের আঁচরে গাত্র রক্তাক্ত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের তুমুল আর্তনাদ ও ক্রন্দন আরম্ভ হইল। এইরূপে বৈষ্ণব নিন্দার ফলও ফলিতে আরম্ভ হইল।

বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে নানাবিধ পীড়ন করিতে লাগিলেন, তাহাতেও যখন তাহার মৃত্যু হইল না, তখন এক উপায় স্থির করিলেন। ছাগ বলি দেওয়ার যুগকাষ্ঠে দক্ষের মুণ্ড দিয়া মুণ্ডটী টানিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যজ্ঞকুণ্ডে দক্ষের মুণ্ড আহুতি দিলেন। এমত সময়ে শ্রীশঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসূতি জামাতাকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। —শিব প্রসন্ন হইয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থ সকলকেই জীবিত করিয়া দিলেন। কেবল দক্ষ জীবিত হইয়া, মুণ্ডবিহীন হইয়া কবন্ধের আয় ঘুড়িতে লাগিলেন। সতীর অভিশাপ আছে জানিয়া তিনি একটি ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের শিরে যোজনা করিয়া তাহাকে জীবিত করিলেন। তখন দক্ষের জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি প্রীতিভরে শিবের স্তব করিতে লাগিলেন। শিব প্রসন্ন হইলে—যজ্ঞেশ্বর হরি তৎক্ষণাৎ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদা ধারণ করিয়া যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। দক্ষের যজ্ঞ এইবারে পূর্ণ হইল।

সাধু সাবধান! বৈষ্ণব অপরাধের এই ভীষণ পরিণাম—“ছাগমুণ্ড”। সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!!

—ত্রিদিগ্ভিষ্মানী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত

নিশুদ্ধ সান্ন্যাসত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষাবতীয়া দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পঞ্জিকা কার্যালয়ে প্রাপ্য।

মাস্ত্রাবাদেৰ জীবনী

(পূৰ্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠাৰ পৰ)

আধুনিক মতে কালেন্দ্ৰ বিভাগ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেৰ বিচাৰে অথবা তন্নতবাদে অনুপ্রাণিত ভাৰতীয় শিক্ষিত সমাজেৰ ও অক্ষজবাদী জ্যোতিষিগণেৰ বিচাৰে উক্তযুগত্ৰয়েৰ স্থিতিকাল ও বৰ্ত্তমান কলিযুগেৰ যে কাল অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া নিৰূপিত হইয়াছে, তাহাতে কাহাৰও কাহাৰও মতে আনুমানিক ৭৫০০ বৎসৰ। উক্ত মতবাদেৰ ভিতৰ প্ৰবিষ্ট না হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও ভাৰতীয় জ্যোতিষিগণেৰ মতেৰ কিয়ৎপৰিমাণে সামঞ্জস্য কৰত বিচাৰ কৰিয়া দেখিলে কালগত বিচাৰে অশ্বৰগণেৰ বিনাশ ও মোহনামৰ্খে ভগবানেৰ আবিৰ্ভাবেৰ একটা ধাৰা লক্ষ্য কৰা যায়। একেণে সেই ধাৰাৰ একটা মোটামুটি বিচাৰ প্ৰদৰ্শিত হইতেছে। সত্যযুগেৰ আবিৰ্ভাবেৰ আনুমানিক ৫০০ বৎসৰ গত হইলে ভগবানেৰ শেষাবতাৰ এবং হংসাবতাৰ সমূহেৰ আবিৰ্ভাব হয়। হংসাবতাৰেৰ ১০০০ সহস্ৰ বৎসৰ পৰে ত্ৰেতাযুগে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰেৰ অধিষ্ঠান কাল। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰেৰ আবিৰ্ভাবেৰ ১০০০ বৎসৰেৰ মध्ये দ্বাপৰেৰ শেষে ক্ৰীষ্ণ-বলৰামেৰ অবিৰ্ভাব। দ্বতৰাং দ্বাপৰেৰ শেষ পৰ্য্যন্ত ন্যূনাধিক ২৫০০ বৎসৰ গত হইলে পৰ, কলিযুগ আৰম্ভ হয়। কৃষ্ণেৰ তিৰোভাবেৰ ১০০০ সহস্ৰ বৎসৰ পৰ অৰ্থাৎ “কলৌ সংপ্ৰাপ্তে” অৰ্থাৎ কলি সন্ম্যক্ৰূপ প্ৰাপ্ত হইলে বুদ্ধ বা বিষ্ণুবুদ্ধ অৰ্থাৎ আদিবুদ্ধেৰ আবিৰ্ভাব হয়। তাহাৰ ১০০০ বৎসৰ পৰে শাক্যসিংহ বুদ্ধ জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তাহাৰ ১০০০ সহস্ৰ বৎসৰ পৰে ন্যূনাধিক ৫০০ শত খৃষ্টাব্দে আচাৰ্য্য শঙ্কৰেৰ আবিৰ্ভাব হয়। তাহাৰ ১০০০ সহস্ৰ বৎসৰ পৰে ন্যূনাধিক ১৫০০ শত খৃষ্টাব্দে (১৪৮৬) সমস্ত অবতারণণেৰ মূলপুৰুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্ৰভুৰ প্ৰকটকাল। শ্ৰীচৈতন্যদেবেৰ জীনা সহস্ৰণেৰ পৰ ন্যূনাধিক ৪৬৮ শত বৎসৰ অতীত হইতে চলিল।

একণে দেখা যাইতেছে হংসাবতাৰ হইতে কৃষ্ণবলৰাম পৰ্য্যন্ত ২০০০ সহস্ৰ বৎসৰ। কৃষ্ণ হইতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ পৰ্য্যন্ত ২০০০ সহস্ৰ বৎসৰ। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইতে শ্ৰীচৈতন্যদেব পৰ্য্যন্ত ২০০০ সহস্ৰ বৎসৰ। দ্বাপৰ যুগেৰ কৃষ্ণাবতাৰ পৰ্য্যন্ত ২০০০ সহস্ৰ বৎসৰেৰ মাস্ত্রাবাদেৰ জীবনী পাঠকবৰ্গেৰ নিকট নিবেদন কৰিয়াছি। বৰ্ত্তমান যুগেৰ প্ৰথম ২০০০ সহস্ৰ বৎসৰ অৰ্থাৎ শাক্যসিংহ বুদ্ধেৰ

আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মারাবাদের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। কৃষ্ণবলরামই কল্যারন্তের পূর্বে উহাদের বিনাশ সাধন করার ফলে এবং তৎপরে আদিবুদ্ধের অমুরমোহণ লীলার প্রকটনকালে মারাবাদিগণ এই ২০০০ সহস্র বৎসর বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

“শাক্যসিংহ”

ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্ত আদি বুদ্ধ অর্থাৎ ‘নবম অবতার বুদ্ধের’ শত্যা-বেশে ‘শাক্যসিংহ-বুদ্ধ’ খৃষ্টপূর্ব ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে ৪৭৭ এবং কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন। এই সময় হইতে মারাবাদ-চিন্তাস্রোত বহুকালের বান্ধ ভাঙ্গিয়া অতি প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গৌতমের আবির্ভাব হইতে শঙ্করের আবির্ভাব পর্যন্ত ১০০০ বৎসর কাল এই চিন্তাস্রোতটী নানা প্রকার আকার ধারণ করিয়া আশ্ফালন করিতেছিল। আচার্য্য শঙ্করের মারাবাদ বৌদ্ধবাদের নামান্তর মাত্র আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈট্টিক অদ্বৈতবাদী শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’-গ্রন্থের ভূমিকার ১ম পৃষ্ঠার বাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

“বুদ্ধদেবের পর প্রায় ৫০০ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যরাজের (৫৭ পূর্ব খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্যন্ত ‘অদ্বৈতমত’ ‘বৌদ্ধ-মতে’র মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।”

তাঁহার মতে বিক্রমাদিত্যের পর ৫০০ শত বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শঙ্করের অদ্বৈতমত বৌদ্ধগণের হস্তে নিহিত ছিল। তিনি উক্ত ভূমিকার ৯ম পৃষ্ঠায়ও লিখিয়াছেন—

“এইরূপে এই সময় অদ্বৈত চিন্তাস্রোত বৌদ্ধগণের মধ্য দিয়া প্রবল বেগে বহিতে থাকে।”

(ঘোষ মহাশয়ের উল্লিখিত উক্তি হইতে তাঁহাকে আমরা নিঃশঙ্কোচে “বৌদ্ধ মারাবাদী” বলিয়া জানিতে পারিলাম। আমার মনে হয় ইহাই তাঁহার ঠিক পরিচয়। ইহাতে রাজেন বাবু যে অন্তরে অন্তরে একজন পাকা বৌদ্ধ ছিলেন তাহা তিনি “হাতে কলমে” ধরা না দিলে তাঁহাকে জনসাধারণের চিনিতে অনেক বেগ পাইতে হইত।) এক্ষণে মারাবাদের বিভিন্ন মূর্তির সামান্য পরিচয় এতৎ-স্থলে না দিলে মারাবাদ-জীবনের অঙ্গহানি হইবে মনে করিয়া নিয়ে তাহার আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

“দর্শন সপ্তক”

চার্বাকের নাস্তিক্য ; জিনের জৈন বা অহিং ; কণাদের বৈশেষিক ; গোতমের ত্রায় ; কপিলের সাংখ্য ; পাতঞ্জলির যোগ ও জৈমিনীর মীমাংসা এই সাত প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া মায়াবাদ তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করত অচিন্ত্য-বৈতাদৈত-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে গলাধঃকরণের জন্য আশ্ফালন করিতেছিল। দর্শন সপ্তকের উক্ত মূর্তিগুলির প্রত্যেকটাই মায়াবাদী। কারণ প্রকৃতই মায়া। প্রাকৃত মায়িক বস্তু লইয়াই যাহাদের বাদ-বিতণ্ডা ও দর্শনশাস্ত্রের পরিপুষ্টি তাহারাই মায়াবাদী। সুতরাং উহারা সকলেই মায়াবাদী। উক্ত দর্শনসমূহ পরস্পর বুদ্ধ ও শঙ্করের মধ্যবর্তীকালে বহু প্রবল হইয়া উঠার দরুণ কেহ কাহারও শ্রীবৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক ও বুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ শক্তিক্ষয় করিয়াছে। তৎফলে সৌভাগ্যক্রমে চার্বাকের নাস্তিক্যদর্শন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অহিং বা জৈনগণও প্রায় তদ্রূপ অস্তিত্বহীন হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদের ঐ প্রকার বিভিন্ন মূর্তি পরিদর্শন করিয়া প্রবাদ গণিলেন এবং পরস্পর গৃহবিবাদে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায় সন্ধান করিলেন। শঙ্কর উক্ত মতসমূহের কতক কতক যুক্তি গ্রহণ করিয়া এবং কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সামঞ্জস্য করিবার অভিনয় দেখাইয়া স্বমতের পুষ্টি করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে স্ফুলভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত সাতটি দর্শন এবং বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্কর কথিত ব্রহ্মবাদ সর্বসমেত নয়টি দর্শন সমুদয়ই মায়াবাদ-শ্রেণীভুক্ত। পূর্ব-কথিত সাতটি দর্শনকে মায়াবাদী বলিবার কারণ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অসম্ভব বিধায়, তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে।

“ভর্তৃহরি”

শ্রীল শঙ্করের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্বে ভর্তৃহরি উপনিষদ্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া মায়াবাদের এক নূতন ধারা জগতে প্রবাহিত করেন। তিনি বৌদ্ধযুক্তি অবলম্বন করিয়া উপনিষদ্ সমূহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াই উপনিষদ্ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন এবং হিন্দু ধর্মের নামে বৌদ্ধ ধর্ম জগতে চালাইবার জন্য যত্ন করেন। ভর্তৃহরি বৌদ্ধ অমরসিংহের সমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধ শবর স্বামীর ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান এবং অমরসিংহ উক্ত শবরস্বামীর শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান—পূর্বে ইহা আমরা জানাইরাছি। সুতরাং উভয়েই

উভয়ের ভ্রাত। অমরসিংহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্কর ভট্টহরির গ্রন্থাদি হইতেও তাঁহার মায়াদ—অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধ মত প্রচার করিবার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ভট্টহরির উপনিষদ-সম্প্রদায় বৌদ্ধ-মায়াবাদেরই প্রচারক ছিল—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠার পর)

কেশব হুসেন সাহের আদেশ লইয়া বিদায় গ্রহণ পূর্বক বাহিরে আসিয়া কোতোয়ালকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। তথাপি যবনরাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া গোপনে একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রভুর ভক্তগণের নিকট জানাইয়া দিলেন—রাজধানীর নিকট হইতে অন্ত্র গমন করাই যুক্তি-সঙ্গত। এদিকে গোড়েশ্বর দাবিরখাসকে নিভৃতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

“দাবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে। গোসাঁঞের মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে॥

‘যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঁঞা।

তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিঞা ॥

তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়। ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥

মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন। তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম ॥

তোমার চিত্তে চৈতন্তেরে কৈছে হয় জ্ঞান। তোমার চিত্তে যেই লয়, সেইত’ প্রমাণ ॥

রাজা কহে—শুন, মোর মনে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ। নাহিক সংশয় ॥”

এত কহি’ রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে। তবে দাবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥”

(চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫—১৮১)

গোড়েশ্বর হুসেনসাহ বলিলেন—আমার মনে হয়, এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার এই যে, উরিষ্যরাজ্যের সামরিক বল অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও যতদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িষ্যার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, ততদিন তথাকার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কারণ এই হুসেনসাহ মহাপ্রভুর প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি করায় প্রতাপরুদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে

ইচ্ছা করেন নাই বা সাহসী হন নাই । শ্রীমন্নুহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রায় ৩০ বৎসরের পরে উরিষ্যা স্বাধীনতা হারাইয়াছিল । ঐতিহাসিক বিচারে মহাপ্রভুই উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষার কারণ ছিলেন । বর্তমান নাস্তিকগণ এই ঐতিহাসিক সত্যকে গোপন করিয়া পামগুতা প্রকাশ করিতেছে ।

সে বাহা হউক, (রূপ গোস্বামী) রাজার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন । এবং গৃহে আসিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রাত্রিযোগে প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাইবেন । অন্ধরাত্রিকালে দুই ভাই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রভুর স্থানে গমন করিলেন । প্রথমে শ্রীনিত্যানন্দ ও নামাচার্য ঠাকুর হরিদাসের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল । তাঁহারা প্রভুকে জানাইয়া তাঁহার আদেশমত সনাতন ও রূপকে লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । রূপ ও সনাতন দত্তে ভূগ ধারণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন । তাঁহারা ভূতলে পতিত হইয়া প্রভূত আতি সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন । এখানে শ্রীল রূপ-সনাতনের অভিন্ন-হৃদয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি গীতি স্মরণ হইতেছে ; তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম । —

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া । কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদ-ছায়া ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান । কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সন্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাজলি বৈষ্ণব নিকটে । দত্তে ভূগ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখ গ্রাম । সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
জুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর । আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় । এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥
সেবকের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে । রূপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥

প্রভু দুই ভাইকে উষ্ণিতে বলিলেন । দুই ভাই উঠিয়া দৈন্ত সহকারে করযোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন । —

ঘরে আসি' দুই ভাই বুকতি করিঞা । প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা ॥
অন্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা 'প্রভু-স্থানে । প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে ॥

তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে ।

রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥

দুই গুচ্ছ ভূগ দুই হৈ দশনে ধরিঞা । গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥

দৈন্ত-রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল । প্রভু কহে, উঠ উঠ, হইল মঙ্গল ॥

উঠি' দুই ভাই ভবে দন্তে ভূণ ধরি' । দৈত্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি' ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮২-১৮৭)

মহাপ্রভু ও রূপ-সম্ভাষণের কথোপকথন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় । পতিত পাবন জয়, জয় মহাশয় ॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাষ । তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥
পতিত-পাবন-হেতু তোমার অবতার । আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার । তাহাঁ উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর । নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কুপার ॥
সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার । পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥
তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন । সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥
জগাই-মাধাই হইতে কোটী কোটী গুণ । অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥
শ্লেচ্ছজাতি, শ্লেচ্ছ সঙ্গী, করি শ্লেচ্ছ কৰ্ম্ম । গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কৰ্ম্ম, মোর হাতে-পলায় বান্ধিঞা । কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ভে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে । পতিত-পাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল । 'পতিত-পাবন' নাম তবে সে সফল ॥
মত এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময় । মো-বিহু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল । অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥
আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাণ্ড ফোভ । তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥
বামন হইয়া টাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে । তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১।১৮৮-২০৫)

মন্তুলো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।

পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ক্রবে পুরুষোত্তম ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৬৫ অঃ)

“আমার আর পাপী নাই, আমার আর অপরাধীও নাই । হে পুরুষোত্তম, মৎ-
কৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা
হইতেছে ।” জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার কোন প্রকার শ্রম
স্বীকার করিতে হয় নাই । আমরা দুই ভাই তাহাদের হইতেও অধম । জগাই
মাধাই ব্রাহ্মণ জাতীর ছিল । পরম তীর্থ—শ্রীধাম নবদ্বীপ তাহাদের জন্ম ও
বাসস্থান । আমরা নীচ, শ্লেচ্ছ-জাতির ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে নিজদিগকে বিচার
করিয়াছি । আমাদের আর তাহারা কখনও শ্লেচ্ছ-সেবা করে নাই । আমরা

তাহাদের অপেক্ষাও হেয় ও ঘৃণ্য। বেহেতু আমরা নীচের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি। আমাদিগকে অবলম্বন করিয়াই নীচাশয় সম্রাট নীচ কার্য্য সম্বধান করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের রূপা ব্যতীত বিষয়ী জীব কখনও নিজের চেষ্ঠা দ্বারা যেকোন বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ভরূপ জড়-ভোগ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না; তদ্রূপ শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মের রূপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের রূপার অধিকারী হওয়া যায় না।

“ভবন্তুমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্য্যিয্যামি সনাথজীবিতঃ।” (বামুন স্তোত্র)

“আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দাস-জীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব।”

দৈন্ত্য বা কার্পণ্যই একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের রূপালাভের উপায়। দৈন্ত্যই বৈষ্ণবতার ভূষণ বা অলঙ্কার; দৈন্ত্য নিজেই সমস্ত জীবকে বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে লইয়া বাইতে সমর্থ। দন্তে ভ্রূণ ধারণ করিয়া দৈন্ত্যের সহিত ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাদের কাতর আতি নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাদের দৈন্ত্যোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন—

“তুমি’ মহাপ্রভু কহে,—শুন, দাবির-খাস।

তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।

আজি হৈতে দুঁহার নাম ‘রূপ’ ‘সনাথন’।

দৈন্ত্য ছাড়, তোমার দৈন্ত্যে ফাটে মোর মন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১২০৭-২০৮)

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে

ঘরে ঘাহ, ভয় কিছু না করিছ মনে ॥

জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।

অচিরান্তে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার” ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১১২০৮-২১৫)

শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া নীলাচলে যাইবার ছলনা করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিষ্মানী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবৈদ্য শান্ত মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী

শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব প্রভুপাদের আবির্ভাব বাসরে

দীনের কৃপা-প্রার্থনা

(১)

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠায় ভূতলে ।

শ্রীমতে ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবেতি সুনামিনে ॥

নমস্তে গৌরসেবা-শ্রীমূর্তয়ে দীন-তারিণে ।

রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিকান্ত-ধ্বান্ত-হারিণে ॥

(২)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীকেশব স্বামী ।

কৃষ্ণ-প্ৰীতি শিক্ষা দিতে আসিলে আপনি ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম করিবারে দান ।

গোলোক হইতে প্রভু করিলে প্রয়াগ ॥

জীবের উদ্ধার লাগি' আসিয়া ধরায় ।

কত জীব উদ্ধারিলে অগণন তায় ॥

তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ধনী কৃষ্ণ যে তোমার ।

তুমি দিলে দিতে পার যে ইচ্ছা তোমার ॥

(৩)

ওহে প্রভো ! বলি এবে হৃদয়ের ব্যথা ।

মায়াতে মোহিত আমি রয়েছি সর্ববথা ॥

দেহেতে আমিত্ব বোধে মরি যে মরমে ।

কৃপা কর প্রভো এবে ধরিগো চরণে ॥

তোমার সেবক করি' রাখ রাঙ্গা পদে ।

কভু যেন নাহি ভুলি সম্পদে বিপদে ॥

তোমার কৃপায় কবে হেন দিন হবে ।

এ অধম রাধা-কৃষ্ণ প্রেমেতে ভজিবে ॥

মোর কি শক্তি আছে কৃষ্ণ ভজিবারে ।

তোমার করুণা হলে সর্বজীব পারে ॥

(৪)

এই জগ-মাঝে,	যোগ্য-জন যা'রা,	সেবে তব পাদদয় ।
লভিবে তাহারা,	তোমার করুণা,	সেবা সে নিয়ম হয় ॥
সেবাই সাধন,	সাধনই সেবা,	এই যে তত্ত্বখানি ।
কেমনে বুঝিব,	না ভজিলে তব,	চরণ দুইখানি ॥
ভজনের যোগ্য,	লভিয়া জনম,	আসিনু ধরণী মাঝে ।
মায়া-মোহে পড়ি,'	ভুলিনু সকল,	স্বজন ভজনে ম'জে ॥
এ ঘোর সংসারে,	প'ড়ে আছি আমি,	না পাই দুঃখের শেষ ।
তব পদ ধরি',	হরি ভজি যদি,	(তবে) অন্ত হয় ক্লেশ ॥
বিষয় অনলে,	জ্বলিছে হৃদয়,	অনলে বাড়ে অনল ।
অপরাধ ছাড়ি',	লব কৃষ্ণ-নাম,	অনলে পড়িবে জল ॥
কত জন্ম গেল,	না ভজিয়া তোরে,	এবারো যেতেছে চলে ।
এখন এসেছি,	তব মঠ-তলে,	চরণ পাইব বলে ॥

(৫)

ধন্য তোমার,	বাণীর হুকার,	ধন্য প্রচার-ধারা ।
মায়াবাদ-মত,	খণ্ডিলে প্রভে,	মাসিক পত্র দ্বারা ॥
তোমার পত্রের,	মাধুরী কিবা,	কেমনে তা' গাঁহিব ।
বৃহৎ মৃদঙ্গের,	কৃপা হ'লে,	সকলিত জানিব ॥
তোমার বাণীর,	মনোরম ধারা,	বিশ্ব যাহাতে আপন হারা ।
ছাড়িয়া সংসার,	চলে আসে সব,	সেবার তরে তোমার তারা ॥
কিন্তু যাদের,	এমনি কস্ম,	ভোগে প্রমত্ত সকল ।
তোমায় ভুলে,	ভজন ফেলে,	সেবে সদা হালাহল ॥
এমন ভাবে,	কেমনে পাবে,	তোমার চরণ দেখা ।
ফাঁকি দিলে,	পড়বে ফাঁকে,	শাস্ত্রে আছে (এ) সব লেখা ॥
তুমি যাদের,	করগো কৃপা,	তারাই ভক্তির পাত্র ।
তারাই লভিবে,	তোমার চরণ,	বাকী র'ব আমি মাত্র ॥

(৬)

অধরেতে তব,	স্নেহ ভরা হাঁসি,	বিকশিত যেন গগনের শশী ।
সুকোমল অঙ্গ,	কাঞ্চন বরণ,	নয়নে ফুটিছে কমলের হাঁসি ॥

জানু বিলম্বিত,	দীর্ঘ বাহুবর,	শোভা কিবা মনোহর ।
হেরিয়া সুন্দর,	তব কলেবর,	(জীব) হয় প্রেমপর ॥
অলৌকিক দেব,	সহনশীলতা,	দেখে যাই বলিহারী ।
সুখায় কাতর,	নহ কভু তুমি,	তৃষাতে নাচাও বারি ॥
জনক রেখেছে,	যে-নাম তোমার,	প্রভুপাদ রাখে তাই ।
ভকতি বিনোদ,	বিহরে তোমায়,	‘বিনোদ-বিহারী’ গাই ॥
ওগো দয়াময়,	ধরিগো চরণে,	করগো করুণা মোরে ।
প্রাণের বাসনা,	আর নাহি কিছু,	কৃপায় তারহ মোরে ॥

নিত্যশ্রোতাকাঙ্ক্ষী
—শ্রীমুদামসখা ব্রজচারী

ভেকাশ্রয় বা বাবাজী-বেষ গ্রহণ

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রীবুত অচিন্ত্য গোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় এই বৎসর শ্রীগৌর-পূর্ণিমা দিবসে অর্থাৎ গত ৫ই চৈত্র ১৩৬০, ইং ১৯শে মার্চ ১৯৫৪, শুক্রবার শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট ভেকাশ্রয় অর্থাৎ বাবাজী-বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান আশ্রমোচিত নাম—**শ্রীঅখোজদাস বাবাজী মহারাজ**। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সরলতা, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি প্রভৃতির সহিত শম-দমাদি বহুগুণ লক্ষ্য করিয়া শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামীর ‘সংস্কার-দীপিকা’মতে তাঁহাকে গুরুাধ্বর-কোপীন বহির্বাসাদি প্রদান করেন।

শ্রীবুত অচিন্ত্য গোবিন্দ দাসাধিকারী মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার নিকটবর্তী ‘বাজিতপুর’ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাজিতপুর গ্রাম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাঙ্কপূত। ১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীল ঠাকুর উক্ত অধিকারী মহাশয়ের গ্রামে গুহ-পদার্পণ করেন। তাঁহার গুহ আশীর্ব্বাদে আমরা ঐ গ্রাম হইতে দুইজন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। পরলোকগত দীনদয়াল ব্রজবাসী তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীবুত অচিন্ত্য গোবিন্দ প্রভু ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত হইয়াও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-স্বভাব লাভ করায় সাত্তত শাস্ত্রানুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব তাঁহাকে দীক্ষাদ্বারা দ্বিজ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি প্রদান করেন। তৎপর কিছুদিন সংসারযাত্রা নিব্বাহ করিবার পর তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবা-পূজায় দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও দৈত্যাদি ব্যবহারের কথা সকলেই অবগত আছেন। ক্রমশঃ সংসারের প্রতি বিশেষ বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় সকল বৈষ্ণবগণের অনুমোদনে তিনি সভাপতি মহারাজের নিকট কোপীন গ্রহণ করেন। দ্বিজ বাতীত অন্য কাহারও কোপীন গ্রহণের অধিকার নাই। ইহা ভিক্ষু আশ্রমেরই অন্ততম—পঞ্চম আশ্রম নহে।

‘ভেক’-শব্দে সাধারণতঃ ভিক্ষুদিগের আশ্রমকেই উদ্দেশ্য করে। কারণ সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি ও মন্ত্রাদির সহিত ভেকাশ্রমের বিধি ও মন্ত্রাদিতে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। তবে ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যে আমরা শ্রীনাথাদি কতিপয় ব্যবহারিক তারতম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং শ্রীন আচার্য্যবর্গের শ্রীমুখ হইতেও ইহা শুনিতে পাইয়াছি। এই শুক্লাক্ষর কোপীন বহির্বিদ্যাাদি গ্রহণ করিলে বাহ্যতঃ ‘রাবাজী-বেষ’ বুঝাইলেও ক্ষেত্রবিশেষে উক্ত বেষদ্বারা বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও পরমহংস-বেষকে বুঝাইয়া থাকে। এই তিন অবস্থাই সংসার-ত্যাগী শুদ্ধ বৈরাগিগণের পক্ষেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রী-সঙ্গাদি ষোড়শ-বর্জন করিয়া সর্বতোভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্ম-নিয়োগই এই আশ্রমের প্রধান লক্ষণ।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

বিগত ৫ই চৈত্র ১৩৬০, শুক্রবার শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-বাসরে শ্রীপাদ পরম ধর্মোদ্বার ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ জয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়-দ্বয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও বিদ্যুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমুক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ মানব-জীবনের সর্বোত্তম সকলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহাদের বর্তমান সন্ন্যাসাশ্রমোচিত নাম যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ‘পরিব্রাজক’ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ‘শুদ্ধাদৈতী’ মহারাজ।

শ্রীপাদ পরম ধর্মেশ্বর প্রভু ১৩৩৫ সালে পরমারাধ্য জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠ ও তদন্তর্গত বিভিন্ন শাখামঠে ধারাবাহিকভাবে বহুকাল সেবা করিয়াছেন। শ্রীল গুরুপাদ-পদের তিরোধানের পর, তিনি পূজনীয় শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজের আশ্রমে থাকিয়া কিছুদিন হরি-সেবা করেন। তৎপর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-কার্যে আকৃষ্ট হইয়া অচ্যবধি প্রায় ১৪ বৎসর যাবৎ উক্ত সমিতির আত্মগত্যে সেবা-প্রচারাদি করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অক্লান্ত, দায়িত্ব-পূর্ণ সেবা সমিতির সভ্যবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শ্রীপাদ জয়াদৈত প্রভুও জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুরের চিরানুকম্পিত একনিষ্ঠ সেবক-শিষ্য। তিনি বহুকাল যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত পুরী, কলিকতা ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মঠ সমূহে থাকিয়া সেবা করার পর কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-সেবার্চনাদি বিবিধ কার্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার পাঠ-কীর্তনও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

শ্রীগৌর-জয়ন্তী ফাল্গুনী-পূর্ণিমা বাসরে তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠায়ণ ও সঙ্কীর্তন সহযোগে উপবাস দ্বারা শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথি-ব্রতের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীল গোপোলভট্ট গোস্বামীর বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীসংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে মহাত্মাদয় ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আচার্য্যত্বে গুরুপরম্পরার জয়ধ্বনি ও উচ্চ হরি-সঙ্কীর্তন সহযোগে সন্ন্যাসের কৃত্য—যজ্ঞ-হোমাদি অনুষ্ঠানের জন্ত স্তুতিতে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর উক্ত সাত্ত্বত-স্মৃতি অনুসারে সন্ন্যাসের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করা হয়। সেই সময় অত্যান্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সমক্ষে উক্ত গুরু-মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অষ্টোত্তর শত নামের অন্তর্গত ‘পরিব্রাজক’ ও ‘শুদ্ধাদৈতী’—এই ‘নাম’ ‘ভক্তিবেদান্ত’ সহযোগে উভয়ই যথাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ড, কোপীনাди সহ যথাবিধি গৈরিক বহির্বাসাদি দ্বারা সন্ন্যাসবেশ ধারণ

করেন। তৎপর তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ভিক্ষা সংগ্রহে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরঙ্গ সেবার আনুকূল্য সংগ্রহ করত ভিক্ষুকাশ্রমোচিত বৃত্তির মর্যাদা রক্ষা করেন।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবেন্দান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব

বর্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্তৃক পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ, রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়া গত ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ শনিবার দিবস পর্যন্ত ৭ দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব-প্রকাশিত পরিক্রমা-পঞ্জী অনুসারে যাত্রীগণ নবদ্বীপ-ভক্তির পীঠস্থান-রূপ নয়টী দ্বীপে পরিক্রমাকালে তত্তৎক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও তত্তৎক্ষেত্রাধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা বিধান করেন। সর্বত্রই সমিতির সেবক-সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রাদি হইতে ধাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া সমবেত ভক্ত-যাত্রীগণকে বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সর্বত্রই সঙ্কীৰ্তন সহযোগে পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরিক্রমাকালে মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শিঙ্গাদি সহযোগে সহস্রাধিক কণ্ঠের সঙ্কীৰ্তন-রোল দিগ্ভ্রমকে মুগ্ধিত করিয়া তুলে। সঙ্কীৰ্তন-ধ্বনিতে আত্মহারা যাত্রীগণ নৃত্য-কীর্তনে নিমগ্ন থাকায় প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে পথাতিক্রম ক্লান্তি বিস্তৃত হইয়া ভক্ত্যুদ্দীপ্ত চিন্ময় পরিবেশের সান্নিধ্য লাভ করেন। সর্বোপরি, সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক সুসজ্জিত জ্যোতিষ্ময় শিবিকারূঢ় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আরাধ্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অর্চা-বিগ্রহের নৃত্যাবিষ্ট শ্রীমূর্তির অনুগমনে সঙ্কীৰ্তন পিতার সাক্ষাৎ আবির্ভাবময়ী উদ্দীপনায় ভক্ত-যাত্রীগণের “জয় গৌর” “জয় নিত্যানন্দ” প্রভৃতি জয়ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলেন। শ্রীধাম পরিক্রমাকে সর্বসাধারণের পক্ষে অধিকতর লোভনীয় ও সুখকর করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীল আচার্যদেব এমংসর বহু ব্যয়ভার বহন করিয়া দ্বীপে দ্বীপে অবস্থানের সুবিধা-করে সমিতির নিজস্ব ২৪২৫টী বৃহৎ শিবির (টাঁবু) সর্বত্র বহন করিয়া লইয়া স্থাপন করিবার সুবন্দোবস্ত করেন। তজ্জন্ত ১টী মোটর লডী পরিক্রমা দিবসগুলির জন্ত সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং শিবির-স্থাপনাদির জন্ত মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সেবোৎসাহী যুবক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ

ও নবদ্বীপ মহরের বিভিন্ন স্কুলের স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমুসিংহদেবের পদপ্রান্তে, চম্পকহুটে শ্রীগৌরগদাধর মঠ-প্রাঙ্গণে, শ্রীবন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট—মামগাছিতে এবং শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা শ্রীবোগপীঠে যাত্রিগণ এক এক রাত্রি অবস্থান করিয়া পরমানন্দে। শ্রীবিগ্রহাদির সেবা-পূজা বিধান ও পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাাদি শ্রবণ করেন। এবং সন্দের পরিক্রমায় যাত্রিগণ অভিনব আনন্দ লাভ করা হেতু বিদায় দিবসে সকলেই বিরহাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করেন। বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানবাসী ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ভিনা প্রভৃতি নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি হওয়ায় এই অল্পস্থানে যোগদানে সমর্থ হন নাই—আমরা তাঁহাদের দুঃখে সমবেদনা জানাইতেছি। আমরা প্রার্থনা করি, শ্রীমুহাপ্রভুর কৃপায় অচিরেই তাঁহাদের এই অন্তবিধা বিদূরিত হউক। এই পরিক্রমারূপ শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে ঘাহারা প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা সেবা ও সহযোগিতা করিয়াছেন, সমিতি তাঁহাদের সকলের নিকটই চির কৃতজ্ঞ।—বিশেষতঃ কল্যাণপুর-নিবাসী মাননীয় শ্রীবুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী, মনুবসান-নিবাসী শ্রীবুত ধরনীধর পাল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইবৎসর গৌর-জন্মোৎসবের দিন অর্থাৎ সাধারণ মহোৎসবে দিবারাত্র ৮০০০ আট সহস্র লোক প্রসাদ পাইয়াছেন।

—ত্রিদিগুস্থামী শ্রীভক্তিবাদান্ত্রিবিক্রম মহারাজ

৫ম পদেবতার

অবতারের উপদ্রব নিবারণ

প্রবন্ধ সূচনা

আমরা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বিগত ৫ম বর্ষের ১০ম সংখ্যার ৪০০ পৃষ্ঠায় এবং উক্ত বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যার ৪৬৭ পৃষ্ঠায় সাউডীর “ইন্ডো-পাকা সহজিয়া সম্প্রদায়” ও “সাউডীর সহজিয়া-দলন”-প্রসঙ্গে জানাইয়াছি, ‘অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। এতদ্ব্যতীত বর্তমান বর্ষের ১ম সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠায় ‘নবীন অপসম্প্রদায়ের তালিকা’ প্রসঙ্গে প্রথমেই জানাইয়াছি,—‘পঞ্চানন তেলির নবীন-সহজিয়া-মতের হেরতা ও অনুপাদেয়তা প্রদর্শন’ করিব। সুতরাং আমি উক্ত প্রবন্ধসমূহের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি।

সম্পাদক

‘অবতারের উপদ্রব’ প্রবন্ধের উৎপত্তি

সাঁউড়ী হইতে প্রকাশিত সজ্জন-সঙ্গিনী নামক একখানা অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-প্রচারক গ্রাম্য-বার্তাবাহের ১৩৬০ সালের আবার সংখ্যার ১৬১ পৃষ্ঠায় ‘অবতারের উপদ্রব’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আমরা পাঠ করিয়াছি। এই প্রবন্ধটি শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বি,এ(?) মহাশয়ের লিখিত বলিয়া প্রকাশ। আমরা তাঁহার লিখিত উক্ত প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধার করিতেছি—

“ভণ্ডামী প্রশ্ন পেনেই বেড়ে যায়। সুতরাং দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই এখন ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রচার করা দরকার। একটু ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে হয় তা’ও ভাল, তবু ধর্মজগতে যারা প্রবঞ্চনা ও প্রভারণা দ্বারা পসার জমিয়ে অবতার সাজতে চায়, তাদের ভণ্ডামীর মুখোষ চিঁড়ে ফেলাই কর্তব্য। অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জার অনেক সময় বহু অনর্থের উৎপত্তি হয়।”

উক্ত প্রবন্ধের চরমে (*) লক্ষ্য চিহ্ন দিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্মকে তথা শুদ্ধা-ভক্তিকে যিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন তাহারই এই সত্যদ্রষ্টা মহাত্মার আহ্বানে সাড়া দেওয়া কর্তব্য— সম্পাদক”

সত্য-দ্রষ্টার (?) আহ্বানে সাড়া

উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে চাই,—শুদ্ধা-ভক্তিকে আমরা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেছি; সুতরাং সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে সাড়া দিতে প্রস্তুত হইলাম। কিভাবে সাড়া দেওয়া আবশ্যক, তাহা প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ং যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাই গ্রহণে অবলম্বন করিব। আমরা ইহা স্বীকার করি যে—“অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জার অনেক সময় বহু অনর্থের উৎপত্তি হয়।” সুতরাং চক্ষুলজ্জার ‘মাথা খাইয়া’ নির্লজ্জ ভাবেই ‘সাড়া দেওয়া কর্তব্য’। ইহা প্রকৃতই সত্য—‘ভণ্ডামী প্রশ্ন পেনে বেড়ে যায়’; সুতরাং ‘ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রচার করা দরকার’। প্রবন্ধ-লেখক গুপ্ত মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—“একটু ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে হয় তা’ও ভাল”। আমরা সর্বতোভাবে এই কথাই যদিও অমুমোদন করি না তথাপি তাহার এই প্রবন্ধের প্রতিবাদকল্পে ঐ প্রকার উক্তির কিছুটা স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হইব না। সুতরাং নিবারণ বাবুর ‘ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে

‘প্রচার’ করিতে গিয়া লেখকের ‘ধর্মবিশ্বাসে আঘাত’ দেওয়া অথবা তাহার ‘মুখোষ ছিঁড়িয়া’ কোন উক্তি করিলে আমাদের কোন দোষ হইবে না। কারণ, নিবারণ বাবুর ও সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শই এইপ্রকার। অতএব আমরা এইপ্রকার তিক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হওয়ায় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বি, এ-পাশের বানান ভুল

এক্ষণে শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের নাম, ধাম, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি নিজেকে ‘বি, এ’ উপাধিধারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপাধিটী প্রকৃত কি না—জানা আবশ্যক। কারণ, তিনি যে সমালোচনা-মূলক অবৈধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার বহু স্থলেই আমরা বানান ভুল লক্ষ্য করিতেছি। আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তিনি প্রকৃত শিক্ষিত লোক হইলে ইহা স্বয়ংই ধরিয়া লইতে পারিবেন এবং বিনয়-সহকারে তাহা স্বীকার করিবেন। তিনি এই বর্ণ-বিত্তাসের ভ্রমগুলি ধরিতে না পারিলে আমরা পরবর্তী সংখ্যায় তাহার তালিকা প্রকাশ করিব।

নিবারণ বাবু ‘অবতারের উপদ্রব’ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার আদি, মধ্য ও অন্ত সর্বত্রই ভ্রমে পরিপূর্ণ। শুধু তাহাই নহে, প্রবন্ধ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা হিংসা, ঘেঁষা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পাপ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষদুষ্ট। ইহা বি, এ, পাশ করা শিক্ষিত লোকের লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধ বলিয়া আদৌ মনে হয় না। ইহা কোনও গুপ্ত-লেখকেরই প্রবন্ধ হইবে। এক্ষণে আমরা ‘অবতারের উপদ্রব’ প্রবন্ধের আদৃত সমস্তই ভুল দেখাইবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম শিরোনামারই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

~~অবতারের উপদ্রব~~—এই শিরোনামায় আপত্তি

‘অবতারের উপদ্রব’—এই শিরোনামাটী অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক এবং অপসিদ্ধান্তমূলক। শাস্ত্র বলেন—

যদা যদা হি ধর্মশ্চ লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ (গীঃ ৪।৭-৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—যখন ধর্মের লানি

উপস্থিত হয় এবং অম্বর ও অপদেবতাগণের অধর্ম ও উপদ্রব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন আমি স্বয়ং শরীর পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকি ; অথবা আমার নিজ প্রিয়জনকেও অবতীর্ণ করাইয়া থাকি । শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সাধুগণের পরিত্রাণ ও ইচ্ছাপ্রাপ্ত প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্ত এবং প্রকৃত সদ্ধর্ম সংস্থাপনের জন্ত যুগে যুগে অবতার স্বীকার করিয়া থাকি । ইহাই হইল অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য । সুতরাং দেখা যাইতেছে, —অবতারগণের আবির্ভাবে জগতে উপদ্রব বিদূরিত হয়—কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না । দৈব-ভাবাপন্ন সাধক ব্যক্তিমাাত্রেরই অবতারের আবির্ভাবে আনন্দই লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু অম্বর ও অপদেবতা গুলি তাহাতে প্রমাদ গণিয়া থাকে । এমন কি, আসন্ন বিপদ উপস্থিত মনে করিয়া নানা প্রকার চীৎকার করিয়া থাকে । আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে পারি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অবতরণে ও তাঁহাদের শ্রীনাম শ্রবণে—“পলায় ছরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে” । যাহারা কলির প্রধান চর বা কলিপঙ্ককের দাস, তাহারা ভগবানের নাম শ্রবণ করিলেই উৎক্লিষ্ট হইয়া উঠে । কিন্তু বৈষ্ণবমাত্রই ভগবানের নাম শ্রবণ করিলে আনন্দিত হন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবানের স্মৃতি জাগরিত হয় । সুতরাং ‘অবতারের উপদ্রব’—এই শিরোনামা যিনি, যাহার বা যে দল স্বীকার করিবেন, তাহারা যে অপদেবতা বা দৈত্য-দানব—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তজ্জন্ত উক্ত শিরোনামার প্রতিবাদকল্পে আমরা এই প্রবন্ধের শিরোনামাটী শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত করিয়া “অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ”—স্থির করিয়াছি । আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের এইরূপ শিরোনামার ইহা প্রথম কারণ । অন্ত্যায় কারণ এই প্রবন্ধেই পরে উপযুক্তক্ষেত্রে আরও প্রকাশ করিব ।

বৈষ্ণবের নাম-করণে বি, এ-পাশের বিচার

নিবারণ বাবু বৈষ্ণবের নামকরণে ভগবানের নাম উল্লেখ করায় ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন । আমরা দেখিতে পাঠি,—ভগবানের সহস্র সহস্র নামের মধ্যে যে-কোনও একটি নাম তজ্জীকার করিয়া পিতা মাতা তাঁহাদের পুত্রের নাম রক্ষা করিয়া থাকেন । ভগবানামের অনুকরণে যদি কেহ ‘কৃষ্ণ’, ‘বিষ্ণু’, ‘রাম’, ‘নারায়ণ’, ‘সীতানাথ’ প্রভৃতি নাম রাখেন, তাহা হইলে নিবারণ বাবুর তাহাতে বিশেষ আপত্তি ও ক্রোধের উৎপত্তি হইতেছে । এইরূপ আপত্তি কোন অপদেবতা বা দৈত্য-দানবের পক্ষেই সমীচীন—কোন ভদ্র-সন্তান বা সনাতন ধর্মাবলম্বী এইরূপ নাম-করণে আপত্তি করিতে পারেন না । খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান

প্রভৃতি অবর হীন জাতির মধ্যে দেখা যায়, তাহারা হিন্দুর দেবতাগণের নামের প্রতি তুচ্ছ-ভাচ্ছন্দ্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সনাতন হিন্দুর মধ্যে এইরূপ আপত্তি অভিনব। নিবারণ বাবু বলিতে চাহেন,—ভগবানের নামে যদি কেহ নাম রাখেন, তখনই তাহাকে অবতার করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন—“কলিকাতার উপকণ্ঠে নাকি অবতার কোম্পানীর মেলা বসেছে, তা’র মধ্যে কেহ নরসিংহের অবতার, কেহ কেশবের অবতার, কেহ নারায়ণের অবতার, কেহ বা বামন ও ত্রিবিক্রমের যুগ্ম অবতার। অতএব কলির জীবের বর্তমান জীবনেই অবতার দর্শন হবে।”

উল্লিখিত শ্লেষ-সূচক উক্তির দ্বারা নিবারণ বাবু বলিতে চাহেন,—কাহারও নাম ‘নরসিংহ’ রাখিলে, তিনি নৃসিংহদেবের অবতার হইবেন; কেশব রাখিলে কৃষ্ণের অবতার হইবেন; নারায়ণ নামক ব্যক্তি সাক্ষাৎ নারায়ণ হইয়া পড়িবেন; বামন, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি নাম যেখানে দৃষ্ট হইবে, সেইখানেই তত্তৎ অবতার প্রকাশিত হইল বুঝিতে হইবে। নিবারণ বাবুর এইরূপ চিন্তাশ্রোতের বা বুদ্ধির মূল্য কোন নিরক্ষর বালকও দিতে রাজী হইবে না। ধন্য তাঁহার বি,এ উপাধি! আবার তিনি নিলজ্জের হায়ে গৌরব করিয়া তাঁহার নামের পশ্চাতে বি,এ-উপাধিটী যোজনা করিয়াছেন! সেখক যেমন গুপ্ত, ঐ উপাধিটীও তেমনই গুপ্ত রাখিলেই লোকে ভান বলিত। অবশ্য আমরা তাঁহার গুপ্ত রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কয়েক মাস যাবৎ হুগলী, ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিভিন্নস্থানে বিপুলভাবে শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ-বাণী প্রচার করিয়াছেন। প্রায় সর্বত্রই সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাগম হইত। তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বলেন যে,—বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল ভারতে তাঁহার প্রদত্ত বাণীর ব্যাপক প্রচার হইওয়া আবশ্যিক। এইরূপ সত্যকথা প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ তত্তদদেশে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যও তাঁহারা আচার্য্যদেবকে অনুরোধ করেন। নিম্নে বক্তৃতাতির স্থান, সময় ও বিষয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

অশোকনগর কলোনীতে

২৪ পরগণার অন্তর্গত হাব্ডার ওয়েল ফেরার অকিসের সম্মুখে ২০ পৌষ, ৪

জানুয়ারী হইতে ২০ পৌষ, ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত পরমহংস-স্বামী অণ্ডোত্তর শতশ্রী-শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে 'বৈষ্ণবদর্শন' ও অন্যান্য দর্শন-পঞ্চকের তুলনা এবং চার্বাক নীতি ও রাশিয়ার বলশেভিক-নীতির বিশদ আলোচনা করেন। এবং তৎপরপর দুই দিবস ঐ স্থানের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৪ পরগণা জেলায়

৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী ও ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী, স্থান—২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সররেড়িয়া গ্রামে, বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী তত্ত্ববেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী, স্থান—টোঁড়া গ্রামস্থ বিদ্যালয়-গৃহ, বক্তা—ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে গৌরলীলা।

৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী, স্থান—একতারা গ্রাম, বক্তা—ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে গৌরলীলা।

১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী ও ১২ মাঘ ২৬ জানুয়ারী, স্থান—একতারা বিদ্যালয়-ভবন, বক্তা—ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে কৃষ্ণলীলা।

১৩ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী, স্থান—একতারা হরিলভা, বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে শ্রীরামলীলা।

মেদিনীপুর জেলায়

১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী, স্থান—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাইকুণ্ডী গ্রামে, বক্তা—ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে রামলীলা।

১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী, স্থান—মহিষাদল রাজকলেজ, বক্তা—শ্রীল আচার্য্যদেব, বিষয়—“ধর্মজীবনের আবশ্যিকতা”।

১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী, স্থান—মহিষাদল রথভাণ্ডা, বক্তা—শ্রীল আচার্য্যদেব, বিষয়—“সর্বধর্ম সম্বন্ধের অর্থ—সকল ধর্মই এক নহে”।

মহিষাদলে ২ দিবস বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কলেজের কতিপয় ছাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আগমন করত অল্প রাত্র ৩।০ ঘটিকা পর্যন্ত তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে বহুবিধ সংশয়ের মীমাংসা করেন।

অন্য রাত্রে মলুবসান নিবাসী শ্রীযুত ধরনীধর পাল মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা আলোচনা করেন।

২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী, স্থান—মলুবসান নিবাসী শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘাটী মহাশয়ের ভবন, পাঠক—শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবত।

২৪ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী, স্থান—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গেঁওখালির নিকটবর্তী নাটশাল গ্রামনিবাসী শ্রীযুত অনন্তকুমার দাস মহাশয়ের দেবালয়ের নাট্যমন্দির। বক্তা—ত্রিবিক্রম মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা।

২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, স্থান—ঐ, বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, বিষয়—ছায়াচিত্রে রামলীলা।

২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী, স্থান—ঐ, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায়, বক্তা—শ্রীল আচার্য্যদেব, বিষয়—“সনাতন ধর্ম্ম”।

এই স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতামুখে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় শ্রীল আচার্য্যদেব পুনরায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং প্রতিবাদী সভাপতির সমস্ত বিচার শাস্ত্রপ্রমাণ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করেন। এবং কলির জীবপক্ষে শ্রীমন্নহাপ্রভুর নির্দিষ্ট পথে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনই যে একমাত্র মঙ্গলকর, তাহা স্থাপন করেন। মৎস্য-মাংস-ভোজী অপসম্প্রদায়-প্রচারিত নানা মত কখনই সনাতন ধর্ম্ম নহে এবং বিষুভক্তিশূন্য ধর্ম্মমত কখনই দৈব পর্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না। তাহা আত্মরিক পর্যায়ভুক্ত—ইহাও প্রমাণিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে সভাস্থ সজ্জনগণ একবাক্যে আচার্য্যদেবের জয় দান করেন এবং সভাপতি মহাশয়ের বিচারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন।

মাননীয় শ্রীযুত অনন্ত বাবু শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও অন্যান্য বহুবিধ নীতিগত ধর্ম্ম প্রচারক-প্রবর্তিত ধর্ম্মের আলোচনাকল্পে পুনরায় একটি ধর্ম্মসভার আহ্বান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্যও তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ইহা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছেন।

২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী, স্থান—মহিষাদল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাশীনগর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে ১ ঘণ্টা “ধর্ম-জীবনের আবশ্যকতা ও সনাতন ধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; তৎপর ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্তৃক ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা আলোচিত হয়।

২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী, স্থান—কল্যাণপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী ও শ্রীযুত বিনোদ বিহারী ভূঞা মহাশয়ের বাসভবন। বক্তা—শ্রীল আচার্য্যদেব, বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা।

২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী, স্থান—নন্দাগ্রাম থানার অধীন এড়াশাল গ্রামস্থ শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহ। শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করেন। পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

পিছলদা—শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ

২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী—এড়াশাল হইতে বিদায় লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীপুরে পৌঁছিলে পিছলদা গ্রামবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে “মাল্য চন্দনাদি দ্বারা অর্চন করেন এবং তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া সপ্তমৃদঙ্গ সহযোগে সংকীর্তন করিতে করিতে সুদূর ৪ মাইল পথ লইয়া আসেন। পিছলদা অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ স্বভাবতঃই সরল-ভক্ত। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করেন। অতঃ হইতে ৪ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীল আচার্য্যদেব কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যামুখে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। বক্তৃতামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, বৈষ্ণবগণই অণু চারি বর্ণের গুরু, কিন্তু নিজ গুরুত্বগুণ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-জাতি-সূচক অভিমানে কেহ কখনই সেই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারিবেন না। সুতরাং বৈষ্ণবগণ সর্বতোভাবে সদাচার পালন ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-ভক্তি সংরক্ষণে অবশ্যই যত্নবান হইবেন। পিছলদা গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ ও ডিঃ কাশিমপুর নিবাসী শ্রীযুত নিত্যগোপাল পড়্যা মহাশয় পিছলদা পাদপীঠ-মন্দির নির্মাণ কল্পে বিশেষ উৎসাহী হওয়ায় সমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৪২ টাকা, বাৎসরিক ২১০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে নইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষানুনে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সংসমালোচনা আদরনীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী দামোদর ঠাকুর

শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস সত্তে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্বয় ও অম্ববাদ ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈকুণ্ঠমন্দিরেরই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অন্বয়, অম্ববাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯২ নর টাকা।

অলং কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ রত্নৈরিব বজ্র-

দ্বিধর্গত্ব স্তম্ভাস্মুট বচন কম্পাশ্রুত পুলকৈঃ ।

হসন্ স্থিচ্চন্ তন্ শিতি-গিরিপতে নির্ভর-মদে

পুং শ্রীগোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ২ ॥

রসোল্লাসে স্থিৰ্যাগ্ গতিভিরভিত্তে বারিভিরলং

দৃশ্যোঃ সিঞ্চল্লোকানরুণ জল-যন্ত্রত্মিতয়োঃ ।

মুদা দন্তৈর্দক্ট্বা মধুরমধরং কম্পাচলিতৈ

ন টন্ শ্রীগোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-মুতশ্চোক বিরহাৎ

ল্লখচ্ছ্রী-সন্ধিতাদধদধিক দৈব্যাং ভুজ-পদোঃ ।

লুঠন্ ভূমৌ কাক্কা বিকল-বিকলং গদগদ-বচা

কদন্ শ্রীগোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

অনুদঘাট্য দ্বার-ত্রয়মুরুচ ভিত্তি-ত্রয়মহো

বিলজ্যেচ্চৈঃ কালিন্দিক-সুরভিমযৌ নিপতিতঃ ।

তনুত্বং সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহাৎ

বিরাজন্ গোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শ্বকীয়স্ত প্রাণার্ববুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্ত বিরহাৎ

প্রলাপানুমানাদাৎ সতত-মতি-কুববন্ বিকল-ধীঃ ।

দধন্তিত্তৌ শশ্বদন-বিধু-ঘর্ষণে কুধিরং

কতোথং গোরাঙ্গঃ হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্বরিতমিহ তং লোকয় সখে

ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধনম্বুদ ইব ।

দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-ত

ভুজান্তো গোরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেচ্চটক-গিরি-রাজস্ত কলনা

দয়ে গোষ্ঠে গোবর্কন-গিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।

ব্রজনস্মীত্যুক্তা প্রমদ ইব ধাবন্নবধূতো

গণৈঃ স্নৈ গোঁরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলা-মহসি বরতনুগুপ-তলে

স্বরূপেণ স্নেহাপর নিজ-গণেনাপি মিলিতঃ ।

স্বয়ং কুবর্বনান্ভামতি মধুর-গানং মুরভিদঃ

সরঙ্গো গোঁরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং

পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরু-বর্যো বদুবরঃ ।

স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরি-ধর ইব শ্রীল-সুবলে

বিধত্তে গোঁরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া

স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কু-জনমপি মাং নৃশ্চ মুদিতঃ ।

উরোগুঞ্জা-হারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং

দদৌ মে গোঁরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরান্দ্রোদগত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম

প্রভা-ভ্রাজৎ পত্ন্যাবলি-ললিত-শাখং সুর-তরুং ।

মূল্যবোধিত-শ্রদ্ধৌষধি-বরবলং পাঠ-সলিলে

রলং সিঞ্চেন্নিন্দেৎ সরস-গুরুতল্লোকন-ফলং ॥ ১২ ॥

শ্রীগৌরান্দ্র স্তব-কল্পতরুর বঙ্গানুবাদ

জনসকল যাহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেণতুল্য মুখবারি সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি স্বীয় কাস্তিদ্বারা স্তবর্ণ-গিরিকে স্ব-মাধুর্য্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরান্দ্র আপনার সুধাময় বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মাধুর-বিরহিণী শ্রীরাধার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব জনিত আনন্দ-

ভরে ভাবিতাহঃ করণ হইয়া নব বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অক্ষুট-বচন, কম্প অশ্রু ও পুলকসমূহ-দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দ বশতঃ হাস্য করিতে করিতে ঘন্টাষু লিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ? ॥ ২ ॥

যিনি রনোন্মাদ জন্ত আনন্দ হেতুক সর্বতোভাবে ইতস্ততঃ চরণ-দ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরুণ-বর্ণ জলযন্ত-সদৃশ নয়ন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্প-কম্পিত দন্ত-পঙ্ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কোন দিন কাশীমিশ্র গৃহে ব্রজপতি-স্মৃত (শ্রীনন্দনন্দনের) অতিশয় বিরহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-ধারণ করত যিনি ভূমি-লুপ্তিত হইয়া বিকল হইতে বিকল, এতাদৃশ কাকু, গদগদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আহলাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ণনানন্তর অমাপনোদন নিমিত্ত ভক্তগণ কর্তৃক গৃহ-মধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকর্ষ প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-হেতুক দ্বারত্রয় উদঘাটন না করিয়া গৃহোদ্ধর্গমনদ্বার দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক কলিঙ্গ-দেশোদ্ভব গো-সুকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-হেতুক শরীরে যে সঙ্কোচ (কুজত্ব) উদ্ভিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কুর্শ্বের গায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে মোদিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহ-জাত উন্মাদ-হেতুক নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায়, ক্ষত হইতে উখিত রুধির সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরানন্দ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের গায় সখি-ভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন—“হে সখে ! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও”—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল—“তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর”—

এই প্রকার দ্বারপাল কর্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া ছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দে আগ্রুত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি নীলাচল সমীপবর্তী চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক कहিয়াছিলেন—
“অয়ে স্বরূপাদি ! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র হইতে গমন করি”—এই বলিয়া স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে হর্ষাধিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ লীলাকৌতুক দ্বারা শোভা বিশিষ্ট মণ্ডপতলে স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারি শ্রীকৃষ্ণের নাম দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত তদভিনয় বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মূনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি ছিল, তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূলে যে প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোস্বামির প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে পুলকিত করিতেছেন ॥ ১০ ॥

পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার এবং (ভজনের উৎকর্ষ জন্ত) আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

এই প্রকার শ্রীগোরাঙ্গে বিদ্যমান বিবিধ সন্তাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত শ্লোকশ্রেণী যাহার শাখা, এবস্তৃত সুরতরু-সদৃশ এই স্তবটী যে-ব্যক্তি নিরন্তর অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠস্বরূপ সলিলসমূহে সেক করেন, তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুর কৃপা-দৃষ্টিক্রম পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত দুই শ্রেণীর - ভক্ত ও ভগবান্

‘শ্রীমদ্ভাগবত’ শব্দদ্বারা দুইটী শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়, —একটী বিষ্ণু ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দ-ব্রহ্ম-মূর্তি ; শব্দ-ব্রহ্ম মূর্তিমান্ ভাগবত বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সর্বাঙ্গীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত। ভগবতুপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি-রহিত আত্ম-বস্তুর ধারণা নির্বিশেষপর ; সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন—ভাগবত হইতে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের বিশেষত্ব ক্ষীণ হইলেই খর্ব-দৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু, তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ-ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত-ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণাঙ্কুশীলনকারী।

গ্রন্থ-ভাগবতের পরিচয়

গ্রন্থ-ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতে বাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ; এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহার। সকলেই কৃষ্ণাঙ্কুশীলন-ধর্ম নিরত। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলায়িত ; তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণেতর প্রতীতি-সম্পদের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয়-সেবকস্বরূপ।

ভক্ত-ভাগবতের পরিচয় ও বন্ধ-দশার অবস্থা

ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্য্যাত্রেই ভাগবত। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগদ্বিমুখ হওয়ার সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফুরণ নাই। ভাগবত যে-কালে ভগবৎ-সেবা বা ভাগবত-পাঠ, শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিতে বিরত হন, সেইকালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, বিচারণপর ধারণাদ্বারা সংসাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ-বৃত্তি ভক্তি সমুদিত হন। ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা-রূপ বন্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুনির্মল ভগবৎপ্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের

প্রাপ্য বিষয়বোধে শ্রবণ-কীর্তন-বিচারণকারীর অনুশীলন করায়। 'আশ্রয়'-ব্যতীত 'বিষয়ের' অবস্থান এবং 'বিষয়'-ব্যতীত 'আশ্রয়'র অবস্থান সম্ভবপর নহে। বিষয়াশ্রয়'-ভেদে বিশিষ্ট-অদ্বয়-জ্ঞান অবস্থিত। উহা হের বা মায়িক বিচিত্রতার দ্বারা দৃষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্যের স্বরূপ বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম।

বদ্ধ-জীব স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে ভাগবত হন

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎ-সেবাবিমুখ অনাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া যাইবে। শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় গুপ্ত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থল ও স্থল দেহদ্বয় ক্রমোত্তর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা আন্তিবাদ হইতে জীবমুক্তগণই স্ব-স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয়-জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ — একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। এবং তাহার অনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

ভগবদ্ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায় এবং গ্রন্থ

ভাগবতই ভক্তিনাভের আকরস্বরূপ

এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মল পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাহারা তাদৃশধারণা ফলে 'নিত্যবদ্ধ'-সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্ত্যভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাহাদিগের রুচি নাই, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড় জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলা।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদ, বেদান্ত, নিগমাদির বিশুদ্ধ ভাষ্য ও সার

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল।

বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য-সত্য কস্মী ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলেনও, বেদগম্য হরিকথা-রূপ প্রাণকল-স্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত বৈয়াকিক-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে (কাহারও মতে) বিবর্তবাদের বিচার বহুহলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈয়াকিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে,—এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই হেয়াংশবর্জিত নিগম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভাগবত-গ্রন্থ সর্বজনপূজ্য এবং অসীম ও বৈকুণ্ঠ

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্যৎসমাজে যে সর্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, এই বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই, এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের গ্রায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেনও, সেই চন্দ্রিকালোকে স্নানীতল হইতে পারে। জীবের পার্থক্য জ্ঞান-রূপ প্রসারিত হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারেনা; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

শ্রীমদ্ভাগবত সকলের নিকট আদৃত না হইবার কারণ

এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়বদ্ধ-জীব ভাবাবেগে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতা-ক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখতা-জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্যে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রায় হইতেছে। আবার যে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এগনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাথ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-শ্রীচৈতন্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনও ভাগবত-ব্যবসায়ীর জীব্য পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও শ্রবণে অনর্থের বিচার উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা না হইয়া, ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাহারা কখনই তাহাদের সর্বকৃষ্ণ,—ইহা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাহারা কোন কালেই, তাদৃশ বৃত্তি পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না।

অযোগ্য ও ব্যবসায়ী পাঠকের গতি

তাঁহাদের ত্রিবর্গ সঙ্গ কখনই ঘটিবে না। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসঙ্গ প্রবল না হইলে বন্ধ-জীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়োদ্ভিদ-তাৎপর্য-বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দোশে উর্দ্ধগুণ অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীনৃসিংহভট্ট কখনও ভাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল 'প্রাকৃত'-সংজ্ঞা প্রদান করেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ক্রমোন্নতিক্রমে ভাগবত ও তদধিকারী হন

পরে যখন তিনি অর্চ্য অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবন্তের সতিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-প্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অসংসদ বর্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ-প্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুরাগ ভজন-প্রভাবে সর্ব জীবে কাঙ্ক্ষ-প্রতীতি, গুণময়-প্রতীতির পরিবর্তে সেবোপকরণ-প্রতীতি ও নিরন্তর সেবা-সেবক-প্রতীতি প্রবল হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

—ভগদত্ত ঙ্গ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীনরসিংহ ঠাকুর

পঞ্চ-সংস্কার

পঞ্চ-সংস্কারের মহিমা ও তাহা কি কি ?

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পঞ্চ সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তি বিবিধ ভক্তি লাভ করত শ্রীহরির নিত্যধামে নিত্যানন্দ লাভ করেন। যথা:—

অবাণ্ণপঞ্চসংস্কারো লব্ধবিবিধভক্তিকঃ।

সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তত্ত্ব ধ্যায় নিত্যং প্রমোদতে ॥

(সংস্কার দীপিকা)

এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণমাত্র প্রজ্ঞাবান্ জীবগণ পঞ্চসংস্কার শব্দের অর্থ

অন্বেষণ করেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে আমরা পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ ও নিগূঢ় তাৎপর্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চসংস্কার কাহাকে বলে, তাহা স্মৃতি শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ ।

অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

১। তাপ, ২। পুণ্ড্র, ৩। নাম, ৪। মন্ত্র, ৫। যাগ—এই পাঁচটিকে পঞ্চসংস্কার বলে। ইহারাই পরম ঐকান্তিকী ভক্তির হেতুস্বরূপ।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও সংস্কার—এই পাঁচটির
কোনটী কি প্রকার?

পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাবান্ জীব কোন সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট গমন করত দীক্ষাদান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গুরুদেব কৃপা পূর্বক শিষ্যের আশ্রয় বুঝিয়া তাঁহার অঙ্গ-সংস্কারের জন্য 'তাপ' ও 'পুণ্ড্র' বিধান করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে তপ্ত-চক্রাদি দ্বারা তাপের বিধান হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন তপ্ত লৌহ দ্বারা শিষ্যের শরীরে যথাস্থানে অঙ্কিত করা হয়। উক্ত পুণ্ড্রকেই পুণ্ড্র বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। হরিমন্দির, হরিপদাকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ উক্ত পুণ্ড্রের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে-সম্প্রদায়ে যে প্রকার পুণ্ড্রের নিয়ম আছে, তাহাই সেই সম্প্রদায়ের স্বীকার্য।

নামই তৃতীয় সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্বক শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের কর্ণে হরিনাম অর্পণ করেন। সেই নাম শিষ্যের অহরহঃ জপ্য হয়। মন্ত্রই চতুর্থ সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্বক প্রিয় শিষ্যকে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রের মধ্যে কোন মন্ত্র অর্পণ করেন। যাগই পঞ্চম সংস্কার। প্রাপ্ত মন্ত্র দ্বারা জাগ্রোজ-শিলা বা শ্রীমূর্তির আর্চন বিধানের নাম যাগ। এবম্বিধ পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ জীব ভজনক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। ভজন দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমরূপ পরম ফলের লাভ হয়।

ভজনের ক্রম ও পঞ্চ-সংস্কারের মূলত্ব

প্রেমলাভের ক্রম বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, যে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে জীবের কোন প্রকার যোগ্যতা হয় নাই। শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। অন্তরঙ্গ সাধুসঙ্গই গুরু-চরণাশ্রয়। গুরু-চরণাশ্রয় হইলেই পঞ্চসংস্কার ও তজ্জনিত ভজন-ক্রিয়া হয়। ভজন হইতে হইতেই

জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ যত নিবৃত্তি হইতে থাকে, পূর্বলব্ধ শ্রদ্ধা ততই নিষ্ঠাক্রমে পরিণত হয়। নিষ্ঠা হইতে কৃচি, কৃচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাব হইতে প্রেম হয়। অতএব গুরু-পদাশ্রয় পূর্বক পঞ্চসংস্কার লাভ করা সমস্ত জীবের কর্তব্য। ^{মু}পঞ্চসংস্কারই সমস্ত ভজন-ক্রিয়ার মূল, সংস্কার ব্যতীত যে ভজন, তাহা স্বাভাবিক হয় না। - বরং সময়ে সময়ে উৎপাতজনক হইয়া পড়ে ॥

^{জীব-}পঞ্চ-সংস্কার বৈষ্ণবমार्গেরই অবশ্য গ্রহণীয়

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, যাহাদের প্রেমলাভ হইয়াছে তাহাদের সংস্কারের প্রয়োজন নাই। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বদ্ধজীব ভগবদ্ভৈমুখ্য ক্রমে এতদূর বৈমুখ্য লাভ করিয়াছে যে, তাহার পূর্ণ সংস্কার না হইলে সে স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। স্বরূপ লাভ হইবার আর কি উপায় আছে? একমাত্র সংস্কারই তাহার মুখ্য উপায়। সংস্কার ব্যতীত বিকৃতি কিসের দ্বারা বিগত হইবে? যদি কাহারও বিকৃতি দেখা না যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, পূর্বজন্মে গুরুকৃপাক্রমে তাহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে; সেই সংস্কারবশতঃ স্বরূপ লাভ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমোদয় হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে ভগবৎ কৃপা দ্বারা অলক্ষিতরূপে সংস্কৃত হইয়াছে। যে-কোন বিচারই করা যাউক, সংস্কার কখনই অস্বীকৃত হইবে না। তবে মুক্ত জীবদিগের প্রপঞ্চ-যাত্রা-স্থানে তাহাদের সম্বন্ধে সংস্কার নাই; যেহেতু তাহারা কখনই বিকৃত হন নাই। বদ্ধ জীবদিগের বিকারই তাহাদের বদ্ধতার হেতু ও স্বরূপ; এতন্নিবন্ধন সংস্কার ব্যতীত বদ্ধ জীবের মঙ্গল সম্ভব হয় না। যদি কোন পুরুষ পূর্বজন্মের সংস্কার শতঃ ইহজন্মে প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, তিনিই সংস্কারের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না; বরং সাধারণের মঙ্গল জন্য সংস্কার-পদ্ধতি স্বয়ং স্বীকার-পূর্বক জগতের আদর্শ হইয়া পড়েন।

১৭-বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কার পদ্ধতি অন্যান্য ধর্মের সংস্কার হইতে

নির্মূল, ও সর্বশ্রেষ্ঠ -

সর্বদেশে সর্বধর্মে সংস্কার-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যে ধর্ম যতদূর নির্মূল, তাহার সংস্কার-পদ্ধতিও ততদূর নির্মূল ও সম্পূর্ণ। সমস্ত ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি বিচার করিবার অবকাশ অভাবে, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, আর্থ্য ধর্মে যে সংস্কার-পদ্ধতি লক্ষিত হয়, তাহা অন্যান্য ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ আৰ্য্য ধর্মের সারভূত বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি অপেক্ষা নিম্নল ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি আর নাই।

সংস্কারের কল-বৈষম্যের কারণ

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার-পদ্ধতি যদি এত উৎকৃষ্ট, তবে তদুদ্দেশ্যবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বন্ধ-বিকার এতদূর কেন দেখা যায়? উত্তর এই যে, সংস্কার-পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সেই পদ্ধতি আজকাল কেবল নামমাত্র পালিত হইতেছে। পদ্ধতির যে বাক্যার্থ পূর্বের করা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উন্নতি-দার রুদ্ধ হইয়াছে। পদ্ধতির যে তাৎপর্য্য, তাহার কোন আলোচনা দেখা যায় না। শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেই গুরু তাহাকে পঞ্চসংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দেন। এরূপ পঞ্চ সংস্কারের দ্বারা কি ফল হইতে পারে?

শিষ্যটিকে দেখিতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই হয় না। দিব্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হরিণাম অঙ্গে অঙ্কিত আছে। মুখে হরিণাম উচ্চারিত হইতেছে। কোন সময়ে শালগ্রাম-শিলা বা শ্রীমূর্তিতে মন্তোচ্চারণপূর্বক অর্চনা হইতেছে। সেই শিষ্য নানাবিধ পাপে আসক্ত। রাত্রে মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য আচরণ করিতেছে! আহা! গুরুদেব তাহার কি উপকার করিলেন? দীক্ষার পূর্বেই তাহার কি ছিল না, এবং দীক্ষার পরেই বা তাহার কি হইল; পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, বরং অপকৃষ্টতা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পূর্বে সে পাপ করিয়া আপনাকে দীক্ষার করিত, কিসে এ পাপ দূর হইবে, তাহার কিছুমাত্র চিন্তা করিত। সম্প্রতি গুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া তাহার সে-চিন্তা দূর হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাপাচরণ করিতেছে! কি দুর্ভাগ্য!!

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ

এ-প্রকার দুর্গতির হেতু কি? গুরু-শিষ্যের অবৈধ সম্বন্ধই ইহার হেতু, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই প্রকার বিধি আছে,—শিষ্য যে কালে সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া বিচার করিতে করিতে সিদ্ধান্ত করিবে যে, এই সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য, আমি ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইবার জন্য গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিব। তখন শিষ্যের শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। সে গুরুপদাশ্রয়ের যোগ্য বটে। গুরু তাহাকে বৎসরাধিক পরীক্ষা করিবেন।

‘তাপ’-রূপ প্রথম সংস্কারের গূঢ় তাৎপর্য্য

এস্থলে দৃষ্টি করুন—জীবের অন্ততাপকেই তাপ বলে। নরুতাপ জীব

গুরুদেবের পরীক্ষাসময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাহাকে বিমুচক্রাদির তাপ দ্বারা অহিত করেন এবং সেই অক্ষন, শরীর থাকা পর্য্যন্ত ধারণ করিবার বিধান করেন। তাৎপর্য—এই সংসার-ক্লেশ-পুঙ্খিল হইতে সম্বন্ধে মরণ পর্য্যন্ত বিমুক্ত রাখিবে। ইহার নাম—তাপ। ইহাই অক্ষানু জীবের প্রথম সংস্কার। এই তাপ শব্দের নাম ইংরাজী ভাষায়—Repentance, atonement, and permanent impression of the higher sentiment on the soul [অর্থাৎ অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মার উপর উচ্চতর ভাবের স্থায়ী ছাপ পড়ার নাম তাপ] তাপ কেবল শারীরিক নয়, কিন্তু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কেবল শরীর আশ্রয় করিয়া তাপের অবস্থিতি হয় না। যে-স্থানে তাপের কেবলমাত্র শরীরোপায় লক্ষণ, সে-স্থানে ভণ্ডতাই ধর্ম। আজকাল ভণ্ডতাই বৈষ্ণব-ধর্মকে পদচ্যুত করিয়াছে। তাপশূন্য জীবন কখনই বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিতে পারে না। তাপশূন্য সদা-সর্বদাই জড়ীভূত। তাপশূন্য মন সর্বদাই অমঙ্গলপূর্ণ। অতএব হে সুধীরবর্গ! যত শীঘ্র পার তপ্ত হয়! বিলম্বে কার্য্য নাই।

পুণ্ড্র-রূপ দ্বিতীয় সংস্কারের গূঢ় তাৎপর্য্য

যখন অক্ষাবান শিষ্যকে গুরুদেব সম্যক, তপ্ত হইতে দেখিবেন তখনই তিনি বিপুল রূপা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে 'পুণ্ড্র দান' করিবেন। উক্ত পুণ্ড্র কি শোভাজনক! উক্ত পুণ্ড্রের অন্য নাম—উদ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে-পর্য্যন্ত উক্ত পুণ্ড্র না গ্রহণ করেন, সে-পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ! এত বৈরাগ্য! এত স্বস্থ-ত্যাগ! এত রিপু নির্ঘাতন! এ সমুদয় কেবল পণ্ড্রশ্রম হয়, যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরি-মন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নাম—জীবের উদ্ধগতি। তাহা আত্মার, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া উদ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরের অনুরক্ত হওয়ার নাম—তাপ ও পুণ্ড্র। এই অলঙ্কার দুইটি বদ্ধজীবের অত্যন্ত আবশ্যক। উদ্ধপুণ্ড্র শূন্য শরীর শবতুল্য। দৃষ্টি করিলে অনুতাপ দ্বারা স্নাত হওয়া কর্তব্য। উদ্ধপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল ক্ষুদ্রবিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের লম্বালোচনা করে। হে তপ্ত জীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে উদ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর ও পরম বৈষ্ণব-ধানের অতিমুখা হও। উদ্ধপুণ্ড্র শূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া

ধাকে। অতএব উদ্ধ পুণ্ড্র ধারণ কর।

তৃতীয় সংস্কার—নাম-প্রদানের তাৎপর্য

প্রিয় শিষ্যকে তপ্ত ও উদ্ধ পুণ্ড্র-শোভিত দেখিয়া গুরুদেব পরমানন্দ-সহকারে 'নাম' প্রদান করেন। নাম অর্থাৎ হরিনাম প্রদান করেন। হরিনাম প্রদান করিয়া জীবের নিজ স্বভাবকে জাগরিত করেন। জীবের নিত্য স্বভাব হরির নিত্য দাস্ত, নাম-রসামৃতে সিক্ত করিয়া জীবকে পরমপদে নীত করেন। জীব তখন বলেন,—'আমি হরিদাস', আমি মায়া-ভোক্তা নই। কৃষ্ণদাম্বে বৃত্ত হইয়া মায়াতেও নিত্য-কৃষ্ণসম্বন্ধে অবস্থিত। আমি কৃষ্ণদাস, আমি সমস্ত মায়াকে কৃষ্ণদাসী মানিয়া সমস্ত প্রপঞ্চকে কৃষ্ণসম্বন্ধী করিয়া ব্যবহার করিব। অনবরত জীব তখন হরিনাম-গানে মুগ্ধ থাকেন। নামরূপ ভগবদ্ভাস-বিগ্রহকে আশ্রয় করত চিদানন্দ-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। হে সুধীরবৃন্দ! বদনে সর্বদা হরিনাম গান কর, মনে সর্বদা হরিনাম স্মরণ কর, আত্মায় সর্বদা হরিনাম অঙ্কিত কর!

চতুর্থ সংস্কার—মন্ত্রোপদেশের তাৎপর্য

শিষ্যের প্রতি প্রীত হইয়া গুরুদেব জড়গত জীবের পক্ষে হরিনাম-রসপান সুলভ করিবার জন্য মন্ত্রোপদেশ করেন। হরিনামে বিভক্তি-সংযোগপূর্বক 'সম্বন্ধ'-যোজনা দ্বারা নাম-রসের আলোচনা-ভূমিকে বিস্তৃত করেন। 'হরয়ে নমঃ' বলিলে নাম-রসেরই আশ্বাদন জন্য চতুর্থী-বিভক্তিদ্বারা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধদ্বারা উপাসক, উপাস্ত ও উপাসনা-রূপ তত্ত্বত্রয়ের পরস্পর ক্রিয়া সুসিদ্ধ হয়। তাহাতে রসের আশ্বাদন সুলভ হইয়া পড়ে। মন্ত্রপ্রাপ্ত জীব আর আশ্বাদন-স্তবের ইয়ত্তা দেখেন না। যে-সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রের অর্থ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মন্ত্রই ভগবদ্ভাসের একমাত্র সংক্ষিপ্ত নিদর্শন। গায়ত্র্যাদি বিচার করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। বাহারা মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া ভগবদ্ভাসের অষ্ট প্রকার আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচনা অনেক শিথিল ও অসংযুক্ত। যে-অংশ সংযুক্ত হইয়া ঈশ্বরিত ফলদান করে, সে-অংশ মন্ত্র-বিশেষ। অতএব মন্ত্র-গ্রহণ সর্বভোভাবে কর্তব্য। মন্ত্র-গ্রহণ জীবের পক্ষে একটি প্রধান সংস্কার। সমস্ত তত্ত্ব অধগত হইয়াও অনেকে উপাসনা-তত্ত্বে স্থির-ভূমি লাভ করেন না। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে তপ্ত, পুণ্ড্রিত, নামাঙ্কিত ও মন্ত্রোপদিষ্ট হয় নাই। সকল বিষয়েই ক্রম ও পদ্ধতি আছে। ক্রম

ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা কখন কখন উৎপাতের হেতু হইয়া পড়ে ; যথা :—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিঃ বিনা ।

আত্মান্তিকী হরেভক্তিরূপাতায়ৈব কল্পতে ॥ (ব্রহ্মসামল)

অতএব হে সুধীর ব্যক্তিগণ ! তর্কাদি দ্বারা বুদ্ধিকে দূষিত না করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করুন । তাহাতে কেবল আপনাদের মঙ্গল হইবে এমনত নয়, কিন্তু পরম পবিত্রসেতু রক্ষার দ্বারা আপনারা জগজ্জীবের মঙ্গলসাধন করিবেন ।

পঞ্চম সংস্কার—‘যোগে’র তাৎপর্য

শিষ্যের প্রতি অধিকতর মেহ প্রকাশপূর্বক গুরুদেব তাঁহাকে যাগ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন । যাগ-পদ্ধতি ব্যতীত বদ্ধজীবের সম্যক মঙ্গল কোনক্রমেই সাধিত হইতে পারে না । তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র লাভ করিয়াও জীবের সহসা জড় সম্বন্ধ দূর হয় না । উপাসনা দ্বারা হরিতোষণ সাধিত হইলে, মরণান্তে জীব প্রপঞ্চ মুক্তি লাভ করে । অতএব মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও মরণ পর্যন্ত অপেক্ষা অবশ্যই থাকে । সেই কালের মধ্যে জড়াসক্তি না থাকিলেও জড়কার্য্য অনবরত সম্ভব । অতএব জড়ের সহিত সম্যক ব্যবহার করিবার উপায়-স্বরূপ যে পদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে ‘যাগ’ বলি । দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আশ্রাণ, আশ্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদয় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজা-পদ্ধতি নিম্নিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ । জালগ্রাম পূজাতে ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থ-কার্য্যে-যোজিত হইয়াছে । ত্রিবিগ্রহ সেবা-পদ্ধতিই বৈষ্ণব-যাগ । সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে । সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে না । অতএব ভক্তিপূর্বক সমস্ত কার্য্য অর্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করা মাত্ৰাপাদিষ্ট-জীবের কর্তব্য কার্য্য । এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমূহ হইতে সম্যক উদ্ধার করেন । যাগই পঞ্চম সংস্কার । যাগশূন্য পুরুষ হয় জীবনশূন্য হইবেন, নতুবা বহির্মুখ কন্মদ্বারা সংসার ফলকে লাভ করিবেন । অতএব বৈষ্ণব যাগবুদ্ধি হইয়া সংসারে বর্ত্তমান থাকিবেন । এই যাগ-তত্ত্বের বিশেষ-বিবৃতি বৈদীভক্তি বিচারে ‘শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত’ গ্রন্থে [তৃতীয় বৃষ্টি, দ্বিতীয় ধারায়] লক্ষিত হইবে ।

কুল-গুরুগণের কুশিক্ষার প্রভাব

পঞ্চ-সংস্কারের বাক্যার্থ ও মূল-তাৎপর্য নির্দেশ করিলাম। এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, আপন শিষ্যদিগের প্রতি গুরুদিগের এপ্রকার উপদেশ কেন দেখা যায় না? উত্তর এই যে, কালদোষে গুরুসম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। অনুমান হয়—কুলগুরু, নিকট অথবা যে যে ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না।

সদগুরুর লক্ষণ ও তাঁহার আশ্রয় একান্ত কর্তব্য

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দরক্ষা ও পবত্রক্ষে নিষ্ঠা ও আশ্রয়প্রাপ্ত গুরুদেবের নিকট আত্মার শ্রেয়-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবে। যথা :—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম।

শাস্ত্রে পরে চ নিম্নোক্তং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

যে-স্থলে এরূপ প্রপত্তি হয়, সে-স্থলে ভবসিন্ধু গোপ্পদ-তুলা হইয়া পড়ে। যে-স্থলে নাম-মাত্র গুরুর আশ্রয় অবলম্বিত হয়, সে-স্থলে সমস্তই নিষ্ফল। আজকাল সাধারণের পক্ষে সদগুরুর আশ্রয় ঘটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ সংসারানল-তপ্ত হইয়া অনেক যত্নপূর্বক সাধু আন্বেষণ করিতে করিতে সদগুরু লাভ করেন। অতএব জীবের পক্ষে সদগুরু আন্বেষণই কর্তব্য। যদি সদগুরু অপ্রাপ্ত হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই; যেহেতু ভগবান্ স্বয়ং সদগুরু আন্বেষকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। সদগুরু লাভসাধ্যত প্রবল হয়, ততই অঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্ম যে-কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত নয়। আন্বেষণ করিতে করিতে যাহাকে সদগুরু বলিয়া বেধ হইবে, তাঁহাকে একবৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করত শ্রীগুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিবে। পরীক্ষা ব্যতীত যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, সে কেবল অনর্থেরহেতু।

পঞ্চ-সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুরের মন্তব্য

পূজ্যাপূজ্য বিচারপূর্বক ইচ্ছাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বদজীবের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চ-সংস্কার না হইলে ঐকান্তিকী ভক্তি কোনক্রমেই সম্ভব হয় না; অতএব পঞ্চ-সংস্কার নিত্য আবশ্যক।

—ভগদগুরু শ্রীম ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রী শ্রীগৌরমুন্দরের আবির্ভাব-বাসরে ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(১)

কষিভ-কাঞ্চন-উজল বরণ, জিনিয়া যাঁহার অমল কান্তি ।

যাঁহারে হেরিলে মোহ দূরে যায়, উপজে মেদুর মধুর শান্তি,

বিরাট বিশ্ব রচিত যাঁহার, যাঁহার মায়ায় মোহিত মানব,

বিরিঞ্চি-মহেশ-দিনেশ-দেবেশ, নিয়ন্ত্র যাঁহার করিছেন স্তব,

(যাঁ'র) চরণ কল হরে পাপ-তাপ, নামে দূরে যায় শমন-ভয়,

(তিনি) গোলোক-বিহারী নদীয়া-বিহারী, গাহ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয় ।

যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, অজ-ভব আদি দেব সমাদরে ।

বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কন্ন প্রকট-বাসরে ॥

(২)

শতদল-দল লোচন যাঁহার, ললাট যাঁহার জোহনা-শুভ্র ।

সুশীল-সুন্দর নয়নের তারা, হেরি' বিমলিন বিষাদে অভ্র ॥

আজানুস্মিত বাহু সুবলিত, গলে দোলে যাঁ'র বনকুল-হার,

করীন্দ্র জিনিয়া গমন মধুর, অনন্ত মাধুরী প্রতি অঙ্গে যাঁ'র,

তাঁহার চরণে লহরে শরণ, কেটে যাবে মায়া-মোহের বন্ধ ;

পাদপদ্ম-সুখা পানে চক্ষুমান, হ'বে, যেই জন মায়াতে অন্ধ ।

যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, অজ-ভব আদি দেব সমাদরে ।

বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কন্ন প্রকট-বাসরে ॥

(৩)

পবিত্র সলিলা জাহ্নবী যাঁহার, চরণ কমলে জনম পান ।

বীণার বাঙ্গারে নারদ যাঁহার, অনন্ত মহিমা করেন গান ॥

অরুণ যাঁহার কমলা নয়ন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবের তরে ।

গোলোকের খন বিলান যে জন, অভয় তাঁহার যুগল করে ॥

তিনি ত শ্রীগৌর অবীম কিণোর, চির সুন্দর গাহ তাঁর জয় ।

চরণে তাঁহার লইলে শরণ, আর কি রহিবে শমনের ভয় ?

যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, অজ-ভব আদি দেব সমাদরে ।

বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কন্ন প্রকট-বাসরে ॥

(৪)

দৈন্তে যাঁহার চমকে বিশ্ব, ত্যাগের যাঁহার তুলনা নাই ;
 ভুবন-গোহন নৃত্য যাঁহার, হেরিলে আপনা ভুলিয়া যাই,
 প্রকাশানন্দে করিয়া করুণা, স্ব-প্রেম যে জন করিলা দান,
 ভেবে দেখ মন সেই প্রভু হ'ন, কতই দয়াল কত মহান ;
 ভজ ভজ মন তাঁহার চরণ, সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে ধরি'—
 পরম আনন্দে যাইবে তরিয়া, অকুল এ' ভব-বারিধি-বারি ।
 যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, অজ-ভব আদি দেব সমাদরে ।
 বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কহ প্রকট-বাসরে ॥

(৫)

(যিনি) ভকতি-আলোকে জীবের হৃদয় কলুষ-কালিমা নাশি' অকাতরে,
 ধর বনি' নাম বিলাইতে যান, কাঙ্গালের বেশে প্রতি ঘরে ঘরে,
 অবিচ্ছা-সেবক সার্বভৌম-দর্প, বিচারে আচারে করিয়া চূর,
 (তাঁরে) ষড়ভুজ রূপ দেখায়ে যে জন, মনের অঁধার করিলা দূর,
 পরম করুণ হ'ন সেই জন, দয়ার তাঁহার নাহিক পার,
 জীবের লাগিয়া হৃদয়ে তাঁহার, বহিছে সতত করুণার ধার ।
 যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, বিধি-হর আদি দেব সমাদরে ।
 বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কহ প্রকট-বাসরে ॥

(৬)

অতি সযতনে অগুরু-চন্দনে, সিক্ত করিয়া তুলসী-দল,
 পূজি' ভক্তিভরে তাহে মিশাইয়া, পতিত-পাবনী সুরধুনী-জল,
 (যাঁরে) আনিলা আচার্য্য গোলোক হইতে, হেরিয়া জীবের মলিন মুখ,
 নিজ দাস জীব-দুঃখ নিবারিতে, তাজিলেন যিনি সংসারের সুখ,
 তাঁহারে ভজিতে মোর মূঢ় মন, কেন হ'লে এত পরাধুখ ?
 তাঁহারে ভুলিয়া সংসারে মজিলে, ভেবেছ কি যাবে ভবের দুঃখ ?
 যাঁহার আদেশ পালন-নিরত, বিধি-হর আদি দেব সমাদরে ।
 বন্দি তাঁহার যুগল চরণ, আজিকে কহ প্রকট-বাসরে ॥

দীন সেবক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণর
 নারায়ণ (মেদিনীপুর)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতত্ৰী ত্রীমূর্ত্তিসিদ্ধান্ত সৰস্বতী

গোস্থানী মহারাজের অশীতিতম আবির্ভাব বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥

শ্রীবার্ঘভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাকরে ।

কৃষ্ণ-নন্দক-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীকৃপানুগভক্তিদ ।

শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিশ্রহায় নমোহস্ত তে ॥

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীন-তারিণে ।

কৃপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বাস্তহারিণে ॥

হে গোড়ীয় ভাস্কর ! আপনার অন্তাচলে গমনের পর, আজ গোড়ীয় গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে । আউল, বাউল, কর্তাভজা, নোঁড়া, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই, কাঁলাচাঁদী, কিশোরীভজা প্রভৃতি অসংখ্য অপসম্প্রদায়ের বিকট হাস্তে এবং তাণ্ডব নৃত্য ভারত টলমল ; ইহাদের অত্যাচারে শুদ্ধ-বৈষ্ণব সম্প্রদায় আজি হাহাঁকার করিয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন । হায় ! জগতের ভাগ্যে কি পুনরায় আপনার সেই ছলভ সৌম্য মূর্ত্তির দর্শন মিলিবে ?

হে চৈতন্য-সরস্বতী-গৌরবাণী ! আর কি পুনরায় আপনার প্রেম-বিচ্ছুরিত মধুর হাস্ত, আমরা অবলোকন করিতে পারিব ? সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চন, এবং কলিকালে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনের বিধান পাশ্বে আছে । আপনি, কলিহত জীবের মঙ্গল কামনায় দিবারাত্র অজস্র সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । আহা-নিদ্রা-বিশ্রামরহিত হইয়া সজ্জন-দুর্জ্জন, পঙ্কু-অন্ধ, বিষয়ী-অবিষয়ী, বিদ্বান্-অবিদ্বান্, পণ্ডিত-মূখ—সকল-ঘরেই অযাচিতভাবে শ্রীহরিনাম বিতরণ করিয়াছেন । জীবন্ত মৃদঙ্গ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী-বহনকারী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসিগণদ্বারা ভারতের দ্বারে দ্বারে এবং পাশ্চাত্যপ্রদেশে শ্রীহরিনামের জয় ডঙ্কা বাদন করিয়া প্রেমদানে জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন । আপনার আশ্রিত উন্নততম বৈষ্ণবের মহিমা চতুরানন, পঞ্চানন, সহস্রাননও বলিতে সক্ষম

নছেন। বলিতে কি, পৃথিবী যদি কাগজ হয়, উন্নত স্রমের পর্বত যদি লেখনী হয়, সমুদ্র যদি মসী হয়, তথাপি আপনার গুণগ্রাম, পরোপকার, জীবে দয়া ও অতিমর্ত্য স্নেহ-রাশির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া কীর্তন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি জীবকল্যাণের জন্য শ্রীহরিগুণগাথা বঙ্গভাষায় দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশে', সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়', পাক্ষিক 'পরমার্থীতে' (উড়ীয়া), মাসিক 'হারম-নিষ্ঠে' (ইংরাজী) এবং 'ভাগবত' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মী, সান্কা, খারোদী, পুঙ্করমাদী ভাষার সম্মান করিয়া তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিয়াছেন। এইসমস্ত বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ বৈকুণ্ঠদূত তারস্বরে বলিতেছেন,— 'উঠরে উঠরে ভাই! আরত সময় নাই, দিনমণি অবসান হ'ল।' বেল ত চলে গেল, আর নিশ্চিন্ত থেকনা, শ্রীহরিভজন কর।

হে পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, প্রভূত শক্তিশালী। আপনি ইচ্ছা করিলে 'কাকেরে গরুড়' করিতে পারেন, পঙ্খকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করিতে পারেন, মূককে বাক-শক্তি প্রদান করিতে পারেন, আপনাতে অসম্ভব কিছুই নাই।

আপনি শ্রীভাগবত শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌর জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছিলেন। শুধু সেই স্থানেই নহে, রাজধানী কলিকাতায়, প্রয়াগে, পাটনায়—নানাবিধ বিগ্রহাদি প্রকট করিয়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির মাহাত্ম্য অসংখ্য জীববৃন্দের নিকট কীর্তন করিয়াছেন; আপনার দয়া জগতে অতুলনীয়।

হে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব! জীব-চক্ষু কলি-মলরূপ 'ছানি'তে আবৃত হইলে আপনি জ্ঞানরূপ অঙ্কন-শলাকা দ্বারা ছানি বিমোচিত করিয়া দিব্য-চক্ষু এবং দিব্য-জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র, যাগ ইত্যাদি সংস্কার প্রদান করিয়া পতিত ব্যক্তিকেও পতিত-পাবন করিয়াছেন। সেই মুক্তকুলদ্বারা আচার এবং প্রচার করাইয়া জগৎকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিয়াছেন। আজ আপনার এই শুভ আবির্ভাব বালরে কি প্রকারে আপনার রাতুল চরণে পুষ্প ও মাল্যাদি অর্পণ করিব, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। কারণ আমি বদ্ধ, দীন, মূক ও অন্ধ। আপনার পাদ-পদ্মের মহিমা কিছুই জানি না। তবে আপনি অহৈতুকী দয়া করিয়া যদি হৃদয়ে উদিত হন তবেই আপনার কৃপা শক্তিতে শক্তি লাভ করিয়া 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার স্থায়' কিছু সেবা-অর্চনাদি করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

—“শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আশ্রসাথ।”—অতঃ ইহাই আমার প্রার্থনা।

হে বিবুধাশ্রয় ! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তন করিয়াছেন—“জড় বিষ্ঠা বত, নারার বেতব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জননিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা ॥” আপনি সেই জড় বিষ্ঠা নিরসন করিয়া জীববৃন্দকে ব্রহ্ম-বিষ্ঠার অধিকারী করিয়াছেন। আপনি সমগ্র বেদ, বেদান্ত স্মৃতি, পুরাণাদি অধ্যয়নপূর্বক, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সিদ্ধি মন্বন করিয়া নিজ জীবনে উহা আচরণ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিরই প্রাধাত্য জগতে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই মঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—ইহা জগৎকে জানাইয়াছেন। আপনি অত্যাভিলাষাদি-ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে ধিকৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরূপ “মহারত্নের খনি” প্রদর্শন করিয়াছেন।

হে দয়ার সাগর ! আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের “অনন্দোদয়া” দয়ার প্রচারক। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর শ্রীপুরীধামে শ্রীগোরাঙ্গদেবকে প্রথম দর্শনেই এই বলিয়া নমস্কার বিধান করিয়াছেন—

“হেলোকুলিত-খেদয়া বিশদয়া, প্রোন্মালদামোদয়া,
শাম্যচ্ছাত্র-বিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া, স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তব দয়া ভূষাদমন্দোদয়া ॥”

আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের “এই দয়ার কথাই” জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন। নীলাধ্বনির স্থায় এই দয়ার তরঙ্গ জীব-কল্যাণের নিমিত্ত প্রবাহিত হইয়াছে—ইহার আদি অন্ত নাই। জাগতিক লোকসমূহ, অনিত্য দয়ার কথা জানে; কিন্তু নিত্য-দয়ার কথা জানে না। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী ইত্যাদির জন্ত ধনী লোক, বহু অর্থ দান করিয়া দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এই দয়ার জীবের চির-অভাব দূরীভূত হয় না। অন্ন খাইলে পুনরায় ক্ষুধার উদ্বেক হয়, বস্ত্র প্রদান করিলেও কিছু দিবস পরে উহা জীর্ণ হইয়া যায়, ঔষধ প্রদান করিয়া কিছু দিবসের মত অস্বাথী নিরাময় হইলেও পুনরায় রোগ দেখা দেয়। এইসব দান দয়া বটে, কিন্তু পুনরায় মন্দের উদয় করায় বলিয়া ইহার নাম “মন্দোদয় দয়া” শ্রীল প্রভুপাদের দান—অনন্দোদয়া দয়া। ইহার মাহাত্ম্য জড় বিষ্ঠা ও অক্ষজ জ্ঞানের অগম্য। এম, এ; পি, এইচ, ডি, তথা কথিত অক্ষজ বুদ্ধি লইয়া অনন্ত কাল গবেষণা করিলেও ইহার অন্ত

পাইবে না। ইহাদের উক্তি এই যে হরি-ভজন করিলে কি হইবে? তাহাতে কি পেট ভরিবে? তুলসী বুক্ষে জল দিলে কি হইবে? লাউ, কুমড়া, বেগুন গাছে জল দিলে তবু কিছু পেট ভরিবার আশা আছে।—ইহাই পশু-বুদ্ধি, ইহাই দৈত্য-দানবোচিত বিচার। জড় মন ও দেহ লইয়া অর্থাৎ দেহাত্ম বুদ্ধি লইয়া ইহাদের চিন্তা-ধারা। আত্মার স্বরূপ পূর্ণ চেতনের সেবা—শ্রীবিগ্রহের সেবা। শ্রীভক্তিদেবী তুলসীর সেবা—অপ্রাকৃত চিন্ময়ী সেবা। চেতনের খাতি—কেবল শ্রীহরি সঙ্কীর্ণন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী অঘটন-ঘটন-পটীয়াসী মায়াদেবীর কুপায় বদ্ধ জীবের ইহা বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীভাগবতের উক্তি এই যে,—প্রাণে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই সজীবতা লাভ হয়, তদ্রূপ বিভুচৈতন্য-শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ ও লীলাদির সেবা দ্বারাই জীবের আত্মানন্দ—পরানন্দ লাভ হয়—ইহা দেহ-মর্যাদা-বাদিগণ সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না! হে জগদগুরো! আপনি এই দয়া অবাচিতভাবে জগজ্জীবকে অহৈতুক করুণা হেতু বিতরণ করিয়াছেন। সুতরাং আপনার দয়ার তুলনা এ চতুর্দশ ভুবনে বা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নাই! নাই!! নাই!!!

হে জগদগুরো! অণু চৈতন্য জীব, বিভু চৈতন্য শ্রীভগবানেরই ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র অংশ। তাঁহাকে তুলিয়া জীব এই চতুর্দশ ভুবনাত্মক মায়া-কারাগারে পড়িয়া আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক, আদিদৈবিক ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। বাসনাময় লিঙ্গ শরীর দ্বারা আবৃত হইলে জীব জননী জঠরে প্রবিষ্ট হইয়া কালক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়। তখন সে স্থিতি, বুদ্ধি, ক্ষয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, মোহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি বিকারের বশীভূত হয়। ইহাই জীবের “ভব রোগ”। এই দারুণ ভব-রোগ হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। আপনি এই ভব রোগের মহৌষধি মায়া-বিনাশী শ্রীহরিনাম জগতে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; সুতরাং আপনার দয়ার অবশিষ্ট নাই।

হে অনাথবন্ধো! জীবের স্বরূপে কোন অভাব নাই; এই বিরূপে অর্থাৎ মায়া-রাজ্যে অনন্ত অভাব; এই অভাব দূর করিবার শক্তি জাগতিক বদ্ধ জীবের নাই। এই দারুণ কলিকালে, শ্রীহরিনামের মহা-চুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীহরিনাম—মহৌষধ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ—পথ্য; চেতনের ইহাই খাদ্য ও পথ্য। তাহা না পাইলে, আত্মার বৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও শুষ্ক হইয়া যায়। এই খাদ্য পাইলে জীবের ভব-ক্ষুধাদি যাবতীয় অভাব চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়। সাধারণ জীব সকল এই জীব মঙ্গলকারিণী দয়ার কথা

মায়াদেবীর প্রভাবে বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়াছে। তাই ইহাদের ক্রেশের নিবৃত্তি হইতেছে না। আপনি জীবের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ জ্ঞান নিরাস করিয়া অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা এবং অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য যথা—বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য, গোলোকে মাধুর্য্য এবং শ্রীধাম নবদ্বীপে ঔদার্য্যের মহিমা প্রচার করিয়া জাগতিক জড় বিদ্যাসমূহকে অনুপাদেয় ও হেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। “সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ পাদ-পরে যদি চিত্ত-বিত্ত রয় ॥”—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও তাৎপর্য্য। জীবের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইলে সে দেখিতে পাইবে—চতুর্দিকে আনন্দেরই ধাম। এখানে মায়ার নিরানন্দের প্রবেশের অধিকার নাই; কেবলই আনন্দ—অফুরন্ত আনন্দ—এ যে কুণ্ঠারহিত স্থান। এ যে বৈকুণ্ঠ-পুরী—আনন্দেরই ধাম। হেথায় জরা, যুত্ব, ব্যাধি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই। এখানে শোক মোহের চির অবসান।

পরিশেষে এই শুভ বাসরে করযোড়ে—গললগ্নীকৃতবাসে আপনার শ্রীচরণ-সরোজে সকাতরে প্রার্থনা করি—যেন জন্মে জন্মে আপনার অহৈতুকী রূপা হইতে বঞ্চিত না হই। সপার্ষদ আপনার জয় হউক! জয় হউক!! জয় হউক!!! আজ এই শুভ বাসরে সতীর্থবৃন্দের চরণে বন্দনা করি; তাঁহাদেরও রূপা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি—

দীন ভিক্ষু (ত্রিদিগ্ধি-স্বামী) শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম (মহারাজ)

ইমলিতলা—শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীরূপগোস্বামীর গৃহত্যাগ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপু্রে প্রত্যাগমনের পর গোস্বামীদ্বয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম মল্লিকের সহিত গৃহ-ত্যাগের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন প্রকার উপায় নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রিকালে রাজমহিষী গোড়েশ্বরের অঙ্গের কোন এক নিভৃত স্থানে, একটি চিহ্ন দেখিয়া তার-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কিম্বের চিহ্ন? গোড়েশ্বর উহা গোপন করিবার চেষ্টায়, অগ্রমনস্ক ভাব দেখাইয়া রাজার প্রীতি উৎপাদন নিমিত্ত প্রজাবর্গের রাজ-ভক্তির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাজা ঐ সমস্ত

কথা উপেক্ষা করিয়া প্রাণেশ্বরের সঙ্গে ক্ষত-চিহ্নের বিবরণ জানিবার জন্ত-ই অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। রাজ্যের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বাদশাহ আর ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—“আলাউদ্দিন হোসেন সারখন গোড়েশ্বর অর্থাৎ রাজা ছিলেন, তখন তাঁহার অধীনস্থ সুবুদ্ধি-রায় নামক কোন এক হিন্দু জমিদারের অধীনে আমি কার্য্য করিতাম। ঐ জমিদার সুবুদ্ধি রায় মহাশয় আমার উপর একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করিবার ভার অর্পণ করিয়া ছিলেন। উক্ত কার্য্যে কোনপ্রকার ছিদ্র পাইয়া আমাকে তিনি কশাঘাত করেন। ইহা তাহারই ক্ষুদ্র চিহ্ন মাত্র।” ইহা শুনিয়া রাজ্যী ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পরক্ষণেই অগ্নিবৎ জলিয়া উঠিলেন। এবং সুবুদ্ধি রায়ের শিরশ্ছেদই সমীচীন দণ্ড বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। কিন্তু গোড়েশ্বর তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন—‘সুবুদ্ধি রায়-ই আলাউদ্দিন হোসেন সার রাজ্যচ্যুতির প্রধান উপাদান, তিনি আমার পোষণ কর্তা, তিনি বিনাদোষে আমাকে দণ্ড করেন নাই। ভৃত্যের প্রতি প্রভু বা মনীষের দণ্ডই একমাত্র মঙ্গলের হেতু। যে ভৃত্য মনীষের দণ্ড নিষিদ্ধারে বহন করিতে সমর্থ থাকে সে ভৃত্যই নিত্য মঙ্গল বা চির সুখ লাভ করে। আমার প্রতি সুবুদ্ধি-রায়ের এই কশাঘাতই, সর্ব মঙ্গলের হেতু হইয়াছে—তজ্জন্তই আজ তুমি আমার গোড়েশ্বরী বা রাজ্যী হইতে পারিয়াছ।’ চেরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—নারীজাতি যেমন সরলা, উদারচিত্তা, নম্র-ভাষিনী, ও স্নেহশীলা, তেমনি আবার সমালোচনা করিলে দেখা যায় তাহারাই বিবাদ-প্রিয়, কলহ-সৃজনকারিণী; এমন কি বিষ উদগীরণকারী ভুজঙ্গও তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া থাকে। ভুজঙ্গিনী যাহাকে দংশন করে, কেবল তাহারই প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে,—অপরের নহে। কিন্তু নারী কাহারও প্রতি কষ্ট হইলে তাহার জাতি, ধন, জন, গৃহ, সমাজ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। নারী জাতির এই প্রকার মহিমা—প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও যে দৃষ্ট হয় না—এমন নহে। নে যাহা হউক—সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ড না হইলে, রাজ্যী নিজেই আত্মহত্যা করিবেন—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া গোড়েশ্বর অতিশয় নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তৎপর ঘন অন্ধকারে আবৃত নিশিতেই সহকারী মন্ত্রী স্ত্রীরূপ গোস্বামীকে আনিবার জন্ত তদগৃহে কেশব সেনকে পাঠাইলেন। কেশবের মুখে গোড়েশ্বরের আদেশ জ্ঞাত হইয়া রূপ গোস্বামী তাঁহার সহিত রাজভবনে গমন করিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরেরও অধিক। বিশেষতঃ মেঘমালা ঘন গর্জনের সহিত চতুর্দিক আবৃত করিয়া বিন্দু বিন্দু বর্ষণ

করিতেছিল। তাঁহারা বাইতে বাইতে কোন গৃহস্থের গৃহের পশ্চাতে বাইয়া স্থিত হইলেন। তাঁহাদের পদ-শব্দে গৃহস্থিতা গৃহিণী চেষ্টন পাইয়া নিজ পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রকার দুৰ্যোগময়ী রাত্রিতে কে শয্যা-মুখ ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছে? স্বামী উত্তর করিলেন, বোধ হয়, কোন নিশাচর জীব-জন্তু বাইতেছে। পত্নী বলিলেন—হাঁ, এই দুৰ্যোগপূর্ণ রাত্রিতে কোনও জীব-জন্তু বাহির হয় না। ইহা নিশ্চয়ই কোন রাজ-কর্মচারী অথবা ধনী ব্যক্তির ভৃত্য। প্রভুর কার্যের নিমিত্ত বা প্রীতি উৎপাদনার্থে স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, এই দুৰ্যোগময়ী গভীর রাত্রিতে গমন করিতেছে। রূপ-গোস্বামী তাঁহাদিগের এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। উহা তাঁহার অন্তরে বিশেষ আঘাত করিল। তিনি আপনাকে উক্ত নীচ বর্ণ হইতে ও স্বর্ণ্য ও পরাধীন ভাবিয়া যৎপরনাস্তি দুঃখিত হইলেন। রাজাদেশে আদিষ্ট হইয়া রাজ-প্রেরিত কেশবের অনুগমন করিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, ও গোড়েশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া রাত্রিকার ঘটনাসকল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলেন। গোড়েশ্বরের আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সুবুদ্ধি রায়ের জীবন রক্ষার্থে বহু কষ্টে রাজ্যকে প্রবোধিত করিলেন। সুবুদ্ধি রায়ের শিরশ্ছেদের পরিবর্তে, জাতি নাশের কথাই হির হইল। তৎপর রূপগোস্বামী যথাগত পথে নিজ-গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবং তিনি অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া জগৎ-পাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন যাপন করাই মনস্থ করিলেন। তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন গোস্বামীর অনুমতি লইয়া, সমস্ত ধন ও ভূ-সম্পত্তি যথাক্রমে, সদ-ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশে বিভাগ করিয়া দিলেন। এবং কিঞ্চিৎ মাত্র অর্থাৎ দশ সহস্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠের প্রয়োজন নির্বাহার্থ গোড়ের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এই সমস্ত কার্য গোড়েশ্বরের অজ্ঞাতসারেই সমাধিত হইল। এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গতিবিধি জানিবার জন্য কয়েকজন লোক উৎকলে প্রেরিত হইল। তিনি নিজেও রাজ-কার্যে উদ্যমিত দেখাইয়া নিজ গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রেরিত লোক সকল উৎকল হইতে প্রত্যাগত হইয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন-পথে বৃন্দাবন যাত্রার কথা জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রূপগোস্বামী কালবিলম্ব না করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত প্রয়াগের পথে যাত্রা করিলেন।

সনাতন-গোস্বামীরা কারাবাস

সনাতন গোস্বামী তখন রামকেলি গ্রামে থাকিয়াই রাজকার্য্য পরিত্যাগের কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলেন ও বিষয় ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পরমার্থ বিহীন জীবনে বিরক্তি হেতু মনে মনে বিষয় ত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাজ সভায় গমনে বিরত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত কাঞ্চ-পণ্ডিতগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রিয়াকলাপরূপ অমৃত আশ্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সনাতন সুর্যোগ পাইলেই প্রভুর চরণে উপস্থিত হইবেন, ইহাই মনস্থ করিয়া গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী সনাতনের অনুপস্থিতি দেখিয়া, গৌড়েশ্বর ইহার কারণ জানিবার জন্ত কোন বিশ্বস্ত লোককে রামকেলি গ্রামে পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি সহকারে বাদসাহের আদেশ নিবেদন করিল। ‘গৌড়েশ্বর আপনার অনুপস্থিতি হেতু সমস্ত রাজসভা অন্ধকার অনুভব করিতেছেন এবং আপনার অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যাইয়া কি নিবেদন করিব বলিতে আজ্ঞা হউক।’ সনাতন গোস্বামী সংবাদ-বাহককে এই প্রকার বলিয়া বিদায় দিলেন—‘হে প্রিয়! তুমি গৌড়েশ্বরকে নিবেদন জানাইয়া বলিও—হে বাদসাহ! আপনার প্রিয় সাকর্য্য অশুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারে নাই।’ বাদসাহের প্রেরিত লোক সনাতন গোস্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজ-সভায় ফিরিয়া গেল এবং গৌড়েশ্বরের নিকট যাইয়া মন্ত্রীর অশুস্থতাই অনুপস্থিতির হেতু বলিয়া নিবেদন জানাইল। গৌড়েশ্বর প্রেরিত লোক মুখে মন্ত্রীর অশুস্থতার কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে রোগ মুক্ত করিবার জন্ত রাজবাড়ীর চিকিৎসককে মন্ত্রীর ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। চিকিৎসক যাইয়া দেখিলেন—মন্ত্রী সনাতন আনন্দ মনে পণ্ডিত মণ্ডলীর শোভাবর্দ্ধন করিয়া ভগবদ্ কথামৃতকোঁর্জন করিতেছেন। তিনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, মন্ত্রীর শরীর অশুস্থ নহে। তথাপি বলিলেন—মন্ত্রীবর! আপনি অশুস্থ—সংবাদ পাইয়া, গৌড়েশ্বর আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যাইয়া কি জানাইব তাহা বলিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। আমি দেখিয়া যাহা অনুভব করিতে পারিলাম তাহাতে আপনার শরীর বোধ হয় সুস্থই আছে।’ সনাতন গোস্বামী বলিলেন—‘হে বৈদ্যরাজ আপনার অনুভব সত্য এটে, আমার শারীরিক কোন প্রকার দীড়া হয় নাই, মন খুবই অশুস্থ। এই মনের দ্বারা রাজকার্য্য চালাইতে পারিব—ইহা সন্দেহ হয় না। গৌড়েশ্বরকে

জানাইবেন,—আমাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। চিকিৎসক এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি গোড়েশ্বরের নিকট জানাইলেন—মন্ত্রীর শরীর সুস্থই আছে। তিনি পাণ্ডিত মণ্ডলীতে উপবিষ্ট থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। মনের অসুস্থতা নিবন্ধন রাজকার্য্য চালাইতে অক্ষম। বাদসা হুসেনসাহ চিকিৎসকের মুখে মন্ত্রীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে স্বয়ংই তাঁহার ভবনে গমন করিলেন। মন্ত্রী সনাতন গোড়েশ্বরকে নিজগৃহে সমাগত দেখিয়া, যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। গোড়েশ্বর আসন গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রী সনাতনের অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যের বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে জানাইলেন। অতি সত্বর সভায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন।

সনাতন গোস্বামী—গোড়েশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সবিনয় বলিলেন,—‘হে বড়েশ্বর! আমার চিত্ত বিশেষভাবেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি এই প্রকার অবস্থায় যে গুরুতর রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিব একরূপ মনে হইতেছে না। গোড়েশ্বর মন্ত্রীর উক্তি শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তই হইলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, আমার সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া রাজ্য বিনষ্ট হউক—ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? আমি তোমার ধর্ম্ম-কার্য্যে কোন প্রকার বাধা প্রদান করি নাই, তবে কেন কার্য্যের অবসর লইতে ইচ্ছুক হইয়াছ? রাজকার্য্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অন্তর্গত নহে? কর্ম্ম ও ধর্ম্মের সমালোচনা করিতে গেলে অনেক স্থলেই এই প্রকার মতদ্বৈত উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ম্মই জড় জগতে বন্ধনের শৃঙ্খল-স্বরূপ, আর ধর্ম্ম—বৈকুণ্ঠ রাজ্যের বস্ত্র বিশেষ, সনাতন গোস্বামী এই প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিলে—

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।

তোমার ‘বড় ভাই’ করে দস্যুব্যবহার ॥

জীব-পশু মারি’ কৈল চাকলা সব নাশ।

এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥

সনাতন কহে, তুমি স্বতন্ত্র গোড়েশ্বর।

যে যেই দোষ করে, দেহ’ তার ফল ॥

এত শুনি’ গোড়েশ্বর উঠি’ ঘরে গেলা।

পলাইব বলি’ সনাতনেরে বাঁকিলা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯২০-২৭)

সনাতন গোস্বামীর শেষ উক্তি শ্রবণ করিয়া বজেশ্বর রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—তোমার ভ্রাতা (বজেশ্বর স্বয়ং) দস্যুর আয় সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি অস্বস্থের ভাণ করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য পণ্ড করিতেছে। ইহা কি তোমার পক্ষে অধর্ম্ম নহে? তোমরা ধর্ম্মের জন্ত অধর্ম্মাচরণেও কুণ্ঠিত নহ। ইহা কি পাপ নহে? ইহার কি দণ্ড নাই? বজেশ্বরের এই প্রকার অযথা তিরস্কারে অস্তুরে বিরক্ত হইয়াও গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—আপনি রাজেশ্বর ও স্বাধীন। আপনি ইচ্ছা করিলেই অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতে পারেন। গৌড়েশ্বর তাহাতে বিশেষ রুষ্ট হইয়া অতঃকোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়া মন্ত্রীকে আবাস পরিত্যাগ করিলেন। বাহাতে সনাতন গোস্বামী পলাইতে না পারেন সেজন্ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজভবনের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

গৌড়েশ্বর যুদ্ধ কামনায় উড়িষ্যায় গমন করিলেন। সনাতন গোস্বামী কারাগারেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঈশান নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সে একদিন শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত একখানি পত্র লইয়া কারাগারে উপস্থিত হইয়া সনাতন গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাচল হইতে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার আচরণ দর্শন কামনায়, বৃন্দাবন চলিলাম। আপনি যে কোন প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সম্বন্ধের আগমন করুন। উদ্ভট চন্দ্রিকা গ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন যে, নিম্ন শ্লোকটী শ্রীরূপ গোস্বামী পত্রাকারে লিখিয়া গোড়ের বন্দিশালে সনাতন গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।—

“বদুপতেঃ ক গতা মথুরা-পুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা।

ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারণ ॥”

পত্র প্রাপ্ত হইয়া সনাতন গোস্বামী কি করিলেন? (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৪-৭)—

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।

যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥

“তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।

কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥

এক বন্দী ছাড় যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া।

সংসার হইতে তাতে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥

পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার।

পুণ্য, অর্থ, দুই লাভ হইবে তোমার ॥” (ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ডেশ্বরী শ্রীমদভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের অশীতিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-প্রশস্তি

(১)

নমঃ তুং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্টায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥

(২)

বন্দ মন সযতনে গুরুপাদপদ্য ।
আর তদমুগ যত ভক্ত-অলিবৃন্দ ॥
সপার্বদ গুরুপাদপদ্য জয় জয় ।
গুরু-কৃপা হ'লে শুদ্ধা ভকতি লভয় ॥
শ্রীগুরুচরণ হও পরসন্ন মোরে ।
মো-হেন পাষণ্ডী আর না পাবে সংসারে ॥
জগাই মাধাই হ'তে মুঁই কোটী গুণ ।
অজামিল রত্নাকর আদি যত শুন ॥
মম সম অপরাধী তা'রা নাহি ছিল ।
নামাভাসে তা' সবার পাপ দূরে গেল ॥
হেন অপরাধ কোন ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই ।
সহস্র সহস্রবার যাহা করি নাই ॥
মহৈতুকী কৃপা তব করহ সফল ।
এইত প্রার্থনা রাদ্রা চরণে কেবল ॥

(৩)

অজ্ঞান তিমির হরি' জ্ঞানের শলাকা ধরি'
চক্ষুদান দিল যেই জন ।
হেন গুরু পাদপদ্য কেবল ভকতি-সদ্ব
কায়-মনে বন্দি অনুক্ষণ ॥
নমামি নমামি আমি নমামি গুরু-গোস্বামী
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ।
পরমহংস মহাশয় প্রভুপায় জয় জয়
দীন হীন কাঙ্গালের গতি ॥
করুণা-সমুদ্র তুমি কণামাত্র মাগি আমি
পতিতা অধমা দুর্মতি ।

কৃপা করি' দয়াময়

রাখ তব রাঙ্গা পায়

পাষাণীর এই যে মিনতি ॥

(৪)

তুমি গোলোকের নিধি

গোলোকে নিত্য-বসতি

'আশ্রয়'-শ্রীমূর্তি ভগবান্ ।

'বিষয়ের' সেবা দিতে

এসেছিলে এ' ধরাতে

আচার-প্রচারে পরমাণ ॥

কলিহত-জীব-উদ্ধার

সকল দৃঢ় তোমার

দেখিয়াছি প্রভু দয়াময় ।

তাই তুমি নীলাচলে

গোবিন্দ-পঞ্চমী হ'লে

পুরোধানে হইলে উদয় ॥

(৫)

বাসুদেব-ভক্তিরনে

বাসুদেব তাঁ'র বশে

জন্মে যথা মথুরা-নগরে ।

সেইমত তুমি প্রভু

জন্ম লভিলে কভু

শ্রীভকতি-বিনোদ-মন্দিরে ॥

জগন্নাথ 'ভগবতী'

যেন সতী দেবহুতি

ধন্য ধন্য ধন্য মানি তাঁ'রে ।

বাঁ'র ভক্তিবলে তুমি

বশীভূত হৈয়া স্বামী

এসেছিলে পতিত-উদ্ধারে ॥

(৬)

শৈশব হইতে তব

অলৌকিক ক্রিয়া সব

ছয়মাসে জগন্নাথে কোল ।

দিয়াছিলে তুমি প্রভু

এমন না শুনি কভু

জগন্নাথ আনন্দে বিভোল ॥

রথে তিনদিন স্থিতি

বেথায় তব বসতি

শ্রীভকতি-বিনোদ-নিকেতন ।

জগন্নাথ-রাম-সেবা

দেখি সারা রাত্রি-দিবা

মহানন্দে থাকিতে মগন ॥

আত্ম তব 'ভগবতী'

সদয়া হইয়া অতি

নিজমুখে করেছেন বর্ণন ।

জন্মকালে যজ্ঞসূত্র

স্বশোভিত ছিল গাত্র ॥

সর্ব সদগুণ আভরণ ॥

দেখি' তব পিতৃদেব মনে ভাবে শ্রীভূদেব
যোষিলেন—“এই মহাজন ।

আসিয়াছেন অবনীতে কৃষ্ণভক্তি বিনাইতে
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্রাট হন ॥”

(৭)

বিমল বিশুদ্ধ চিত্ত, দেখি' শিশুর চরিত্র
'বিমলাপ্রসাদ' কৈল নাম ।

শ্রীগৌর-মনোভীষ্ট প্রচারিতে গৌরপ্রের্ষ
আসিলেন ভাগবতোত্তম ॥

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে চিনে ভকতি-বিনোদ বিনে
ইহা কেহ চিনিবারে নায়ে ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ হউ নিত্য সুসম্পদ
হেন কৃপা কর কাঙ্গালেরে ॥

(৮)

জীবের দুর্গতি দেখি বুঝেছিল তব আঁখি
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার ।

'কীর্তনীয়ঃ সঁদা হরিঃ' আপনি আচার করি'
যুচাইলে অশেষ ভূভার ॥

মধ্যাহ্ন-ভাস্কর প্রায় ভকতি-জ্যোতির ন্যায়
জগৎ-কৈতব নাশিবার ।

কল্প-জল-মোহাবৃত মায়াবাদ আদি যত
মেঘপুঞ্জ কৈলে পরিষ্কার ॥

সিংহের হুঙ্কার করি' অসংসঙ্গ পরিহারি'
প্রচারিলে বৈষ্ণব-আচার ।

'দ্বী-সঙ্গী' অসাধু হয় আর 'কৃষ্ণভক্তে' কয়
এ' বাণী জানালে বারবার ।

পাইয়া গৌরান্ধাদেশ অন্তরে গৌরান্ধাবেশ
গৌর-বাণী পশরা লইয়া ।

প্রচারিলে সর্বকাল না মানিলে আচণ্ডাল
ভিক্ষু-বেশে সন্ন্যাসী হঞা ॥

(৯)

তব মুখামৃত বাণী হয় মৃত-সঞ্জীবনী
সদা বহে প্রভঞ্জন প্রায় ।

কৃষ্ণকথা-পয়োরামি সর্বদেশে দিবানিশি
 প্রদান করিলে অমায়ায় ॥
 যত ছিল ভাগ্যবান তাহা সব কৈল পান
 অভাগিনী পড়িয়া রহিল ।
 কর্ণে না প্রবেশ কৈল দুষ্কৃতি দূরিত রৈল ।
 শ্রেয়ঃ লাভ কভু নাহি হৈল ॥
 (১০)

জগ'-ভরি স্ম-ভ্রমণ অতীর্থ তীর্থ-করণ
 বহু মঠ-মন্দির স্থাপন ।
 শ্রীগৌর-গোবিন্দ-সেবা আহা কিবা মনোলোভা
 সবাকারে করা'লে শিক্ষণ ॥
 নিজশক্তি সঞ্চারিয়া নিজগণে পাঠাইয়া
 দ্বারে দ্বারে শ্রীহরিকীর্তন ।
 আয়ু অন্তাচলে গেল এবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বল
 কৃষ্ণপদে লও হে শরণ ॥
 পরমার্থ-প্রদর্শনী শুদ্ধভক্তি-বিধায়িনী
 দরশনে কিবা চমৎকার ।
 মুখ্যস্থানে প্রকাশিলে বহু চিত্ত আকর্ষিলে
 যাহে হয় ভকতি-প্রচার ॥
 (১১)

তব গুণকণা কা'র শক্তি আছে বর্গিবার
 রেণু যদি গণনীয় হয় ।
 তব গুণার্ণব-সিন্ধু সে সিন্ধুর একবিন্দু
 স্পর্শিবার যোগ্যতা না পায় ॥
 “সর্ববমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ।
 কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে ॥”
 স্মরিয়া তোমার গুণ জ্বলিছে বিরহাগুণ
 হেনজন কোথা পা'ব আর ।
 অগতির গতি বিভূ গুরুপাদপদ্ম প্রভু
 রাস্তাপদে নমি বারবার ॥

ব্যাসপূজা-দিনে আজ বিরহ-অনল । নিবাইব পূজি, তব পদ-গতদল ॥
 তব পদধূলি-কণা এই ভিক্ষা চাই । জনমে জনমে যেন শ্রীচরণ পাই ॥

—শ্রীমরোজবাসিনী দেবী

অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৭ পৃষ্ঠার পর)

নিবারণবাবুর নিজের নামকরণ

আমরা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি যে,—নিবারণ বাবু বৈতুকুলে উদ্ভূত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধির চিন্তায় পুরুষানুক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই ব্যাধিটী সাধারণ ব্যাধি নয়—ইহা ভব-রোগ বা জন্ম-রোগ। গুপ্ত মহাশয়ের জন্ম-কাহিনী সমাজে গুপ্ত থাকিলেও আমরা তাহা, আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার নামটী সহজে প্রথমে বিচার করিব। নিবারণ বাবুর পিতা-মাতা পুত্রের নাম-করণ-কালে তাহার স্বভাব বিচার করিয়া নাম রাখিলেন—নিবারণ। কারণ তাহাতে তাঁহার বংশে ভগবৎ-স্মৃতি সমূলে নিবারিত হয়, তজ্জন্মই পুত্রের নাম কোনও দেবতার নামের সহিত মিল না রাখিয়া কেবল ‘নিবারণ’ রাখিয়াছেন। সুতরাং সেই নিবারণ বাবুর পক্ষে ভগবন্নামে যে আপত্তি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ‘নিবারণ’—এই নামটী অপদেবতা বা দৈত্য-দানব ব্যতীত কোন দেব-দ্বিজ বা ভগবন্তের নাম নহে। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের নামকরণ ‘অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ’—লিখিবার ইহা দ্বিতীয় কারণ।

‘নিবারণচন্দ্র’ শব্দের অর্থ

আমরা জিজ্ঞাসা করি—‘নিবারণ চন্দ্র’ বলিতে কি বুঝায়? চন্দ্র শব্দের পূর্বে ‘নিবারণ’-শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা কতকটা ‘নিবারিত’ এই অর্থেই বিশেষণরূপে ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে ‘নিবারিত চন্দ্র’ বলিলে, ‘রাহু’ ব্যতীত অণ্ড কি হইবে? ‘চন্দ্র’ বাহার দ্বারা আক্রান্ত হয় বা নিবারিত হয়। ‘রাহু’ একটি অপদেবতা ও দৈত্য-দানব বিশেষ—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং নিবারণ বাবুর গ্রাম কু-শিক্ষিত অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ করাই সমগ্র বৈষ্ণবগণেরই একান্ত কর্তব্য। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের শিরনামার ইহাই তৃতীয় কারণ।

শব্দের অর্থ-গ্রহণের পদ্ধতি

নিবারণশব্দের অর্থ যে-কোন অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা স্বাভাবিকভাবে কোনও মতেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করে না। এমন কি এই শ্রেণীর নাম নিরর্থক ও হিত-সাধনে পরাঙ্গুথ। শব্দের অভিধা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা বা কষ্ট করিয়া অনেক কিছু করা যাইতে পারে।

নিকৃতির সাহায্যে আক্ষরিক ব্যাখ্যা দ্বারাও হয়ত কিছু একটা কাঠাম খাড়া করা যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ বলিয়া গৃহীত হয় না। যদি কোনও মহাপুরুষ বলেন বিশেষ্য শব্দমাত্রই বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে, এবং ক্রিয়া মাত্রই ভক্তি-নির্দেশক; তবে অতিমর্ত্য পরমহংস মহাপুরুষগণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সাধারণ সাধক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী এক নহে—ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শব্দমাত্রই অপ্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিলেও সাক্ষাৎভাবে বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের উদ্দেশক নাম গ্রহণই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। ‘কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’ বলিলে, ভগবানের নামই উচ্চারণ করিতে হইবে। ‘নিবারণ, নিবারণ’ উচ্চারণ করিলে চলিবে না। আর যদি বলেন—নিবারণচন্দ্র বলিলেও ভগবানকে বুঝায়, তাহা হইলে, তাঁহারই বৃত্তি অনুসারেই আমরা বলিতে পারি—তবে তিনি একজন অবতার সাজিলেন!

নামকরণের শাস্ত্রীয় রীতি

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নাম-করণের কি প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহা নিবারণ বাবুর আদৌ জানা নাই। যদি কেহ বলেন তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র অল্পও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও বলিব, তিনি উহার বিচার নিজে পালন করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। আমরা বলি—তিনি নিতান্ত মূর্খ ও বিদ্বেশী বলিয়া বৈষ্ণব-বিরোধিতা করাই নিবারণ বাবুর হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ‘বৈষ্ণব চিন্তিতে নায়ে দেবের শক্তি’—অপদেবতার কা কথা। বাঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতি, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই ভগবদাস্ত্রপর নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুসম্মুখে নীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই বিষ্ণুদাস্ত্রপর নাম গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। শুধু কর্তব্য বলিলে চলিবে না; ভগবৎদাস্ত্রপর নাম গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে অপসম্প্রদায়ী, অপাণ্ডুতের, অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। অজানিলের উপাখ্যান তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নাই। অজানিলের পুত্রের নাম নারায়ণ রাখায়, তাহাকে সপোধন করার সময় বিষ্ণু-স্মৃতিক্রমে অজানিল সূক্তি লাভ করেন। এজন্যই বৈষ্ণব-সমাজে বিষ্ণুদাস্ত্রপর নাম গ্রহণের প্রথা বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। বৈষ্ণব-মাত্রই পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। পঞ্চ-সংস্কার বলিতে বৈষ্ণব-স্মৃতিকার গোপালভট্ট গোস্বামী লিখিয়াছেন—

তাপঃ পুণ্ড্রঃ তথা ‘নাম’ মন্ত্রো যাগচ্চ পঞ্চমঃ।

অগ্নী হি পঞ্চ-সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

অর্থাৎ (১) তাপ, (২) পুণ্ড্র, (৩) নাম, (৪) মন্ত্র, (৫) যাগ—এই ৫টি সংস্কার পরম ঐক্য ত্বকতা লাভের হেতু। এখানে নাম বলিতে ত্রিবিধ জপযোগ্য শ্রীনাম গ্রহণকে এবং বিষ্ণুদাস্ত্রপর নাম নিজ-নামস্বরূপ অঙ্গীকার করাকে বুঝায়। নিজনাম গ্রহণ সম্বন্ধে গোপালভট্ট গোস্বামী ‘নামকরণ’ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

নামাত্র কথিতং সত্ত্বিহরেভূতাত্ত্ব-বোধকম্।

ভরি-দাসাদিকমিতি কৃষ্ণ-দাসাদিকং তথা ॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির ভূতাত্ত্ব-বোধক হরিদাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদি নামের উপদেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও প্রমের-রত্নাবলী গ্রন্থে ‘তাপঃ পুণ্ড্রং’ শ্লোকের অন্তর্গত ‘নাম’-শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—“নামাত্র পদিতং সত্ত্বিহরিভূতাত্ত্ববোধকম্।” সুতরাং বৈষ্ণব-মাত্রেরই নাম-গ্রহণের বা নাম-করণের ইহাই পদ্ধতি। ইহা যিনি উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে পারিবেন না বা তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। নিবারণ বাবুর এসব বালাই নাই। তাহার নামের সহিত ভগবানের, নামের যখন কোনও মিল নাই তখন অত্য়ের নামই বা সেরূপ থাকে কেন? সব শৃঙ্গালেরই লাঙ্গুল কাটা থাকা দরকার।

সন্ন্যাসীর নামকরণ

সন্ন্যাসীর নাম-করণ ক্ষেত্রেও ভগবানের স্মৃতি ও তদাস্ত-সূচক নাম অঙ্গীকার করিতে হইবে। সন্ন্যাসের নাম-করণ সম্বন্ধে মুক্তিকোপনিষদ্ ও সাত্তত-সংহিতা হইতে ‘গোড়ীয় কর্ণহারে’ উদ্ধৃত ১০৮টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ তীর্থ, আশ্রম, ~~বন~~, অরণ্য প্রভৃতি উক্ত ১০৮টি নামকে উপাধি বলিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা উপাধি নহে—নাম। উপাধি-শূন্য হইয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। ভক্তি নিরূপাধিকী বৃত্তি। উহা যত উপাধি শূন্য হইবে ততই জীবের পক্ষে মঙ্গল। উক্ত (১০৮) অষ্টোত্তর শত নামকে ভক্তির দ্বারা বিশেষিত করাই বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গের সিদ্ধান্ত। সন্ন্যাস-নামের সহিত ‘ভক্তি’-শব্দ যুক্ত থাকিলেই ‘দাস্ত্র’ বুঝাইবে। ‘ভজ্’ ধাতু হইতেই ‘ভক্তি’-শব্দের উৎপত্তি এবং ‘ভজ্’-ধাতুর অর্থ ‘সেবা’। সুতরাং সন্ন্যাস-নামের পূর্বে ‘ভক্তি’ শব্দ থাকায় ‘দাস বা সেবক’ বুঝাইবে। বাহারা সন্ন্যাসের নাম সমূহকে ‘উপাধি’ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য ‘গোড়ীয় কর্ণহারে’র ২৮৯ পৃষ্ঠায় শেষ শ্লোকটি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এখানে তাহা সকলের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল—

“কথ্যন্তে যতিনামানি প্রথিতানি মহীতলে ।

অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি” ॥

অর্থাৎ এই শ্লোকে ‘অষ্টোত্তরশতানি যতিনামানি মহীতলে কথ্যন্তে’ বুঝিতে হইবে । সুতরাং উহাকে উপাধি বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবার কোন কারণ নাই । মুক্তিক-উপনিষদেও ‘তীর্থাশ্রমাদি’ শব্দগুলিকে ‘নাম’ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে—উপাধি বলিয়া প্রকাশ করা হয় নাই । এখানে ঐ শ্লোকটীও দ্রষ্টব্য—

তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি-পর্বত-সাগরাঃ ।

সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥

উক্ত শ্লোকেও ‘নামানি’ শব্দের দ্বারা উপাধি বুঝাইতেছে না । আমরা সকলের বিশেষতঃ নিবারণ বাবুর শিক্ষার জন্ত যে-কোন আশ্রমী ব্যক্তির নাম-করণ কি প্রকার হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে সাধু-বৈষ্ণবগণের চির আচরিত প্রথা ও বিচার প্রদর্শন করিলাম । ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দাস্ত-সূচক নাম গ্রহণ করাই বৈষ্ণব-সদাচার ।

ইহাতে আপত্তি করিলে কেবল যে বৈষ্ণব-সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়—এরূপ নহে ; পরন্তু উহা হীন, ঘৃণিত, মৎসরতাপূর্ণ, দৈত্য-দানবোচিত চিত্তবৃত্তির পরিষ্কারণ বলিয়া জানিতে হইবে । নিবারণ বাবু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্বোত্তম উন্নততম সন্ন্যাসিবর্গের বিষ্ণুদাস্তপর নাম শ্রবণ ও প্রচার-প্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া পরশীকাতরতাবশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া হিংসা-দ্বেষে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছেন । তিনি যে সাউডীর ন্যায় অত্যন্ত হীন কদর্য্য সম্প্রদায়ে নিজ মস্তক মুগুন করিয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের কুৎসিত ক্রিয়া-কলাপসমূহ ‘মুখোষ খুলিয়া’ ব্যক্ত করিলে, তিনি যে উন্নতের ন্যায় চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি ? যোগ্যঃ যোগোন যুজ্যতে

নিবারণ বাবুর মতে সীতানাথ বাবুও রামের অবতার

তিনি গৌড়ীয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের নামের বা নাম-করণের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া যদি সর্বাগ্রে তাহার নিজ অপসম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের নামগুলি আলোচনা করিতেন তাহা হইলে নিবারণ বাবুর ভ্রম নিবারিত হইত । মানুষ ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়িলে তাহার নিজের অবস্থা ভুলিয়া যায় । সুতরাং এস্থলে নিবারণ বাবুর স্মরণের জন্ত তাহাদের দলের গোড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি । সাউডীর সহজিয়া দলের সৃষ্টি কর্তা মাননীয় শ্রীযুক্ত

সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের নাম, কি নিবারণ বাবুর স্বরণ নাই? এস্থলে 'সীতানাথ' নাম বলিলে কি তাঁহাকে রামচন্দ্রের অবতার বুঝিতে হইবে? অথবা সীতানাথ বলিলে সাক্ষাৎ অদ্বৈত প্রভুকেই বুঝিব? যদিও আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, সীতানাথ বাবুর চেলার দল তাঁহাকে ভগবান্ খাড়া করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাহা হউক সে-সব প্রশ্ন আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৩ পৃষ্ঠার পর)

মায়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ

“গৌড়পাদ”

মায়াবাদের ইতিহাস আলোচনার মধ্যে গৌড়পাদের ইতিহাস প্রধানতঃ আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবে। সুতরাং তাঁহার জন্মকর্মাদি এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করা যাইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ।—শুধু তাহাই নহে, শঙ্করের যাহা কিছু সিদ্ধান্ত, সমস্তই এই গৌড়পাদের বিচারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদ এবং তাঁহার গুরু গৌড়পাদ। অতএব গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু। গৌড়পাদকে কেহ কেহ গৌরপাদ বলিয়া থাকেন। গোবিন্দপাদের কোনও গ্রন্থাদি নাই। গৌড়পাদই প্রকৃত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্যের গুরু। শঙ্করযুক্তো নারীবাদ যে-প্রকার ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয় সনাতন-হিন্দুসমাজ ‘মায়াবাদী’ বলিতে একমাত্র শঙ্কর ও তাঁহার অনুগত জনগণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানিতে হইলে, তাঁহার যিনি প্রকৃত গুরু বা আদর্শ শিক্ষাগুরু তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা বিশেষ আবশ্যক। হরিবংশে আছে,—

পরশরকুলোৎপন্নঃ শুকো নাম মহাযশাঃ।

ব্যাসাদরগ্যাং সংভূতো বিশ্বমোহগিরিব জলন্ ॥

স তস্তাং পিতৃকণ্ঠায়াং বীরিণ্যাং জনয়িষ্যতি।

কৃষ্ণং গোড়ং প্রভুং শ্রুত্ব তথা ভুরিশ্রুতং জন্মন্ ॥

কণ্ঠাং কীর্তিমতীং বশীং যোগিনীং যোগমাতরম্।

ব্রহ্মদত্তস্ত জননীং মহিষী মমুহস্ত চ ॥

অর্থাৎ পরাশুরের পুত্র ব্যাস, ব্যাসের পুত্র শুক, শুকের পুত্র গোড় এবং শুকের কন্যা মহিমীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।

কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতে “শুক কন্যায়ং ব্রহ্মদত্তম্ অভিজন্মৎ ॥” এইরূপ দেখিয়া পরীক্ষিতের উপদেশকারীষ্ট এই শুক বলিয়া ভ্রম করেন। তৎসম্বন্ধে আমি পূর্বেই জানাইয়াছি যে, ভাগবত ব্যাখ্যাকারী শুক, জাবালি কন্যা বাটিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আকুমাৰ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই অবিবাহিত শুকের কোন কন্যা থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। হরিবংশীয় শুক সম্বন্ধেই গার্হস্থ্যাদি ব্যবহার আছে। শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদের উক্ত বাক্যের টীকা হইতে জানা যায়—এই গৃহস্থ শুকের অন্য নাম ‘ছায়াশুক’। তাঁহার টীকার প্রাসঙ্গিক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

“যদ্যপি শুক উৎপত্ত্যেব বিমুক্তসঙ্গো নির্গতস্তথাপি বিরহাতুরং ব্যাস-মনুষ্যন্তং দৃষ্ট্বা (ছায়াশুকং) নিষ্মায় গতবান্। তদতিপ্রায়েনৈবারং গার্হস্থ্যাদি-ব্যবহারঃ ইত্যবিরোধঃ। স চ ব্রহ্মদত্তো যোগী গবি বাচি সরসভ্যাম্।”

দেবী ভাগবতে এই ছায়াশুকেরই পুরুরূপে শ্রীগোড়পাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—গোড়পাদ তাঁহার পিতা ছায়াশুকেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ছায়াশুকের পিতা ব্যাস একদা যুতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, অরণি গর্ভে বা অরণ্যে শুক্র নিষ্ক্ষেপ করিয়া ছায়াশুকের জন্মদান করেন। এই শুক তাঁহার পিতৃকণ্যা অর্থাৎ সহোদরা ভগ্নী বীরিণির গর্ভে আচার্য্য শঙ্করের পুত্র শুক গোড়পাদের জন্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপে কলিকালে গোড়পাদ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভার তদানন্তনকার জন্ম মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকা ও মাণ্ডুক্যকারিকা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। উক্ত কারিকাদ্বয়ই মার্যাবাদের জীবাত্ম।

“শুকুর মত খণ্ডন”

আচার্য্য শঙ্কর গোড়পাদের উক্ত কারিকাদ্বয় অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ভাষ্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ মার্যাবাদী বাচস্পতি যিশ্র শঙ্করের প্রায় সমকালীন লোক। তিনি উক্ত গোড়পাদের সাংখ্য কারিকার তত্ত্বকৌমুদী নামে টীকা রচনাকালে গোড়পাদের কারিকার খণ্ডন করেন। এই সম্পর্কে একান্ন (৫১) কারিকার টীকা দ্রষ্টব্য। মার্যাবাদিগণ সাধারণতঃ বাহার উপর নির্ভর করে তাঁহাকেই ধ্বংস করিয়া থাকে অর্থাৎ বৃক্ষের যে ডালে বসে সেই ডালটাই কাটিয়া

ফেল। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাসসূত্রের শারীরক ভাষ্য করিতে গিয়া তিনিও উক্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে গেলে “ব্যাস ভাস্তু বলি’ এক উঠাইল বিবাদ।” (চৈঃ চঃ) — এইরূপ বসিতে হয়। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।—

তিনি ব্রহ্মসূত্রের “অনন্দময়াহিত্যাসাৎ” (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) সূত্রের “আনন্দময়” শব্দের স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া উক্ত দ্বাদশ সূত্র হইতে একোনবিংশ সূত্র পর্যন্ত যেরূপ বাক্য-বিজ্ঞান করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যাসের উক্ত সূত্রের নঙ্গতি করিতে না পারিয়া দোষ দর্শন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

“যং কারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম “তদেতুব্যাপদেশাচ্চ” সর্বস্তু চ বিকারজাতস্য আনন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্মব্যাপদিশ্যতে।”

ভাবার্থ এই যে, “শ্রুতিতে ব্রহ্মেবই অভ্যাস কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মই (আনন্দই) সবার কারণ (আনন্দময়ের) কারণ। সুতরাং উক্ত দ্বাদশ সূত্র ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। এবং উহা ‘আনন্দময়’ এইরূপ না হইয়া ‘আনন্দ’ এইরূপ হওয়াই সঙ্গত।” এইরূপ বলিয়া সূত্রে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া—

“অস্তু চ যুক্তাযুক্তত্বে সুবিভিরেবাবগন্তব্যো ইতি কৃতং পরদোষাদ্ভাবনেন নঃ সিদ্ধান্তমাত্র-ব্যাখ্যান-প্রবৃত্তানামিতি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গৌড়পাদের কারিকার খণ্ডন করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়াছেন, তাহারই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। আচার্য্য চিদ্বিলাসও ক্রীতর্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন। উহারা উভয়েই শঙ্করপন্থী মারাবাদী।

শঙ্কর মতে গুরু যখন ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য অবিদ্যাগ্রস্ত, অর্থাৎ অনবগত মুখ, তখন গুরুর দোষ দর্শনে আর আপত্তি কি? যে-গুরুকে শাস্ত্রে “সাক্ষাদ্বিরিহেন সমস্ত শাস্ত্রেঃ” বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাকে শঙ্কর বলেন—‘অনবগতো ব্রহ্মাভাবঃ স্যাৎ’। (অজ্ঞানবোধিনী) (ক্রমঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার

মেদিনীপুর জেলায়

৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী—মঙ্গলামাড়োর নিকটবর্তী গোল আড়া গ্রামে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতা প্রদান করেন।

৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী—স্থান—মঙ্গলামাড়ো উচ্চ ইং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ—

শ্রীল আচার্য্যদেব অন্যান্য ২২৥ সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলিপূর্ণ সভায় প্রায় ১৯১৫ কাল “শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীবৃদ্ধ যোগেশ চন্দ্র মহাপাত্র বি, এ, বি এল, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতায় অতীব আনন্দিত হন এবং মঙ্গলামাড়ে পল্লীতে অচ্যাবধি এরূপ বিরাট ধর্ম-সভা তিনি কখনও দর্শন করেন নাই বলিয়া প্রকাশ করেন। স্কুলের শিক্ষকগণ এবং কয়েকজন রাজকর্মচারী বক্তৃতার পর শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল আগমন করেন; তাঁহারা ঐ অঞ্চলে সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্তও শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার পর ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্তৃক ছায়া চিত্র যোগে শ্রীমন্নহা-প্রভুর লীলা আলোচিত হয়।

বিষ্ণুপুর—কামারপোতা

৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে কামারপোতা বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বীয় জন্মদিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত “শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি” গ্রন্থানুসারে পূজা-পঞ্চক সহকারে মহা-সমারোহে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণও অচ্যকার তিথিতেই তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন।

১১ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত্যে সমিতির সেবকবৃন্দ ও সমবেত ভক্তবৃন্দ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে অচ্যকার সভায় প্রেরিত পত্নাদি পাঠ ও সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য চরিত্রাবলীর আলোচনা করিলে সভা ভঙ্গ হয়। এই ব্যাস পূজা অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ভার শ্রীবৃদ্ধ রাধানাথ দাসাধিকারী মহোদয় বহন করিয়া সমিতির বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা যাঁহারা এই সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—নিজস্ব সংবাদ

১. গৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বঙ্গাব্দে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। কালানুসারে মাস হইতে মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ২১০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র নাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমদ্ব্যাক্রম্য প্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সমালোচনা আদরনীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিব্য প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী দামোদরচরিতম্

শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস মতে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া অবয়ব ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১০ আনা।

২। শ্রীমদুগবদগীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদুত্তম বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অবয়ব, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯৮ নং টাকা।

তত শুধির-ঘনানাং রাগ-মানক-ভাজাং
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাং ।

তটভূবি নটরাজ-ক্ৰীড়য়া ভানু-পুত্র্যা
বিদধদতুলচারীভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥২॥

নিখিনি কলিত-ষড়্জে কোকিলে পঞ্চমাটো
স্বয়মপি নব-বংশোদ্যাময়ন্ গ্রাম-মুখ্যং ।

ধৃত-মৃগ-মদ-গন্ধঃ সুষ্ঠু গান্ধার-সংজ্ঞং
ত্রিভুবন-ধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৩॥

অনুপম-কর-নাথোপাত্ত-রাধাঙ্গুলীকো
লঘু লঘু কুসুমানাং পর্যটন্ বাটিকায়াং ।

সরভসমনুগীতশ্চিত্র-কণ্ঠাভিরুচৈ-
ব্রজ-নব-যুবতীভিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৪॥

অহি-রিপু-কৃত-লাশ্বে কীচকারক-বাণে
ব্রজগিরি-তটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীত-ভাজি ।

বিরচিত-পরিচর্য্যশ্চিত্র-তোর্য্যত্রিকেন
স্তমিত-করণ-বৃতিভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৫॥

দিশি দিশি শুক-শারী-মণ্ডলৈর্গৃঢ়-লীলাঃ
প্রকটমনুপঠদ্বিনির্মিতশ্চির্য্য-পূরঃ ।

তদতিরহসি বৃত্তং প্রেমসী-কর্ণমূলে
স্মিত-মুখমভিজলন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৬॥

তব চিকুর-কদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী-
নয়ন-কদল-লক্ষ্মীবন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।

অলিরলমল-কান্তং নোতি পশ্যেতি রাধাং
সুমধুরমনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৭॥

মদন-তরল-বালা-চক্রবালেন বিধ-
দ্বিবিধ-বরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।

স্থলিত-চিকুর-বেশে স্কন্ধ-দেশে প্রিয়ায়াঃ

প্রথিত-পৃথুল-বাহুভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৮॥

ইদমনুপম-লীলা-হারি কুঞ্জে-বিহারি-

স্মরণ-পদমধীতে তুষ্টধীরষটকং যঃ ।

নিজগণ-বৃত্তয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং

নয়তি নিজপদাভং কুঞ্জ-সন্মাধিরাজঃ ॥৯॥

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারী-দ্বিতীয়াষ্টকের বঙ্গানুবাদ

কন্দর্প-বিলাসহেতু যাঁহার মুখমণ্ডলে মন্দ-মন্দ হাস্য সর্বদা শোভা পাইতেছে, যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ভঙ্গীরূপ তরঙ্গদ্বারা যেন কবলিত হইতেছেন, যাঁহার বদনচন্দ্র সর্বদা হর্ষযুক্ত, যিনি মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিতেছেন এবং নবীন-মেঘের স্থায় মধুরকান্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

যমুনাতে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রজরমণীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, কাংশ্র প্রভৃতির বাজ আরম্ভ করিলে যিনি উত্তম নটের স্থায় সুন্দর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

ময়ূরগণ ষড়্ভুজ স্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চম-স্বরের আলাপ করিতে লাগিলে, যিনি সর্বাপেক্ষে মৃগমদগন্ধ ধারণ করিয়া অভিনব বংশীদ্বারা গান্ধার নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মুচ্ছনা পূর্বক ত্রিভুবনের ধৈর্য্য হরণ করেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

যিনি আপনার সুকোমল বামকরাঙ্গুলীদ্বারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পূর্বক পুষ্পবাটিকায় মন্দমন্দ পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে মধুরকণ্ঠী ব্রজবৃন্দীগণ আনন্দভরে যাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

গোবর্দ্ধন-পর্বতের অধিত্যাকা-রূপ রঙ্গস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীচকের (ছিদ্ৰিত বাঁশের) বাজ ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে, বোধ হয় যেন গোবর্দ্ধনপর্বত স্বয়ং তৌর্য্যাত্মক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাজদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা করিতেছেন,

এইরূপ পরিচর্যায় যাহার অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ আদ্ৰ হইয়া থাকে সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কুঞ্জের চতুর্দিকে বিরাজমান শুকশারিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্জনকৃত গূঢ়-লীলা সকল সুস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে, তৎশ্রবণে যিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ শুকশারিকার উক্তি সকল প্রেয়সী শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে সহাসাবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

“হে রাধিকে ! দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমাদিগের পুচ্ছসকল ইদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) শুদ্ধ হইতেছে, কৃষ্ণসার নামক যুগেরাও তোমার নয়নপদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুস্তলকে অতিশয় স্তব করিতেছে”—যিনি শ্রীরাধিকাকে এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

পুষ্পমালা-রচনাদি শিল্পকার্য-শিক্ষাচ্ছলে যিনি স্বরবিলাস-চতুরা ললিতা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণকর্তৃক সেব্যমান এবং আলুলায়িত-কেশী প্রেয়সী শ্রীরাধিকার স্বকদম্বো বাহু অর্পণ করিয়া রহি ছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

প্রত্যেক পদে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ থাকায় অতি-মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-পদ্ধতি-স্বরূপ এই পট্যষ্টক যিনি সহৃষ্ট চিত্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধিকার সখীগণকর্তৃক আরাধিত সেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

শক্তি-পরিণত জগৎ

মায়াবাদীর জগৎসম্বন্ধে-মিথ্যা বিচার

“অবিচিন্ত্যশক্তিসূক্ত শ্রীভগবান্ ।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪)

এই কথা শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু কাশীবাসীগণকে বলিয়াছিলেন । প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ সেই কালে নির্বিশেষ মতে বিবর্তবাদ বিশ্বাস করিতেন । রজ্জুতে সর্প প্রতীতি যেমন রজ্জুর বস্তুত্ব বিচারে সত্য নহে কিন্তু অনুভবকারীর তাৎকালিক সত্য প্রতীতিবিশেষ সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থান জীবের

নিকট ভ্রমময় প্রতীতি যাত্র বস্তুতঃ বিশ্বের বস্তুত্ব বিচারে ইহাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম।
যাঁহারা এই রজ্জু-সর্পবাদকে জগদধিষ্ঠানের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা
বিবর্তবাদী বা মায়াবাদী বা জগৎ মিথ্যা ভ্রম-জাত বলেন।

চিন্ময় জগৎ ও জড়জগৎ—উভয়ই শক্তিপরিণাম

পক্ষান্তরে জগৎকে যাঁহারা নিত্যানন্ত অবিকারী শক্তিমান্ ভগবানের বহিরঙ্গা
নারী শক্তির বিকার বলেন, তাঁহারা শক্তি পরিণামবাদী। অবিকারী শক্তিমান্
ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য বিরাজমান।
বদ্ধজীব-ভোগ্য জড় জগৎ নশ্বর, হরি-ভোগ্য জড়ের চিজ্জগৎ নিত্য।
জড়জগতে দৈত ও ভেদ-জ্ঞানে বস্তুর জড়ত্ব-জন্ত অনেকত্ব। চিজ্জগৎ পরিণতিতে
অদ্বয়-জ্ঞানে বস্তুর একত্ব হইলেও শক্তিগত নিত্য অনন্ত বৈচিত্র্য তথায়
বিরাজমান।

ভগবানের ত্রিবিধশক্তির ত্রিবিধ জগৎ

ভগবানের তিন প্রকার শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রকার
অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময় নিত্য চিজ্জগৎ; দ্বিতীয় প্রকার
বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত বিচিত্রতাময় নশ্বর অচিৎ জড়জগৎ; তৃতীয়
প্রকার তটস্থা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগৎ-দ্বয়াক ভেদাভেদ
জীব-জগৎ। শক্তি পরিণত হইয়া এই তিন প্রকার জগৎ প্রকট করেন।

নির্বিশেষবাদীর শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নির্বিশেষ মত-মূলে বিবর্তবাদীগণ ব্রহ্মশক্তিকে অজ্ঞান, ভ্রম-মূল্য এবং
নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের পরিচয় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে যেখানে
শক্তিমানের শক্তির কথা উল্লিখিত হয় উহা খণ্ডজ্ঞানানুভূতি বলিয়া আংশিক জ্ঞান
বা পূর্ণজ্ঞানাভাবে ভ্রমময় প্রতীতি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তাদৃশ বিচার প্রাকৃত
নশ্বর জড় জগতের অভিজ্ঞতাপ্রায়ে উদ্ভূত এবং নিত্য সবিশেষত্বের অনভিজ্ঞতা-
ব্যঞ্জক।

অদ্বৈতবাদীর পক্ষে দুর্বোধ্য হইলেও ভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবন্তা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, অথবা তাঁহার বিচারে
ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন না—একুপ নয়। অজ্ঞানময় প্রাকৃত-
বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের বিচার সক্ষীর্ণ বলিয়া একু বৃহৎ নয়, পরমাত্মা ব্যাপক নহেন,
বা ভগবান্ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল নন—একুপ নয়।
নির্বিশেষবাদী বুঝিতে পারেন না বলিয়া ‘অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবন্তা’ থাকিবার

আবশ্যক নাই,—পেচক সূর্য্যাকিরণ দেখিতে সমর্থ নয় বলিয়া ভাস্করের অস্তিত্ব নাই, বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যুবার ধর্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বলিয়া মানব-জীবনে যৌবন নাই—এরূপ বিচার করা উচিত নহে। মায়াবাদ স্থাপন করিতে হইলে শক্তিমান্রই জড়, হেয় ও চিদ্র্ম-বর্জিত জাতিয়া নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ধারণা প্রবল করিতে হয়, তদনুকূলে অসংখ্য বুদ্ধি-তর্ক, উদাহরণ প্রভৃতি আসিয়া সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয় বস্তুর পরিমাণ করিবার ধৃষ্টতা উপস্থিত হয় এবং ভগবত্তাকে বা নিত্য শক্তি সমূহে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া নানা প্রলপিত বিজ্ঞতা আসিয়া জীবকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে।

মায়াবাদীর বস্তু-জ্ঞানে মিথ্যা বিবর্তের আশ্রয় ; কিন্তু শক্তি-

পরিণামবাদের সত্য-বিবর্তের বিচার

বিবর্তবাদী বস্তু-সত্তাকে ব্রহ্ম বলেন এবং বস্তু-ধর্মের আংশিক প্রতীতি-জন্ম (তাহাকে) খণ্ডজ্ঞান, ত্রিগুণজাত, অপূর্ণ বা মিথ্যা বলেন। খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না—বলিয়া, জড় জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার অন্বয়তা নাই, কেবল ব্যতিরেকতা আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। জীবের বিচার খণ্ডজ্ঞান সম্মত ; সুতরাং জীবের এবং জড় জগতের স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া ‘অদ্বয়-ব্রহ্ম’ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিবর্তবাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

এই মতের প্রতিকূলে শক্তিপরিণাম উচ্চৈশ্বরে বলেন—বদ্ধজীবের বদ্ধত্ব এবং তদ্বিপরীত মুক্তত্ব অদ্বয়াদ্বয় অত্যাঁয়পূর্ব্বক এক করিয়া লইবার ভিক্ষা বিবর্তবাদীকে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। “দেহে আত্ম বুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান” অর্থাৎ অচিৎ বস্তু দেহের সহিত চিদ্র্স দেহীর সমতা জ্ঞানই বিবর্তের উদাহরণ অথবা চিদচিৎ শক্তিদ্বয়কে ঐক্য বুদ্ধি। দেহকে বা জড়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া ধারণা করাই ভ্রান্তিময় প্রতীতি ; অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে, ভক্তের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত কলেবর মনে করাই বিবর্তের উদাহরণ। পরন্তু বস্তু মানিয়া তদ্রূপ বা শক্তি রহিত করিবার চেষ্টাই বিবর্তবাদ উদাহরণের স্থল।

ভট্টা-শক্তিপরিণত জীবের স্বভাব

বস্তু হইতে এক প্রকার শক্তিবলে মায়িক কালাত্যস্তরে নশ্বর প্রাকৃত জগৎ পরিণত হইল,—বস্তুকে বিকৃত করিল না। অন্য প্রকার শক্তিবলে কালাতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত জগৎ নিত্যকাল উদিত রহিল,—বিচিত্র হইয়াও নশ্বর জড়ের দ্বায় হের হইল না, আবার বস্তুর তৃতীয় প্রকার ভট্টা-শক্তি কখনও প্রথম

প্রকার বহিরঙ্গ-শক্তির সহ আপনাকে অভিন্ন বুঝেন, কখনও বা ভিন্ন বুঝেন এবং কখনও বা যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন বুঝেন। শক্তিমান্ শক্তিপরিণতি জড় জড়ের ধর্মের দ্বারা বিকার-বিশিষ্ট হয় হইলেন না—ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, যে-শক্তি কেবলাবৈতবাদী মারিক ধারণায় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক মতে—শক্তি ব্যতীত বস্তুর সত্তা নাই

আজকালকার জড়বিজ্ঞানবিদগণের মতে পরমাণু কোন বস্তুতে স্থান পায় না। তাঁহারা তড়িৎশক্তির সূক্ষ্ম উন্নত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল মাত্র ‘ধনতড়িৎ-কণ’ ও তৎ পরিধিতে ‘ঋণতড়িৎ-কণ’ শক্তিমাত্র বিরাজ করে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই পরমাণুর অধিষ্ঠান। শক্তি হইতে দ্রব্যের অস্তিত্ব। শক্তি-বিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জড়ের পরিচয়ে ঐহিক জ্ঞানের গম্য নহে। পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত এবং সেই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়—এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণ পোষণ করিতেন।

ইলেক্ট্রন-থিয়রী অনুসারে বস্তু নিঃশক্তিক নহে

এক্ষণে ইলেক্ট্রন-থিয়রী বা ‘বিদ্যুৎকণ’-ধারণার অভ্যুদয়ে ধন-ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণ সমীকরণেই পদার্থ পরমাণুর উদ্ভব-ধারণা প্রবল হইতেছে। প্রাকৃত জগতে বস্তু দেখিতে গিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাণু-সন্ধানে পরমাণু-সত্তা শক্তিতে পর্যাবসিত। সূলভাবে বস্তু-দর্শন ঘটিল না। শক্তি অবশ্যই আধার অপেক্ষা করে। কাহারও বিবেচনায় শক্তির অচঞ্চল-অবস্থাই বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যেখানে শক্তি অপ্রকাশিত, সেখানে বস্তু জড় বলিয়া বিদিত। শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন ভদ্র। কিন্তু বস্তুর পরিচয় পাইতে হইলে, তাহার শক্তি বা কার্যের অনুপলব্ধিতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান জ্ঞাতার জাড়াই প্রতিপন্ন করে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে বস্তু অবিকৃত থাকিয়াও বিচিত্রতাপূর্ণ

জড় জগতে নিহিত শক্তি-সমূহ-দ্বারা জড়ে অভিনিবিষ্ট বদ্ধজীব, বিশ্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বস্তুকে জড় এবং শক্তিকে তদ্বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট মনে করিয়া বস্তুর দ্বৈত-ধারণায় প্রবৃত্ত হন। আবার শক্তির তারতম্য বিচার আসিয়া মানব-ধারণা জড়কে স্বল্প শক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়া অদ্বয়-ধারণা স্থির করে।

বিবর্তবাদাশ্রয়ে জড়-নিঃশক্তিকত্ব, যৎজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইয়াছেন—মনে করেন। প্রভাকর, ভাস্করাদি বিকারবাদী বিশ্বকে বস্তুর বিকার স্থির করিয়া বিবর্তবাদীগণের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য চিন্ত্য জড়ধারণায় সম্ভবপর নহে—একথা অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত মত

প্রকাশকগণ প্রাকৃত বিচারকদিগকে ভূয়োভয়ঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও বস্তুর অবিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার নিত্যতা এবং বিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার অনিত্যতা প্রতিপাদক জড় জগৎ উভয়ই উদ্ভিত—একথা বলিয়া থাকেন।

মায়াবাদীর জগৎ সম্বন্ধে বিবর্তবাদ মিথ্যা

প্রাকৃত বিচারকগণ যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত ধারণা করিতে অক্ষম ; কেননা, অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা ভগবানেই সম্ভব—তাহারা একরূপ কোন উদাহরণ জড়ে না দেখিয়া জড়াতীত রাজ্যে তাহার অস্তিত্বে সন্দেহপর হন। অবতারী ভগবানের ব্যক্তিগত অধিষ্ঠানকেও অজ্ঞান-সমষ্টি প্রভৃতি আখ্যা দিয়া জড়-নির্বিশেষকেই চিন্মাত্র বলিয়া স্থাপন করেন। জড় প্রত্যক্ষবাদীগণ জড় নির্বিশেষ সত্তাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া জ্ঞানেন, আবার কেহ বা কেবল, নিগুণ, চেতা, সাক্ষী এই বিশেষ চতুষ্টয়কে অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করিয়া অবতারী তত্ত্বকে দয়া করিতেও অগ্রসর হন। জড় জগৎ নশ্বর হইলেও জীব-প্রতীতিতে মিথ্যা নহে। বিবর্তবাদাশ্রয়ে খণ্ডজ্ঞানময় জীব-প্রতীতির উপযোগিতা থাকিলেও জগতের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে তাদৃশ প্রতীতিও বিবর্তবাদ-মূলক জীবজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া বিবর্ত বা মিথ্যা মাত্র। এক জ্ঞাতার বিবর্ত প্রতীতি সত্ত্বেও জগতের অধিষ্ঠান অপর সকলের নিকট মিথ্যা নহে। বিবর্ত-বাদের চিন্তাও বিবর্তেরই প্রকার-ভেদ, স্মরণ্য তাহাও বিবর্ত।

— জগদগুরু ঔবিকুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

মৎস্য-মাংস ভোজন

মৎস্য-মাংস-ভোজন-প্রবৃত্তিরূপ কুসংস্কারের কারণ

আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্যন্ত মরশরীরে বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটী জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্বদেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনে-প্রবৃত্তি উত্তেজন করেন।

আমিষ ভোজনের কুফল ও নিরামিষ-ভোজনের

প্রয়োজনীয়তার আলোচনা আরম্ভ

তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আৰ্য্যসন্তানগণ পৈত্রিক ঋণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্যসকল আহাৰ করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগতবীৰ্য্য হইতেছেন। দীত-প্রধান দেশের ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছু বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা সমস্ত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সহজে প্রতিপন্ন করা যায়। আমরা ক্রমশঃ এবিষয়ের অনেক আলোচনা করিব। সম্প্রতি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

প্রাচীন ভারতায় ভোজনের ত্রিবিধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে পক্কাহারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন প্রকার ভোজনের ব্যবস্থা আছে। (১) হবিষ্যন্ন ভোজন, (২) নিরামিষ্যন্ন ভোজন ও (৩) স্যামিষ্যন্ন ভোজন।

(১) যাহারা হবিষ্যন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা একবারমাত্র এক পাকে আতপ তণ্ডুল, কয়েকপ্রকার মুদগাদি বীহি, কয়েকপ্রকার ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও গুড়বর্জিত ঐক্ষর পক্ক করত ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে এক সময়ে আহাৰ করিতে পারেন।

(২) যাহারা নিরামিষ্যন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুল এবং মৎস্য-মাংসবিহীন নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বহুবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারেন।

(৩) যাহারা স্যামিষ্যন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা দেব-পিতৃ-ক্রিয়াতে অর্পিত মাংস ও দেশভেদে মৎস্য ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত ভোজন করিতে পারেন।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহাৰ এবং তত্ত্বৎ অধিকারী

এই প্রকার ত্রিবিধ পক্কাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণ দ্বারা বিভক্ত। সাত্ত্বিক লোকগণ হবিষ্যন্ন, রাজসিক লোকগণ নিরামিষ্যন্ন এবং তামসিক লোকগণ স্যামিষ্যন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাত্ত্বিক লোকদিগের অতি অল্প পীড়া হয়, এবং যোগাদি ক্রিয়ানুসাধনে তাঁহাদের প্রভূত সামর্থ্য আছে। রাজসিক লোকদিগের তামসিক লোকাপেক্ষা স্বল্প পীড়া হয়। রাজসিক লোকেরা অতিশীঘ্র সাত্ত্বিকতা

অবলম্বনপূর্বক উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উপযোগী হন। তামসিক লোকদিগের আহাৰাদি বিধান—কেবল তাহাদের তত্তৎ প্রবৃত্তি অনুসারে আহাৰাদি দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

হরিবাসরাদি ব্রত ও পৰ্বদিনে আগ্নেয়-ত্যাগ-বিধি লিখিবার কারণ

সংক্রান্তি, রবিবার, পৰ্বদিন, হরিবাসরাদি ব্রতদিনে যে মৎস্য-মাংসাদি নিবেদন করা হয়, তাহা কেবল তামসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সে-সকল বিধান তত প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রভেদ এই যে, সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজসিক ও তামসিক খাদ্যাদি কোনকালেই স্বীকার করেন না। রাজসিক ব্যক্তিগণ নিমিত্তযোগে তামসিক দ্রব্যাদি কখন কখন স্বীকার করেন।

মানব-প্রকৃতির উন্নতির ত্রিবিধ কারণ নির্দেশ

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কেবল সাত্ত্বিক আহাৰ করিলেই যদি সমস্ত লাভ হয়, তবে কিছু দিবস সাত্ত্বিক আহাৰ মাত্র করিয়াও আমরা কোন রোগশূন্যতা, যোগ-যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক সাধন লাভ করি না? এই কথার উত্তর এই যে, মানব-প্রকৃতি কেবল আহাৰের উপর নির্ভর করে না। আহাৰ, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক চেষ্টা—এই তিন প্রকার কার্যের দ্বারা মানব-প্রকৃতির উন্নতি হয়।

সাত্ত্বিক আহাৰ, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন

আদৌ সাত্ত্বিক 'আহাৰ' দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহার সকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার' শব্দ দ্বারা আহাৰ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রী-দম্প পরিভ্যাগ, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি ব্রহ্ম ও নিরামগত সমুদায়ই ব্যবহার শব্দের অন্তর্গত। আহাৰ ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও, মানব যে-পর্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে, সে-পর্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক উন্নতি কিরূপে হয়? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে জন্মাবধি সাত্ত্বিক আহাৰ, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন। অবশুই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটি হইলে অবশুই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহাৰের প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক আহাৰাদিৰ সুফলতা—সৰ্ববাদী সম্মত

সাত্ত্বিক আহাৰ, ব্যৱহাৰ ও অনুশীলন দ্বাৰা যে মানব-উন্নতি সাধিত হয়, তাহাৰ অনেক উদাহৰণ আছে। যুগবৃন্দ বৈদেশিক দৰ্শন বিচাৰ প্ৰতি অধিক শ্ৰদ্ধা কৰেন বলিয়া আমাৰা তাহাদিগকে খ্ৰিস্টিয় ও মুসলমানদিগেৰ ফকিৰ-দিগেৰ চৰিত্ৰ দেখাইয়া দিতেছি। মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্ৰিস্টিয়গণ মানব-উন্নতিৰ বিধি কিয়ৎপৰিমাণে অবগত হইয়া অনেকস্থলে কাৰ্য্যসিদ্ধি কৰিয়াছেন। সেহিলে সকল আৰ্য্য ও বৈদিক সাত্ত্বিকতা যে আৰ অধিকতৰ কাৰ্য্যকৰ ও ফলপ্ৰসূ ইহাতে আৰ সন্দেহ কি ?

নিৰামিষ আহাৰেৰ সুফলতাৰ উদাহৰণ

আমাদেৰ নব্য যুগবৃন্দেৰ উপকাৰ্য্য আমাৰা অনেকগুলি উদাহৰণ দিব। তন্মধ্যে অত একটা উদাহৰণ দিতেছি, তাহা পৰীক্ষা কৰিয়া লইতে পাৰেন।

উত্তৰপাড়ানিবাসী প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি শ্ৰীযুক্ত চন্দ্ৰনাৰায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েৰ এখন বাৰাণসী বয়স। তিনি দশ বৎসৰ বয়স হইতেই হৰিষ্যান-ভোজী। তাহাৰ শৰীৰে ও সমস্ত ইন্দ্ৰিয়েতে যথেষ্ট বল আছে। তাহাৰ চক্ষুৰ যথেষ্ট তেজ আছে। তাহাৰ খুল্লতাত প্ৰেমনাৰায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭০ বৎসৰেও নিৰামিষ ভোজনবলে তাহাৰ ঞ্জ স্বাস্থ্য ভোগ কৰিয়াছেন।

—জগদগুরু শ্ৰীনাথকুৰ ভক্তিবিনোদ

প্ৰাৰ্থনা-পঞ্চক (৫)

(ক)

প্ৰভুপাদ !

হাহা প্ৰভো ! দয়া কৰে' রাখ পাদপদ্মে মোৰে,
কৃপাদৃষ্টি চাহ একবাৰ।

মায়াজালে বন্ধ হ'য়ে, মৰিতেছি বিষ খেয়ে,
বিষে তনু দহিছে আমাৰ ॥১॥

ভাবিয়া দেখিনু মনে, গতি নাই তোমা বিনে,
বড় খেদ উঠিয়াছে মনে।

স্বাকুল হ'য়েছে হৃদি, কৃপা কৰি' রাখ যদি,
এ অধমে তব শ্ৰীচরণে ॥২॥

ভূমিত দয়াল প্রভু, তোমা'রে না ভজি' কভু,
এ দুর্দশা হ'য়েছে আমার ।

তোমার চরণ পে'তে, বড় আশা মোর চিতে,
তাই তোমা' ডাকি বারবার ॥৩॥

তব শ্রীচরণামৃত, পানেনে সদা র'বে রত,
পতিতের এ' চিত্ত ভ্রমর ।

আমি এই আশা করি, তোমার চরণ ধরি'—
গোপালের আশা পূর্ণ কর ॥৪॥

(২১)

প্রভুগাদ !

সদা সাধু নিন্দা করি, নাম অপরাধে মরি,
কৃষ্ণাভক্ত সনে করি বাস ।

ছাড়িয়া কৃষ্ণের সেবা, পূজি' অন্য দেব দেবা,
করিতেছি নিজ সর্বনাশ ॥১॥

পাণ্ডিত্য-যৌবন-মদে, মত্ত হ'য়ে সাধু পদে
সদা করি কত অপরাধ ।

মায়া-জালে বদ্ধ হএম, গোরাপদ পাশরিয়া,
ঘটায়ছি বড়ই প্রমাদ ॥২॥

শুদ্ধাভক্তি পরিহরি, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করি,—
পড়িয়াছি সংসার বিবর্তে ।

যোষিৎসঙ্গ-সঙ্গী হ'য়ে, ধর্মো জলাঞ্জলি দিয়ে
ডুবিয়াছি বিষ্ঠাপূর্ণ গর্ভে ॥৩॥

প্রভু মোর, শিরোপরে, যমদণ্ড সদা ঘুরে,
সদা ভয়ে ভীত প্রাণ-মন ।

এ দীন গোপাল রায়, করে সদা হায় হায়,
রক্ষা কর পতিত পাবন ॥৪॥

(১)

প্রভুপাদ !

অন্য বত শুভ কর্ম,
পরিহরি' আন ধর্ম,
যেবা করে তব পদাশ্রয় ।

যুচে তা'র ভব-দুঃখ,
পায় কৃষ্ণ সেবা-সুখ
জড়বুদ্ধি তা'র দূর হয় ॥১॥

তুমিত চিন্ময় সহ,
জীবের অনর্থ বত,
নাশিবারে হ'য়েছ উদয় ।

ব্রহ্ম-জ্ঞানী যোগী বত,
অন্য শুভ কর্মে রত,
তা'রা নাহি তব কৃপা পায় ॥২॥

তোমার করুণা লাভে,
যে জন বঞ্চিত হ'বে
সেই পশু বড় অব্যবচীন ।

তোমারে না তজে যেই,
'তা'রে জ্ঞানহীন'—কই,
সেই পাপী মায়ার অধীন ॥৩॥

তোমার চরণে যেই,
আশ্রয় লভেছে সেই,
কৈবল্য-আনন্দ নাহি চায় ।

অভি অভাজন আমি,
পতিত পাবন তুমি,
এ গোপালের করহ উপায় ॥৪॥

(২)

প্রভুপাদ !

আমি দীন-অকিঞ্চন,
অধম দুর্গত জন
জীবমধ্যে আমি অতি ছায় ।

কৃষ্ণের সংসারে বাস,
করি, হ'য়ে মায়া-দাস
ভুলিয়াছি এই কথা সার ॥১॥

কভু সাজি আমি দাতা,
কভু সাজি পিতা-মাতা,
কভু আমি সন্তান-বনিতা ।

কভু সাজি মহারাজা,
কভু হই দীন প্রজা,
কখন বা জন-পালয়িতা ॥২॥

এসব দুর্বন্ধি মোরে, করিয়াছে চিরতরে
সারস্বের হইতে অধম ।

নিজ ইচ্ছা অনুসারে, পড়েছি বিষম ফেলে,
তাই কেনে ধরিয়াছে বম ॥৩॥

ভক্তি-অনুকূল যাহা, হেলায় ত্যজিয়া তাহা,
লইয়াছি ভক্তি-প্রতিকূল ।

কি হ'বে উপায় প্রভু ! চিন্তা নাহি করি কভু,
এবে ভেবে গোপাল আকুল ॥৪॥

(ঙ)

প্রভুপাদ ।

রুচি যায় তন্তু কামে, উদাসীন কৃষ্ণনামে,
বিষয়েতে সদাই আসক্ত ।

প্রভু আমি অতি হীন, ভূপি বটে নিশি-দিন,
(কিন্তু) চিত্ত নহে নামে অনুরক্ত ॥১॥

তুলসীর সন্নিকটে, নিত্য নিত্য বাই বটে,
কিন্তু তাহে নাহি অনুরাগ ।

ইন্দ্রিয় তোষণ লাগি, কনক-কামিনী ভোগি—
বৈষ্ণবের সেবা করি ত্যাগ ॥২॥

প্রতিষ্ঠাশা-শাঠ্য বৃত্তি, তাহে মোর বড় রুচি,
অভিলাষ জাড়ে অনিবার ।

নিরুপকট বিষয়-স্পৃহা, নরকে ডুবায় যাহা,
নিরন্তর বাড়িছে আমার ॥৩॥

আমি অতি ভাগ্যহীন, মোর সম কেবা দীন,
নিত্যকাল দুঃখ অভাগার ।

এ দীন গোপালে কর, গুন প্রভু দয়াময় !
তব পদ ভরসা আমার ॥৪॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

শ্রীবামনদেবের উপাখ্যান

দৈত্যগণের সহিত শ্রীবলিরাজের যুদ্ধ

পূর্বকাল হইতেই দেবাসুরের সংগ্রামের কথা প্রচলিত আছে। প্রজাপতি কশ্যপ ঋষির প্রাধান্য দুইটি মহিম্বী ছিল; তাঁহাদের নাম—দিত্তি ও অদিত্তি। অদিত্তির গর্ভে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাসকল, আর দিত্তির গর্ভে অগণিত অসুর সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গ লোকের অধিপতি ছিলেন। সেখানে উর্বশী, মেনকা, রক্তা প্রভৃতি অঙ্গুরী সকল, নন্দন-কানন, পারিজাত, অমৃত, অতুল ঐশ্বর্য্য, নানাবিধ ভোগসকল সর্বতোভাবে বর্ত্তমান ছিল। অসুরসকল স্বভাবতঃই ভোগী; সুতরাং বৈমাত্র ভাই দেবতার এই স্বর্গলোক ভোগ তাহাদের অসহ্য হইয়াছিল। ইন্দ্রের একটি নাম শত-ক্রতু অর্থাৎ একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে, তবে ইন্দ্রত্ব পদবী লাভ করা যায়। ইহা কিন্তু লাভ করা সহজ নহে; কারণ, অজ্ঞ কেহ এই ইন্দ্রত্ব লাভের আশায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেন।

এদিকে অসুরেরা কুমন্ত্রণা করিয়া স্বর্গলাভের জন্য বলিরাজকে অগ্রগণ্য করিয়া দেবতাদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। বুদ্ধে জয় পরাজয় সমস্তই দৈবের উপর নির্ভর করে; কিন্তু এবার দেবতাদের পরাজয় হইল। ইন্দ্র স্বর্গ হইতে শচীদেবীকে লইয়া দেবতাগণ-সহ পলায়ন করিলেন। তাঁহারা দৈত্যদের ভয়ে ছদ্মবেশে পর্বতে, কাননে অতি দুঃখের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দৈত্যদের আর আনন্দের অবধি নাই; তাহারা বলিকে স্বর্গের রাজা করিয়া স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। দৈত্যরা স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া মাতা অদিত্তির দুঃখের আর সীমা নাই। তিনি পুত্রদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, অবিরাম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভোজন, গৃহ-সংস্কারাদি পরিত্যক্ত হইল, অনাহারে শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার পতি কশ্যপ ঋষি তপস্তায় গিয়াছেন—এইসকল দুঃসংবাদ তিনি জানিতে পারেন নাই।

কিছুকাল পরে কশ্যপ ঋষি তপস্তা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 'আশ্রমে' প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—আশ্রমের আর সেই শ্রী নাই। গৃহাদি সংস্কার অভাবে, জীর্ণ ও মলিন হইয়াছে; গাভী সকল আহার না পাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। দেবমাতা অদিত্তির বদন বিষন্ন ও মলিন—অজস্রভাবে রোদন

করিতেছেন। এইসকল দেখিয়া ঋষি কাতরভাবে অদিতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“অরি সতী ! কি জন্য আশ্রমের এই দুর্দশা এবং তুমিই বা কেন এমন শোকাতুরা হইয়া রোদন করিতেছ ?” তখন দেবী বলিতে লাগিলেন—“স্বামিন্ ! আমার পুত্রসকল স্বর্গলুপ্ত হইয়া দীনভাবে বধুসহ অনাহারে অনিদ্রায় দৈত্যভয়ে কালাতিপাত করিতেছে। অশ্বরগণ স্বর্গ-রাজ্য অধিকার করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি কি করিব—আপনি উপদেশ করুন।” এই কথায় কশ্যপ ঋষি বিবাদিত হইয়া দেবীকে বলিতে লাগিলেন—“সতী ! তুমি কাহাকে স্বামী বলিতেছ ? স্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, রক্ত, মাংস, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র, পরিপূরিত একটি মলভাণ্ডকে স্বামী বলিতেছ ! ‘স্বামী’ সেই জগত-স্বামী ভগবান্। তাঁহার আরাধনা কর ; তিনিই তোমার মনের বাসনা পরিপূরণ করিবেন।” ঋষির এই বাক্যে দেবমাতা বলিলেন—“আপনি তাঁহার আরাধনার প্রণালী বর্ণন করুন, আমি নিশ্চয়ই পুত্রের কল্যাণ-জন্য তাঁহার অর্চন করিব।” কশ্যপ ঋষি বলিলেন—“আমি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত মতে একটি ব্রতের কথা বলিতেছি, তুমি সেই ‘পরম ব্রত’ অবলম্বন কর। বরাহ যে স্থানে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়াছে, সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া গায়ে মৃক্ষণ করিবে ; পরে ত্রিশ্রোতা নদীর জলে স্নান করিয়া শুধু দুগ্ধ পান করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিবে। তিনি প্রসন্ন হইলে মানবের সমস্ত অভিষ্টই সিদ্ধ হয়।

অদিতি-মাতার বরলাভ ও ভগবদ্-দর্শন

স্বামীর উপদেশানুযায়ী অদিতি দেবী শুধু পয়মাত্র পান করিয়া, একাগ্র মনে হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ দিবস পরে, অদিতি-মাতার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন।

দেব-মাতা দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভূজ প্রশান্ত-মূর্তি, পদ্মকেশর তুল্য পীতবস্ত্র পরিহিত, নীলেন্দ্রিবর-লোচন, গিরে শিখিপুচ্ছ, মণি-খচিত মনোহর মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে বৈজয়ন্তী ও বনফুলের মালা ; বাহুতে কেয়ুর, পদতলে নৃপুংস, বক্ষে কোমল-মণি ও শ্রীবৎস-চিহ্ন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। সাক্ষাৎ বরপ্রদ শ্রীহরিকে দেখিতে পাইয়া অদিতি-মাতা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্বক উত্তিত হইলেন, এবং কৃতাজলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—

“নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” (বিঃ পঃ ১।১৯।৪৮)

অদিতির নয়ন হইতে অবিরত দরদর ধারায় প্রেমাক্রম বিগলিত হইতে লাগিল ; তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল । শ্রীহরি অদिति-মাতাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি করযোড়ে গলগলী-কৃতবাস হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—“হে দেব ! আমার পুত্রসকল স্বর্গ-রাজ্য হইতে বলির প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া সম্প্রতি অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে । আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন—‘আমার পুত্র দেবতাগণ যেন পুনরায় তাহাদের স্বর্গ-রাজ্য প্রাপ্ত হয় ।’”

শ্রীভগবান্ একটু হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার পুত্রগণ যখন স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর হয়, তখন তুমি সুখী হও ; কিন্তু দिति দুঃখিতা হন । আর যখন দিতির পুত্রগণ স্বর্গ-রাজ্য পায় তখন তিনি সুখী হন এবং তুমি দুঃখিতা হইয়া থাক । এইরূপ বিচিত্রভাব জগতে প্রতি নিয়তই দেখা যায় । আমি সত্যী ! সম্প্রতি মহাবলশালী দৈত্যরাজ বলি, তাহার গুরু গুহাচার্য্য এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা রক্ষিত আছে । এই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইবে না ; তবে আমার দর্শন কখন বিফল হয় না, আমি কালক্রমে তোমারই গর্ভে পুত্ররূপে অবতরণ করিয়া, বলি-রাজকে পাতালে প্রেরণ করিয়া তোমার পুত্রগণকে স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর করাইব ।” এই বলিয়া শ্রীহরি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । এই শুভ বর পাইয়া অদिति মাতার আর আনন্দের সীমা নাই ।

শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব

কিছুকাল পরে, অদिति মাতা গর্ভ ধারণ করিলেন ; বিষ্ণুর পরম ভেজঃ সেই গর্বে আবিষ্ট হইল । তখন দিবা-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া দেবমাতা বিচরণ করিতে লাগিলেন । ইতিপূর্বে তাহার এরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি আর কেহ কখনও দেখে নাই,—সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন । শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রবণা-দ্বাদশী দিনে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হইলেন । তাহার আবির্ভাব-বাসরে সকলেই আনন্দে শ্রীহরি-কীর্তন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণপঞ্চবি পুত্রের জাত-কর্যাদি সব করাইলেন । অদिति মাতা পুত্রের কল্যাণে সাধু, বৈষ্ণব, দুঃখী, কান্দালকে বহু কিছু দান করিলেন । পুত্রটী অতি খর্বাকৃতি হইলেও তাহার অপূর্ব জ্যোতিতে স্নতিকাগৃহ আলোকিত হইল । অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদ, মুখে বৃহ বৃহ হাসি—এই বামনরূপ দৃষ্টে সকলেই এমনকি দেবীবৃন্দও মানবরূপ ধারণ করিয়া মস্তকে ধাতু দুর্বা দিয়া বামনদেবকে চিরজীবী হও

বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বামনদেব ক্রমে ক্রমে হামাগুরি দিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া পিতামাতার আর আনন্দের অবধি নাই।

শ্রীবামনদেবের উপনয়ন

শ্রীজয়দেব কবি গাহিয়াছেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদুতবামন
পদনখনীরজনিতজন পাবন।

কেশব ধৃত “বামনরূপ” জয় জগদীশ হরে ॥

— যিনি বলিরাজকে ছলনা করিবার নিমিত্ত অদ্বুত বামনরূপ ধারণ করিয়াছেন; যাহার পদধৌত জলে ত্রিভুবন পবিত্র হয় সেই জগদীশ জয়যুক্ত হউন।

ক্রমে বামনদেব সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখন উপবীত দিবার সময়, স্ততরাং দরিদ্র ব্রাহ্মণ মহা চিন্তায় পরিলেন। হাতে অর্থ নাই কি দিয়া কি করিবেন, উপায় নাই তাই অতি সংক্ষেপে বামনদেবের উপনয়নের আয়োজন করিলেন।

আগামীকল্য বামনদেবের উপনয়ন সংস্কার। আশ্রমের প্রাঙ্গণে মহা-আয়োজন। সাধারণে প্রচলিত আছে,—

“অজ্ঞাবুদ্ধে ঋষিশ্রদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।

কম্পতোঃ কলহে চৈব বহ্বারন্তে লঘুক্রিয়া ॥”

মহা আড়ম্বর থাকিলেও ঋষিদের ক্রিয়ার খাণ্ডদান দাণ্ডয়ান ব্যাপার লঘুই হইয়া থাকে। তাই অণু কণ্ডপ ঋষি অজস্র ডোঙ্গা, খোলা কাটিয়া প্রাঙ্গণে ভরপুর করিয়াছেন। তিল, যব, হরিভকী, কুম্ভ শুভে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে সহসা শ্রীনারদ ঋষিকে দেখিয়া কণ্ডপ ঋষি কিছু শঙ্কিত হইলেন; কেননা, নারদ—তিনি থাকায় কি যে হাদ্রাম বাধান, তাহার কোন ঠিক নাই। তবু মুখে বলিলেন—“এস, এস, ঠাকুর! অণু বড়ই সুপ্রভাত।” শ্রীনারদ হাঁসিমুখে বলিলেন—“এসব কি আয়োজন করিতেছেন?” শ্রীকণ্ডপ বলিলেন—“চুপ্ চুপ্! আমি দরিদ্র তাই বিশেষ আড়ম্বর না করিয়া পুত্রের উপনয়ন দিব ঠিক করিয়াছি। আগামীকল্য দিন ধার্য হইয়াছে। তুমি নিম্ন দ্রবের ভার গ্রহণ কর; সাবধান তিন লোকের বেশী নিমন্ত্রণ করিও না। তাহা হইলে আমার কুলান অসম্ভব হইবে।” শ্রীনারদ ঋষি অন্তর্যামী ছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছেন—বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীভগবান আসিয়া এই দরিদ্রের

ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে। তিনি মনে মনে বামনদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক ‘হরি হরি’ বলিয়া যাত্রা করিলেন। শ্রীনারদ ঋষি মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—সাক্ষাৎ ভগবানের উপনয়ন উপলক্ষে এত গরীবানা করিলে চলিবে না, তাই তিনি তিনলোক বলিতে—‘স্বর্গ’, ‘মর্ত্ত’, ‘পাতালের’ সমস্ত ত বলিলেনই আরও উ-লোক,—ভূ-লোক,—দ্যু-লোক বলিতে কিছুই বাকী রাখিলেন না। এবং অসংখ্য বাতকারীদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পরে তিনি বৈকুণ্ঠে যাইয়া মহালক্ষ্মীকেও কণ্ডপ ঋষির আশ্রমে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আসিলেন; কেননা, তাহার দৃষ্টিপাতে কিছুই অকুলান থাকিবে না। বিশ্বকর্মাাকে বলিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ বামনদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমার শিল্পকলা সবই সার্থক হইবে,—শ্রীভগবানের সেবার কার্যে তোমার শক্তি নিয়োগ কর; অত রাত্রির মধ্যেই শত শত পট, মণ্ডপ, তাঁবু এবং মনোহর লোকাবাস নিৰ্ম্মাণ করিবে। ভগবদ্শক্তি-প্রভাবে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। একরাত্রি মধ্যে তুমি দ্বারকায় অতুল ঐশ্বর্য্য নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলে। বিশ্বকর্মা তথাস্তু বলিলে নারদ ঋষি হৃষ্ট মনে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমন্তুক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

শঙ্করের জন্ম

মায়াবাদৈকসংরক্ষক, শূন্যবাদপৃষ্ঠপোষক, অধুনাতন অদ্বৈতবাদ প্রবর্তক ও মায়াবাদিকুলতিলক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্ত বর্তমান শিক্ষিত সমাজের সকলেই স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। শঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে তৎতৎ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ শঙ্কর-বিজয়, শঙ্কর-দিশ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করের সম্বন্ধে বহুকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্ব সম্প্রদায়ও মধ্ব-বিজয়, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি তৎ-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহেও শঙ্করের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বহু কথার আলোচনা করিয়াছেন। শাক্তগণ মাধ্বগণের বিরোধী এবং মাধ্বগণ শাক্তগণের বিরোধী। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ আলোচনা দ্বারাই আচার্য্যের জীবন-বিবরণ স্পষ্ট ভাবে জানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহই

প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থাদি হইতেও আচার্য্য শঙ্করের জীবনী জানা যায়। সুতরাং শঙ্কর সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে চাহি না। শঙ্করের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমার অনুমান হয়, তিনি ন্যূনাধিক ৭০০ শত খৃষ্টাব্দে কেরল দেশের অন্তর্গত চিদম্বর নামক গ্রামে 'বিশিষ্টা' নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'বিশ্বজিত' বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায় মনের দুঃখে বিশিষ্টাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। বিশ্বজিৎ পরে শিবগুরু নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিশিষ্টা একাকিনী গৃহে থাকায় চিদম্বরের গ্রাম্য দেবতা শ্রীশিবমন্দিরের সেবাইতকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মহাদেবের দৈনন্দিন সেবায় তাঁহার দেহমন সর্বস্ব সমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি গর্ভধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভধারণ বার্তা লোকসমাজে প্রচারিত হইলে তৎগ্রামবাসী নৈতিক সামাজিকগণ তাঁহাকে দুর্নৈতিকা ভ্রষ্ট-চরিত্রা মনে করিয়া সমাজচ্যূত করিলেন। বিশিষ্টা লজ্জা, অপমান ও লোকাপবাদে মর্মাহত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, 'বিশিষ্টার গর্ভে শঙ্কর অবস্থান করিতেছেন, সাবধান যেন তাঁহার মৃত্যু না হয়।' বিশিষ্টার পিতা মঘমণ্ডন স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত যত্নে আচার্য্য শঙ্কর নির্বিলম্বে ভূমিষ্ট হইলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর উপনয়নের পূর্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলেই বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি গুরুমুখে যাহা শুনিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। শঙ্কর সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া ষড়্দর্শন ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। কথিত আছে তাঁহার সংসারে আস্থা ছিল না। তিনি অধ্যয়ন ও শিবোপাসনায় সময়াতিপাত করিতেন। একদা শঙ্কর মাতার সহিত গ্রামান্তরে বাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পরপারে বাইবার সময় স্রোতে ভাসিয়া বাইতে-ছিলেন। একমাত্র পুত্রের জননী তাঁহার গর্ভধারিণী এই ঘটনায় বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বলিলেন,—‘মাতঃ! তুমি যদি বিবাহের পূর্বে আমাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি আত্ম-

রক্ষা করিব। অগত্যা শঙ্কর-জননী তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং শঙ্কর জন হইতে উথিত হইয়া গৃহে আসিলেন।”—(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শিবনাথ শিরোমণি-কৃত শঙ্কার্থ-মঞ্জরীর পরিশিষ্ট)

আচার্যের উক্ত জীবন বৃত্তান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি মাতাকে শাস্ত্রবাক্যদ্বারা বা নানা প্রবোধবাক্যদ্বারা সান্তনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জগন্মঙ্গলকর সন্ন্যাসধর্মের অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। মাতাকে ছলনা করিয়া তাঁহার পুত্রবাৎসল্যের সুযোগ লইয়া ক্ষুদ্র নদীতে প্রাণ ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া বতিধর্মের আত্মা লইলেন। অতঃপর মহাজনের জীবনীতে এইরূপ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। জগদগুরু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে তাঁহার বৃদ্ধা অসহায়্য মাতা শচীদেবী ও তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী উভয়কেই বুঝাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার ; আর শঙ্কর তাঁহার ভক্ত শঙ্করের অবতার। এস্থলে বক্তব্য এই যে আচার্য্য শঙ্কর যে-স্থলে তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে স্থাপন করিতে অসমর্থ, সে-স্থলে ছল-চাতুরী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার অশোভন ব্যবস্থা ও অবলম্বন করিতে ক্রটি করিতেন না। বাহ্য হউক, ছলে-বলে, কলে-কৌশলে সর্বপ্রকারেই কার্য্য উদ্ধারের প্রথা সর্বকালেই দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার সমতপোষক কতিপয় উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি জগতে অতুল কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার সমত প্রতিষ্ঠার জন্ত নানাদেশে দিগ্বিজয়-কলে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনীর দুই একটি কথা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

শঙ্কর বিজয়

(ক) শঙ্করের জীবনী পড়িলে জানা যায় তাঁহার সহিত বহু স্মার্ত্ত, শৈব, শাক্ত ও কাপালিকদের বিচার হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশবাসী ‘উগ্রভৈরব’ নামে এক কাপালিক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, শঙ্কর তাহার চিত্ত পোষন করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বুদ্ধিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে আত্ম-সমর্পণ পূর্বক নিজমস্তক দান করিয়াছিলেন। আচার্য্য পদ্মপাদ তাঁহাকে সেই কাপালিক উগ্রভৈরবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায়

শঙ্কর কাপালিকের বৃত্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই বরং তাহার ধর্মের যৌক্তিকতায় মস্তক বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(খ) কণাটদেশে 'ককচ' নামে এক ব্যক্তি কাপালিকগণের গুরু ছিল, শঙ্কর বিচারে তাহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাজা 'অধ্বা' দ্বারা পাশব বলপ্রয়োগে বুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যোগবল ও বৃত্তিবল এক্ষেত্রে কোন কার্যকরী হয় নাই।

(গ) 'অভিনবগুপ্ত' নামে জনৈক শাক্তাচার্য্যের সহিত আচার্য্যশঙ্করের উক্ত মতবাদ লইয়া বিচার উত্থাপিত হয়। তাহাতে অভিনবগুপ্ত, শঙ্করের প্রভাবে ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শঙ্কর উক্ত মতবাদের দ্বারা তাহার শিষ্যের চিত্ত শোধনে সক্ষম হন নাই। কারণ অভিনবের বড়বয়ে তিনি উৎকট ভগবদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। আচার্য্যের বিষয় অন্তের দ্বারা ঐরূপ রোগাক্রান্ত হওয়ার নিদর্শন চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। বাহা হউক, অভিনবের চরিত্রে ঐরূপ দোষারোপের দ্বারা মনে হয়, তিনি শঙ্করের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেও বৃত্তি তর্কে তাহার সহিত মিল হইত না। এই জন্যই তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া পদুপাদ উক্ত অভিনবগুপ্তের প্রাণ বিনাশ করেন।

(ঘ) শঙ্কর যখন উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন, তখন আচার্য্যভাস্করের সহিত তাহার মায়াবাদ সিদ্ধান্ত লইয়া নানাপ্রকার বিচার হয়। আচার্য্য ভাস্কর শৈব বিশিষ্টদ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন। শঙ্কর কোনক্রমেই তাহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। পরন্তু ভাস্করের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ভাস্কর বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করমতকে সূক্ষ্মভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এবং তাহাকে মায়াবাদী মাহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া বেদান্তের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণাদি আমি পূর্বেই 'শঙ্কর মাহাযানিক বৌদ্ধ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আচার্য্য ভাস্কর এক্ষেত্রে তাহার স্বমত প্রচার করিতে ত' পারেনই নাই, বরং বিপরীত হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল—মাহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন।

(৩) ‘উভয়ভারতী’ নামী মণ্ডন মিশ্রের এক মহতী বিদুষী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার স্বামী শ্রীমণ্ডন মিশ্রের পরাজয়ের পর, তিনি শঙ্করকে, রতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিচারে পরাস্ত করেন। শঙ্কর স্ত্রীলোকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া মহা বিপদাপন্ন হইলেন। তখন তিনি গতান্তর না দেখিয়া যোগবলে কোনও এক রাজার মৃত-শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজাস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় রাজমহিষীগণের নিকট হইতে ‘কাম’ বা ‘রতি’ সম্বন্ধে উভয় ভারতীর যুক্তির প্রত্যুত্তর শিক্ষা করেন। ইহাতেও শঙ্করের অপ্রতিহত দুর্দমনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐরূপ রতিক্রিয়ার আলোচনায় যতি-ধর্মের হানি হইল কিনা বিবেচনার বিষয়। আমার মতে কোনও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী যদি স্ত্রীঘটিত রতিক্রিয়ার শাস্ত্রীয় বিধান না জানা থাকে,—তবে তাহার পক্ষে প্রশংসার বিষয়ই হইয়া থাকে। পরন্তু কোনক্রমেই নিন্দনীয় নহে। সুতরাং শঙ্করের ঐরূপস্থলে জয় লাভের চেষ্টা নিতান্ত অশোভন।

(৪) মণ্ডন মিশ্রই শঙ্কর বিজয়ের বিজয়ত্ব। মণ্ডন তৎকালে একজন স্মার্ত ও কর্ম-মীমাংসায় অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন। শঙ্করের জয় বৌদ্ধের মধ্যে (?), কাপালিকের মধ্যে, শাক্তের মধ্যে, স্মার্ত ও কর্মীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মণ্ডন মিশ্রকে জয় করিয়া তিনি যে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভোগপর কর্মের জয় করিয়াছেন মাত্র। কাপালিকের প্রাকৃত ভাস্করিক তৈরবোপাসনা, শাক্তের মতবাদিগণের পঞ্চমকার ও বামাশক্তির উপাসনা, জৈমিনির ভোগপর কর্মজড়বাদ ও স্মার্তগণের পঞ্চোপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ। তৎতৎ ক্ষেত্রে বিজয়াফালনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় নাই। আচার্য্য শঙ্কর তাহা তৎকালেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(৫) আচার্য্যের জীবনীতে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি বিপদাপন্ন হইলেই তাঁহার শিষ্য পদুপাদ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনাকাশে পদুপাদ নিখুঁত পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। পদুপাদ শঙ্করের শারীরিক-ভাষ্য প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বেদান্তের-ভাষ্য রচনা করেন। ঐ ভাষ্য তাঁহার মাতুল কর্তৃক অপহৃত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মান্বিত হন। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-শঙ্কর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—“পদুপাদ! তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার সূত্র-ভাষ্যের প্রথম চারিটি সূত্রের ভাষ্য আমি কণ্ঠস্থ

করিয়া রাখিয়াছি। তুমি শ্রবণ কর।” ইহা হইতে দেখা যায় শঙ্কর পদ্যপাদীয় বেদান্ত-টীকা কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার নিজের ভাষ্য প্রণয়নের পূর্বেই উহা উদগীরণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর যখন সৌরাষ্ট্রদেশে উপনীত হন তখনই তাঁহার নারায়াদিপূজিত বিখ্যাত বেদান্ত-ভাষ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পদ্যপাদের যে প্রকার ক্রিয়াকলাপ, পাণ্ডিত্য খ্যাতি শ্রবণ করা যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই শঙ্কর স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে শঙ্করই আদি ভাষ্যকার, কি পদ্যপাদই আদি ভাষ্যকার—ইহা বিবেচনার বিষয়। অন্ততঃ পদ্যপাদ শঙ্করের সর্ববিষয়ে রক্ষক ও অবলম্বন ছিলেন একথা নিঃশঙ্কোচে বলা যায়।

(জ) - তিব্বতীয় বৌদ্ধ ‘লামার’ সহিত বিচারে শঙ্কর পরাস্ত হন। ‘লামা’ তখনকার বৌদ্ধ জগদগুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বিচারকালে উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে—“যিনি পরাস্ত হইবেন তিনিই তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সুতরাং বিচারে পরাস্ত হইয়া আচার্য্য শঙ্কর উত্তপ্ত তৈলে আত্মবিসর্জন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ জগদগুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ (?) খৃষ্টাব্দে জগতের উজ্জল জ্যোতি শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে।”—শঙ্কার্থ মঞ্জরী পরিশিষ্ট।

প্রকাশ থাকে যে আজও তিব্বতে সেই শঙ্কর কটাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। লামাগণ উহা তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আদর ও সম্মান করিয়া থাকে। শঙ্কর বিজয়ের হুহাই প্রকৃত ইতিহাস। (ক্রমশঃ)

শ্রীম প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সান্ন্যাসত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিনাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।
মূল্য—১০ আট আনা।—শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য

শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারন গৌড়ীয় মঠ,

চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,

জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)

১৯শে জৈষ্ঠ, ১৩৬১ ; ইং ২৬।৫৯

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদাচাৰ্য্যদেব
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা
উপলক্ষে আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৬১, ইং ৩০শে জুন, ১৯৫৪, বুধবার
হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১৩৬১, ইং ১০ই জুলাই, ১৯৫৪, শনিবার পর্য্যন্ত
একাদশ-দিবস-ব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী,
শ্রীবিষ্ণুহৃদয়ের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাটিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ
প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধৰ্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যানুষ্ঠানে যোগদান করিলে
সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে
যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির
সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী মুকুতি অর্জিত
হইবে। পরপৃষ্ঠার দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
হইলে ত্রিদিগ্ভিঙ্গামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত
ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

- ১। ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, বুধবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব
উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, বৃহস্পতিবার—নগর-সংকীর্তন-মুখে
শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও শুগুচা-
মন্দির-আর্জ্জন, গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন, পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে
১০টা।
- ৩। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, শুক্রবার—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।
সংকীর্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীশুগুচা-বাড়ী
শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্তন।
- ৪। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শনিবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই,
সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাধি-
কান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরানন্দ
ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, মঙ্গলবার—হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-
বিজয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সংকীর্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে
৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন।
- ৬। ২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, বুধবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই,
শুক্রবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাধিকান্তে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত
ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর
বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, শনিবার—সংকীর্তন শোভাযাত্রাযোগে
শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত।
পরে আরাধিকান্তে সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রগতি-কুসুমাজলি

হে প্রভু দয়াল নাথ ! করি পদে প্রণিপাত,

অবশ হৃদয়ে মম আন নব জাগরণ ।

আঁখির সন্মুখে আসি' খুলে দাও আবরণ ॥১॥

তোমার পদে হৃদয় মম, দাও লুটায়ে কুসুম সম,

নিত্য মোরে শুনায়ে তোমার মধুর অভয়বাণী ।

দুঃখ যত দূর করে দাও শান্তি প্রাণে আনি ॥২॥

মুক্ত ধামের বাসী তুমি, ধন্য মোদের জন্মভূমি,

পুণ্য তোমার স্পর্শে হলো তীর্থ সবাকার ।

সত্য-স্থাপক হে গুরুদেব ! তোমায় নমস্কার ॥৩॥

নির্মল আজি চন্দ্র-কিরণ, তারকার দল মেলেছে নয়ন,

শতেক কণ্ঠে ভরিয়া গগন মাগিছে আশীষ-বাণী ।

পূজিছে সকলে তব শ্রীচরণ ভক্তি-অর্ঘ্য আনি ॥৪॥

পূজিবার লাগি তব পদতল, নয়ন ভরিয়া আনিয়াছি জল,

অন্তরখানি পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি দীন-মিনতি ।

সব মলিনতা ঘুচাইয়া দিয়া দাও হৃদে মম ভকতি ॥৫॥

আসে কভু যদি ঘোর বিপত্তি, তুমি যদি সদা থাক মোর সাথী,

তোমায় স্মরিয়া বাইব চলিয়া নিত্য চলার পথে ।

তব কৃপাবলে . পাইব উদ্ধার সকল বিষ হ'তে ॥৬॥

যেদিন তোমার পায়ে আমার একটুখানি স্থান হবে ।

সেদিন আমার সব কামনার . চির অবসান হবে ॥৭॥

অতীতটাকে আস্ব রেখে স্মৃতির সাগর পার ক'রে ।

তোমার দেওয়া সকল শিক্ষা রাখিব গলার হার ক'রে ॥৮॥

ভুলিয়া প্রভু চা'বনা কভু অসার ধন-মান ।

মুক্ত কণ্ঠে সদাই গাহিব তব মহিমার গান ॥৯॥

দীন-সেবিকা—শ্রীআভারাগী দত্ত
চৌমাথা, চু'চুড়া ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতন

(পূর্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কারামুক্তি

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কারাধ্যক্ষকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় সনাতন গোস্বামী তাহাকে বহু প্রকার স্তুতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার চিত্ত আদ্র করিতে পারিলেন না। পরিশেষে—

পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার।

পুণ্য, অর্থ, —তুই লাভ হইবে তোমার ॥

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা।

সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৩১৫)

নগণ্য নফর কারাধ্যক্ষ মন্ত্রীবর শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট কৃতজ্ঞ-পাশে আবদ্ধ থাকিয়াও, গোড়েশ্বর বাদসাহ হুসেন সাহের ভয়ে তাঁহাকে অল্প মুদ্রায় কারা-মুক্ত করিতে সম্মত হইল না। কিন্তু যখন সাত হাজার টাকা এক কালীন প্রাপ্ত হইবার সুযোগ ঘটিল তখন তাহার মন ফিরিয়া গেল। কিন্তু রাজাকে কি উত্তর দিবে তাহা স্থির করিতে না পারায় সনাতন গোস্বামী তাহাকে বলিলেন—
রাজা উড়িষ্যায় বুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন তুমি এই কথা বলিবে—‘মন্ত্রীবর গঙ্গার তীরে বাহির্দেশে যাইয়া শৃঙ্খলের সহিত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।’ এইরূপ বলিলে তোমার কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। কারণ, আমি এই বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া নকায় যাইয়া দরবেশ হইব। এই কথা শুনিয়া কারাধ্যক্ষের মন সন্তুষ্ট হইল। সনাতন গোস্বামীর প্রদত্ত সাত হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া অতিসংগোপনে সনাতন গোস্বামীকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিল।

“লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।

রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫)

সনাতন গোস্বামীর বারাণসী যাত্রা—

গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাঁহা যাইতে।

রাত্রি-দিন চলি’ আইলা পাতড়া-পর্বতে ॥

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।

‘পর্বত পার কর আমায়’—বিনতি করিলা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬-১৭)

সনাতন গোস্বামী গোতেশ্বরের কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া ভূতা
ঈশানকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন লাভস্বরূপ বারাগসী ক্ষেত্রাতিথুখে
যাত্রা করিলেন। তিনি প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া বনপথে, বন
ফল-মূলাদি দ্বারা ক্ষুধিবৃত্তি করিয়া তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নকালে পাতড়া পর্বতে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অসহায় পথিকদের ধন-প্রাণাদি সর্বস্ব লুণ্ঠন
করিবার অভিপ্রায়ে ভৌমিক উপাধিধারী কোন এক দস্যু ঐ পাতড়া পর্বতের
নিভৃত গুহার বাস করিত। ঘটনাচক্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহারই নিকট
উপস্থিত হইয়া পর্বত পার করিয়া দিবার জন্ত তাহাকে অমুরোধ করিলেন।

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাক্রি গেলা।

‘পর্বত পার কর আমায়’—বিনতি করিলা ॥

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা।

ভূঞার কাছে কহে সেই জানি’ এই কথা ॥

‘ইহার ঠাক্রি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়’।

শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥

রাষ্ট্রে-পর্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া।

ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৭-২০)

সেই ভূঞার অধীনে একজন গগক বাস করিত। সে গগনা করিয়া বলিতে
পারিত কাহার নিকট কি ধন রহিয়াছে। গগক ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া
কাণে কাণে জানাইল, ঈশান নামক ভৃত্যটির নিকট আটটি সুবর্ণের মোহর
রহিয়াছে। ভূঞা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পরমানন্দের সহিত সনাতন
গোস্বামীকে আদরের সহিত বলিলেন—‘আমি আমার লোক দ্বারা রাত্ৰিকালে
পর্বত পার করিয়া দিব;—এখন জানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন।’

এত বলি’ অন্ন দিল করিয়া সম্মান।

সনাতন আসি’ তবে কৈল নদীস্নান ॥

তুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে।

রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।২১-২২)

ভূঞা পরম শ্রদ্ধা সহকারে রন্ধনের দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিল।
তক্ত-কুলচুড়ামণি শ্রীল সনাতন তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া তৎসমুদায়ই
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ করিবার জন্ত নদীতে স্নান করিয়া ভগবানের ভোগ রন্ধন

করিলেন। ভগবন্তু কোন দ্রব্যই ভগবানকে না দিয়া গ্রহণ করেন না। কৰ্মজড় স্বাক্ত ও শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, অবৈষ্ণব স্বাক্তগণ যাবতীয় দ্রব্য কৃষ্ণ-সেবার নিবৃত্ত না করিয়া নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকেন। তাহারা জানে না যে দ্রব্যমাত্রেরই মালিক—শ্রীভগবান্। সুতরাং ভগবানের বস্তু ভগবানকে না দিয়া স্বয়ং গ্রহণ করার ফলে মায়াতে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আর শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভোগ প্রমুখ জীবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ভগবানের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তাহাতে বদ্ধজীবের মায়াবন্ধন ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে। বৈষ্ণবগণের ইহাই জীবে দয়া। এবং বদ্ধজীব এইরূপ ভাবেই বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ পাইয়া মুক্তি লাভ করে। বৈষ্ণব-সঙ্গই মুক্তির প্রধান হেতু।

মহৎ-সেবাং দ্বারমাহর্কিমুক্তে তমোদ্বারং যোষিতাং সদ্ভি-সঙ্গম্।

মহান্তন্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমত্তবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ (ভাঃ ৫।৫।২)
পণ্ডিতগণ মহৎ-সেবাকেই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং যোষিতদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি; তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার অর্থাৎ নরকের প্রশস্ত পথ-বিশেষ বলিয়া জানেন। যাহারা সাধু, তাহারা মহদব্যবসায়ী, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব-সুহৃৎ।—

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পানর।

নিজ-কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

মহাবিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্যুত্থা কল্পতে কচিং ॥ (ভাঃ ১।৮।৪)

দীনচেতা গৃহিদিগের নিত্য-মঙ্গল সাধনের জন্যই মহৎ ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকেন, অথু কোন কারণে গমন করেন না। সনাতন গোস্বামী ভৌমিকের প্রদত্ত দ্রব্যাদি শ্রীকৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন পূর্বক প্রসাদ স্বরূপ তাহা গ্রহণ করিলেন। ‘প্রসাদ’ শব্দের অর্থ—অনুগ্রহ বা কৃপা। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জগতের কোন প্রকার অমঙ্গল জীবগণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে, তাহার অর্থাৎ সেই কৃষ্ণচক্রের অধরাবৃত্তই মহাপ্রসাদ।

ভীক্স বুদ্ধি রাজমন্ত্রী সনাতন ভৌমিকের আদরাদি লক্ষ্য করিয়া সংশয়-চিন্তে নিজ ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঈশান! তোমার সঙ্গে কিছু অর্থ আছে কি?” ঈশান আটটি মোহরের মধ্যে একটি মোহর গোপন করিয়া সাতটি মোহরের কথা উল্লেখ করিয়া উত্তর করিলেন—“পাথের স্বরূপ সাতটি মোহর

সঙ্গে লইয়াছি।” সনাতন গোস্বামী মোহরের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত ঈশানকে বলিলেন,—এখনই সাতটী মোহর আমাকে দাও।

বৈষ্ণব সঙ্গই স্নুকৃতির জনক

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।

ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥

এই সাত স্তবর্ণ মোহর আছিল আমার।

ইহা লঞা ধর্ম দেখি’ পর্বত কর পার ॥

রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি।

পুণ্য হবে, পর্বত আমা দেহ পার করি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।২৬-২৮)

সনাতন গোস্বামী ঈশানের নিকট হইতে মোহর সাতটী গ্রহণ করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে দম্ভ্য ভৌমিকের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও মৃদু-মধুর বচনে বলিলেন,—
“আমার সঙ্গে সাতটী মোহর আছে, আপনাকে আমি অর্পণ করিলাম। আপনি এইগুলি লইয়া আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য পথে যাইতে পারিব না, আমাকে পর্বত পার করিয়া দিলে, আপনার বিশেষ পুণ্য হইবে।” প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা শ্রেয়ঃ আচরণ করিলেই দেহধারী জীবের জন্ম সফল হইয়া থাকে।—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈর্বিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ (ভাঃ ১০।২২।৩৫)

বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

কর্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ (বিঃ পুঃ ৩।৪২)

বাক্য, মন ও কর্মদ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণিগণের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন। আপনি উদার-চিত্ত ও দয়ালু, আপনার আচরণ দ্বারাই আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি; হে ধর্ম-প্রাণ। আপনি আমাকে পর্বত পার করিয়া দিন। এই কার্য্যানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই আপনার পুণ্য হইবে।—

ভূঞা হাসি’ কহে,—‘আমি জানিয়াছি পহিলে।

অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥

তোমা মারি’ মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।

ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাও পাপ হৈতে ॥

যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকঞ্চল দিল ।

গঙ্গা পার করি' দিল, গোসাঞি চলিল ॥

তবে বারাগঙ্গী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।

শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৮, ৪০-৪৫) (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমদভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

পত্রিকা-প্রশান্তি

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-বিধুর্জয়তি

গোবর্দ্ধন, ২৯ বৈশাখ

প্রিয় সম্পাদক মহাশয় !

আপনাদের শাস্ত্রোক্ত ভক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেছি । এই পত্রিকা দ্বারা মায়াবদ্ধ জীবেরও বহু কল্যাণ সাধিত হইতেছে । আশা করি এরূপ সেবা-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া জগতের কল্যাণে নিয়োজিত থাকিবেন । ইতি—

বৈষ্ণব-দাসাশুদাস — শ্রীমনোহর দাস বাবাজী

চক্লেস্বর, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জিউর মন্দির

পোঃ গোবর্দ্ধন (মথুরা)

ভ্রম সংশোধন

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি—শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠায় ‘অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ’ স্থলে ভ্রমবশতঃ ‘অবতারের উপদ্রব নিবারণ’ ছাপা হইয়াছে । সমালোচনা মূলক প্রবন্ধে বিশেষতঃ তাহার শিরোনামায় উক্ত প্রকার মুদ্রাকর প্রমাদ বিশেষ অশোভনীয় । আমরা তজ্জন্তু পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । অবশ্য প্রবন্ধের ভিতরে সর্বত্রই ‘অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ’ শিরোনামাটিই উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা হইতেও পাঠকবর্গ উক্ত শিরোনামার ভ্রান্তি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিয়া সংশোধন করিয়া লইয়া থাকিবেন । তথাপি কর্তব্যানুরোধে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম । পাঠকবর্গ উক্ত শিরোনামায় ‘অবতারের’-শব্দটি কাটিয়া ‘অপদেবতার’-শব্দটি লিখিয়া রাখিবেন । নতুবা বর্ষশেষে মূঠপত্র দেখিয়া এই প্রবন্ধ খুঁজিয়া লইতে অসুবিধা হইতে পারে ।

—প্রকাশক

অপদেবতার উপদ্রব-নিবারণ

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গ-দোষ

পণ্ডিত সমাজে একটি সাধারণ গ্রাম প্রচলিত আছে,—‘যোগ্য যোগ্যে
যুজ্যতে’। অর্থাৎ যে যেমন যোগ্য ব্যক্তি, সে তেমন সঙ্গই বাছিয়া লয়।
আমরা ইংরাজী ভাষাতেও ভূনিয়াছি কাহারও পরিচয় জানিতে হইলে, তিনি
কিরূপ সঙ্গ বাস করেন তাহা জানিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত স্বভাব জানিতে
পারা যায়। ‘Men are known by their company, they keep.’
মৃতরাং নিবারণ বৈদ্য তাহার জন্ম ও কুলানুসারে কোন সঙ্গ পছন্দী প্রাকৃত
রাসলীলা-প্রমত্ত সঙ্গ বাছিয়া লইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সাউডীর
গুরু-বৈষ্ণব-দ্রোহী ইচড়ে-পাকা প্রাকৃত সহজিয়া দলের বর্তমান প্রধান পাণ্ডার
নাম—‘পঞ্চানন তেলী’। নিবারণ বাবু এই ‘পঞ্চাননের’ নামটীও যদি স্মরণ
করিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবের নাম-করণ লইয়া অবৈধ ঈর্ষান্বিত হইয়া
নিজের মূর্খতার পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমার মনে হয়, তিনি শ্রীমান্
পঞ্চাননকে দশানন মনে করিয়াছেন। কারণ, দশানন যে-প্রকার সীতাহরণ
করিয়াছিল, সেইপ্রকার পঞ্চানন তেলীও বিপত্নীক হইয়া রাধাকুণ্ডে একজন
রজকিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি নাকি সহজিয়া মতের চণ্ডীদাসের
অবতার। অতএব গুপ্তমহাশয় ‘অবতারের উপদ্রব’ ছাড়া আর কি বলিবেন?
আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ ‘পঞ্চানন তেলীর বিয়ুপ্রিয়া ভজন’ প্রসঙ্গে
আলোচনা করিব। আমরা জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি—নিবারণ বাবুর
শিক্ষাগুরু পঞ্চানন তেলী নাকি রাধাকুণ্ডে মহান্ত সাজিবার জন্ত ধৃষ্টতা প্রদর্শন
করিতেছে। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাকেই
বলে প্রকৃত কলির প্রভাব। আমাদের বিশ্বাস—গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডবাসী
শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ পঞ্চানন তেলীর সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহার ও বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তের অধিকার এবং স্বভাব-চরিত্র সর্বতোভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে
রাধাকুণ্ড-বাসের অযোগ্য বলিয়া স্থির করিবেন—মহান্ত করা ত দূরের কথা।

গুপ্তের প্রবন্ধে আত্ম-স্বভাব ব্যক্ত

যে সম্প্রদায় বা সঙ্গ সর্বদা প্রাকৃত সহজিয়ার গ্রাম রাসলীলা অনুকরণ
ও আচরণ করে, সেই সম্প্রদায়ের বা সঙ্গের অনেকেই যে পরস্পর-হরণাদির গ্রাম

প্রাকৃত পারকীয় রসের অনুশীলন করিবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? স্মরণে
নিবারণ বাবু তাহার নিজের মনোমত ও স্বভাবমত সঙ্গ ও সঙ্গ্য খুজিয়া
লইয়াছেন। ইহা তাহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। আমরা এই প্রসঙ্গে
তাহার ‘অবতারের উপদ্রব’ নামক প্রবন্ধের প্রথম অংশ নিয়ে উদ্ধার করিয়া
তাহার স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তিনি লিখিয়াছেন—

“দেশের লোকের সরল বিশ্বাসকে আশ্রয় ক’রে কত রকম যে উপদ্রব চলেছে,
তার কি আর সীমা আছে ? জমিদার মহাজনের অত্যাচার, সিপাহী
বরকন্দাজের অভিযান, উকিল মোক্তারের কৌশল জাল, ভীর্ষের পাণ্ডা বা
মোহান্ত বাবাজীর টাকা আদায়ের ফন্দী, এমন কি বরের বাপের আবদার
পর্যন্ত সব রকম উপদ্রব সহ করা অনেকের পক্ষে একরকম অভ্যাসের মধ্যে
দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি দেশের সর্বত্র একশ্রেণীর অবতার পুরুষদের যে
উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ
হ’য়ে উঠেছে।”

উক্ত প্রবন্ধাংশের এক একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে—
‘দেশের লোকের সরল বিশ্বাসকে আশ্রয় ক’রে কত উপদ্রব
চলেছে, তার কি আর সীমা আছে ?’ আমরা এই বাক্যের প্রতিবাদ
করি না। কিন্তু এই সরল বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়া কে বা কাহারো জগতে
উপদ্রব সৃষ্টি করিতেছে তাহার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা বিশেষ
দর্পের সহিত বলিতে চাহি—সাঁউড়ীর পারকীয় রসের ভজনানন্দী-দলই সরল
বিশ্বাসী জনসমাজের উপর অবৈধ সহজিয়া চিন্তাশ্রোত প্রচার ও প্রসার-কল্পে
গুরুদ্রোহিতা, ধর্মদ্রোহিতা ও সমাজ-দ্রোহিতার একটা আড্ডাখানা প্রস্তুত
করিয়াছে। ইহা নিবারণ বাবু তাহার নিজের প্রবন্ধেই প্রমাণ দিয়াছেন।

‘জমিদার মহাজনের অত্যাচার’

তিনি ‘জমিদার মহাজনের অত্যাচার’ সম্বন্ধে যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা
আমি অত্যন্ত কোথাও তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার পূর্বে আমি পাঠকবর্গকে
সাঁউড়ী-শালার অধিপতির কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার মনে হয়
প্রবন্ধ লেখক গুপ্ত মহাশয় সীতানাথ বাবুর জমিদারী-মহাজনার চালে পড়িয়া
বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাহার বাড়ীর
সিপাহী দারোয়ানগণ বোধ হয় তাহার ভাবধারা বুঝিয়া তাহাকে গৃহস্থে
প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

উকিল মোস্তারের প্রতি কটাক্ষ

উকিল মোস্তারের প্রতি কটাক্ষ করিবার কারণ বিশেষ বুঝিয়া উঠা যায় না। তবে চোর-ডাকাত, পরদ্বী-হরণ-কারী, ভণ্ড ও যত্তা-গুত্তা-শ্রেণী মাত্রই পুলিশ-দারোগা, উকিল-মোস্তার, হাকিম প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কোন সচ্চরিত্র, সাধু, ধার্মিক বৈষ্ণবগণের কখনও শিক্ষিত উকিল মোস্তা রগণকে দেখিয়া ভয়ের উদ্রেক হইতে পারে না। দোষী-চিত্ত সর্বদাই শঙ্কিত থাকে। পুলিশ, সিপাহী বরকন্দাজ দেখিলেই তাহাদের আতঙ্ক হয়। নিবারণ বাবু উকিল 'মোস্তার' পুলিশ দেখিয়া এত আতঙ্কিত হইলেন কেন?—ভিতরে কোন গলদ আছে কি?

মহান্ত বাবাজীদের প্রতি ক্রোধ

'মহান্ত বাবাজীদের' প্রতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের অন্ধাই লক্ষ্য করা যায়। নিবারণ বাবু মহান্ত বাবাজীদের প্রতি এত চটিয়া গেলেন কেন? আমার মনে হয় পঞ্চানন তেলীর মহান্ত সাজিবার চেষ্টা দেখিয়াই ভিতরে ভিতরে ঘণার উদ্রেক হইয়াছে। নিবারণ বাবুর নিশ্চয় স্বরণ পথে জাগিয়াছে,—পঞ্চানন তেলী রাধাকুণ্ডে পারকীয় রসের আলোচনা করিতে গিয়া জনৈক বিষ্ণুপ্রিয়া রজকিনীকে তাহার পাচিকা ও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া টাকা রোজগারের ফন্দি-ফিকির করিতেছে। ইহাতে নিবারণ বাবুর অসন্তুষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ থাকা উচিত—তবে বলা যায় না, তেলী বাবু নিজের দলেরই পাণ্ডা।

'তীর্থের পাণ্ডা'

'তীর্থের পাণ্ডা' যদি এতই শত্রু মনে হইয়া থাকে, তবে সাউড়ীর দলের প্রধান পঞ্চানন তেলীর রাধাকুণ্ডে পাণ্ডা সাজিবার চেষ্টা করা অবৈধ হইবে না কেন? আমরা জানি তীর্থের পাণ্ডাসকল যাত্রীগণকে তীর্থ-দর্শনের বিশেষ সহায়তা করে এবং যাত্রীগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে; অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাহারা পরসার জন্য তীর্থ-যাত্রীগণের প্রতি একটু পীড়াপীড় করিয়া থাকে বটে, তাহাও যাত্রীগণের পক্ষে বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয় না। যাত্রীগণ প্রত্যেক তীর্থেই পাণ্ডার সহায়তা ও আশ্রয় লইয়া শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করেন এবং তীর্থের পরিচয় পাইয়া থাকেন। পাণ্ডাগণ তীর্থ-যাত্রীর সর্বতোভাবে সহায়তা না করিলে নূতন তীর্থ-যাত্রীর পক্ষে তীর্থ-দর্শন অসম্ভব। কেহ কেহ তীর্থের পাণ্ডাগণকে 'তীর্থ প্রদর্শক'—এমন কি, 'তীর্থ গুরু' এইরূপ আখ্যাও দিয়া থাকেন। নিবারণ বাবুর পক্ষে তীর্থের পাণ্ডা বা 'যাত্রী-

সংরক্ষক' উঠিয়া গেলে তাহার পক্ষে অবাধে অবৈধ আচরণ অগম হইবে। ইহা তিনি তাঁহার পূর্ব পুরুষগণের অথবা তাহাদের জাতীয় উৎপত্তির ইতিহাস স্মরণ করিয়াই বোধ হয় তীর্থ যাত্রার পাণ্ডার (রক্ষকের) বিরোধিতা করিতে বসিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

আসাম প্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি পরমহংস স্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ গত ৩১ শে বৈশাখ ইং ১৪ই মে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় ন্য হইতে আসাম অভিমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে শুভ বিজয় করেন। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, প্রচার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ, প্রভৃতি ৫ মূর্তি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ৫ মূর্তি ব্রহ্মচারীও তাঁহার অনুগমন করেন। সভাপতি মহারাজ নিম্নলিখিত অঞ্চলে নির্ভীকভাবে অকপট সত্যবাণী কীর্তন করিয়া সর্বসাধারণের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার অতিমর্ত্য প্রভাবসম্পন্ন শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও যুক্তি শ্রবণ করত সর্বসাধারণ বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অতীব আকৃষ্ট হন। সর্বত্রই বিপুল জনসমাগমে সভাস্থল ও মণ্ডপাদি পরিপূর্ণ থাকিত।

গোলোকগঞ্জ—সভাপতি মহারাজ গোলোকগঞ্জ ষ্টেশনে ২রা জ্যৈষ্ঠ সকালে ৮-১১মিনিটে পৌছিলে মাননীয় শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ খোলকরতাল, পতাকাদি সহ নগর-কীর্তন শোভাযাত্রা সহযোগে সভাপতি মহারাজকে ষ্টেশন হইতে শ্রীদ্ব্যজ্ঞান দাসাধিকারী মহাশয়ের বাস-ভবনে লইয়া যান। তদবধি ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত তিনি সগোষ্ঠী তথায় অবস্থান করেন। প্রত্যহই স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এবং রেল ও সরকারী কর্মচারীবৃন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার পরিপ্রশ্ন দ্বারা তাহাদের সংশয়গুলির শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-মূলক সীমাংসা শ্রবণ করিতেন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ উচ্চ ইং বিদ্যালয়, জগমোহন বিদ্যাপীঠে এবং ৫ই জ্যৈষ্ঠ টোকর নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় মহাশয়ের গৃহে সভাপতি মহারাজ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতামুখে তিনি দেশের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিমাণিক অধঃপতন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবং আৰ্য্য ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ যতদিন না ভারত সর্বতোভাবে অঙ্গীকার করে ততদিন প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই—এবিষয়ে সকলকে সচেতন করেন।

তাঁহার বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত্রিবিক্রম মহারাজ উভয় ক্ষেত্রেই ছায়াচিত্রে শ্রীমদ্বাহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করেন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সভাপতি মহারাজ স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুত রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের বাস-ভবনে শ্রীভাগবত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বেদান্ত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপতা এবং ইহার অনুশীলনের অধিকারী নির্ণয়ই এই বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে কয়েকটি শ্লোক আলোচনা করেন।

ধুবড়ী--৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সভাপতি মহারাজ গোলোকগঞ্জ হইতে ধুবড়ীতে ভূতবিজয় করেন এবং স্বতীর্থবর গোলোকগত শ্রীপাদ নিয়ানন্দ সের্বাতীর্থ প্রভুর প্রপরাশ্রমে অবস্থিতি করেন। ৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে ধারাবাহিকভাবে ৭ দিনের জন্ত তিনি স্থানীয় হরিনামভার শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন। প্রত্যহই সভাস্থল শ্রোতায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। স্কুলের শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রত্যহই সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মেধাবী শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে সভাপতি মহারাজ গাভীব্যপূর্ণ দার্শনিক বিচার এবং ষড়দর্শনের সূক্ষ্মতম বিষয়গুলির তুলনা মূলক আলোচনা করেন। ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং একমাত্র ভক্তিই বেদান্ত সূত্রকারের হৃদয় অভিপ্রায়,--ইহা শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিমূলে স্থাপিত হয়। আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানবাদ যে বেদান্ত দর্শনের অভিপ্রায় নহে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভাষ্যকারে রচিত হইয়া ভক্তিই বেদান্ত-সূত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে,--এবিষয়ে দার্শনিক বিচার ও যুক্তির প্রচুর আলোচনা হয়। তাঁহার যুক্তির গাভীর্য্য এবং শাস্ত্রের অতিমর্ত্য অধিকার দর্শন করিয়া সকলে বিশেষ আকৃষ্ট হন। সভায় ধর্ম্মধবজী ও অহংগ্রহোপাসকগণের ভগবান্ সাজিবার ও ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিবার অপরাধময় কুপ্রবৃত্তির বিশেষ সমালোচনা করত প্রকৃত ধর্ম্মের, অধর্ম্মের, ছলধর্ম্মের ও কুধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সভাপতি মহারাজ সকলকে অবিহিত করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণে হরিনাম (?) প্রচার করিয়া ভগবান্ সাজিতে গিয়া ভগবানের পঙ্খলীলার অবতারের স্তাবক-গণসহ অধোগতি অনিবার্য্য। হরিনাম সংকীর্ত্তনদ্বারা জীবের ভগবৎ প্রেম লাভ হয় কিন্তু যে হরিনামগ্রহণকারী হরিনামদ্বারা ভগবদ্সাবুজ্য অথবা ভগবৎ স্বরূপতা লাভ করিতে চায়, সে কখনও ভগবান্ বা ভক্ত হইতে পারে না পরন্তু ভক্তবেশে

কপট, লোকবঞ্চক মাত্র। সদাচার, সাধ্বিক আহার, আগ্নিষ পরিবর্জন না করিয়া বাহ্যিক ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে এবং জীব-ব্রহ্মৈকবাদ অলম্বনে বাহ্যিক ইতরগতি লাভ করিয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ অথবা কৃষ্ণ সাজিতে চাহে তদ্রূপ ধর্মধ্বজীর বিচারও কখন বেদান্ত অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে—এতদ্বিষয়ে বহুল পরিমাণে অনুকূল-সম্প্রদায়ের নামে ধর্মের প্রতিকূল বিচার সম্পন্ন অসংসঙ্গ ত্যাগই বর্তমানে কর্তব্য—প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করত সভাপতি মহারাজ সাধারণের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সভাপতি মহারাজের পাঠে আকৃষ্ট হইয়া আরও কয়েক দিন পাঠ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অধিক সময় না থাকায় শ্রোতৃবর্গের অনুরোধ রক্ষার্থে আরও ১ দিবস তিনি পাঠ করেন। বৃষ্টি ও দুর্ঘ্যোগের দিনেও দৈবানুকূলে প্রত্যহ শৃঙ্খলে পাঠ কীর্তনাদি হইয়াছে। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হরিসভায় ছায়াচিত্রে ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্তৃক শ্রীগৌরাজ লীলা আলোচিত হইয়াছে। সহরে আরও ২।১ স্থলে ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করেন।

কাছারির হাট—২৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ধুবড়ী হইতে সভাপতি মহারাজ নদলে কাছারীর হাট নামক পল্লীতে গুপ্ত বিজয় করেন। এতদেশীয় সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট কয়েকজন ভক্তের একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনার তিনি তথায় ৩ দিবস অবস্থান ও বক্তৃত্তা করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের সরল ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া প্রাকৃত মহাজিয়া ও গুরুব্রহ্মগণ এতদেশে অবাধ ব্যবসা চালাইতেছে দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব “গুরুতত্ত্ব” সম্বন্ধে ৩ দিবস বক্তৃত্তা করেন। অসদাচারী মানক-সেবী ও মৎস্য-মাংস-ভোজী ব্যক্তি বাহ্যতঃ বৈষ্ণব বেশভূষা ধারণ করিলেও কখন গুরু পদবাচ্য নহেন। সদগুরু লক্ষণ প্রভৃতি বাহ্যতে না লক্ষিত হয় তদ্রূপ ব্যক্তিকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিলে প্রকৃত সিদ্ধি অসম্ভব। গোস্বামী প্রদর্শিত সদগুণের অধিকারী হইলেই প্রকৃত গুরু হওয়া সম্ভব; পরন্তু কেবলমাত্র কুলপরম্পরায় গুণহীন ব্যক্তিকেও গুরু-পদে অভিষিক্ত করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। স্থানীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রে গৌর-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রত্যেক সভাতেই সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে।

নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, বাৎসরিক ২১০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষানূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সমালোচনা আদরণীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী শ্রীদামোদরাস্তকম্

শ্রীহরিতত্ত্ববিনাস মতে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১০ আনা।

২। শ্রীমদুগবদগীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদুত্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)
মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯৮ নর টাকা।

পিতুরিহ বৃষভানোরববায়-প্রশস্তিঃ
 জগতি কিল সমস্তে সৃষ্ট-বিস্তারয়ন্তীং ।
 ব্রজ-নৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
 সুরভিনি নিজ-কুণ্ডে রাধিকামর্চয়ামি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথ-কীর্ত্তি-
 প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মের-বক্তাং ।
 নটদয-ভিদ-পাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
 কলিত-কুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুমবৃন্দোৎফুল্ল-ধাম্মিল-ধাটী-
 বিঘটিত-মদ-ঘূর্ণং-কেকি-পিঙ্ক-প্রশস্তিঃ ।
 মধু-রিপু-মুখ-বিঘোৎগীর্ণ-তাম্বূল-রাগ-
 স্মরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তুঃ-স্নেহ-সিতান্তুরঙ্গা-
 মখিলবিধ-বিশাখা-সখ্য-বিখ্যাত-শীলাং ।
 স্মরদযভিদনঘ-প্রেম-মানিক্য-পেটীং
 ধূত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৫ ॥

অতুলমহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেভিষিক্তাং
 নিখিল-সময়-ভর্তৃঃ কার্ত্তিকস্তাধিদেবীং ।
 অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সীবৃন্দ-মুখ্যাং
 জগদঘ-হর-কীর্ত্তিঃ রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৬ ॥

হরিপদ-নখ-কোটি-পৃষ্ঠ-পর্যন্ত-সীমা-
 তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণ-কোটেরভীষটং ।
 প্রমুদিত-মদিরাক্ষীবৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
 গুরুমতিগুরু-কীর্ত্তিঃ রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৭ ॥

অমল-কনক-পটোদঘৃষ্ট-কাশ্মীর-গৌরীং
 মধুরিমলহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীং ।

হরিভুজ-পরিরক্তাং লক্ক-রোমাঞ্চ-পালিঃ

সুন্দর-দুর্কলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিমাং কামমাধার-রূপং

পরিপঠতি বরিষ্ঠং স্মৃষ্টু রাধাষ্টকং যঃ ।

অহিম-কিরণ-পুল্লী-কূল-কল্যাণ-চন্দ্রঃ

স্মৃটেমাখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

বাঁহার কোন দিকে দৃষ্টিপাত হইলে বোধ হয় যেন সেইদিকে খঞ্জনমালা খেলা করিতেছে, অর্থাৎ খঞ্জনের স্রায় বাঁহার নয়ন যুগল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ ভ্রমরের মল্লিকা-কুসুম-স্বরূপ এবং অশেষ গুণের আশ্রয়-হেতু যিনি গভীর প্রকৃতি, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ১ ॥

যিনি এই নিখিল জগতে স্বীয় পিতা বৃষভাসুর বংশ-শ্লাঘা বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি নানাবিধ জনজ-পুষ্পে স্তব্ধকৃত নিজ বিলাসস্থান শ্রীরাধাকুণ্ডে সখীগণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত জনক্ৰীড়া করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ২ ॥

যিনি মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত বদন-মণ্ডল-দ্বারা শরৎ-কালীন নিশ্চল চতুর্দশ শোভাওতিরস্কার করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বারা বাঁহার অনঙ্গ-রঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ধারণ করিতেছেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৩ ॥

নানাবিধ কুসুম-শোভিত কেশপাশ দ্বারা যিনি শিখণ্ড-গর্বে গর্ভিত শিখণ্ডি-গণের গর্ব খর্ব করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুখচুসন-হেতু বাঁহার সুন্দর গণ্ডদেশ তামূল-রাগে দীর্ঘ রঞ্জিত, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি অর্চনা করি ॥ ৪ ॥

বাঁহার অন্তঃকরণ ললিতার নিশ্চল আন্তরিক স্নেহে অভিষিক্ত, বিশাখার সহিত অশেষবিধ সখ্যভাব থাকায় বাঁহার সুস্বভাব জগদ্বিখ্যাত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য প্রেমরূপ মাণিক্যের পেটিকা (পেটরা), মাধুর্য-বিনোদিনী 'সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৫ ॥

যিনি অতুল প্রভাব বৃন্দাবন-রাজ্যের অধীশ্বরী, নিখিল সময়ের অধিপতি

কার্ত্তিক মাসের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রেমসীগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা, এবং যাহার লীলা নিখিল-পাপ-হারিণী, সেই সাধুর্য্য বিনোদিনী শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ নখ-প্রাপ্তকে প্রাণের অতীষ্ট বলিয়া বোধ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণ বৈ আর কিছু যিনি জানেন না, যিনি নিখিল ব্রজ-রমণীগণের বাক্য-চাতুর্য্য-শিফার গুরু, সেই বিপুল-কীর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৭ ॥

কনক কষ-পাষণ-[কটিপাথর] ঘৃষ্ট কুঙ্কুমের স্তায় যিনি গৌরাদ্বী, যাহার শ্রীঅঙ্ক সাধুর্য্য-তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কুজবারা আলিঙ্গিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলকিত তনু হন, সুনন্দর অরুণ বর্ণ যাহার বসন, সেই কিশোরী শ্রীরাধিকাকে আমি পূজা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকার স্বরূপ, গুণ, বিভূতি-পূর্ণ এই উৎকৃষ্ট অষ্টক যিনি নিয়ত পাঠ করেন, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করেন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণব-দর্শন

দর্শন-শব্দের অর্থ ও ইহা চক্ষুর কার্য্য

দৃশ্যবস্তু-সহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। সাধারণতঃ যে-করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকার ও রূপাদির অনুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিতে চক্ষু-নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ায়ক করণের সাহায্য আবশ্যক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপ নহে। কারণরূপে চক্ষুর অতিভাবক বা চালকরূপে অপর একটী বাহ্যেন্দ্রিয়-পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শন-ক্রিয়ার কারণরূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মন কাহাকে বলে ও তাহার সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ

চক্ষুর দর্শনে বাধা নাই এমনত স্থলেও যাহার কর্তৃত্বভাবে চক্ষু কার্য্য করে না, তাহাই মন বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল একমাত্র চক্ষুর নায়ক তাহাও নহে। মনের অধীনে চক্ষুর স্তায় আরও চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তু-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য আকার ও

রূপাদি না থাকিলে, বা ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন, বৃহত্ত্ববশতঃ, অভিজাত জন্তু, আবরণ-যুক্ত হইলে, বা স্বদূরাবস্থিতি-জন্তু অনেক সময় চক্ষুর দ্বারা অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্য-বস্তুও প্রতীত হয় না।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও মানস অনুমিতি

বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়-সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞান-সংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-পতি মন, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অননুভূত বস্তুরও ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ-পন্থা ব্যতীত অনুমিতি-পন্থায় নিরাকরণ করিতে পারেন। দর্শনাদি প্রত্যক্ষ যদিও একমাত্র স্বানুভব পথ, অনুমিতি দোষ-দুষ্ট না হইলেও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষও কোন কোন সময় সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য অনুভূতি বিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেক সময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়। দর্শন-শব্দে 'দেখা' বুঝাইলেও অপরেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু-প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়।

জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

জড়বস্তু-সত্ত্বামাত্র-দর্শনকে জড় বিজ্ঞান, এবং জড়াতীত চেতনময় বস্তুসত্ত্বা-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপে বুদ্ধি বা মহত্ত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন অংশাংশীকূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কতৃ-সত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃ-শক্তি রহিত জড় এবং দ্রব্যে কতৃ-সত্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃ পোওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মনরূপে কথিত হয়।

প্রাচীন ষড়দর্শন ও পরবর্তী দশটি দর্শন

পুরাকালে ভারতে ছয়টি বিভিন্ন দর্শন, প্রসিদ্ধি লাভ করে। কপিলের সাংখ্য-দর্শন, কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, পতঞ্জলীর যোগ-দর্শন, গৌতমের জায়-দর্শন, জৈমিনীর মীমাংসা-দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্বাকের উলুক্য-দর্শন, নাকুলের পাণ্ডপত-দর্শন, রসেশ্বর-দর্শন, অর্হৎ-দর্শন, সুগত দর্শন প্রভৃতি আরও দশ প্রকার দার্শনিক মত সমূহের পরিক্যাশ্চি সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এস্থলে প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়-

গুলির তারতম্যগত গবেষণা সম্যগ্ভাবে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, আমরা তদালোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবল-মাত্র উত্তর-মীমাংসা বা ব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরম্ভবিষয়ের মূল-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে।

বেদান্ত-দর্শনের পরিচয়

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ-তাৎপর্য্য দৃষ্টার দর্শনে ধারাবাহিক প্রকৃত উপলব্ধি হইবে না বলিয়া, উপনিষৎ অবলম্বনেই ব্যাস ব্রহ্মসূত্র-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাই উত্তর-মীমাংসা, শারীরক বা বেদান্ত-দর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিক-গণের পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া আপ্ত-বাক্যকে প্রত্যক্ষ ও অহুমিতির সোদর জ্ঞানে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণপূর্বক এই মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্ম প্রণালীসমূহ ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে গঠিত।

বেদান্ত বা শারীরকের বিবিধ ভাষ্যকার

এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যা-কর্তৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার, ব্যক্তিককার দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাত্ত বোধায়ন, টক্ক, ভাকুচি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া বেদান্তাচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকেও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উদাহৃত হয়। যাদবচার্য্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষক রূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা আনন্দগিরি, সায়ন-মাধব প্রভৃতি এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতের পুষ্টি লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মসূত্রের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসাবলম্বনে নির্বিশেষ-বিশ্বাসভরে কেবলাদ্বৈত-মতের প্রসারণ ব্যতীত ব্রহ্মে সবিশেষত্ব লক্ষ্য করিবারও কয়েক শতাব্দী পূর্বে অনেক-গুলি শৈশুমী-সম্পন্ন ভগবৎ-পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা এই সবিশেষ-দর্শনের রক্ষাকর্তা ও প্রচারক। ইহারা কেবলমাত্র খণ্ড-দার্শনিক নহেন; পরন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত-পারঙ্গত। সূত্রসাং বস্তু-সম্বন্ধীয় অভিধেয় ও প্রয়োজন-দর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

জ্যোতির্বিদ্যার জড়-বৈজ্ঞানিকের আন্তি

পুরাকালে জ্যোতির্বিদগণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিত, এবং আমাদের ভূমিকেই কেন্দ্রে বরণ করিয়া সূর্য-গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও হুম্মালোচনা-ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া, তাঁহারা জানিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বক্ষে করিয়া যে মহীতল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে বুধ গ্রহ বা শুক্র গ্রহের জ্যোতিষ্ক, শুক্রগ্রহ ও কুজগ্রহের মধ্যকাশে সূর্যদেবকে প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথিবী দ্রষ্টা নিজ স্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া, যে ভ্রমজ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশ্বাস-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিক, নিজ স্থল-শরীরকেই ভোগের কেন্দ্র-জ্ঞানে ভোক্তৃত্ব বা বিষয়ত্ব বিশ্বাস করিয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব

মনোবিজ্ঞানবিদগণ জড়বিজ্ঞানেও মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থান এবং দ্রষ্টা মনশ্চক্ষে জড়কে দৃশ্য স্থানীয় জানিয়া অস্বাভাবিক অবলোকন করিতেছেন। জড়, মনকে দেখেন না বুঝিতেছেন, মনই জড়কে দেখে, এই প্রতীতি তাঁহার প্রবল হইতেছে। মনন শক্তির অভাবে জড়ে চক্ষুর ভ্রমোপাদান মাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শন শক্তি-রহিত ভ্রমোপাদান, মনকে বা স্বচক্ষুকে দেখিতে পায় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণের দার্শনিক বিচার আন্তিময়

জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস, অজ্ঞেয়তাবাদী এগ্‌নস্টিক হাঙ্কলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্টিকগণ, দিব্যজ্ঞান-বাদী হেগেল, মপেনহুয়ার ও ক্যান্ট প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সফ্রেটিস্, প্লেটো, এপ্লাটন, প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক সমূহ এবং অস্বদেশীর দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সেবায় জীবনোতিবাহিত করিয়াছেন, এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক কৈরুণ্যে বস্তুর দর্শন করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোময় 'অভিজ্ঞতাকে বহুমানন' বা চিন্তাশ্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে আন্তিময় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

জীবের অধিকার অনুযায়ী দার্শনিক দৃষ্টি

এক প্রকার দৃষ্টি অন্তের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানাপ্রকার বিবদমান দর্শন সমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিতেছেন। যাহার চিত্তবৃত্তিরূপ আবাসস্থলী যে দার্শনিকের গৃহের সন্নিকট, তিনি পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষীগণের মত তাহাকে দর্শন-রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময় ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাহারা দার্শনিক মণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাহাদের যোগ্যতারূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজের ক্ষুদ্র বিপণীকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

প্রাচীন জ্যোতিষীগণের বিচার ভ্রান্তির ক্রায় নির্বিশেষ

মায়াবাদ ও ভ্রান্তিময়

যেদূর জ্যোতিষীগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্তান্ত সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, যেদূর মানবগণ পুরাকালে আমাদের শারীরিক আধারকেই সকল অদ্বৈতবের মধ্যবর্তী মনে করিতেন, সেদূর দার্শনিকগণ ও প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশে দ্রষ্টাকেই আত্মা বা বাবতীয় বস্তু-কেন্দ্র জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনেও অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছিল। বেদান্ত বলিলেই কেবলাবৈত-বাদ, জীবৈক্য-বাদ, জড়-চিদৈক্য-বাদ, বিবর্ত-বাদ, নিঃশক্তিক-বাদ, ব্যতিরেক-বাদ, নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদ, নির্বিশেষ-বাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতসমূহ উদার বিশ্বজনীন বিচার পুষ্ট বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রার্থীর নয়নাবরণ করিয়াছিল।

শঙ্কর-দর্শন আলোচনায় সময়-ক্ষেপমাত্র এবং

উহা সত্যের আচ্ছাদক

সবিশেষ অল্পভূতি, বিশিষ্টাবৈত, শুদ্ধবৈত, শুদ্ধাবৈত ও বৈতাবৈত প্রভৃতি বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অসংখ্য চেষ্টা ও সঙ্কীর্ণতা উদার বিশ্ব-জনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপর্যয় করিয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অল্পায়ু কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারণ্য ভারতীর শেবদশা, পর্য্যন্ত কেবলাবৈত বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা প্রতিপাদন, জগতের নিখাদ্ব প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান-সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অব্যক্ত দেশ কালাদিকে পূর্ণ বস্তুত্ব স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয় বিবেকাতাবে বস্তুকে নীরসতার আধার বলিয়া স্থাপন প্রমাদে জগতের বৃথা কালক্ষেপ মাত্র হইয়াছে। বস্তুদর্শনের ছলনায়

অংশিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি কার্যাত্তরে ব্যাপৃত থাকায় পরম-সত্য-দর্শন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনোবিগণ 'বেদান্ত' দর্শন করিয়া জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও, দ্রষ্টা, ভোক্তা বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, আশ্রয়, ভোগ্য-রূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করার পরম সত্য হইতে দূরে অবস্থিত।

অপরোক্ষ-পন্থায় বৈষ্ণবদর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন-শিরোমণি

এই পরম সত্য-দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্য শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই। জড় হইতে প্রত্যক্ষ-পন্থায় ও পরোক্ষ-পন্থায় বস্তু-নির্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ-পন্থার মহিমা একমাত্র বৈষ্ণব দর্শনেই নিহিত আছে। বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব-দর্শন-শিরোমণি এবং যাবতীয় দার্শনিক তথ্য তাহাতেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আপেক্ষিকতায় সত্য অদৃশ্য এবং নিরপেক্ষ সত্যই বৈষ্ণবদর্শন

আপেক্ষিক অস্মিতা, আপেক্ষিক কৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের সহায়তায়, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তু সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে গেলে পরম সত্যবস্তু দর্শন ঘটে না—ইহা প্রত্যেক দ্রষ্টা বস্তু-দর্শনকালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে, বস্তু হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞান-প্রতীতিতে বস্তু-দর্শনে ব্যস্ত তাঁহারা মায়াবাদী বৈদান্তিক; আর যাহারা মায়াবাদীর দাস্ত-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন, কিন্তু অখণ্ড পরম সত্য, অবিমিশ্র পূর্ণ চিৎ ও অরূপাদেয়-রহিত ঘনানন্দের অদ্বয়-জ্ঞান। (ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

বাউল-মতের বিচার

বাউলদের সম্বন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন

কাকিনোয়া নিবাসী শ্রীযুত রাধিকানাথ রায় মহাশয় আমা-রিগকে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা যথান্যায় নিম্নে প্রত্যুত্তর সহ লিখিতেছি।

- (১) বর্তমান বাউল-ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ও ইহার প্রবর্তক কে ?
- (২) স্বকীয়া ও পরকীয়া সাধন প্রণালী কিরূপ ? রসাশ্রয় ও ভাবাশ্রয় কাহাকে বলে ?
- (৩) রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী, জয়দেব, বিদ্যাপতি, বিশ্বমঙ্গল, মিরাবাই, পদ্মাদেবী, লক্ষ্মীবাই, চিত্তামণি প্রভৃতি মহাজনগণ এইরূপ আশ্রয় অবলম্বন ও লীলালুকরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন কি না ?
- (৪) শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বুঝিবার দোষে যদি এইরূপ ধর্ম প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তবে সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ কি ?
- (৫) স্বরূপ দামোদর ও মিরাবাইয়ের এই পন্থা বিষয়ক কড়চার সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের কি মত ?

বাউল-মত সর্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ

বাউল-ধর্ম যে আকারে বর্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলেরা কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করেন না। রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। বস্তুত রাগানুগা ভক্তি অতিশয় পবিত্র। তাহাতে লেশমাত্র জড়ীয় ব্যাপার নাই। আত্মার অপ্ৰাকৃত রস ও ভাব অবলম্বনপূর্বক ঐ ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্বের বিবরণ এই পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রদত্ত হইবে। বাউলদিগের অসং প্রথা অনেকদিন হইতে প্রচলিত। ঐ প্রথার প্রবর্তক যে কে,—তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখন শ্রীসনাতন গোস্বামী ও কখন শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুত তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কুপ্রথা শিক্ষা দেন না।

বাউলেরা রায় রামানন্দ প্রভৃতির শ্রীচরণে অপরাধী

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আপাতত লিখিত হইল না ; কেন না, অতি শীঘ্রই স্বকীয়া পারকীয়া তত্ত্ববিচার অবলম্বন পূর্বক একটা স্মরণ্য প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে—রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ বিশুদ্ধ রাগমার্গে ভজন করিয়াছেন। কখনই বাউল মতের রসাশ্রয়, ভাবাশ্রয়াদি করেন নাই। বাউলেরা নানা ছলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করত তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইয়া থাকে।

বাউলেরা কু-প্রবৃত্তি-শালী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাউল মত শাস্ত্রসিদ্ধ নয় । কতকগুলি কু-প্রবৃত্তিশালী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোক শাস্ত্রের কোন কোন স্থলের কদর্থ করিয়া তাহাদের সুখজনক একটি কল্পিত মত সৃষ্টি করিয়াছে । বাউলেরা শাস্ত্রের কোন বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে চরিতামৃতের কোন কোন পদ্যাংশ ধরিয়া নিজ-মতের প্রতিষ্ঠা করে । সেই সেই অংশ যদি আমাদের নিকট দেখান হয়, তবে আমরা বিতর্কার্থ প্রচার করিতে পারি ।

বাউলের কড়চাষয় স্থণিত ও স্ত্রীলোকদিগকে

কুপথে আনার জন্য কল্পিত

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে-দুইটি কড়চা রায় মহাশয় পাঠাইয়াছেন তাহা নিতান্ত স্থণিত । বাউলেরা ঐ সকল কড়চা রচনা করিয়া দুর্বল হৃদয় মূর্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে লইয়া যায় । আমরা স্বরূপ-দামোদরের কড়চা অল্পসন্ধান করিতে করিতে ঐ প্রকার অনেক কৃত্রিম পুস্তক পাইয়াছি । সে সমস্তই হেয় । বস্তুত স্বরূপ-দামোদরের কড়চা পাওয়া যায় না ।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পঞ্চক (৬)

(ক)

প্রভুপাদ !

আপন করম দোষে,

পড়ে'ছি শমন ঘোষে,

নাহি প্রভু ! আমার নিস্তার ।

আমার অনর্থ রাশি,

কুজাটিকা রূপে আসি,

‘নাম’-সূর্য্য ঢাকে বারম্বার ॥ ১ ॥

নানাদেবে পূজাকরি,

কর্ম্ম-মার্গে ভ্রমে' মরি,

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ ভাবি নাই ।

দুর্ভমায়ী জড়াশ্রেয়ে,

আছি যে অজ্ঞান হ'য়ে,

(নিজ) চিৎস্বরূপ ভুলিয়াছি তাই ॥ ২ ॥

অসতৃষ্ণা সদা হুদে, দৌর্বল্যের অপরাধে,
স্বভঃসিদ্ধ 'নামে' নাহি রুচি ।

সম্বন্ধ ভেদের জ্ঞান, চিতে নাহি লয় স্থান,
তাই মায়া কারাগারে পচি ॥ ৩ ॥

তোমার চরণ ধরি, সচাই কাকুতি করি,
দণ্ড দিয়ে কর প্রতিকার ।

তুমি প্রভু দয়াময়, কাঁদিয়া গোপাল কর,
মুক্তকর মায়া কারাগার ॥ ৪ ॥

(২)

প্রভুপাদ !

(আমি) ভক্তিবৈরী মায়াবাদী, ইহী মহা অপরাধী,
'নাম' নাহি করি উচ্চারণ ।

'নাম'-ভব নাহি জানি, 'নাম'কে অনিত্য মানি,
তাই মোর হ'য়েছে পতন ॥ ১ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-কামী, প্রেম-তর নাহি জানি,
তাজিয়াছি সচ্চিৎ আনন্দ ।

রতিমূলা শ্রদ্ধাভাবে, (নাম) নাহি হয় শুদ্ধভাবে,
ভুলিয়াছি জ্ঞান মুসম্বন্ধ ॥ ২ ॥

যুরে মরি দেবীধামে, নিত্যসিদ্ধ 'কৃষ্ণ-নামে',
অনিত্য সাধন বুদ্ধি করি ।

'নামের' মহিমা নাশি, দুঃখের সাগরে ভাসি,
নিত্য মহা অপরাধে মরি ॥ ৩ ॥

কোটি কোটি জন্মে তাই, আমার উদ্ধার নাই,
প্রভু তব অনুকম্পা বই ।

পাদধন্দে এ গোপালে, টানিয়া লওহে বলে,
দীনের প্রার্থনা প্রভু এই ॥ ৪ ॥

(গ)

প্রভুপাদ !

অহং মম বুদ্ধি দোষে, কুবাসনা হৃদে পু'ষে,
'কৃষ্ণনামে' নাহি পাই প্রীতি ।

ধর্ম্মধ্বজী-শঠ আমি, বৃথা এই ভবে ভ্রমি,
কর্ম্মফলে দুঃখ পাই অতি ॥ ১ ॥

ভক্তিলতা-প্রেমফল, সুদুর্লভ সুনির্ম্মল,
তাহে মোর চিত্ত নাহি ভায় ।

পরম মঙ্গল ত্যজি, দশ অপরাধে মজি,
পাপম্পৃহা সতত বাড়য় ॥ ২ ॥

রূপানুগ হরিদাস— সঙ্গে নাহি করি বাস,
শ্রেষ্ঠরসহীন মোর চিত্ত ।

হরিকথা মহোৎসবে— ত্যজি' মত্ত ভোগোৎসবে,
জন্দের নিকৃষ্ট রসে মত্ত ॥ ৩ ॥

হরি-শাস্ত্র হরি-ক্ষেত্র, না হেরে এ পাপনেত্র,
হরি-দিনে কুসঙ্গে মগন ।

এদীনে গোপাল দাসে, টানি' লহ ধরি কেশে,
'দেহ শিরে ওরাসা চরণ ॥ ৪ ॥

(ঘ)

প্রভুপাদ !

অনিত্য সংসার ধর্ম্মে, মত্ত হ'য়ে মর্ম্মে মর্ম্মে,
কত দুঃখ পায় এই দীন ।

দেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মন, মোহযুক্ত অনুক্ষণ,
হইয়াছি রিপুর অধীন ॥ ১ ॥

রক্ত-মাংস এই দেহ, ইহাতে অধিক মোহ,
চিদানন্দ-রসেতে বঞ্চিত ।

পর-নারী দরশনে, কুবাসনা জাগে মনে,
(চিত্তে) হইয়াছে কলুষ সঞ্চিত ॥ ২ ॥

হরিনাম নিত্যধর্ম্য, ত্যজি এই মুখ্য কর্ম্য,
মায়াবদ্ধ হইয়াছি হায় ।

‘অবিদ্যা আসিয়া হায়, ‘নাম’-ধর্ম্মে বাধা দেয়,
বৈকুণ্ঠের পথরুদ্ধ তায় ॥ ৩ ॥

মায়ায় মোহিত হঞা, তবপদ পাশরিয়া,
ভবান্বে হাবুড়বু খাই ।

রক্ষ প্রভু এ গোপালে, ভাসি আমি এ অকূলে,
পরিতাপ সদা বড় পাই ॥ ৪ ॥

(৬)

প্রভুপাদ !

আমি হীন ক্ষুদ্র অতি, বিষয়েতে লুপ্ত মতি,
অহৈতুকী রূপাতে বঞ্চিত ।

কৃষ্ণ-সেবা নাহি করি, জীবন যাপন করি,
ভবকূপে হয়ে’ছি পতিত ॥ ১ ॥

শাস্ত্রযুক্তি পরিহারি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
বাড়ায়েছি আপন-জঞ্জাল ।

মত্ত জড় অভিমানে, জড়দেহ সংরক্ষণে,
ক্ষয় করি মহামূল্য কাল ॥ ২ ॥

নাহি আমি নিক্ষিপ্তন, নাহি হৃদে ভক্তি-ধন,
নাহি ভজি শ্রীকৃষ্ণ চরণ ।

বিষয়েতে মত্ত হ’য়ে, সাধু-সেবা না করিয়ে,
নাহি করি ‘নাম’ সংকীৰ্ত্তন ॥ ৪ ॥

ধরি তব শ্রীচরণ, কৈলু আত্মনিবেদন,
রক্ষাকর এ দীন গোপালে ।

এই দেবীধামে এসে, আপনার কর্ম্ম দোষে,
(যেন) বদ্ধ নাহি হই মায়াজালে ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

শঙ্করের পরবর্ত্তি সহস্র বর্ষের মায়াবাদ “শঙ্করের প্রভাব”

ভক্তাবতার শঙ্কর হইতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত আনুমানিক ১০০০ (সহস্র) বৎসরকাল মায়াবাদের অবস্থা এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। বুদ্ধের তিব্বত অবৈদিক শূন্যবাদ শঙ্করাবির্ভাবে তাহার বৈদিক শঙ্করাবরণে আশু মধুর বলিয়া মনে হওয়ায় লোক-সমাজে উহার বেশ আদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যক্ষভাবে সমূলে উৎসাদন হইলেন জনসমাজ নিজদিগকে বৌদ্ধ না বলিয়া ‘হিন্দু’ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আজও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ ‘হিন্দুধর্ম’ বলিতে শঙ্করের প্রচারিত মতকেই হিন্দুমত মনে করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা হউক, শঙ্করাবির্ভাবের ইহাই সুফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু ‘বাস্তব হিন্দুধর্ম’ বলিতে অচিন্ত্য-দ্বৈতাত্মত-সিদ্ধান্তপর ভগবানের নিত্য সেবাকেই প্রকৃত-বাস্তব হিন্দু-ধর্ম বলা হইয়া থাকে।

এই সহস্র বৎসর মায়াবাদ যে কি প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগ্নশিরে, নগ্নদেহে বাস করিতেছিল, তাহারই পরিচয় দিতেছি।

যাদব প্রকাশ

পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বাচস্পতিগিপ্র প্রভৃতি মায়াবাদিগণের পরে, কাঞ্চীনগরের যাদবপ্রকাশই মায়াবাদিগণের মধ্যে সর্ব প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। যামুনা-চার্য্যের এই সময়ে বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া যাদবপ্রকাশ তাঁহার সহিত সম্মুখ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যামুন-মুনির শিষ্য। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া শঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করেন এবং ‘কপ্যাস’-শ্রুতির যাদবীয় ব্যাখ্যার খণ্ডন করেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের এই প্রকার প্রতিভা দর্শন করিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিলেন। যাদব-প্রকাশ তাঁহার জীবন নাশ করার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতেছে জানিয়াও আচার্য্য রামানুজ তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করতঃ তাঁহার

চিন্তাবৃত্তির সংশোধন করেন। শঙ্কর-জীবনে ইহার অনুরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও অভিনব গুপ্তের প্রতি তিনি কৃপা না করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিয়া-ছিলেন। শ্রীম রামানুজের চরিত্র এই সম্পর্কে শঙ্করের তুলনায় পরম মাধুর্য্যময়। তিনি তাঁহার প্রাণনাশোद्यোগী যাদবপ্রকাশকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করায় আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভক্তের মহিমা সর্বত্রই এইরূপভাবে প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছে। মার্যাবাদ তৎকালে রামানুজ-হন্তে বিনষ্ট হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্বত্র ঘোষিত হইতে থাকে।

শ্রীধরস্বামী

শ্রীধরস্বামী গুজরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহার কাল সম্বন্ধে যাহা অনুমান করেন, তাহা আদৌ সত্য বলিয়া মনে হয় না। মধ্বমুনি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই শঙ্করগণ তাঁহাকে মধ্বের পরে বলিয়া স্থির করিতে চাহেন। কেবলমাত্র মধ্ব শ্রীধরের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই শ্রীধর মধ্বের পরে হইবেন—ইহা ঠিক বিচার নহে। আচার্য্য শ্রীধর স্বামী বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতির কোন ভাষ্য রচনা না করার মধ্ব তাঁহার কথা উল্লেখ করেন নাই; নতুবা তিনি শ্রীধরের কথা নিশ্চই উল্লেখ করিতেন। শ্রীধর কেবলমাত্র শঙ্করের নাম তাঁহার গীতাভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি শঙ্করের পরবর্তী ও মধ্বের পূর্ববর্তী বলিয়াই মনে হয়। রামানুজ প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকা করিয়াছেন। রামানুজ উক্ত টীকার সন্ধান পাইলে তাহার উল্লেখ করিতেন এবং তাহা তিনি প্রমাণস্বরূপও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু রামানুজ কোথাও শ্রীধর স্বামীর নাম উল্লেখ করেন নাই এবং শ্রীধরস্বামীও আচার্য্য রামানুজের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। তাহার দ্বারা শ্রীধরস্বামী আচার্য্য রামানুজের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহা স্থির করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক তিনি রামানুজের পূর্বে বা পরেই হউক মার্যাবাদী অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে আজও ‘টানাটানি’ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত রাখিতে চান। কারণ শ্রীধরস্বামী পূর্বে কোন অদ্বৈতবাদীর সঙ্গ প্রভাবে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহার লিখিত টীকা সমূহ হইতেও তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। পরমানন্দ তীর্থ নামক জনৈক

সিংহ-উপাসক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তখন শুদ্ধাঐতবাদের প্রচারক ছিলেন। শুদ্ধা-ঐতবাদের আদি আচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী শঙ্করাবর্ত্তাবের বহুকাল পূর্বে অবস্থিত ছিলেন। তিনি ‘আদিবিষ্ণুস্বামী’ বলিয়াও জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। পরমানন্দ তীর্থের কৃপায় শ্রীধরস্বামী শুদ্ধাঐতবাদ আশ্রয় করেন এবং শুদ্ধজ্ঞানে প্রকৃত মোক্ষের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মোক্ষের উপায় ও উপায়, তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি গীতার টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

“শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বচনাত্তেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষ-হেতুরিতি সিদ্ধম্। * * * * পরমানন্দ-শ্রীপাদাজ-রজঃশ্রী-ধারিণাধুনা শ্রীধরস্বামি-যতিনা কৃত্য গীতা-সুবোধিনী।”

শ্রীধরস্বামীপাদ মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তাঁহারা কি তাঁহার উক্ত গীতার সিদ্ধান্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন? যদি না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর মায়াবাদী শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা কেন?

স্বামীপাদের গীতার টীকা-প্রকাশ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাঠকবর্গের কোতুহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদা শ্রীধরস্বামী তীর্থ পর্য্যটনের পর কাশীধামে উপস্থিত হইয়া গীতার টীকা রচনা করেন। ঐ টীকোক্ত বিচার দেখিয়া অঐতবাদী মায়াবাদিগণ নানা প্রকার আপত্তি তুলিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিবার যত্ন করেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেও তাহারা শ্রীধরস্বামীর ‘সুবোধিনী টীকা’ গোড়ামীবশতঃ মানিয়া লইতে স্বীকার করেন নাই। তৎপর বৈষ্ণবপ্রেষ্ঠ শঙ্কু অর্থাৎ কাশীর বিশ্বনাথের নিকট সকলে একত্রিত হইয়া মীমাংসা প্রার্থনা করিলে বিশ্বনাথ পণ্ডিতগণকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

“অহং বেত্তি* শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।

শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ ॥”

উক্ত শ্লোকের দ্বারা জানা যায় শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী অঐতবাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে পরমানন্দ তীর্থ কর্তৃক শ্রীধরস্বামীর এবং শ্রীধরস্বামী কর্তৃক অত্যান্ত মায়াবাদিগণের পরাভব হইয়াছিল।

“বিষমঙ্গল”

বিষমঙ্গলের পূর্বনাম কাহারও কাহারও মতে শিহলন মিশ্র বা

* ‘বেত্তি’ এস্থলে আর্ষ-প্রয়োগ। ‘বেত্তি’ ইহার শুদ্ধ পাঠ।

চিংসুখাচার্য্য। বল্লভ-দিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে অষ্টম শক-শতাব্দী বিল্বমঙ্গলের উদয় কাল। ইনি পূর্বজীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন ; কিন্তু পরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডবৈষ্ণব গ্রহণ করেন। শঙ্কর সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠের তালিকায় চিংসুখাচার্য্য (কল্যাদ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। বল্লভ-দিগ্বিজয়ের মতে বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-প্রতিষ্ঠাতা রাজবিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং ৭ শত (?) বৎসর বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার নাম ‘লীলাশুক’ হয়। বিল্বমঙ্গল কিভাবে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন, তাহা তিনি স্বরচিত একটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

“অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাশ্রাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধু-বিটেন ॥”

অর্থাৎ অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণের দ্বারা উপাশ্র এবং আত্মানন্দের সিংহাসনে আরুঢ় হইয়াও আমি গোপী-লম্পট, কোনও শঠ কৃষ্ণের দ্বারা বলপূর্বক তাঁহার দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতন

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩র্থ সংখ্যা, ১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

চন্দ্রশেখর গৃহে-সনাতন গোস্বামী ও মহাপ্রভু

সনাতন গোস্বামী কাশীধামে উপনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখর-ভবনে অবস্থান করিতেছেন। সনাতন গোস্বামী চন্দ্রশেখর গৃহে উপস্থিত হইয়া, দ্বারদেশে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির শ্রীচরণ দর্শন লালসায় দ্বারে বসিয়াই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সর্বাস্তুর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া, চন্দ্রশেখরকে আদেশ করিলেন—“চন্দ্রশেখর ! তোমার দ্বারে একজন বৈষ্ণব উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।” চন্দ্রশেখর দ্বারে আসিয়া সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ ও লম্বমান শ্মশ্রু সমূহ-দ্বারা মুখ-মণ্ডল আবৃত থাকায়, তাঁহাকে একজন দরবেশ মনে করিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করিলেন না। এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে বলিলেন—“দ্বারে

কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না।” শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন—
 “দ্বারে কোন ব্যক্তিকেই কি দেখিতে পাও নাই?” চন্দ্রশেখর বলিলেন—
 “হাঁ, একজন দরবেশ বসিয়া কাহারো প্রতীক্ষা করিতেছে।” প্রভু বলিলেন—
 “তুমি ঐ দরবেশকেই আমার নিকট লইয়া আইস।”—

চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি’ দ্বারেতে বসিলা ।
 মহাপ্রভু জানি’ চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥
 ‘দ্বারে এক ‘বৈষ্ণব’ হয়, বোলাহ তাহারে’ ।
 চন্দ্রশেখর দেখে, ‘বৈষ্ণব’ নাহিক দ্বারে ॥
 ‘দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি’—প্রভুরে কহিল ।
 ‘কেহ হয়’ করি’ প্রভু তাহারে পুছিল ॥
 তেঁহো কহে—এক ‘দরবেশ’ আছে দ্বারে ।
 ‘তাঁরে আন’ প্রভুর বাক্যে কহিল আসি’ তাঁরে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/৪৬-৪৯)

যিনি ক্রমোদ্ভূত তৃপ্তি কামনায় দশেন্দ্রিয় নিযুক্ত রাখেন তিনিই বৈষ্ণব ।
 অধোক্ষজ বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণও অধোক্ষজ । তাঁহাকে অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা
 বুঝিয়া লইবার চেষ্টা বুঝা, চন্দ্রশেখর দ্বারা দর্শনীয় ও জড় মনের গ্রাহ্য নহে ।
 প্রভু-পার্বদ চন্দ্রশেখরের এইপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা কিছুতেই সম্ভব নহে । যেমন
 শ্রীকৃষ্ণ নিজ পার্বদ অর্জুনের দ্বারা ভ্রান্তির অভিনয় করাইয়া জড় জগতবাসী
 জীববৃন্দের মঙ্গল বিধান করিবার ইচ্ছায়, অর্জুনকে হিতোপদেশ করিয়াছিলেন,
 তদ্রূপ, শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিও এই লীলা দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে—বৈষ্ণব
 কখনও জড়-মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন । স্বপ্রকাশ বস্তু সূর্য্য রাত্তিকালে
 লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে দর্শন করিবার অভিপ্রায় যেমন মূর্ত্তার পরিচায়ক,
 সেইরূপ স্বপ্রকাশ বস্তু বৈষ্ণবকে জড়েন্দ্রিয় দ্বারা জানিয়া লওয়ার চেষ্টাও এক
 প্রকার মূর্ত্ততা । “বৈষ্ণবের জীভা-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায় ।” যিনি যত পরিমাণে
 সেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া যতটুকু বৈষ্ণবতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার
 নিকট তত পরিমাণেই বৈষ্ণবী শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে । অবৈষ্ণবদিগের
 বৈষ্ণব দর্শন, অন্ধের দর্পনে প্রতিবিম্ব দর্শনের ত্যায়ই হইয়া থাকে ।

“বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শক্তি ।” গুণময় দেবতাগণও, নিগুণ
 বস্তু বৈষ্ণব তত্ত্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহেন । বৈষ্ণব কখনও জড়েন্দ্রিয়ের
 গ্রাহ্য বস্তু নহেন । প্রভুর আদেশ পাইয়া চন্দ্রশেখর পুনর্বার যাইয়া সনাতন
 গোস্বামীকে প্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন ।

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধারণা আইলা ।
 তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
 প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন ।
 'মোরে না ছুঁইহ' কহে গদ্যাদ-বচন ॥
 ছুঁইজনে গলাগলি রোদন অপার ।
 দেখি চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ।
 তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেল ।
 পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥
 শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সন্মার্জন ।
 তিহোঁ কহে,—'মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥
 প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে !
 ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৫১—৫৬)

সনাতন গোস্বামীকে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ভিতরাজনে প্রবেশ করিতেছেন
 দেখিবামাত্রই, মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । ভক্ত ও
 ভগবান্ উভয়ের স্পর্শে উভয়েই প্রেমাবিষ্ট হইলেন । সনাতন গোস্বামী কাতর
 কণ্ঠে, দৈন্ত্যভরে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—“প্রভো! তুমি আমাকে স্পর্শ
 করিও না । হীন-সঙ্গ-প্রভাবে আমার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে । আমি তোমার
 স্পর্শ যোগ্য নহি ।” হরিকীর্তনকারী সর্বক্ষণ নিজকে ভূণের ভ্রাতা হীন বলিয়াই
 জ্ঞান করেন । শ্রীমন্নহাপ্রভু সনাতনের দৈন্ত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দের
 সহিত তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । একজন দরবেশকে
 আলিঙ্গন করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন—দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চমৎকার
 বোধ হইল । মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে লইয়া নিজ আসনের পাশ্বে বসাইয়া
 তাঁহার কারা-মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্নহাপ্রভুর
 শ্রীচরণ সমীপে কারামুক্তির অষ্টোপান্ত সকল কথাই নিবেদন করিলেন ।
 প্রভু সে সমস্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দ চিত্তে সনাতনকে বলিতে লাগিলেন—

এত কহি কহে প্রভু,—‘শুন, সনাতন ।

কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥

মহা-রৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার ।

কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গন্তীর অপার ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৬২-৬৩)

অনন্তর প্রভু সনাতনকে বলিলেন—হে সনাতন ! তোমার অমুজ্জ্বলের সহিত প্রয়াগে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছে । তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবিধ প্রেমালাপের পর মহাপ্রভু তপন-মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত সনাতন গোস্বামীর পরিচয় করাইয়া দিলেন । তপন-মিশ্র সনাতনের পরিচয় জানিয়া আনন্দিত হইলেন ও সনাতন গোস্বামীকে নিমন্ত্ৰণ করিলেন ।

উপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্ৰণ ।

প্রভু কহে,—‘ক্ষৌর করাহ, বাহ, সনাতন ॥

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা ।

‘এই বেষ দূর কর, বাহ ইহাঁরে লঞা ॥

ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।

শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥

সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।

জুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ (টৈঃ চঃ মঃ ২০।৬৮-৭১)

চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর আদেশানুসারে সনাতন গোস্বামীকে ক্ষৌরকাব্য লম্পার করাইয়া গঙ্গাস্নান করাইলেন ও একখানি নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন । সনাতন গোস্বামী নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন । তপনমিশ্র সনাতন গোস্বামীর অভিমত জ্ঞাত হইয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র তাঁহাকে দান করিলেন । সনাতন গোস্বামী ঐ বস্ত্রখানি গ্রহণ করিলেন । সনাতন গোস্বামী তপনমিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর শেষার প্রাপ্ত হইয়া সেই দিবস অতিবাহিত করিলেন ।

পরদিন প্রভু স্বয়ং সনাতন গোস্বামীকে মহারাত্রীর বিপ্রেয় সঙ্গে পরিচয় করাইয়াছিলেন ।

সেই বিপ্র তাঁরে কৈলা, মহা-নিমন্ত্ৰণে ॥

‘সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা ।

তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥’

সনাতন কহে,—‘আমি মাধুকরী করিব ।

ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ?

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।

ভোট কখন পানে প্রভু চাহে বার বার ॥

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ।

ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥

এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।

এক গৌড়িয়া দিয়াছে কাঁথা ধুঞা শুকাইতে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৯-৮৪)

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র সনাতন গোস্বামীর পরিচয় পাইয়া সানন্দচিত্তে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা করাইলেন । তিনি আরও নিবেদন জানাইলেন—“সনাতন, তুমি যতদিন কাশীধামে থাকিবে, ততদিন আমার গৃহে ভিক্ষা করিয়া এদীন সেবককে অনুগ্রহীত করিবে ।” সনাতন গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—“হে বিপ্র ! আমি একত্রে স্থল ভিক্ষা লইতে ইচ্ছুক নহি, মধুকর-বৃন্তি অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব, মনস্থ করিয়াছি ।” সনাতন গোস্বামীর কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আনন্দ পাইলেন বটে, কিন্তু সনাতন গোস্বামীর গায়ে, গ্রাম্য সম্বন্ধে ভগ্নিপতি শ্রীকান্তের প্রদত্ত ভোট কঞ্চলখানির প্রতি বারবার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মুখে কোন কথাই বলিলেন না । সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভোট-কঞ্চলখানি ত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন । তিনি মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন—কোন একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব একখানি জীর্ণ কাঁথা গঙ্গার জলে ধুইয়া শুকাইতেছেন । সনাতন গোস্বামী তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন,—

তারে কহে,—‘ওরে ভাই, কর উপকারে ।

এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ’ মোরে ॥’

সেই কহে,—‘রহস্ত কর প্রামাণিক হঞা ?

বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা ?’

তঁহো কহে,—‘রহস্ত নহে, কহি সত্যবাণী ।

ভোট লহ, তুমি দেহ’ মোরে কাঁথাখানি ॥’

এত বলি’ কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।

গোসাঞির ঠাই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৮৫-৮৮)

ওহে ভাই ! আপনি আমার কঞ্চলটি গ্রহণ করিয়া আপনার কাঁথাখানি আমাকে প্রদান করুন, আমি তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইব । বৈষ্ণব

ভাবিলেন সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে উপহাস করিতেছেন। এই ভাবিয়া সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন আপনি প্রবান লোক হইয়া আমাকে উপহাস করিতেছেন কেন? উত্তরে সনাতন কহিলেন—আমি ইহা সত্য সত্যই বলিতেছি, উপহাস করিতেছি না। এই বলিয়া কঞ্চলখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া কাঁথাখানি গলায় জড়াইয়া লইলেন। সনাতন গোস্বামী ঐ কাঁথা গান্ন দিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রভু বলিলেন—সনাতন! তোমার বহুমূল্য কঞ্চলখানি কোথায় গেল? সনাতন গোস্বামী কঞ্চল ত্যাগের বৃত্তান্ত প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—

প্রভু কহে,—‘ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ সে তোমার ॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি’ সন্দেশ না রাখে শেষ রোগ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম-হানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯০-৯২)

মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর শ্রীহরি-সেবামূল্যে নিজের ভোগ-ত্যাগ দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে সনাতন! কৃষ্ণ তোমার বিষয়-রোগ খণ্ডাইয়া অবশিষ্ট রাখিবেন কেন? সন্দেশ বা সূচিকিৎসকগণ রোগের অবশিষ্ট রাখিয়া চিকিৎসা করেন না। তাহা ছাড়াও তিন মুদ্রার কঞ্চল গায়ে দিয়া মাধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে, লোকে তোমাকে উপহাস করিবে। উপহাসকারীগণ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইবে, তাহাতে তাহাদের ধর্মের হানি হইয়া যাইবে। প্রামাণিক ব্যক্তিগণের আচরণাদি অনুসরণ করাই মায়াবদ্ধ জীবগণের আত্মোন্নতির সোপান। শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকেও লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীঃ ৩।২১)

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর সাধারণ ব্যক্তিসকল অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলেন, সকলে তাহাতেই অনুবর্ত্ত হয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি বেদান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীকেশবাচার্য্যষ্টকম্

নমঃ তুং বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহ-রূপিণে ।

শ্রীশ্রীমত্তত্তি-প্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥ ১ ॥

শ্রীসরস্বত্যভীষিতং সর্বথা সূচু-পালিনে ।

শ্রীসরস্বত্যভিনায় পতিতোক্লার-কারিণে ॥ ২ ॥

বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-পালিনে ।

সত্যস্বার্থে নির্ভীকায় কুসঙ্গ-পরিহারিণে ॥ ৩ ॥

অভিমত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।

জীব-দুঃখে সদাভ্যায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুপাদ-প্রকাশায় কৃষ্ণ-কামৈক-চারিণে ।

গৌর-চিন্তা-নিমগ্নায় শ্রীগুরুং হৃদি ধারিণে ॥ ৫ ॥

বিশ্বং বিষ্ণুময়মিতি স্নিগ্ধ-দর্শন-শালিনে ।

নমস্তে গুরু-দেবায় কৃষ্ণ-বৈভব-রূপিণে ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ ।

শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধামঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে ॥ ৭ ॥

নবদ্বীপ-পারিক্রমা যেনৈব রক্ষিতা সদা ।

দীনং প্রতি দয়ালবে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥

দেহি মে তব শক্তিস্তু দীনেনেয়ং সূচ্যচিতা ।

তব পাদ-সরোজেভ্যো মতিরস্তু প্রধাবিতা ॥ ৯ ॥

সেবকাভিমানিনা

—ত্রিদণ্ডভিক্ষুণা শ্রীভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রমেন

শ্রীদ্ধ মত-বিবেক

(এক)

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অধিকারী ও কৃচি ভেদে সাধন বৈষম্য থাকিলেও সেই বেদাগমপর এক তত্ত্ব-বস্তুকেই বিভিন্নরূপে ব্যক্ত করা বেদ ও বেদান্তগ সকল শাস্ত্রের সম্মিলিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই ঐক্যতান বাদনের মধুর ধ্বনি যাহার প্রবণে পৌঁছেনা, তিনিই মূল কেন্দ্র হইতে দূরত্ব বা নৈকট্যের বৈষম্য অনুসারে একই তত্ত্বের বিভিন্ন অসম্যক উপলব্ধি-হেতু পরমত অসহিষ্ণু হইয়া বাগ্‌বিতণ্ডার প্রবৃত্ত হন।

কফ, পিত্ত ও বায়ু এই দোষ-ত্রয় অনন্ত রোগের কারণ এবং ইহাদের প্রশমন হেতু বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে। এই ত্রিদোষের সাম্য-ভাব স্থাপনে স্বাস্থ্য-সুখ দান যেমন সকল চিকিৎসা-বিধানের উদ্দেশ্য; সেইরূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ নাশ পূর্বক প্রকৃত আনন্দ দানই শাস্ত্রাদির মূলভূত কারণ ও উদ্দেশ্য। তবে রজস্তম গুণের আধিক্য আমাদের বিষয়-ভ্রম বা ভোগাশক্তি প্রবল থাকায়, অজ্ঞানাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্লেশকর কর্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা আমরা নিরন্তর ত্রিতাপাত্মক দুঃখেরই সম্মুখীন হইয়া থাকি। এই জাতীয় কামনা-সন্তুপ্ত মোহাচ্ছন্ন-মতি মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত অধিকারানুরূপ কর্মের ভিতর দিয়া অর্থাৎ তমঃ হইতে রজো গুণের এবং রজঃ হইতে সত্ত্ব গুণের উদয়ে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হইলে, সেই বিজ্ঞানসত্ত্ব-চিত্ত-দর্পণে পরব্রহ্ম বা পূর্ণ-ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপ প্রতিফলিত করানই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদে তিনটি কাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে; যথা—কর্মকাণ্ড (দেবতাকাণ্ড), জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ড।

(১) কর্মকাণ্ড—সকাম ও নিকাম ভেদে দুই প্রকার। ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-তৎপর হইয়া পশু-হননাদি-মূলক হিংসাবৃত্ত বা হিংসা রহিত কর্ম করার নাম সকাম। অন্য আকাজকা রহিত হইয়া ভগবৎ-প্ৰীণনমূলক কর্মের নাম নিকাম। এই কর্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত অধিকারীভেদে নানা দেব-দেবীর উপাসনাও বিহিত হইয়াছে।

(২) জ্ঞানকাণ্ড—মায়া বা অবিद्या বিনাশক মূলতত্ত্ব-জাতীয়তা-নিরূপক জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) উপাসনা বা ভক্তিকাণ্ড—নিকাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে মহৎ-

কৃপায় শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা জীবের অন্তরে যে প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়, ইহাই বেদের প্রধানতম বেদ। সেই বেদ-ভক্তিই বেদরূপ কল্পভরু চরম ফল। উপাসনা কাণ্ডই বেদের সার। উপাসনা প্রধান বেদের সার উপনিষদ এবং এই উপনিষদের সার শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতা।—

“সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ স্ত্রীভোক্তা দুষ্কং গীতামৃতং মহৎ ॥”

শ্রীগীতায় সেই গোপাল (নন্দ) নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন—

১। মম্বনা ভব মদুভো মদ্বাজী মাং নমস্কুরু। (গীঃ ৯।৩৪)

২। যৎ করোষি যদশ্বাসি যজুহোষি দদাসি যৎ।

যতপশুসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ (গীঃ ৯।২৭)

৩। সর্ব-ধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। (গীঃ ১৮।৬৬)

—ইত্যাদি শ্লোকে সকল কর্ম ও ধর্ম শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিরই উপজীব্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সর্বশাস্ত্র-সিদ্ধ। “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম, যোগ ও জ্ঞান।” বেদভাষ্যরূপে অষ্টাদশ সংখ্যক পুরাণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছয় খানা তামসিক, ছয়খানা রাজসিক ও ছয়খানা সাত্ত্বিক।

মাংসং কৌর্ম্মং তথা নৈজং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।

আগ্নেয়ঞ্চ বড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।

গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

ত্রিগুণের অধিকারী ভেদে সকলেই নিজ নিজ অনুকূল শাস্ত্র মানিয়া চলেন; সুতরাং ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও গুণানুসারে উক্ত শাস্ত্রীয় পথের ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন বটে, তবে সত্ত্ব, রজ ও তমের ভেদকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যাহারা বৈষ্ণবীয় কোন অনুষ্ঠান দেখিবামাত্রই ইর্ষাবশে অযথা চিৎকার দিয়া বলেন—‘তোমরা বেদ মাননা?’ তাহারা বেদশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু-সম্বন্ধে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন—বেদ লইয়াই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। যে বেদ মানেনা সেত নাস্তিক। তবে বেদ সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা-হেতু

বে-সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, আজ তাহা সংশোধনের আবশ্যক হইয়াছে। বেদ-ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ একদিন বিধি দিলেন—“শূদ্রের বেদপাঠ ও প্রণবোচ্চারণ নিষেধ।” এবং এই নিষেধ জারীর অযোগ্য লইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্মে বদৃচ্ছা বিধি-নিষেধের বজ্রদল-পাথর চাপান হইয়াছিল। কিন্তু আজ সকলে জানিতে পারিয়াছে—বৈদিক বহু মন্ত্র বা স্তোত্রাদি-রচনাকারী কবজ, ঐলুব, ভলন্য, বন্দ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি কবি সকল ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ছিলেন না। মনু, মহাভারত-কার ব্যাস প্রভৃতি এক বাক্যে বলিয়াছেন—“শূদ্রের নিকট হইতে ও জ্ঞান আহরণ করিবে।” মহর্ষি পরাশর, বেদব্যাস, শুক, নারদ, বশিষ্ঠ, মন্দপাল ও দার্শনিক কণাদ নিকট জাতীয় নারীর গর্ভজাত ছিলেন। বেদব্যাস-শিষ্য তিনজন শূদ্র-কর্তৃক বিষ্ণুপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত লোমহর্ষণ, দৌতি (উগ্রশ্রবা), সঞ্জয়, তুলাধর প্রভৃতি শূদ্র কুলে আবির্ভূত হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহারা ই নিখিল বিশ্বের গুরু। সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াই বৈষ্ণব-চাণ্যবর্গ বহুকাল হইতেই সকলকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া প্রণবোচ্চারণ, দেবার্চনা ও বেদাধিকার দানে কৃতার্থ করিতেছেন।

(দুই)

বর্তমান স্মার্তগণের বিচার-সমালোচনা

জাগতিক ক্রিয়াকাণ্ড-মূলক পৌরাণিক ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম ও মার্যবাদী ধর্মের সংমিশ্রণে হিন্দু-সমাজে স্মার্ত-ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। রঘুনন্দন এই দ্র্যাক ধর্মবাদী। স্বর্গই এই ধর্মের চরম লক্ষ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শাস্ত্র মাত্রই এক যুগে এক সময়েই আসিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত হয় নাই। যে আদি যুগে অশ্বমেধ, গবালভূ, পলগৈত্রিক, কশ্ম-সন্ন্যাস ও দেবর দ্বারা স্তুতোং-পত্তির বিধান ছিল, এই যুগে ঐগুলি নিতান্ত দোষণীয় ও বর্জনীয় হইয়াছে।

অশ্বমেধং গবালভূং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।

দেবরেণ স্তুতোংপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

(মলমাসতত্ত্ব—সন্ন্যাস প্রকরণ)

“ন স্ত্রী তুষ্ণতি জারৈণ” স্মৃতি শাস্ত্রের এই বাণী স্মার্ত-মহোদয়গণও বর্তমান কালে সমর্থন করেন না। পরাশর সংহিতায় আছে—

তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ বানি লোমানি মানবে।

তাবন্ত্যদানি সা স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি ॥

(শুদ্ধিতত্ত্ব—সহানুগমন—২)

অর্থাৎ, মানব দেহে যে সার্ব-ত্রিকোটী লোম আছে, যে রমণী স্বামীর অনুগমন করেন অর্থাৎ সহমৃত্যু হন তিনি সেই পরিমাণ বৎসর স্বর্গে বাস করেন। এই জাতীয় নীতির উপদেশে সতী-দাহ প্রথা, প্রথম সম্ভান গঙ্গায় বিসর্জন শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। আজ ঐগুলিকে কুসংস্কার বলিতে অনেকেরই মুখে আটকায় না। সাগর পারে বাঁহারা যাইবেন, স্মৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্থ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, মদন মোহন মালব্য, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষিগণকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবার যোগ্যতা কোনও স্মার্ত পণ্ডিতের আছে কি? ঐ সকল সাগর-যাত্রী শুধু হিন্দুর কেন, বিশ্বেরই আদর্শ।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতে আছে—

“অষ্ট-বর্ষা ভবেদগৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।

দশমে কন্যাকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥ (উদাহতত্ব-কালপ্রসঙ্গ)

অর্থাৎ অষ্টম বর্ষ বয়স্কাকে ‘গৌরী’, নবম বর্ষ বয়স্কাকে ‘রোহিণী’ ও দশম বর্ষ বয়স্কাকে ‘কন্যা’ বলা যায়, ইহার উর্দ্ধ বয়স্কাকে ‘রজস্বলা’ বলা হইয়া থাকে। তারপর অন্য স্ত্রীকে বলা হইতেছে ঐ অবিবাহিতা রজস্বলাকে দর্শন করিলে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা নিরয়গামী হয়। যথা—

“মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলান্ ॥” (উদাহতত্ব-কালপ্রসঙ্গ)

এদিকে ‘সদ্বি-বিল’ অনুযায়ী চতুর্দশ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। একপক্ষে পিতা, মাতা ও ভ্রাতাকে নরক হইতে উদ্ধারের কি ব্যবস্থা স্মার্ত মহোদয়গণ করিতে পারেন? স্মরণ্য বর্তমানে অশ্বমেধ, গবালন্তের মত ঐ সব স্ত্রীক বা নীতি পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে যুগে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষণীয় ছিল না, গত্যান্তরাভাবে আহার বিহার যথেষ্ট ছিল, সেই যুগের ক্রিয়া-কলাপ কিছুতেই এযুগে সর্বক্ষেত্রে উপযোগী বা প্রয়োজ্য নহে। তথাপি আহার-বিহারের যথেষ্টাচার কে স্মার্ত মহোদয়গণ আধুনিক কালেও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মের নামে প্রবৃত্তিই এখানে প্রধান।

গোভিলের গৃহ-সূত্র, কাত্যায়নের শ্রৌত-সূত্র, আপস্তম্বের ধর্ম্ম-সূত্র এইগুলির মিলিত নাম ‘কল্প’-সূত্র। ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের আদি প্রবর্তন। এই কল্প-সূত্রেই ‘গবালন্ত’-মূলক অষ্টকা-শ্রাদ্ধের বিধান দৃষ্ট হয়। আজ ইহা হিন্দুসমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এমন কি, এই শাস্ত্রীয় বিধানের স্মরণ মাত্রই স্মৃতির

পণ্ডিতগণ শিহরিয়া উঠেন। অথচ তাঁহাদের প্রবৃত্তিমূলক বৃত্তি বিশেষের প্রতিবাদ করিলে অনেকেই উৎক্লিষ্ট হইয়া উঠেন এবং নিজ মত সমর্থনে মনু-সংহিতার দোহাই দিয়া বলেন—

“ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মন্তো ন চ মৈথুনে।

প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥” (মনু—৫।৫৬)

অর্থাৎ, মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, মৈথুনাदিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; সুতরাং এই প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষ দোষী হয় না। তবে নিবৃত্তিতে বিশেষ ফল আছে। কিন্তু সেই নিবৃত্তির মহা ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাহারা প্রবৃত্তির আগুনে ইন্ধন দেওয়া কেই জীবনের পরম ও চরম মত্য মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাত্বত সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতের ভেদ স্বাভাবিক। স্মৃতির বিধান সম্বন্ধে আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য—শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে যে সকল সংস্কার আধুনিক সমাজ-জীবনের অকল্যাণকর বা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় অল্পপযোগী, বর্তমানকালে শাস্ত্রানুসারে তাহার পরিবর্জন ও পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি, কবিভূষণ
সাং বিরাট (শ্রীহট্ট)

শ্রীব্যাসপূজা বাসরে

দীনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি

গুরুদেব ! দয়া কর হেন দীন জনে ।

চঞ্চল আমার মন তোমার রিহনে ॥

আকর্ষহ দুষ্টি মন করুণার বলে ।

থাকে যেন মোর মন চরণের তলে ॥

আজি ব্যাসপূজা দিনে এ শুভ তিথিতে ।

বড় সাধ জাগে তব চরণ পূজিতে ॥

আমি ত অধম অতি দুঃখমতি ব'লে ।

সাক্ষাতে না পূজা নিলে গেলে দূরে চ'লে ॥

তোমার চরণে আমি জানাই মিনতি ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবে মোর থাকে যেন মতি ॥

আমি অশেষ বিশেষ অপরাধী ব'লে ।

দয়াময় ! উপেক্ষা না কর অবহেলে ॥

ক্ষমা করি' যত সব অপরাধ মোর ।
 দাও তব পদ-সেবা-অধিকার ঘোর ॥
 অধীনার হৃদে দেহ বিগুণা ভকতি ।
 জিহ্বায় স্ফুরক মোর তব গুণ-কীৰ্ত্তি ॥
 জয় জয় গুরুদেব পতিত-পাবন ।
 এ অধম পতিতাকে করহ তারণ ॥
 অনেক জনম মোর গিয়েছে যে কেটে ।
 এইবার শ্রীচরণ দানিয়াছ বটে ॥
 কিন্তু মোর দুষ্কটন নানাদিকে ধায় ।
 বায়ুগতি দুর্নিবার—কি করি উপায় ॥
 কৃপা করি' কেশে ধরি' ফিরাও আমারে ।
 গৌরহরি সেবামগ্ন রাখহ দীনারে ॥
 অপরাধী বলি মোরে ঘৃণা নাহি কর' ।
 রাখ' রাখ' শ্রীচরণে নাহি ভাব পর ॥
 স্বামিসঙ্গে একসাথে ভজিতে তোমায় ।
 সদা আশা জাগে মোর আকুল হিয়ায় ॥
 তোমার করুণা হ'লে (আশা) অবশ্য পুরিবে ।
 গুরুদেব ! তাঁ'রে কৃপা কবে যে করিবে ॥
 দয়াময় ! দয়া কর, এই দীন জনে ।
 রত্নক চঞ্চল মন তোমার চরণে ॥

—দীনা সেবিকা 'গার্গী'

(রায় সাহেব শ্রীমুনীন্দ্র নাথ সাধুর জ্যেষ্ঠা কন্যা)

চৌমাথা, চুঁচুড়া

“মথুরায় উজ্জ্বলত হইবে”

মাতঙ্গীপল সত্বন প্রভূত হউন :

শ্রীবামনদেবের উপাখ্যান

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকণ্ঠপঞ্চাষির বিম্বয়

পরদিবস প্রাতঃকালে কণ্ঠপ ঋষি উঠিয়া এইসব বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আর দেখিলেন—অগণিত পিপীলিকা-শ্রেণীর মত অসংখ্য নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ-যুবা আসিয়া প্রাঙ্গণ ভরপুর করিয়া দিল। ঢাক, ঢোল, সাঁনাই, বাঁশী, করতাল, মৃদঙ্গ, বাঁঝরি, শঙ্খ বাজিতে লাগিল—ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—“আরে থাম্ থাম্ !! কে তোদের টাকা দিবে ?” নারদঋষি ইঙ্গিত করিলেন—“আরে বাজাও বাজাও।” স্তূতরাং তাহারা কণ্ঠপ ঋষির কথা না শুনিয়া, আরো উৎসাহের সহিত বাজ্য করিতে লাগিল। অসংখ্য বাজ্যরবে চতুর্দিক্ মাতিয়া উঠিল—কে কাহার কথা শুনে !

কণ্ঠপ ঋষি আশ্চর্য্য হইলেন—কোথা হইতে এতদব দ্রব্য সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল—বুঝিতে পারিলেন না। কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। ‘দিয়তাং’ ‘ভূজ্যতাং’-শব্দে মহা কোলাহল সৃষ্টি করিল। এইরূপ মহা-সমারোহে শ্রীবামনদেবের উপনয়ন উৎসব শেষ হইল।

শ্রীবলিরাজের দান-যজ্ঞ

এদিকে বলিরাজার গুরু শ্রীগুরুচার্য্য শিষ্যের যশঃ সৌরভ বিস্তারের জন্ত পরামর্শ দিলেন—“তুমি সস্ত্রীক কল্লতরু হইয়া সিংহাসনে বসিয়া ‘দানযজ্ঞ’ আরম্ভ কর,—যাহা এতকাল পর্য্যন্ত কেহই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই মহাদানের ফলে তোমার অতুল-কীর্ত্তি কাহিনী পৃথিবীতে ঘোষিত থাকিবে।”

মহারাজ বলি শ্রীগুরুদেবের আদেশ গিরোধার্য্য করিয়া দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মহাসমারোহে বলিরাজ দান-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে সাদা পড়িয়া গেল; এই যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হইল। মহারাজ সস্ত্রীক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কল্লতরুর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। স্তূতরাং ব্রাহ্মণ, দেব, যক্ষ-রক্ষ, কিংপুরুষ, দানব, বিত্যাধর, কিন্নর-কিন্নরী, বাচক, দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বলিতা সকলেই বলির যজ্ঞে দান লইবার জন্ত ছুটিয়াছেন। অসংখ্য লোক এই মহাযজ্ঞের ভূরিভূরি প্রশংসা করিয়া ছুটিয়াছে। সকলেই এক বাক্যে বলিতে লাগিল—এমন হয় নাই, আর হইবে না।

বামনদেবও এই বলিরাজের যজ্ঞে যাইবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মচারীর ভিক্ষাই বা দান-গ্রহণ করাই উৎকৃষ্ট বৃত্তি। পিতা কণ্ঠপ সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রকে বলির যজ্ঞে দান গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন।

শ্রীবামনদেব দণ্ড-কমণ্ডলু, ছত্র-পাছুকা, অজিন-মেখলাদি ধারণ করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে প্রশস্ত রাজপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীও রাজপথে চলিতেছেন; তাঁহারা সহসা দেখিতে পাইলেন—দূরবর্তী রাজপথে একটি ‘ছাতা’ যাত্র চলিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া একটি ব্রাহ্মণ হস্ত করিয়া বলিলেন—“ওহে ভায়া! দেখ দেখ, কি আশ্চর্য্য, বলির যজ্ঞে ছাতাও ভিক্ষায় যাইতেছে।” “ওহে ছাতা মহাশয়! থাম থাম।” সম্মুখে যাইয়া ব্রাহ্মণগণ উকি মারিয়া দেখিল—‘একটি ক্ষুদ্র বেটে বালক ছাতার ভিতরে চলিতেছে।’ কিন্তু তাহার অপরূপ রূপ ও সৌন্দর্য্য সকলেই মোহিত হইল। তথাপি তাঁহারা পরস্পর বলিলেন—“ভাই হে! চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হই। এই বালক আমাদের অগ্রে গেলে প্রভূত দান লইবে।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ-সকল দ্রুত গতিতে বালককে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গেলেন; কিছু দূরে গিয়া ব্রাহ্মণ-সকল আর একটি ‘ছত্র’ চলিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—“আহা, দেখ কত ছাতাই চলিতেছে।” কৌতূহল বশতঃ পূর্বের স্থায় ব্রাহ্মণবৃন্দ নিকটে গিয়া দেখিল—সেই বালক। তখন তাঁহারা আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সম্মুখে একটি প্রশস্ত নদী এবং ঐ নদীর তীরে সেই বালকটি বসিয়া রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণগণের আনন্দের আর সীমা নাই; তাঁহারা বলিলেন—“ওহে বালক! আমাদের অগ্রে যাইয়া রাজার দান লইবে মনে ভাবিয়াছ, তাহা আর হইবে না, এখন নদী তীরে বসিয়া থাক।” এই বলিয়া তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র পদ প্রসারণ করিয়া নদী পার হইয়া বালককে বৃদ্ধাজুলী প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন।

বাহার ‘নাম’ গ্রহণ করিলে জীবনমুহু এই ভব-সাগর পার হয়, তাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র নদী পার হওয়াত অতি তুচ্ছ কথা। আর একটু অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলী দেখিতে পাইলেন সেই ক্ষুদ্র বালকটি তাঁহাদের অগ্রেই বৃহৎ রাজবাটীর তোরণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। আর সকলে বলিল—“তাইত, এ বড় আশ্চর্য্য! ঐ বালকটি বোধহয় ইন্দ্রজাল জানে! আমাদের অগ্রেই রাজবাটীতে প্রবেশ করিল!”

শ্রীবামনদেবের ছলনা

শ্রীবামনদেব রাজসভার দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার অসামান্য তেজে

সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইল। বলিরাজ-মহিষী বিক্র্যাবলী অপূর্ব বালক বৃত্তি দেখিয়া স্নেহে আগ্রত হইলে, তাঁহারা উভয়েই সমস্তমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ বটুকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন—বসিতে বসান দিলেন। স্বহস্তে বামনদেবের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেই জল সস্ত্রীক মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন—“অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য! আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই, আপনার পদধূলি আমার রাজসভা মধ্যে পতিত হইল—আমরা গবিত্র হইলাম।” বলিরাজের স্তমধুর বাক্যে বামনদেব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার বংশাবলীর গুণ-কীর্তন করিতে লাগিলেন। বামনদেব বলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“মহারাজ! দানব হইলেও অতি উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার পিতামহ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের যশঃ-সৌরভ অবনী-মণ্ডলে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীহিরণ্যকশিপু বলবীৰ্য্যে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ত্রিলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইত, এবং শ্রীহিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত বৃদ্ধ করিয়া মহা-বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সম্প্রতি আপনি তাঁহাদেরই বংশধর, এই অপূর্ব দান-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন। সুতরাং আপনি ও কখনই প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন না—ইহা আমি বুঝিয়াছি।”

মহারাজ বলি বামনদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“প্রভো! আপনি কি প্রার্থনা করেন, দাসকে আদেশ করুন। আমি অবশ্যই আপনার প্রার্থনা পূরণ করিব।” বামনদেব রাজাকে বলিলেন—“আমি আমার ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি আপনার নিকট বাচঞা করি।” এই কথা শুনিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—“একেত আপনি অতি ক্ষুদ্র বামন, পদ দু’খানিও তদ্রূপ, সুতরাং এ সামান্য দান লইয়া কি করিবেন? আপনারা ব্রাহ্মণ, অতি সরল, কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহাও জানেন না। আমি ত্রিলোক-মণ্ডলের অধীশ্বর, আমি আপনাকে কি না দিতে পারি? লক্ষ লক্ষ গাভী প্রার্থনা করুন, উৎকৃষ্ট রাজ্য প্রার্থনা করুন, হীরা, মণি, রত্ন, স্বর্ণ অলঙ্কার, দাস-দাসী, যাহা ইচ্ছা চান, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।” বামনদেব রাজাকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণের লোভ থাকা উচিত নয়, আমি তপস্যা করিব, তাহার নিমিত্ত আমার এই ত্রিপাদ ভূমি পাইলেই যথেষ্ট হইবে।”

রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য সম্মুখেই ছিলেন। তিনি যোগবলে বিষ্ণুর ছদ্মবেশের কথা বুঝিতে পারিয়া মনে করিলেন—ইনি আমার যজমান বলিরাজের সর্বস্ব গ্রহণ করিবেন। তাই রাজাকে সাবধান করিয়া বলিলেন—“মহারাজ! এই

চরবেশী ব্রাহ্মণকে দান দিবেন না—ইনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু। আপনার সর্বস্ব অপহরণের জন্ত এই ছলবেশে আসিয়াছেন। আপনি সতর্ক হউন।” বলিরাজ গুরুদেবকে বলিলেন—“গুরুদেব! তাই যদি হয়, তবেত আমার পরম নৌভাগ্য। আমি অশ্রুতকূলে জন্মিয়াছি, কি পুণ্য করিয়াছি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ আমার গৃহে পদার্পণ করিবেন? যদি সত্যই হয়, তবেত আমি ধন্য। ‘সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্তাৎ।’ সকলই ভগবান্কে দিতে হয়।” তখন গুরু গুক্রাচার্য্য সক্রোধে বলিলেন—“সর্বস্ব দিলে তুই খাবি কি?” অর্থাৎ রাজার সকল বিষ্ণুকে দিলে আচার্য্যের নিজ গৃহ বে অচল হইবে! মহারাজ বলিলেন—“আমি দান দিতে অস্বীকার করিয়াছি—আমি কখনই সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইব না।”

গুক্রাচার্য্য বলিলেন—“মহারাজ! আপদে-বিপদে, বিবাহ-ব্যাপারে মিথ্যা বলিলে কোন দোষ হয় না, ইহা ব্যবহারিক শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে।” মহারাজ গুক্রাচার্য্যের কোন কথা না শুনিয়া রাজমহিষীকে বলিলেন—“বিক্র্যাবলী! ভৃঙ্গার আনয়ন কর।” রাণী স্বামীর আজ্ঞায় জনপূর্ণ ভৃঙ্গার আনয়ন করিলে, বামনদেব দান লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। গুক্রাচার্য্য শিষ্যের মঙ্গলের জন্ত যাত্নাতে জল পতিত না হয় এজন্ত যোগবলে ভৃঙ্গারের মধ্য প্রবেশ করিলেন। মহারাজ ভৃঙ্গার অবনত করিলে যখন জল পড়িল না, তখন বামনদেব বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠ দ্বারা ভৃঙ্গারের মুখ বিদ্ধ করিলেন। তাছাতে গুক্রাচার্য্যের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। তদবধি তিনি ‘কাণাশুক্র’ নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। বামনদেবের হস্তে জল পতিত হইলে, তিনি ‘স্বস্তি’ বলিয়া দান গ্রহণ করিলেন। এবং ভীষণ উরুক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রথম পদ দ্বারা বলির ভূঃ-লোকের, শরীরের দ্বারা ভুব-লোকের এবং দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বলোকের অধিকার গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় পদ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যলোক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে ব্রহ্মা তাঁহার পদভৌত করিয়া সেই জল মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

স্বরং ভগবান্ শ্রীশ্রীবামনদেব দুই পদের দ্বারাই বলির সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। বামনদেব বলিকে বলিলেন তুমি ত্রিপদ ভূমি দিবে বলিয়া অস্বীকার করিয়াছ—কিন্তু আমি দুই পদে সমস্ত লইরাছি। আর একপদের স্থান দেও; বলি আর দিতে না পারিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিলে, বামনদেব গুরুদেবকে আজ্ঞা দিলেন—“গুরু! তুমি নাগপাশে ইহাকে আবদ্ধ কর;

‘দান করিব’ বলিয়া যে দিতে না পারে তাহার এই উপযুক্ত শাস্তি। তখন ভগবানের আজ্ঞায় গরুড় নাগ-পাশে বলি রাজকে বন্ধন করিল।

তখন কালকেয়, নিবাত-কবচ, ধুম্রলোচন, বাতাপি, ইল্লোল, নমুচি, ঘণ্টাকর্ণ, ত্রিশিরা, মহাবাহু ইত্যাদি দৈত্যরাজের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ অসি নিক্ষেপিত করিয়া, বিকট-স্বরে চীৎকার করত বলিতে লাগিল—‘এই ভণ্ড, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, বটু-বেশধারী প্রতারককে এখনই বিনাশ কর।’ বলিরাজ সেনাপতি-দিগকে ইঙ্গিত করিলেন ; এখন দেবতাগণের স্তূপময় আমরা কালক্রমে প্রবল হইয়া পুনরায় স্বর্গ অধিকার করিব। তোমরা সম্প্রতি পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা কর ; মহারাজের এই আজ্ঞা নিরোধার্য্য করিয়া, আর কোন প্রকার কলহ না করিয়া, অস্তুর সকল পাতালপুরে প্রবেশ করিল। রাজ্ঞী বিজ্ঞাবলী ভগবান্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“দেব ! একি আপনার চলনা ; আপনার মায়ায় ব্রহ্মা-শিবাদি ত্রিভুবন মুগ্ধ ; আপনারই ত সব, মানুষ্য দৈবী মায়া বশতঃ নিজেকে এই সকলের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। আমি এত বড়, আমি কি না দিতে পারি। গঙ্গাপূজা যেমন গঙ্গাজলে হয়, আপনার দ্রব্য দিয়াই ত আপনার পূজা হইবে ? জীবের কি সম্বল আছে ? সে আবার কি দিতে পারে ?”

পরিশেষে বলিরাজ নিজ শির অবনত করিয়া মস্তকে বামনদেবের তৃতীয় চরণ ধারণ করিলেন। বলি ‘বাক্য’ দান করিয়া তাহার সত্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

আত্মনিবেদনের ফল

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আত্মনিবেদন, তুরা পদে করি, হইলু পরম স্তুখী।

(আমার) দুঃখ দূরে গেল, ষিষ্টা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥

অশোক অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদয়।

তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িলু ভবের ভয় ॥ (শরণাগতি)

বামনদেব বলি রাজকে ‘সুতল’ নামক ভূমিতলে প্রেরণ করিলেন। ভগবানের আদেশে বলি গণসহ সেই স্থানে গমন করিলেন। বলিরাজ তাহার সর্বস্ব বিষ্ণুরূপী ভগবান্ বামনদেবকে অর্পণ করিলেন। এই আত্মনিবেদন ফলে, তিনি ভগবান্কে প্রেমডোরে বাঁধিয়া ফেলিলেন। স্বয়ং ভগবান্ গদাধারী হইয়া বলিরাজের পুরীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতি—

—ত্রিদিগুশ্রামী শ্রীমন্তুক্তিবিনোদ আশ্রম মহারাজ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

[ঔ বিষ্ণুনাথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে

একাদশ-দিবসব্যাপী মহামহোৎসব]

পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা অনুযায়ী ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, বুধবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুন, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে একাদশ-দিবসব্যাপী মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৫ই আষাঢ়, বুধবার—প্রাতঃকালে মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী আলোচনা ও পাঠ কীর্ত্তন এবং বক্তৃতামুখে শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথি প্রতিপালন করেন। অপরাহ্নে কীর্ত্তনাদির পর শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রীল আচার্য্যদেব রচিত ‘শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ’ প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব এককালে আবিভূত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যময় অতিমর্ত্য চরিত্রাবলী আলোচনামুখে বহুবিধ অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন।

এবংসর রথযাত্রা উৎসব বিরাটভাবেই সম্পন্ন হইয়াছেন। যদিও সময়ভাবে পূর্ব হইতে পত্রাদি সময়মত বিলি করা হয় নাই তথাপি উৎসবে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবংসরও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ দিনপঞ্জী অনুযায়ী যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্বক প্রত্যহ অপরাহ্নে পাঠ করেন।

২৫শে আষাঢ় তারিখে সর্বসাধারণে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে; সন্ধ্যার পর অনূন সহস্র ভক্তবৃন্দকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। হুগলী ভজ কোটের প্রধান উকিল শ্রীযুত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বলাই চাঁদ গুই ও চৌমাথাস্থ ভক্তবৃন্দ পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবংসরও নানাপ্রকারে ও বিচিত্রসত্তারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা বিধান করিয়া সমিতির আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ও উৰ্জ্জব্রত

আজকাল কতকগুলি ভণ্ড সহজিয়ার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় চাতুৰ্ম্মাস্ত্র ব্রত বৈষ্ণবের পালন করিবার আবশ্যক নাই। কারণ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চাতুৰ্ম্মাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু কেবলমাত্র উৰ্জ্জব্রতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—সুতরাং কাটিক মাসে কেবলমাত্র উৰ্জ্জব্রত পালন করিলেই চলিবে; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ত্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত চাতুৰ্ম্মাস্ত্রের আদর না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ বিচার সর্বতোভাবে ভক্তিরাজ্যের হানিকারক। শ্রীমন্নহাপ্রভু পুরীতে, দক্ষিণদেশে ও বিভিন্ন স্থানে স্বয়ং আচরণ করিয়া চাতুৰ্ম্মাস্ত্রের আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। এই আদর্শ যাহারা পরিত্যাগ করিবেন তাহারা গোড়ীয় বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না। শ্রীমন্নহাপ্রভু স্বয়ং ‘আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়’—এই মন্ত্রে সকলকে ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। ভক্তনানন্দী ভক্ত-মাত্রেরই কৃষ্ণভজনে যাহা অনুকূল পাইবেন তাহা সমস্তই গ্রহণ করিবেন। ‘কৃষ্ণ ভজনের যাহা অনুকূল, বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।’—পরম মুক্ত বৈষ্ণব-মহাপুরুষের এই শিক্ষা সর্বতোভাবে যাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে না, গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাহাদিগকে ভণ্ড-তপস্বী বলিয়া জানিবেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শরণাগতির উল্লেখ করেন নাই; তজ্জন্তু কেহ যদি মনে করেন, আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদ-পদ্মে শরণাগত না হইয়াই ভক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎপাতকারী ভণ্ড ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

মানুষের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের আকর্ষণ করিলে তহার সর্বাত্মক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ জ্ঞান। ইহা ছাড়া গ্রাম্য জ্ঞানেও শুনিতে পাওয়া যায়—‘কাণ টানিলে মাথা আ’সে’। সুতরাং পূর্ণ অবয়বের আকর্ষণ না করিয়া শ্রেষ্ঠ অঙ্গ আকৃষ্ট হইলেই পূর্ণাঙ্গের আকর্ষণ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তদনুসারে ষড়বিধ শরণাগতির অন্ত্যতম ও শ্রেষ্ঠাঙ্গ—আত্মনিবেদন ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে গৃহীত হইলে, শরণাগতির অন্ত্য পঞ্চাঙ্গও গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। সাউড়ীর প্রাকৃত সহজিয়ার দল শ্রীল জীবগোস্বামীর চরণে নিতান্ত অপরাধী। ৬৪ ভক্ত্যাঙ্গে উৰ্জ্জব্রতের উল্লেখ হইলেই চাতুৰ্ম্মাস্ত্রের আদর বুঝিতে হইবে। আমরা তজ্জন্তু

সর্বসাধারণ বৈষ্ণববর্গকে চাতুর্মাস্য ব্রত পালনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

চাতুর্মাস্য-ব্রতের বিধি

এই বৎসর পূর্ব পূর্ব বৎসরের জ্যৈষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্য ও অন্তর্গত সেবকগণ ৩১শে আষাঢ়, ১৬ ই জুলাই, শুক্রবার পূর্ণিমা তিথি হইতে চাতুর্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই ব্রত ২৪শে কার্তিক, ১০ই নভেম্বর, বুধবার সমাপ্ত হইবে। এই ব্রত সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পালিত হইবে :—

শ্রাবণ মাসে সর্বপ্রকার শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ, কার্তিক মাসে আশ্লিষ (মাষকলাই, মস্তুর, সরিষা, পলাণ্ডু ইত্যাদি) সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, উক্ত চারিমাসের কোন দিনই লাউ, বেগুন, পুঁই, কলসীশাক, শিম, বরবটি, পটোল, মাষকলাই প্রভৃতি কোনও প্রকারের প্রসাদ ভক্ষণ করা চলিবে না। ক্ষৌর-কাষ্যাদি ও পান, বিড়ি, তামাক প্রভৃতি বিনাসিতা ও মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া এইগুলি চার মাস সর্বতোভাবে বর্জনীয়। চাতুর্মাস্য-ব্রতের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১৯০ পৃষ্ঠায়, ও ২য় বর্ষ ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীদামোদরচরিত্রকম্ গ্রন্থখানি চাতুর্মাস্যে বিশেষতঃ উর্জ বা কার্তিক-ব্রতে প্রত্যহ আলোচনীয় ও কীর্তনীয়। উক্ত গ্রন্থখানি গৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে পাওয়া যাইবে। উহার ভিক্ষা ৥০ আট আনা মাত্র।

শ্রীপিছলদা-পাদপীঠ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিছলদা গ্রামে শ্রীগৌর-পাদপীঠ-স্মৃতি সংরক্ষিত হইতেছে। তথায় বর্তমানে একটী মঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহান্বিত ও আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আমরা তজ্জন্ম গ্রামবাসীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। উক্ত পিছলদা গ্রামের সংলগ্ন কুলুপ গ্রাম নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত বক্তেশ্বর রথ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত ভুতনাথ রথ মহাশয় দ্বয় গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ তারিখের একখানা পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা উভয় ভ্রাতা ও তাঁহাদের পুত্রাদি সকলে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মঠ স্থাপনের জন্ম যে

জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহারা সর্বতোভাবে নির্বৃত্ত-সত্ত্বে দান করিতে প্রস্তুত আছেন এবং অতিসত্বর তথায় গিয়া নির্দিষ্ট জমির উপরে সত্বর যাহাতে মঠ স্থাপিত হয় তজ্জন্ত ব্যবস্থা করিতে জানাইয়াছেন। আমরা এই দানশীল রথ-ভ্রাতৃদ্বয়কে সপরিবারে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই বৃদ্ধ উৎকল ব্রাহ্মণদ্বয়ের সেবাদর্শ সকলেরই গ্রহণীয়।

আসাম প্রদেশে প্রচার

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৬০ পৃষ্ঠার পর)

খ্যাকশিয়ালী—শ্রীল সভাপতি মহারাজ সদলে ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, বুধবার প্রাতে কাছারির হাট হইতে গৌরীপুর অভিমুখে শুভবিজয় করেন। পশ্চিমধ্যে খ্যাকশিয়ালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ ব্যাপারী মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবের শকটের পথ রুদ্ধ করত তাঁহাকে তাঁহার (রাজেন বাবুর) বাটীতে পদধূলি প্রদানের জন্ত গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা জানান। সভাপতি মহারাজ নানা প্রকার অন্ত্রবিধার কথা জানাইয়া অব্যাহতি লইতে চেষ্টা করিলেও ব্যাপারী মহাশয়ের হস্ত ছুইতে কোন প্রকারেই নিস্তার পাইলেন না। অগত্যা সদলে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। রাগে সমাগত গ্রামবাসিগণের নিকট ত্রিবিক্রম মহারাজ ভাগবত পাঠ করেন তৎপর সভাপতি মহারাজ কৃপাপূর্বক হরিকথা-কীর্তন করেন। রাজেন্দ্র বাবুর গৃহে যোগবাশিষ্ঠের বিশেষ আদর দেখিয়া সভাপতি মহারাজ যোগবাশিষ্ঠ-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ গতি কখনই মঙ্গল-জনক নহে এবং উক্তগ্রন্থ পাঠে ভক্তিবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি নানা প্রকার শাস্ত্রবৃক্তি-মূলক উপদেশ প্রদান করেন। পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে নিরাকার নির্বিশেষ বলিয়া শুব করেন, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্র বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বশিষ্ঠের বুদ্ধি ও বিচার সংশোধন করিয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবুকে তিনি শ্রীগীতা ও উপনিষদের বাক্য স্মরণ করাইয়া নিরাকার নির্বিশেষ বিচারের হেয়তা বুঝাইয়া দেন। শ্রীরাজেন্দ্র বাবু শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদিগকে সেবা-পূজার দ্বারা বিশেষ প্রীত করেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

গৌরীপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার প্রাতে খ্যাকশিয়ালী হইতে সভাপতি মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ গৌরীপুররাজের অতিথিশালায় উপস্থিত হন। রাজকুমার শ্রীযুত প্রকৃতীশ চন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের অবস্থান ও প্রসাদাদির সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার আতিথ্য

স্বীকার করিয়া সম্মানসিগন এখানে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রতাপ চন্দ্র উচ্চ ইং বিদ্যালয় গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব 'সনাতন-ধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতামুখে বর্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্দের প্রতিবাদ করত প্রত্যেকেরই সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণের একান্ত কর্তব্যতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন—ভারতীয় কৃষ্টি যাহা কিছু সমস্তই সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারাই জানা যায়। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষা প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে দেওয়া আবশ্যিক। সাধারণ বালিকাগণ যাহাদের উপর গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে অস্তুতঃ তাহাদিগকে এই সংস্কৃত শিক্ষা দিবার কোনপ্রকার অসুবিধা নাই। তাহারা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে এই সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়া ঋষিগণের শিক্ষায় শিক্ষিত হউক ও প্রাচীন ভারতের সর্বোচ্চ জ্ঞান-গরিমামণ্ডিত কৃষ্টির পুনঃ প্রকাশ করত ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করুক।

সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন—কর্মের ফল তুচ্ছ ও অনিত্য, জ্ঞান ও যোগের ফল আত্মবিনাশ সুতরাং চেতন জীবাত্মার নিত্যত্ব বা সনাতনত্ব তদ্বারা রক্ষিত হয় না। একমাত্র ভক্তিই চেতনের ধর্মের নিত্যত্ব রক্ষণে সমর্থ হওয়ায় ভক্তিকেই “সনাতন ধর্ম” বলা বেদাদির অভিপ্রায়।

পরদিবস ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, স্কুল ভবনে ছায়াচিত্রে গৌরলীলা আলোচিত হয়। ছায়াচিত্র আরম্ভের পূর্বে শ্রীল আচার্য্যদেব ‘লোকবৎ তু লীলা কৈবলাম্’—এই সূত্রটি অবলম্বন করিয়া লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শ্রীরাধামহেন্দ্র মন্দিরেও ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীশ্রীরাম-লীলা-সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা করেন।

৩১শে তারিখে, গৌরীপুর রাজ-প্রতিষ্ঠিত আসামের অগ্রতম সুপ্রাচীন সংস্কৃত টোলে তারিণীপ্রিয়া চতুষ্পাঠীতে আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। উক্ত টোলের অধ্যাপক শ্রীযুত লক্ষ্মীপতি তর্কশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীহরিকথা আলোচনায় বিশেষ যত্ন করেন। আমরা তজ্জন্তু তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পাঠের পর উক্ত টোলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত ষড়ানন তর্কতীর্থ মহোদয় অবৈত চিন্তা-প্রসূত কয়েকটি প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার সহুত্তর প্রদান করেন। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, দেওয়ান বাহাদুর ও অগ্রাণ্য কর্মচারীগণ এবং প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত ষড়ানন তর্কতীর্থ সহ টোলের বহু বিদ্যার্থী প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অত্ম ধর্ম সুস্থরূপে পালে সেই জন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৬ষ্ঠ বর্ষ } প্রদ্যুম্ন, ৩ হৃষীকেশ, ৪৬৮ গৌরাক্ষ
মঙ্গলবার, ৩২ আশ্বিন, ১৩৬১ ; ইং ১৭৮১৫৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ

বলভিদুপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
যুগ্ম-রস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু-গান্ধর্বিকায়াঃ ।
স্বমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥

উদিত-বিধু পরাধ-জ্যোতিরুজ্জ্বল্য-বস্ত্রে ।

নব তরুণিম-রজ্যদান-শেষাতিরম্যঃ ।

পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥২॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি পীতং নিতম্বে

তদুপরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিখং দধানঃ ।

প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥

স্বরভি-কুসুম-বন্দে বঁাসিতান্তঃ সমুদ্বৈঃ

প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাং ।

মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়নৈব রাধাং

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৪॥

পরিমলমিহ লক্সা হন্তু গান্ধর্বিকাক্ষাঃ

পুলকিত তনুরুচৈ রুদ্ভদন্তুৎক্ষণেন ।

নিখিল-বিপিন-দেশাদ্বাসিতানৈব জিহ্মন্

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥

প্রণিহিত-ভুজ-দণ্ডঃ স্কন্ধ-দেশে বরাদ্র্যাঃ

স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্তিদা কণ্ঠকায়াঃ ।

মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুষ্মনেনৈব তবন্

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥

প্রমদ-দনুজ গোষ্ঠ্যাঃ কোহপি সম্ভবত্বি-

ত্রৈজভুবি কিল পিত্রো মূর্তিমান্ মেহপুঞ্জঃ

প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিং মুকুন্দঃ ॥৭॥

স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মৃদীং বিশাখাং

কৃতচটু-ললিতান্তু প্রার্থয়ন্ পৌঢ়শীলাং ।

প্রণয়-বিধুর-রাধামান-নির্বাসনায়

প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্তিঃ মুকুন্দঃ ॥৮॥

পরিপঠতি মুকুন্দশ্রীকং কাকুভি যঃ

স্মৃটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়ানি ।

ব্রজনব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং

স্বজন গগন মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥৯॥

শ্রীমুকুন্দাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

ইন্দ্রনীলমণির ঘণাকারি স্বীয় অঙ্গস্থিত কুঙ্কম রসের বিলাস দ্বারা শ্রীরাধার দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্ধন করিতেছেন অর্থাৎ অত্র রাজ্যে যেমন প্রজার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সর্বদাই রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজ্যস্থ উত্তম উপকরণ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শোভা বৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত কুঙ্কমোপকরণ আলিঙ্গন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার বদন পুরাঙ্গ-সংখ্যক সমুদিত চন্দ্রের কান্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, যাঁহার নবতারুণ্য দ্বারা বাল্যাবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ তদ্বারা যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-যুগল দ্বারা সখী-সমাঙ্গে ললিতার বয়স্থা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীতবসন এবং তদুপরি রক্ত বস্ত্র এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রীতিময়া শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৩ ॥

রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন সময়ে সখীগণ পরিবৃত্তা শ্রীরাধাকে, যিনি সুরভি-কুহুমে সুবাসিত সুতরাং কামোৎপাদক জলসেচন দ্বারা ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৪ ॥

কি আশ্চর্য্য ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড মধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাভ করিয়া

তৎক্ষণাৎ পুনরিত-তলু ও উন্নত হইয়া যিনি নিখিল বন প্রদেশ হইতে সমাগত ও সুবাসিত গন্ধ সমূহ আশ্রয় করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৫ ॥

উত্তমাজী কীৰ্ত্তিদা-কন্যা শ্রীরাধার ক্ষতদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি তদীয় স্নিত-বিকসিত গণ্ড-প্রদেশে চুষন করিয়াই কন্দর্প-জন্য সুখ-বিস্তার করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানবগণের অনির্বচনীয় প্রলয়গ্নি, পিতা-মাতা নন্দ-বশোদার মূর্ত্তিমান্ন মেহরাশি এবং যিনি শ্রীরাধার সহস্রে শ্যামবর্ণ রসরাজ শঙ্কর স্বরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

প্রণয়-বিকলা শ্রীরাধার মানভঞ্জন নিমিত্ত স্বীয় পরমোদ্বেগ কথায় যিনি যুহুসভাবা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রমত্ত-সভাবা ললিতাকে চাটুবাঁক্যে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥ ৮ ॥

যে-ব্যক্তি বিষয়-সমূহ হইতে ইঞ্জিয়-সংযমন-পূর্বক স্পষ্টরূপে চাটুবাঁক্যে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া, শ্রীরাধার স্বজনের মধ্যে তাঁহাকে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

মায়াবাদীর ভ্রান্তিময় দর্শনে জগৎ মিথ্যা

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবল মায়ার আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন । বাস্তব দর্শনের পরিবর্তে বাবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বস্তু দেখিতে দেয় না । খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্য বস্তু দেখিতে পান না ; ভ্রতরাং বিচার আনিয়া তাঁহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রমময় দৃষ্টা ও খণ্ডবস্তু প্রতীতির মিথ্যাত্ব এবং নিত্যসত্য-জ্ঞান হইতে বিপথগামী করেন ।

বিশুদ্ধ দর্শনে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু নশ্বর এবং

মায়ামুক্তি প্রসূত

তদ্বিবৎ জগৎকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্যখণ্ড প্রতীতি জন্ম তাৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন । যাহাকে পরিমিত করা যায় তাহাই মায়-

গঠিত সঙ্কোচ-ধর্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়া-সাহায্যে বাহ্যবস্তুর নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাদ্য আসিয়া দৃশ্য বস্তুর বিশেষত্ব দেখাইয়া, তাঁহাকে—‘বিষয়’ এবং দৃশ্য বস্তুকে—‘আশ্রয়’, ‘আলম্বন’ বা দর্শনের ‘আধার’ মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি বস্তুর শক্তি-বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাভাবে প্রদর্শন করায় এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করায়। বস্তুর বাহ্য-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা-জীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই, তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অহঙ্কার, ও করণপতি—মনে পরিণত হয়।

মায়াবাদী শঙ্করের ত্রানুগম্য বিচার ও তত্ত্ববাদী মধ্বেবর বিমুক্ত বিচার

মায়াবাদী মায়া-আশ্রয়ে ভেদজ্ঞান যুক্ত হইয়া বলেন—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তব ভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞান-আশ্রয়ে বলেন তত্ত্ববস্তুর ভগবানে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্য বিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞান-আশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বে পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বিমুক্তত্ব দর্শন করেন। বিমুক্তত্বে স্বগত লীলাময় নিত্যবৈচিত্র্য আছে, চিচ্ছক্তি বস্তু প্রকাশে স্বজাতীয় এবং অচিচ্ছক্তি পরিণত বহির্জগতে বিজাতীয়ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলে অচিন্ত্য-শক্তিবলে সেই বিমুক্তত্বেই চিৎ প্রকাশকারিণী ও অচিৎ সর্গের উভয় শক্তিই নিত্য বর্তমান। বেদান্ত-দর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শন মাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্ত-দর্শনেই চিদচিদীশ্বর বিমুক্তত্বই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থায় স্থিত দৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব দর্শনে বিমুক্ত, বৈষ্ণব ও জগতে পরম্পর নিত্যভেদ

শ্রুতিতে লিখিত আছে—‘তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ।’ দিব্য-সুরিগণ দৃশ্য বস্তুকে সর্বদাই বিমুক্তের পরম পদ বলিয়া দেখেন। তবে অল্পপাদেয়, দেশকাল বিচ্ছিন্ন অচিদর্শনে বিমুক্ত বা বস্তুত্ব আবদ্ধ করেন না। চিদ বা অচিদ বিমুক্তশক্তি-পরিণত বস্তু-প্রতীতিকে বিমুক্ত বোলে না এবং বিমুক্ত ব্যতীত তাঁহাদের অত্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিমুক্ত-সম্বন্ধ যেখানে উন্মুখ, তদ্বস্তুর প্রতীতিকে বা বস্তুসত্ত্বকে চিৎ এবং বিমুক্তবিমুক্ত তদ্বস্তুর প্রতীতিকে বা বস্তুসত্ত্বকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ করেন। একপ নিত্য-ভেদ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহারা

বহুবীশ্বরবাদী এরূপ নহে । বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন । তদন্ত
বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধ—নিত্য সেব্য-সেবকবৃত্তি

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উভয়েই নিত্য ‘শক্তিমান ও শক্তি-পরিণাম’ বা ‘বিষয় ও
আশ্রয়’-স্বরূপ হইয়া নিত্য-রসের উপাদান ও অত্যাশ্রয় সম্বন্ধময় । উভয়ের সেব্য-
সেবন-বৃত্তি নিত্য (অর্থাৎ) কালক্ষোভ্য না হওয়ার বিনাশী বা কস্মায়ন্ত নহে,
পরন্তু অনাদি । জড়কাল, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ ।
নিত্য শক্তিমান বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব অনিত্য ও কালক্ষুদ্র ।
বৈষ্ণবের স্থিতি নিত্য । তাঁহার দর্শনও নিত্য, কালে পরিবর্তনযোগ্য নহে ।

চিৎসর্গ, জড়জগৎ ও জীব সমস্তই বৈষ্ণবতত্ত্ব

চেতনময় সর্গ সমূহে এবং জড়ময় যাবতীয় বস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায়,
তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ ; সুতরাং সকল গুলিই বৈষ্ণব । চেতনময় সর্গ বাহা
জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃত অপেক্ষাবুক্ত, সুতরাং বিষ্ণুসেবনোন্মুখ
না হওয়ার গুণান্তর্গত । প্রকৃতির অতীত রাজ্যে মুক্তাবস্থায় যে বিষ্ণুর চিৎ সর্গ
তাহা মায়ার কোন প্রকার বশ্ত বা অধীন নহে । এই জগতে জীবনাত্রেই বৈষ্ণব
কিন্তু জড় বস্তুর এবং জড় ভোগের অভিনিবেশক্রে হরিবিমুখ ও জড়ের ভোক্তা
বলিয়া নিজ-সত্তা নানাধিক বিস্মৃত । হরি-সেবনোন্মুখ চেষ্টাময় চেতন সর্গ ত্রিবিধ
অবস্থায় আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হন ।

বৈষ্ণবের সামান্য, মধ্যম ও উত্তম অধিকার-ত্রয়

বৈষ্ণবের সামান্যাদিকারে ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র সেব্য । নির্দিষ্ট
উপকরণাবলী দ্বারা ভগবৎ-অর্চনাই তাঁহার লক্ষীভূত চেষ্টা । অধিকার উন্নতি-
ক্রমে তিনি বিষ্ণুভক্তি-নিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে এবং ভগবদর্চনায় উভয়
বিষ্ণু দেখিয়া প্রেমবিনিষ্ট ভগবন্ত্বের প্রতি তাঁহার বন্ধুতা অকৃত্রিম, সমগ্র জগৎ
হরিসেবায় নিবৃত্ত হউন—এরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর সঙ্গত্যাগে
তাঁহার যত্ন পরিদৃষ্ট হয় । উত্তমাদিকারে স্থল-শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার
বাসনা রহিত হইয়া, জড়-বস্তুকে নিজ ভোগের উপাদান আদৌ মনে না করিয়া
সকল বস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-সেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধি-বস্তু জ্ঞান ও দর্শন
করেন । দৃশ্য বস্তু মাত্রই শক্তি পরিণতি বৈষ্ণব সহ অভিন্ন বিষ্ণু । জগতে
সকল বস্তুই বিষ্ণুতে অবস্থিত, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই সর্বদা নিযুক্ত ।

সামাজিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব নহে

বৈষ্ণব বলিলে বর্তমান কালে সমাজের যে সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণে আবদ্ধ নহে। নীতি ও পুণ্য বর্জিত হইয়া শিক্ষা-মন্দিরের সহিত যাহাদের বৈয়িতা, শৌক্ৰবর্ণ ভেদ যাহারা স্বীকার করেন বা স্বীকার করেন না, মৃত ব্যক্তির সংকারোপলক্ষে যাহারা গীত বাত নৃত্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জন করেন, মাদিক্শিক, বর্ণাশ্রম ধর্মসমূহ লাঞ্ছনা করিয়া যাহাদের যথেষ্টাচার বৈধ সামাজিকগণের সর্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাহারা সংযোগী বা জাতি-বৈষ্ণব পরিচয়-বিশিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

বংশগত ও ব্যবসায়ী গুরু বা অধিকারী গুরু বৈষ্ণব নহে

আবার এই জাতি-বৈষ্ণবের গুরু ও পৌরোহিত্য-কার্যে নিরত, মন্ত্রাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্বীয় জীবিকা-নির্বাহে তৎপর, ধর্মের উপদেশ, শাস্ত্র-পাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জন প্রিয়, হিন্দু-সমাজে উন্নত বর্ণগণের মধ্যে পুত্র-কন্যা আদান-প্রদানাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়-সংযমে লক্ষ্য না করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা জানেন, বা গোস্বামি-সন্তান, অধিকারী, আচার্য্য-সন্তান বা গুরু পরিচয়াকালী ব্যক্তিতেই বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

নির্বিশেষত্ব মুক্তিকামী বৈষ্ণব নহে

হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরাগত বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণু দেবতার সেবনতৎপর, মুক্তিতে নির্বিশেষত্ব বিদ্বানী, তাঁহারাষ্ট যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিবেন এরূপ নহে।

আখড়াধারী বাবাজী ও সন্ন্যাসিন্যাত্রই বৈষ্ণব নহে

ভোর-কৌপীনাঙ্গ সন্ন্যাসবেশে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিধি-গর্হনশীল, আখড়া-গঠ-দেবালয়াদিতে অবস্থিতিপরায়ণ, শাস্ত্রাদি দর্শনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার কল্লনদী যাহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাষ্ট যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিতে অধিকারী,—বৈষ্ণবগণ তাহা মনে করেন না।

‘বৈষ্ণব’-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়

কৃষ্ণ-সেবানুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। যাহার কৃষ্ণার্থে অখিল — চেষ্টা, যিনি ভগবৎ-সেবার সর্বাঙ্গ দ্বারা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিসম্বন্ধি-বস্ত্র দ্বারা ও হরিসেবনোপযোগী নানসী চেষ্টা দ্বারা যে-কোন অবস্থায়

অবস্থিত থাকিয়া হরির অনুশীলনপর, বাঁহার 'প্রাপ্য'-বোধে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তি-অভিলাষ হরিসেবার উদ্দেশ্য নহে, তিনি উপরি উক্ত যে-কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন। যাবতীয় সদগুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদগুণ সমূহ স্থায়িতাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব পরিচয়াকাজ্ঞী ব্যক্তিমাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমটী তিনি সর্বোত্তম বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমानी এবং দ্বিতীয়টী তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন।

বৈষ্ণবের নিত্য সদগুণ

বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সন্ন্যাস, নির্দোষ, বদান্ত, বৃহৎ, শুচি, অকিঞ্চন, সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতবড়্গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, ককণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গুণভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানা কারণে বৈষ্ণবপরিচয়াকাজ্ঞী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণ সমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

সহজিয়া বৈষ্ণবের কপট দৈন্ত্য

অনেক সময় বৈষ্ণবের নিকপট দৈন্ত্য বুঝিতে অনর্থক হইয়া, সরল মানব বৈষ্ণবের শিকক সংজ্ঞায় নিজ অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্ত্য মিথাইতে অগ্রসর হন। অবৈষ্ণব বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিজ বৈষ্ণব-বিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, একপ প্রার্থনা করেন। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কোনদিন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। তাঁহাকে না বুঝিয়াই, উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতার, পরমোদার আদর্শ বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া, নিজের সংকীর্ণতার পরিচয় দেন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম

স্ব-নিষ্ঠিত ও পরিনিষ্ঠিত বৈষ্ণবের পার্থক্য

এই বিষয়ে আমরা দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি*। আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। সম্প্রতি কতকগুলি ‘সংযোগী বৈষ্ণব’ আমাদের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যিক। আমরা ‘সংযোগী বৈষ্ণব’-রূপ প্রথার বিরোধী নই; কেবল তাঁহাদের ধর্ম-ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমাদের যত কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে,— পরমার্থের জন্ত ভগবানকে ভজন করিবে; কিন্তু অত্যাচার প্রাকৃত ফলের জন্ত অত্যাচার দেবতার উপাসনা পদ্ধতি। যাহারা এইরূপ কার্য করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কৰ্ম্মাশ্রমী। যদি সংসারে বর্ত্তমান হইয়া অত্যাচার দেবতা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতান্বিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে ‘পরিনিষ্ঠিত’ নাম লাভ করা যায়। তাহাদের লক্ষণ ভাগবতে ঐশ্বর্নেই কৃত হইয়াছে; যথা :—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩১০)

[পূর্বের অকামই থাকুক, সর্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মনুষ্য তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের বজন করিবেন।]

তীব্র ভক্তিযোগ-অভাবে সংযোগী বৈষ্ণব নহেন

সংসারী লোক মাত্রেই সর্বকাম। সর্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্ত কৰ্ম্ম-কাণ্ডান্তর্গত বহু দেবতা-ভজন পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই বজনা করা যায়, তবে স্বনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটি কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। ‘তীব্রেন ভক্তিযোগেন’ এই শব্দ দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীব্র ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্র হইতে সম্ভব হয় না। অনাদি বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা তাহাতে নিষ্ঠাপূর্বক বর্ত্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দোষী। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয় পদ চ্যুত হয়। ‘তীব্র-ভক্তিই’ একমাত্র অচ্যুত-কুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব

* গৌড়ীয় পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যার যথাক্রমে ৪০৭ ও ৪৪৬

পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য। —(গোঃ সংঃ)

বলিলে 'বর্ণাশ্রমী' ও 'সংযোগী' উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন ; কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্র ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কুলচ্যুত । কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই । কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে ? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্য দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে । তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না ।

তিন প্রকার বৈষ্ণব ; তন্মধ্যে 'নিরপেক্ষ'—ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার—(১) স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতাস্থিত ব্যক্তি-বিশেষ ; ইহারা উভয়েই গৃহস্থ । (৩) নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্মত্যাগী । নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ । ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব । কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিনজনেরই জীবন । উত্তরোত্তর কৃষ্ণ-ভক্তির উন্নতিই প্রয়োজন । যে-স্থলে পরিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে তদনুসারে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায় ।

কৃষ্ণ-ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রমত্যাগ বা ভেদাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয় । একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ । বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই ।

গৃহস্থ বা স্ত্রীসঙ্গীর কোপীন-গ্রহণে অধিকার নাই

ইহাতে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়েই গৃহস্থ, অতএব কোপীন গ্রহণে অনধিকারী । অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয় । স্বনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ পর্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয় । পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষ সংস্কারস্থলে বর্ণাশ্রমাত্মগত নামাস্তর গ্রহণ দ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয় । তাঁহাদের কোপীন গ্রহণ হইতে পারে না । নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কোপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয় । ইহাই সর্বশাস্ত্র সিদ্ধ । পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোপীন গ্রহণে অপরাধ হয় । কোপীন গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে । অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক । একথা অণু আমরা সংক্ষেপে বলিলাম ।

ত্যাগী ব্যতীত গৃহস্থের ভিক্ষা নিষিদ্ধ

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যিক। সেই অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধেও অনেকগুলি বিচার আছে। এইস্থলে (ভাগবত) সপ্তম স্কন্ধোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষা-দ্বারা সংসার-নির্বাহ করার বহু সুতরাং সন্দেহনীয়। তদ্বারা তাঁহারা পতিত হইবেন। যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি-দিগের স্বভাবানুসারে একটি একটি বর্ণ নিরূপণপূর্বক তদ্বৃতি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন।

এই সমস্ত বিষয়ের ক্রমশঃ বিশেষ আলোচনা করিব।

(সজ্জনতোষণী ২য় খণ্ড, ১১ সংখ্যা)

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পঞ্চক (৭)

(ক)

প্রভুপাদ !

তোমার অভয় পদ, সর্ববজীব সুসম্পদ,
সে' পদ সাধন যে না করে।

ভরে জড়বুদ্ধি যার— জড় দ্রব্যে প্রীতি তার,
শমন শাসন করে তারে ॥ ১ ॥

জড়-ভাবাশ্রয়ে জীব, ইফটাপূর্ত-বজ্রাদিক,
পুণ্যকর্ম্য হোম, দান আদি।

বর্ণাশ্রম-কর্ম্য-ধ্যান, পিতৃ-ব্রত-কর্ম্য-জ্ঞান,
তীর্থযাত্রা সেই করে যদি ॥ ২ ॥

তোমার চরণ বই, কিছুতে নিস্তার নাই ;—
জীবের উপায় তুমি প্রভু।

অনিত্য উপায় ছাড়ি', (তব) পদরঞ্জে গড়াগড়ি,
দিতে যদি পারে জীব কভু ॥ ৩ ॥

(তবে) পূর্ণানন্দ লাভ হয়, সর্বসিদ্ধি উপজয়,
পায় কৃষ্ণসেবা অধিকার।

এ' দীন গোপাল তাই, আনন্দে অধীর হই',
তবপদ করিয়াছে সার ॥ ৪ ॥

(২)

প্রভুপাদ !

শ্রীরূপ অনুগবর !

কৃপা করি' নিরন্তর,

নৃত্য কর আমার জিহবায় ।

অধম পামর আমি,

পতিতপাবন তুমি,

প্রভু তব ধরি রাগা পায় ॥ ১ ॥

মহাবদান্তের গুণে,

নাম দিতে জগজ্জনে,

এ প্রপঞ্চে তব অবতার ।

সেই জগ-জন মাঝে,

আছি আমি দীন সাজে,

মোরে প্রভু কর অঙ্গীকার ॥ ২ ॥

দুর্দম দুর্জেন আমি,

অধম তারণ তুমি,

এ অধম তবপদ চায় ।

হে প্রভু জগবন্দ্য !

সেব্য-সেবক সম্বন্ধ,

হয় প্রভু তোমায় আশ্রয় ॥ ৩ ॥

আমি জড়বুদ্ধি করি',

সে' সম্বন্ধ পরিহারি'—

তোমা হ'তে পড়িয়াছি দূরে ।

তুমি প্রভু ! এ গোপালে,

আপন ককুণা-বলে,

টানিয়া লহ'গো নিজ পুরে ॥ ৪ ॥

(৩)

প্রভুপাদ !

হে প্রভু, অনাদি কাল হ'তে আমি,

নহি কৃষ্ণ অনুরক্ত ।

রসনা আমার অবিচ্ছাদিত

সদাই উত্তপ্ত তিল ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-বিশুদ্ধতা হেতু কৃষ্ণ-নাম-

গুণ-চরিতাদি রূপ—

সুমিষ্ট মিছরি নহে রুচিপ্রদ

জিহবা যেন বিষ-কূপ ॥ ২ ॥

তব কৃপাবলে শ্রদ্ধাবিত হ'য়ে,
 নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম-
 চরিতাদিরূপ মিছরি সেবন
 কৈলে পূরে মনস্কাম ॥ ৩ ॥

(তা'তে) কৃষ্ণ বিমুখতা জড়ভোগ ব্যাধি,
 সবই উপসম হয় ।
 তাই এ' গোপাল কার-মনোবাক্যে
 (তব) চরণ সেবিতো চায় ॥ ৪ ॥

(ঘ)

প্রভুপাদ !

ভূগাপেক্ষা আমি, অতি ক্ষুদ্র হীন,
 এ মোর নাহিক জ্ঞান ।

তব সন্মান, নাহি সহিষ্ণুতা,
 নাহি করি কৃষ্ণনাম ॥ ১ ॥

হীন-মান হ'তে, পারি নাই প্রভু
 মানমঞ্চেপরি বসি' ।

অহঙ্কারে মত্ত, হ'য়ে অবিচার,
 ভজিতেছি অহনিশি ॥ ২ ॥

এবে বুদ্ধি মোর, সত্যের স্বরূপ,
 পরমার্থ বস্তু হ'তে ।

বিচ্যুত হইয়া, আমি ও আমার,
 বুদ্ধি এসেছে দেহেতে ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম— কীর্তনাদি সব,
 করিয়াছি পরিহার ।

এ ঘোর শঙ্কটে, এদীন গোপালে,
 কর প্রভু ! নিস্তার ॥ ৪ ॥

(৬)

প্রভুপাদ !

এ জীব জগতে

মায়াবদ্ধ হ'য়ে

অনিতা সুখের আশে ।

অনর্থের রাশি,

করি উপার্জন,

যা'তে কৃষ্ণ-ভক্তি নাশে ॥ ১ ॥

আমি সে অধম,

পতিত পামর,

বিষয়-বাসনানলে ।

রবিতপ্ত মরু-

ভূমি সম হায়,

মোর চিত্ত সদা জ্বলে ॥ ২ ॥

ইচ্ছাময় তুমি,

করুণা করিয়া,

(মোর) চিত্ত বিত্ত সব হরি' ।

(মোরে) সিদ্ধ দেহ দিয়া,

তব পাশে রাখ,

(এই) পাপ দেহ নাশ করি' ॥ ৩ ॥

ভুবন মঙ্গল,

কৃষ্ণ-নাম দিয়া,

এ গোপালে কর ত্রাণ ।

তুমি দীনবন্ধু,

করুণার সিদ্ধু,

তুমি সে আমার প্রাণ ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

অবসর ও অনুবাদ সহ

“শ্রীশ্রীদামোদরধামকম্”

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পারিপূর্ণ অপূর্ব সংস্করণ ।

হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য ।

বৈষ্ণব মাত্রেয়ই সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য ।

ভিক্ষা—৥০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্য ।

মার্যাবাদের জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৮ পৃষ্ঠার পর)

ত্রিবিক্রমাচার্য

অচ্যুতপ্রেক্ষ তৎকালে মার্যাবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর, ত্রিবিক্রমাচার্য, পদ্মনাভাচার্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মার্যাবাদিগণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তীব্র সাধনা ও বিপুল প্রচার করেন। আনন্দ-তীর্থ মধ্বমুনি দক্ষিণ-কানারা জিলায় উড়ুপী গ্রামের সাত মাইল পূর্ব-দক্ষিণে পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বেদান্তের বৈতবাদ স্থাপন করিয়া মার্যাবাদের সমুদয় যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্যের সহিত উক্ত মার্যাবাদি-আচার্য-চতুষ্টয়ের সম্মুখ-বিচার হইয়াছিল। রামানুজাচার্য যেরূপ যাদব প্রকাশের নিকট শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ মধ্বমুনিও অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক অদ্বৈত-বাদাচার্যকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারের অভিনয় করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্যের বিচার ও ভজন প্রতিভায় অচ্যুতপ্রেক্ষ পরাস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য মধ্বাচার্যের সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইলেও তাঁহার স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। পদ্মনাভাচার্য ও ত্রিবিক্রমাচার্যের সহিত সম্মুখ বিচারে মধ্বাচার্য তাহাদিগকে অদ্বৈত-বাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-মতে আনয়ন করিয়া-ছিলেন। ত্রিবিক্রমাচার্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত আচার্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র নারায়ণাচার্য ‘মধ্ববিজয়’ ও ‘মণিমঞ্জরী’ গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য পরে মধ্বসম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি উভয়-দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই শ্রবণ করিয়া নারায়ণাচার্য শঙ্কর সম্বন্ধে ও মধ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জগৎকে জানাইয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর ও মধ্ব উভয় সম্প্রদায়েরই ত্রীনারায়ণাচার্যের গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। ‘মণিমঞ্জরী’ গ্রন্থ “মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত কোন আচার্য লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া সম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট”—এ প্রকার উক্তি সমিচীন নহে। এই সময়ে

দেখা যাইতেছে—মধবাচার্য তাঁহার বিচার-বৃত্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের প্রবল প্রতাপের দ্বারা শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যবরকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তাঁহারা সরলতা ও নিরপেক্ষতা প্রযুক্ত পূর্বকার মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত অঙ্গীকার করেন। অপর দুইজন বিচারে পরাস্ত হইলেও নিরপেক্ষতার অভাবে ও সংস্কার বশতঃ মায়াবাদের অন্তর্গত ক্ষীণধারা হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তৎকালে মায়াবাদ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাদী মধ্বের নিকট মস্তক মুগ্ধিত করিয়াছে।

“দ্বিতীয় শঙ্কর—বিষ্ণুরণ্য”

বিষ্ণুরণ্যের অপর নাম ‘মাধব’। তাঁহার পিতার নাম ‘সায়ন’। এই জন্ত কেহ কেহ বিষ্ণুরণ্যকে ‘সায়ন-মাধব’ও বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুরণ্য পাণ্ডিত্য প্রতিভায় এইরূপ উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে বিষ্ণুরণ্যের জায় পণ্ডিত অবৈতবাদিগণের মধ্যে আর কেহই আবির্ভূত হন নাই বলিয়া প্রকাশ। এবং তিনি শঙ্করের অবতার ও দ্বিতীয়-শঙ্কর বলিয়া মায়াবাদি-সমাজে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় মাধব সম্প্রদায়ে অক্ষোভ্যমুনির আবির্ভাব হয়। ইনি জায় শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত দ্বিতীয়-শঙ্করকে সমুখ বিচারে আহ্বান করেন। এবং বিচারকালে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত মহামতি শ্রীশ্রীবৈদ্যন্তদেকিশাচার্য্যকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ নিরূপণ করিয়া উভয়ই উভয়ের সহিত বিচার-সময়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে—মাধব-সম্প্রদায়ের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের ‘স্বয়ং ভগবানের অবতারত্ব’ ও ‘ভজনের বৈশিষ্ট্যাদি’ লইয়া বিশেষ বিবাদ চলিতেছিল। এমন কি, উভয় সম্প্রদায় মধ্যে কত্থা-পুত্রের আদান-প্রদান, শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইয়াছিল। বিষ্ণুরণ্যের জায়-শাস্ত্রে অধিক পাণ্ডিত্য না থাকায়, অক্ষোভ্য তীর্থের সহিত তাঁহার পরাজয় হইল। অক্ষোভ্য মুনির জায়-সম্প্রদায় বিচার-প্রসিতে বিষ্ণুরণ্যের মায়াবাদারণ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অক্ষোভ্য-বিজয় সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিত সমাজে নিম্নলিখিত শ্লোকটী সুপ্রসিদ্ধ আছে—

“অসিনা তত্ত্বমসিনা পর-জীব প্রভেদিনা।

বিষ্ণুরণ্যমরণ্যানি হক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥”

ইহার পর হইতেই বিষ্ণুরণ্যের প্রতাপ কমিয়া গেল। অক্ষোভ্য মুনি ও বিষ্ণুরণ্যের আবির্ভাব ন্যূনাধিক চতুর্দশ শতাব্দীতে।

জয়তীর্থ

তৎপর বৈষ্ণব-সমাজে জয়তীর্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়তীর্থ অকোভ্যমুনিরই শিষ্য। অকোভ্যমুনির রূপায় জয়তীর্থ একজন দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার রচিত ‘তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা’ নামী বেদান্তের ত্রিমাধবভাষ্য-টীকা ও ‘গ্রামসুখা’ নামক গ্রন্থ বিচার-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—“সুখা বা পঠনীয়া, বসুখা বা পালনীয়া।” তখন গুরুশিষ্য উভয়েরই প্রচণ্ড প্রচারফলে অদ্বৈতবাদ গিরিগহ্বরে লুকাইয়া হইল।

গৌড়পূর্ণানন্দ নামক মধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য “তত্ত্বমুক্তাবলী” বা মায়াবাদ-শতদূষণীতে মায়াবাদের একশত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থ “গ্রামামৃতম্” “ভেদোজ্জীবনম্” প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মধ্বাচার্য্যের প্রায় তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত বাদিয়াজতীর্থ (দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য) “বুত্তিমল্লিকা”, “পাষণ্ডমতখণ্ডনম্”, “সুখাটিপ্পনী” প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াবাদকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী মায়াবাদী মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতসিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোন বৈষ্ণবই অদ্বৈতবাদীর নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রাদ্ধ-মত-বিবেক (তিন)

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৯ পৃষ্ঠার পর)

বৃষোৎসর্গ

এক্ষণে আমরা রঘুনন্দন-স্মৃতি-শাস্ত্রধৃত ‘বৃষোৎসর্গাদি’-সম্বন্ধে একটু দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস পাইব। এই বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ প্রাচীন গৃহ-সূত্রের যুগে কাম্য বলিয়াই স্বীকৃত হইত। বিশেষ কোনও ফল লাভের জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহার নাম কাম্য-কর্ম। সুতরাং বৃষোৎসর্গ করা না করা, শ্রাদ্ধ-কর্তার স্বকীয় ইচ্ছাধীন ছিল। আধুনিক কালে স্মার্ত রঘুনন্দন জোর করিয়া ইহার নিত্যতা স্থাপনের বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি তামস অগ্নিপূরণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

“আগ্ন-শ্রাদ্ধে ত্রি-পক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।

বৃষোৎসর্গশ্চ কর্তব্যো যাবন্ন স্তাৎ সপিণ্ডতা ॥”

(শুদ্ধিতত্ত্ব—অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন-কৃত্য)

অর্থাৎ, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে, ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ মাসে ও সম্বৎসরে বৃষোৎসর্গ কর্তব্য, যদি অপকর্ষাদি হইয়া সপিণ্ডীকরণ না হইয়া থাকে। স্মার্তের অভিপ্রায় অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে বৃষোৎসর্গ নিত্য, অন্ত্যদিন কাম্য। পুনরায় শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দনই বলিয়াছেন—

শয্যাদানং বৃষোৎসর্গশ্চ শক্তেনাশৌচান্তে
মল-মাসেহপি অবশ্যং কর্তব্যং ॥

(শুদ্ধিতত্ত্বে বৃষোৎসর্গবিধি ব্যাখ্যায়)

এই নিজবাক্যে ‘শক্তেন’ পদ-দ্বারা ‘বৃষোৎসর্গ’ অসমর্থের পক্ষে অকরণীয় বলিয়াই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যাহা নিত্য, তাহা সকল সময়ে সকলের পক্ষেই করণীয়। সুতরাং ‘শক্তেন’ এই পদ দ্বারা বৃষোৎসর্গের নিত্যত্ব ব্যাচ্যুত হইয়াছে। কাশিরামও শুদ্ধি-তত্ত্বের টীকায় রঘুনন্দনের কথিত—

অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি যশ্চ নোৎসজ্যতে বৃষঃ ।

পিশাচত্বং ক্রবং তশ্চ দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব আশুশ্রাদ্ধ কালনির্ণয়)

—শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া তাহার নানা প্রকার দোষ ও অসঙ্গতি প্রদর্শন করত বলিয়াছেন—

অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গো ন নিত্যঃ, অকরণে কর্তুঃ প্রত্যবায়াজননাৎ ।

অর্থাৎ, অশৌচান্তে ‘বৃষোৎসর্গ’ নিত্য নহে। যেহেতু অকরণে কর্তার কোনও প্রত্যবায় হয় না।

এতদ্ব্যতীত ঐ শ্লোকটী কোনও পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না। যদিও দৃষ্ট হয়, তথাপি বৃষোৎসর্গ-করণে লোক-সংগ্রহ-হেতু উহা একটী ভয় প্রদর্শন মাত্র। যেখানে শুধু শক্ত বা সমর্থের পক্ষেই বৃষোৎসর্গের বিধান (পরে দেখান হইবে রাজা মহারাজা ব্যতীত বৃষোৎসর্গ করণে কেহই সমর্থ নহেন) সেখানে সকলের পক্ষেই বৃষোৎসর্গ না করিলে পিশাচত্ব লাভের ক্রব আশঙ্কা অলীক। এতদ্ব্যতীত আশু-শ্রাদ্ধাদি সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধের ফলেই প্রেতত্ব বিমুক্তি ঘটিয়া স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে—ইহা স্মৃতি শাস্ত্র সম্মত। সুতরাং বৃষোৎসর্গের অতিরিক্ত প্রশংসা-মূলক এই শ্লোকটী প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও, আধুনিক কালে ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয় হওয়া উচিত।

বৃষোৎসর্গের শক্তাশক্ত বিচার করিতে হইলে, প্রশ্ন উঠিবে শক্ত কে? নীলবর্ণ-নীরোগ বলিষ্ঠ বৃষের শৃঙ্গ স্বর্গদ্বারা, ক্ষুর-চতুষ্টয় রৌপ্য দ্বারা, পৃষ্ঠদেশ তাম্র

দ্বারা ও ক্রোড়দেশ কাংশুদ্বারা মণ্ডিত করিতে হইবে ; এবং তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইতে হইবে । বৃষের সঙ্গে ৮টি বা ৪টি বৎসতরীও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া দিতে হইবে । ব্রহ্মা, হোতা, সদশ্রু ও আচার্য্যাদির বরণ এবং দক্ষিণাদি দিতে হইবে । অপরদিকে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রচুর গোচারণ ভূমি ও বৃহৎ বন-জঙ্গলাদি থাকাও দরকার । কারণ উৎসর্গীকৃত বৃষ তদীয় ভাৰ্য্যা বৎসতরীগণ সহ বংশবৃদ্ধিক্রমে দাতার অধীনস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে বা জঙ্গলে বসবাস করিয়া তাহাদের আহাৰ্য্য সংস্থান করিবে । অন্তের অধিকৃত স্থানে বা প্রান্তরে বিচরণ পূর্বক ক্ষেত্রস্থ তৃণ ভক্ষণ করিবার অধিকার ইহাদের নাই ।

এক্ষণে বিচার করুন এই জাতীয় বৃষোৎসর্গ কয়জন রাজা-মহারাজার পক্ষে সম্ভব ? অতঃপর আরও বিচার্য্য যে, বৃষোৎসর্গে শক্তাশক্তের বিচার থাকায় ইহাতে স্বৈরাচার মতে ‘অনুকল্পের’ বিধানও চলিতে পারে না । যেখানে ক্রিয়ার নিত্যত্ব বা একান্ত কর্ত্তব্যত্ব, সেখানেই ‘মক্ষভাবে গুড়ং দদ্যাৎ’ এই বৃত্তি খাটে । এতদ্ব্যতীত ‘দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি’ এই কথাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক । সুতরাং বৃষস্থলে পুং-বৎস ও বৎসতরী বাহা মিলে এবং নাম-মাত্র স্বর্গ, রৌপ্য, কাংশু ইত্যাদি অনুকল্পের বিধান কখনও চলিবে না । অন্যদিকে অজাত-শৃঙ্গ-বৎসের উৎসর্গ দ্বারা ‘বৃষোৎসর্গ’ কিরূপে হইতে পারে ? যে-বৎসের শৃঙ্গই হয় নাই তাহার শৃঙ্গই বা কিরূপে স্বর্গ দ্বারা মুড়ানো সম্ভব ? বৃষোৎসর্গের বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ও বৎসতরীগুনিকে তাহারই ভাৰ্য্যারূপে পরিকল্পনা করিয়া অর্চনা ও উৎসর্গক্রমে প্রার্থনা করা হয়—

ওঁ যাবন্তি সন্তি রোমানি তব তাসাক্ গোপতে ।

তাবদ্ বর্ষ-সহস্রানি স্বর্গে বাসোহস্ত মে পিতুঃ ॥

(পুরোহিত-দর্পণ-শ্রাদ্ধকাণ্ড-ধৃত যজুর্বেদীয় বৃষোৎসর্গবিধি)

অর্থাৎ, হে বৃষ ! তোমার দেহে ও এই বৎসতরীগণের দেহে যত লোম আছে, তাবৎ সহস্র বৎসর আমার পিতার স্বর্গে বাস হউক । অতঃপর পিতৃপুরুষের মঙ্গল হেতু এই সভাৰ্য্যা-বৃষকে নিজ দখলীকৃত প্রান্তরে ছাড়িয়া দিতে হইবে । ইহাদের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরই শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃ-পুরুষের ও নিজের মঙ্গল নির্ভর করে । বৎসতরীগণকেও বলা হয়—

“হে বৎসতর্য্যো বঃ (বুয়াকং) এনং পতিং ।

(স্বামিনং) সুবানং (ভরুণং) দদানি ।” (পুঃ দঃ ওর্থ খণ্ড)

অর্থাৎ হে বৎসতরীগণ ! তোমাদিগকে এই যুবক স্বামী দেওয়া হইল ।

পরে “যথেষ্টং যুথং পর্যট” অর্থাৎ যথেষ্ট যুথ এই ভূমিতে তোমরা পর্যটন করিতে থাক—এই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিতে হয়—

“ন খাদেঃ পর-শস্ত্রানি নাক্রামে গভিনীক গাং ।” (পুঃ দঃ ৪র্থ খণ্ড)

অর্থাৎ, বৃষের পক্ষে পরের শস্ত্র খাওয়া ও অপর গাভীতে গৈখুন নিষেধ । উক্ত ‘যথেষ্টং যুথং’ বাক্যে যথেষ্ট শব্দে ‘যথা ইষ্ট’, অর্থাৎ যথা ইচ্ছা পর্যটনের অর্থ গ্রহণ করিলেও শ্রাক কর্তার দখলীকৃত ভূমিতেই যথা-ইচ্ছা পর্যটন বুঝায় । কারণ যথেষ্ট অস্ত্রের দখলীয়া গোচারণ ভূমিতে বৃষ ও বৎসতরী গেলে “ন খাদেঃ পর-শস্ত্রানি” বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করা হইবে না ।

সুতরাং স্মৃতি শাস্ত্রানুযায়ী বৃষ ও বৎসতরীগণের চারণ নিমিত্ত যেখানে শ্রাক কর্তার স্বকীয় যথেষ্ট গোচারণ ভূমি নাই : সেখানে বৃষোৎসর্গ ব্যাপারটি গ্রহণনেই পরিণত হইয়া থাকে । যেখানে বৃষকে চতুষ্পাদ ধর্মরূপে পূজা করিয়া ছাড়িয়া দিবার বিধান সেখানে পুরোহিত মহাশয় ইহাকে আরও দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া যেখানে-সেখানে বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তাঁহার স্বকীয় জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন । এতদ্ব্যতীত এই বৃষের মুষ্ক-ছেদন, হল-চাষে ব্যবহার, এমন কি অর্থলোভে কোনস্থলে যবনোদরে প্রবিষ্ট হইবারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এবং চতুষ্পাদ ধর্মের পত্নীগুলিরও যদৃচ্ছা ব্যবহার হইয়া থাকে । ইহাতে—

অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতাবক্রোত্তিভিঃ পদৈঃ ।

ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিনায়োৎসৃষ্টন্তু নির্জনে ॥

তং কশ্চিদন্তো ন নয়েদ্বিতাজ্যঞ্চ যথাক্রমম্ ।

ন বাহুং ন চ তৎকীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ ॥

(ছন্দোগবৃষোৎসর্গতন্ত্র-ধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, বৃষোৎসর্গ হইলে পর, দাতা ব্রাহ্মণগণকে বলিবেন—আমি বাহা এই নির্জন স্থানে উৎসর্গ করিলাম, তাহা যেন কেহ বিভাগাদি পূর্বক (অর্থাৎ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া) গ্রহণ না করেন । এবং বৃষ ও বৎসতরীগণকে কেহ বাহক-রূপে (অর্থাৎ হল-শকট বাহন কার্য্যে) নিযুক্ত না করেন । এমন কি ? বৎসতরী-গণের মুষ্ক পান-করাও অবিধি । ইহার বিপর্যয় হইলে শ্রাকের দ্বারা মৃত পুরুষের কল্যাণ দূরে থাকুক, বিশেষ অকল্যাণ হওয়ারই স্বাভাবিক । সুতরাং এই জাতীয় শ্রাদ্ধে শ্রাককর্তারও বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা । শুধু তাহাই নহে—উক্ত ব্রহ্মপুরাণ বচনেরও সার্থকতা সম্পাদন হয় না । ক্ষণস্থায়ী

স্বর্গ কামনার এই জাতীয় প্রত্যাবাস্তক বরণ করিতে যাওয়া কি বুদ্ধিসঙ্গত ? এই জাতীয় প্রত্যাবাস্তক নীতি বহুকাল হইতেই সমাজে অহায় ভাবে চলিয়া আসিতেছে । ইহা জানিয়া শুনিয়াও কি সংশোধন করিতে পারা বাইবে না ? ইহার মূলে স্বার্থপরতা ও গোড়ামী ব্যতীত কোনও যুক্তি লক্ষ্য করা যায় না ।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মোৎসর্গের দ্বারা স্বর্গের পথে যাত্রা করিলেও স্বর্গে যাওয়ার আর একটি প্রবল বাধা অতিক্রম করিতে হইবে । 'বৈতরণী-দান'-প্রসঙ্গে দেখা যায়—শ্রাদ্ধকর্তা একটি সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিবেন । ঐ গাভীর পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া মৃত ব্যক্তি বৈতরণী পার হইবেন । সেই বৈতরণী কি প্রকার তাহা সকলের জানা আবশ্যিক—

যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী ।

তাক্ষ তর্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্ ॥

(শুদ্ধিতত্ত্ব বৈতরণী প্রসঙ্গে)

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা কুধিরাবহা ।

উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্তি-কেশা তরঙ্গিনী ॥

অর্থাৎ, যমদ্বারে দুর্গন্ধা, কুধিরাবহা, উষ্ণতোয়া, খরশ্রোতা, অস্তি-কেশমুক্তা, উত্তালতরঙ্গ-বিষ্ফুকা একটি ভীষণা নদী আছে । ঐ নদীর নাম বৈতরণী । আমি মস্তপূতা, একটি সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিতেছি । যেহেতু ঐ গাভীর পুচ্ছাবলম্বনে ঐ নদী পার হইয়া আমি স্বর্গে গমন করিব ।

মৃত ব্যক্তি যত বড় পুণ্যবানই হউন না কেন, এমন কি তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ হইলেও তাঁহাকে ঐ জাতীয় শ্রাদ্ধের ফলে স্বর্গ-পথের এই দারুণ দৃশ্য দর্শন, সত্তরণাদিরূপ দুঃখ বরণ করিতে হয় ।

ব্রহ্মোৎসর্গাদি শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে অন্তর্য

যাহা হউক যেখানে ব্রহ্মোৎসর্গের নিত্যতা বা যৌক্তিকতা খুজিয়া পাওয়া যায় না, সেখানে বৈতরণী-দানের অর্থাৎ কৃষ্ণাগাভী দানেরও প্রসঙ্গ নিরর্থক হইয়া পড়ে । এস্থলে আরও বিবেচনা করা আবশ্যিক যে, স্মার্তগণ বলেন আত্মাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ দ্বারাই মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব দূর হইয়া থাকে ; যথা—

প্রেত-সংস্কার-কর্মানি যানি শ্রাদ্ধানি ষোড়শ ।

যথা কালন্ত কার্যানি নান্যথা মুচ্যতে ততঃ ॥

কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাং পরম্ ।

প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপণ্যতে ॥ (শ্রাদ্ধতত্ত্ব-সপিণ্ডীকরণ)

যদি তাহাই হয় তবে “পিশাচত্বং ক্রবং তস্ত দত্তৈঃ শ্রাদ্ধ-শতৈরপি ॥” এই বাক্যের স্বার্থকতা কোথায়? এই বাক্যটি সত্য ও প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইলে ষোড়শ শ্রাদ্ধের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না, অথবা আত্মাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিলে বৃষোৎসর্গের কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং “অশৌচাত্তাৎ..... শ্রাদ্ধশতৈরপি” শ্লোকটি অমূলক, রঘুনন্দনের স্বকপোল-কল্পনা প্রসূত ও স্বার্থ-বিজরিত বাক্য বলিয়া মনে হয়। আরও বক্তব্য এই যে—স্মার্তগণের কৰ্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদির প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য স্বর্গ-প্রাপ্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই স্বর্গও “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি” গীতার এই বাক্যানুসারে অনিত্য। স্বর্গ হইতে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যে আগমন অনিবার্য। সুতরাং পরিণাম বিচার করিলেও দেখা যায়, স্মার্তের ঐ প্রকার যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপই শাস্ত্র-যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অলীক। এইজন্য বৈষ্ণব মতে স্মার্তের কৰ্ম্মকাণ্ডীয় সমস্ত ব্যাপারই সৰ্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। (ক্রমশঃ)

—শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি, কবিভূষণ
সাং বিরাট, পং জলন্তকা, (শ্রীহট্ট)

আগ্নিষ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ

শক্তি-পূজায় বলিদানের উদ্দেশ্য

শক্তি-পূজায় জীবহত্যা কখনও দুঃখ-বিমোচক সাত্ত্বিক ধর্ম্ম নহে। আমরা নানা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, শক্তিমাত্রেই ভগবৎ-অংশ-সমুত্তা বৈষ্ণবী। অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ ভিন্ন সেই শক্তির তৃপ্তি-সাধন হয় না। তবে আজকাল নিরীহ জীবকে বলিদান করিয়া যে শক্তি-পূজা করা হয়, তাহা তামসিক। শিব পুরাণে বর্ণিত আছে—একদিন মহাদেব কৈলাসে দেবীকে বলিয়াছিলেন—“হে দেবি! তুমিতো বৈষ্ণবী। বিষ্ণুর সহস্র-নাম পাঠ পূর্ণ না করিয়া আমার সহিত ভোজন করিতেও স্বীকার কর না। তবে তোমার ভক্ষণ তোমার পূজায় জীব-হত্যা করে কেন? যেখানে জীব সেখানেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। সুতরাং জীব-হত্যায় বিষ্ণু-হৃদয়ে আঘাত লাগিয়া থাকে। তোমার কি ইহা অভিমত?” শিবের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী জীব-ঘাতী নরগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন—

মদর্থে শিব ! কুব্ধন্তি তামসা জীব-ঘাতনম্ ।

আকল্প-কোটি-নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ, হে শিব ! তমোভূত ব্যক্তিসকল আমার ভৃষ্টি-সাধন নিমিত্ত আমার পূজায় জীব-হত্যা করিয়া থাকে । কিন্তু তাহারা ঐরূপ কার্যের দ্বারা কোটি-কল্পকাল নরকে বাস করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

এস্থলে দেবী নিজ স্বামীকে হে 'শিব !' এইরূপে 'নাম' উল্লেখ করিয়া সন্মোদন করায়, ইহাই বুঝা যায় যে—শিব-বাক্যে দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাহার সেই ভৈরবী নৃত্যের ভাব উদ্ভিত হইয়াছিল । আবার উক্ত শিব-পুরাণে আরো বলিয়াছেন—

যে মমার্চনমিত্যুক্তা প্রাণি-হিংসন-তৎপরাঃ ।

তৎ-পূজনং মমামেধ্যং যদোষাতদধোগতিম্ ॥ (শিব-পুরাণ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার 'পূজা'—এইরূপ নাম দিয়া কেবল জিহ্বার লালসে প্রাণী-হিংসায় তৎপর ; তাহার সেই পূজা আমার মল বলিয়া জানিবে, এবং সেই দোষে তাহার অধোগতি হইবে । আবার অত্র বলিয়াছেন :—

মদ্যাজেন পশুন্ হত্বা যঃ কুর্যাদ্রক্তকর্দমম্ ।

ভেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে ॥ (শিব-পুরাণ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার পূজার ছলে জীব-হত্যা করত রক্তে কর্দম করে, তাহা দ্বারা যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে আর নরকে গমন করিবে কে ? আবার বলিয়াছেন :—

উপদেষ্টা বধে হত্বা কর্তা ধর্তা চ বিক্রয়ী ।

উৎসর্গ-কর্তা চ জীবানাং সর্কেষাং নরকং ভবেৎ ॥ (শিব-পুরাণ)

অর্থাৎ, বধের জন্ত যে উপদেশ দেয়, যে জন হত্যা করে, যে ব্যক্তি পশুকে ধরে, যে সেই কার্যের কর্তা, যে জন পশুকে বিক্রয় করে এবং যে পুরোহিত মন্ত্র-পাঠ করিয়া উৎসর্গ করে, তাহারা সকলেই নরকগামী হইবে । পদ্মোত্তর খণ্ডেও তদন্তরূপ প্রমাণ লিখিত আছে ।

দেবযজ্ঞে পিতৃ-শ্রাদ্ধে তথা মাজল্য-কর্ম্মণি ।

তস্মৈব নরকে বাসো যঃ কুর্যাজ্জীব-ঘাতনম্ ॥

অর্থাৎ, দেবযজ্ঞে ও পিতৃ-শ্রাদ্ধে, সেইরূপ যে কোন মাজল্যিক কর্ম্মে যে, ব্যক্তি জীব-হিংসা করে, সে-ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে বাস করে ।

পশু-হিংসা-বিধিযুক্ত পুরাণে নিগমে তথা ।

উক্তো রজস্বমোভ্যাং স কেবলং তামসাপি বা ॥ (পাদ্মোক্তরে)

অর্থাৎ, যে সমস্ত বেদ ও পুরাণে পশু-হিংসার বিধি লিখিত আছে, সেই সমস্ত শাস্ত্র রাজসিক ও তামসিক মিশ্রিত অথবা কেবল তামসিক শাস্ত্র বলিয়া জানিবে। হিংসা-মাত্রই তমোগুণ, তমোগুণ হইতেই সংসার-বিনাশ রূপ অকল্যাণ হয়। তবে বেদ ও পুরাণে এইরূপ বিনাশের হেতু তামসিক-বিধি দেওয়া হইল কেন? তাহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

লোকে বাবায়ামিব-মদ্য-সেবা, নিত্যাস্ত্র জন্তোৰ্ণ হি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতিস্তেবু বিবাহ-যজ্ঞ-শ্রাঘ্রহৈরাস্ত্র নিবৃত্তিরিষ্টা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১১)

অর্থাৎ, সংসারে প্রাণীমাত্রেরই স্ত্রী-সহবাস, আমিষ-ভোজন ও মদ্য-সেবা প্রভৃতি নিত্য স্বভাব। সুতরাং বেদ তাহা করিবার জন্ত বিধি দিবেন কেন? অর্থাৎ ঐরূপ বিধি বেদ কখনও দেন নাই। তবে কোন কোন শাস্ত্রে দেব-দেবীর পূজায় ও যজ্ঞে পশু-বলি, সৌত্রামণি যজ্ঞে মদ্যপান ও বিবাহ-শ্রুত্রে স্ত্রীর সহিত সহবাস ইত্যাদির যে বিধি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল আমিষ ভোজনাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে সৰ্ব্বতোভাবে দূরীকরণ হেতুই—জানিয়া রাখিতে হইবে। সুতরাং ঐ সমস্ত তামসিক কার্য শীঘ্র ত্যাগ করাই মঙ্গল জনক।

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামমুশাসনম্।

কৰ্ম্ম-মোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধন্তে হৃগদং যথা ॥ (ভাঃ ১১।৩।৪৪)

অর্থাৎ,—পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ একপ্রকারে স্থিত বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব গোপন করিবার জন্ত, অল্প প্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটা স্বভাব। সুতরাং সেই পরোক্ষবাদ-পূর্ণ বেদ যাহা উপদেশ দেন, তাহা বালক-শাসনের জন্য, যেমন মাতা-পিতা রোগগ্রস্ত অবাধ্য পুত্রকে তিক্ত ও কটু ঔষধ-সেবন করাইবার জন্ত খণ্ড, লড্ডুক অথবা মিষ্ট বস্তুর লোভ দেখাইয়া ঔষধ সেবন করায়, সেইরূপ করুণাময়ী বেদ-মাতা আমিষ-ভোজনাদি-স্বভাব-সিদ্ধ জীবগণকে ক্রমে ক্রমে তাহা ত্যাগ করাইয়া কৰ্ম্ম-বন্ধন মোচন করত ভক্তি-মার্গে আনয়ন হেতু এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

জীব মাত্রই ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন, চক্ষুদ্বারা রূপ ও সৌন্দর্যাদর্শন, কর্ণদ্বারা মধুর গান ও বাক্য শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ভাল গন্ধ গ্রহণ, চর্ম্মদ্বারা কোমল ও মসৃন স্পর্শন প্রভৃতি বিষয়-স্বথভোগে চিত্তবৃত্তি মগ্ন থাকাহেতু সংসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু মূঢ় জীব বালকের স্থায় বুরিতে পারে না যে ইহাতো

পারমাণিক নিত্য সুখ নহে—মায়া-কল্লিত ক্ষণিক সুখ মাত্র। ‘আমি’ নামক পদার্থটি দুঃখের অতীত সুখময় চিৎবস্তু। এই সমস্ত দেহাদি ইঞ্জিয়-ব্যাপারগুলি মায়া-কল্লিত স্বপ্নতুল্য। যতদিন ইঞ্জিয়-সমূহকে সাধনদ্বারা দমন করিয়া বিষয়-ভোগ হইতে চিত্তবৃত্তিকে ফিরাইতে না পারিবে, ততদিন জীবের পারমাণিক নিত্য সুখ লাভ হইবে না। সেইজন্য বেদ স্বভাব-সিদ্ধ বিষয়-সুখে মগ্ন জীবগণের কানকূটরূপী বিষয়কে অল্লে অল্লে ছাড়াইয়া পারমাণিক নিত্য সুখ দিবার জন্য বালক-শাসনের ন্যায় উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব পশু-পক্ষী বলিদান করিয়া জিহবার তৃপ্তি সাধন করা—বেদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং ‘আত্ম নিবৃত্তিরিষ্টা’-ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমস্ত তামসিক স্বভাব হইতে শীঘ্র নিবৃত্তি হওয়াই জীবের পরম মঙ্গল।

মৎস্য ও মাংস-ভোজীর পরিণাম

যে ত্বনেষষিদোহসন্তুঃ শুক্লাঃ সদভিমানিনঃ।

পশুন্ দ্রুহন্তি বিশ্বকাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।১৪)

অর্থাৎ, যে সকল সাধুস্বাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিগণ হিংসার এইরূপ পরিণাম না জানিয়া নির্ভয়ে পশু হিংসা করে, পরকালে সেই পশুই পুনরায় তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এইরূপ শাস্ত্রের অনুজ্ঞা না জানিয়া যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পশুগণের প্রাণ বধ করে, তাহার পরজন্মে সেই সকল হিংসিত পশু ঐ বধকারীকে বধ করিয়া তাহার মাংস খাইয়া থাকে। “মাংস ভক্ষয়িতা” এই পদটির মধ্যে তিনটি শব্দ আছে যথা—‘মাং’—আমাকে, ‘জঃ’—সে, ‘ভক্ষয়িতা’—খাইবে। আমি ইহকালে যাহার মাংস খাইতেছি, পরজন্মে সে আমার মাংস খাইবে। ইহা দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হি মহারাজকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তিনি যোগবলে যজ্ঞে হিংসিত পশুর পরজন্মাবস্থা বিদিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে রাজন্! তুমি যজ্ঞে যে সকল পশুর দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়াছিলে, ঐ দেখ তাহারা তোমার কৃত হিংসা স্মরণ করিয়া, তোমার মাংস ভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা বিদিত হইয়া প্রাচীনবর্হি মহারাজ সেই যজ্ঞরূপ হিংসা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

মাংস ভোজন অপেক্ষা মৎস্য ভোজন আরও বেশী বিপজ্জনক ; যে হেতু—

হত্বাহত্বা তু মৎস্যানী সর্কেষাং যো বিশেষতঃ।

মাংসাদঃ প্রাণিনাং দোহপি তস্মান্নমৎস্যং পরিত্যজেৎ ॥ (পদ্ম পুঃ)

অর্থাৎ, বিশেষতঃ বাহারা মৎস্য বধ অথবা মৃত মৎস্য সংগ্রহ করিয়া ভোজন করে, তাহারা সমস্ত প্রাণি-মাংসেরই ভক্ষক হইয়া থাকে সেইজন্য মৎস্য ভোজন অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। মনুসংহিতাতেও লিখিত আছে, যথা—

যো যন্ত মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে ।

মৎস্তাদঃ সর্ব-মাংসাদস্তন্মাংসান্ বিবর্জয়েৎ ॥

(মনুসংহিতা ৫ম অঃ ১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ, যে বাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংস-ভোজী বলে ; যেমন বিড়ালকে মুষিকভোজী বলে। কিন্তু মৎস্য-ভোজীকে ‘সর্ব-মাংস’-ভোজী বলে। একমাত্র মৎস্য ভোজন করিয়াই সকল-মাংস-ভোজী হওয়া, মহাপাপ। অতএব ইহা অবশ্য বর্জন করিবে। মনুসংহিতার প্রধান ভাষ্যকার ‘মেধাভিথি’ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মৎস্যভোজীকে গো-মাংস-ভোজী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। “যন্তু মৎস্তাদঃ স সর্বমাংসানী ভবতি। গোমাংসাদ ইত্যপি ব্যপদেষ্টুং যুক্তঃ।”

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়—

ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবানামভক্ষ্যং মৎস্যমেব চ ।

ইতরেষামভক্ষ্যঞ্চ পঞ্চ-পর্বন্তু নিশ্চিতম্ ॥

শ্বেতবর্ণঞ্চ তালঞ্চ মসুরং মৎস্যমেব চ ।

সর্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ত্যাজ্যঞ্চ সর্বদেশতঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মৎস্য একেবারে অভক্ষ্য। ইহারা ভিন্ন অন্য সাধারণ লোকগণের অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব দিনে মৎস্য নিশ্চয় অভক্ষ্য। এতদ্বিন্ন শ্রীএকাদশী, রবিবার প্রভৃতি দিনেও মৎস্য-ভোজন অবশ্য পরিত্যাজ্য। শ্বেতবর্ণ তাল, মসুরডাইল ও মৎস্য এগুলি সকল দেশের সর্ব মনুষ্যের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের অবশ্য পরিত্যাজ্য ॥

‘মৎস্তাশিতা’—এই পদেও তিনটী শব্দ আছে ; যথা—‘মৎ’ মদীয় মাংস, ‘স্ত্য’ সেই জাতীয় সকল, ‘আশিতা’ খাইবে। আমি ইহকালে যে-মৎস্যকে খাইতেছি, পরকালে মদীয় মাংস সেই মৎস্য জাতীয়েরা খাইবে। আমি যে মৎস্যকে খাইতেছি, কেবল সেই মৎস্য দ্বারা আমি ভক্ষিত হইব—এমন নহে, মৎস্য জাতিমাত্রই আমার মাংস খাইবে। ইহাই ‘মৎস্তাশিতা’ শব্দের তাৎপর্য। এক পশুর মাংস খাইলে পরজন্মে সেই পশু আমাকে খাইবে। সুতরাং এক ‘মৎস্য’-জাতিকে খাইলে যখন সমস্ত পশুরই মাংস খাওয়া হয়, তখন সমস্ত পশু

মিথিয়া আবার মাংস খাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে মৎস্য-ভোজন নিষিদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত আছে সেই সমস্ত লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা বর্তমানে অনাবশ্যক মনে করি। কারণ, যে-প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলোচ্চু ব্যক্তিগণের পক্ষে যথেষ্ট।

জগতে অজ্ঞ, তদ্বজ্ঞ ও মধ্যবর্তী এই ত্রিবিধ লোক বিद्यমান। অজ্ঞ ব্যক্তির তদ্বজ্ঞগণের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া সংসার উত্তীর্ণ হয়, আর তদ্বজ্ঞগণ নিজেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞও নহে, আর একান্ত তদ্বজ্ঞও নহে, এইরূপ মধ্যবর্তী বিবরাসক্ত মানবগণেরই পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। তাহার কারণ, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি আপাত সুখদায়ক বিষয় নমূহের চর্চায় প্রমত্ত থাকায় প্রকৃত মঙ্গল-লাভের জন্ত সাধন করিবার অবসর পায় না। সুতরাং তদ্বজ্ঞান বা ভক্তি লাভের উপায় স্বরূপ শ্রীহরিকথা শ্রবণের ভাগ্য কোথা হইতে পাইবে? একদিকে যেমন শ্রীভগবানে আসক্তি আসিলে, কাণে অগ্র কথা প্রবেশ করে না; অন্যদিকে, বিষয়ে আসক্তি থাকিলে তদ্রূপ ভগবানের বার্তা হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ‘ভগবান্ আকাশের ন্যায় সর্বত্র বিরাজিত’ শাস্ত্রের এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তাহাকে যতই দৃঢ়ভাবে বুঝাও না কেন, সে তাহা কোনও প্রকারেই বুঝিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর লোককে ভাগবতে ‘আত্মঘাতী’ বলিয়াছেন। আত্মঘাতী লোক “অসূর্য্য” নামক তামসাত্মকাবে আবৃত (সূর্য্যহীন) দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসার দুঃখ ভোগ করে। অতএব হে কলির মানবগণ! অনিত্য দেহ লইয়া কয়েক দিন ভবের বাজারে আসিয়া পরকালে দুঃখজনক হিংসা বৃদ্ধির ফল ক্রয় করিয়া দুঃখের পর দুঃখ লাভ করা কর্তব্য নহে; সুতরাং জীব-হিংসা বা আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করাই অবশ্য কর্তব্য।

—শ্রীমদেবকুমার দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি বাসরে
দীনেত্র নিবেদন

হে তিথি অতিথি, সাথে লয়ে সাথী, সাজায়ে বীথির দ্বার ।
বরষের পরে' করুণার তরে, এসো তুমি বার বার ॥

মহাভারতের, মনীষী সূতের, গুরু-ব্যাস পূজা গান ।
নিতাই দয়ায়, মিলে যা হেথায়, তাই তুমি কর দান ॥

“রসো বৈ সঃ”—কৃষ্ণের দাস, স্বাধীন জীবের মান ।
মায়াবাদীর, কু-মেধা-অধীর, বুঝে না তাহার কাণ ॥

কৃষ্ণ-সেবার, সেই সদাচার, গোউর হরির গানে ।
গোপী প্রেমের, -ব্যা না মের, ভাসাক সুধীর জনে ॥

মহাযোগী এই, গাহিলেন যেই, জয় হোক তার ধাম ।
শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁর নাম ॥

শিরে বহি ভার, গঞ্জনা সার, এখনও সেবক তাঁর ।
করিয়া প্রচার, কত না মায়ার, পারাবার করে পার ॥

এ হাট ভাঙ্গিলে, কেঁদে আখি ভলে, কেহ না তারিবে আর ।
সাধ্য-সাধন, শাসন বচন, না শুনাবে সমাচার ॥

(তাই) আবির্ভাব, তিথি তব ভাব, যদি মোরে কৈলে যায় ।
দিয়ে তিরোভাব, ‘বেদনা অভাব’ কেন বা আবার চায় ॥

গুরুর অভাব, অনুভব ভাব, নাহি যদি জাগে মনে ।
কহ গো, হুজের, সাধনে সাজের, অধিকার কার সনে ?

জগতের হিতে, এসো যদি দিতে, বিরহের উপহার ।
(ও) মিলন বিহীনে, বিরহ আগুণে, জ্বালিও না মোরে আর ॥

প্রতি-ক্ষণে ক্ষণে, তব শ্রীচরণে, আজি তাই নিবেদন ।
তব দয়া ধারা, কোটি গ্রহ তারা, কর মোরে সুপালন ॥

কোটি নতি লই, তোমাতে জানাই, পুনঃ করি বিলপন ।
এ ধরার পরে, মরি ঘুরে ঘুরে, দাও গো গৌর জন ॥

দাসাত্মদাস

—ত্রিভক্তি স্বামী শ্রীমদভক্তি বেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার ও উর্জ্জবতের নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

তাং—ইং ১৬।৮।৫৪

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামে উর্জ্জ-
ব্রত পালন উপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট আয়োজন
করিয়াছেন। উক্ত সেবানুষ্ঠানের মধ্যে সমিতি শ্রীশ্রীমথুরাধামে
একটি মঠ-মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্কল্প
করিয়াছেন। আগামী ২৫শে আশ্বিন ১৩৬১, ১২ই অক্টোবর
১৯৫৪, মঙ্গলবার হইতে ২৪শে কার্তিক, ১০ই নভেম্বর, বুধ-
বার পর্যন্ত উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমা হইবে। তজ্জন্ত ২২শে আশ্বিন
৯ই অক্টোবর, শনিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৮।০ (৭)
টার ট্রেনে রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা করা হইবে। আমরা ধর্মপ্রাণ
সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব
সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি— নিবেদক—

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ।

নিয়মাবলী :—

- ১। উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমার ন্যূনাদিক ৩০ দিন সময় লাগিবে।
- ২। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ, হাওড়া ষ্টেশন হইতে
যাত্রাভাত ট্রেনভাড়া ও মোটর ভাড়া প্রভৃতি খরচের জন্য
১৬০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।
- ৩। মোটর বাসে পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্ত পৃথক ব্যয় লাগিবে না।
- ৪। যাত্রীগণ সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা, চাদর ও জামা
সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টি ঘটি ও ১টি বাটী লইবেন।
- ৫। যাত্রীগণকে ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বেই
দেয় ভিক্ষার মধ্যে ৬০ টাকা ত্রিদিগ্বিশ্রামী শ্রীমন্তজিপ্রভতান
কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।
- ৬। অগ্রিম ৬০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ২২শে আশ্বিন, ৯ই
অক্টোবর শনিবার—বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে হাওড়া
ষ্টেশনে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।
- ৭। যাহারা অন্ত্যাত্ম তীর্থস্থান দর্শন করিতে ইচ্ছুক এবং উর্জ্জব্রতের
সমাপ্তি পর্যন্ত থাকিতে অনমর্থ, তাহারা অন্ততঃ ১৩ই আশ্বিন,
৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে জানাইলে পৃথক বন্দোবস্ত করা হইবে।

শ্রীমদ্ভক্তপ্রভু ও রূপসনাতন

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুস্থানে সনাতনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা

অথাপি তে দেব পদান্বজয়-

প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্বহিয়ো

ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্তন ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২৯)

হে দেব, তোমার পাদ-পদম্বয়ের রূপা-লেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ ; কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্র বিচার করিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই তোমার সেই তত্ত্ব জানিতে পারে না । গীতায় দেখা যায়—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদ গুরুর চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি নিয়া উপস্থিত হইলে, গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাস্ত ব্যক্তিকে জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন । শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবান্ কাহাকেও কোন বিষয়ের প্রেরণা প্রদান করেন না । গীতাশাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ।

তেষাং নক্ততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রাপ্তিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ (গীঃ ১০।১০)

তাহারা ভগবানে প্রাণ, মন, দেহাদি সমর্পণ করিয়া, একাগ্রচিত্তে প্রীতিসমন্বিত তঁাহার আরাধনা করেন, ভগবান্ তঁাহাদিগকেই সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন ।

অতরাং তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রধান লক্ষণই শরণাগতি । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র তঁাহার একান্ত শরণাগত ভক্ত অর্জুনের দ্বারা স্বেচ্ছায় মোহগ্রস্তের অভিনয় করাইয়া তঁাহার নিকট শিক্ষা দিয়াছিলেন—

কার্পণ্য-দোষোপহতম্ভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংযুচেতাঃ ।

যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রানিচ্ছিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ (গীঃ ২।৭)

অর্থাৎ, আমি কার্পণ্য-বশতঃ প্রকৃত ধর্ম সন্মুখে বুদ্ধিবিমূঢ় হইয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে বাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দাও । আমি শরণাগত হইয়া তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম ।

সনাতন গোস্বামী স্বয়ং মূর্খমান্ শাস্ত্র হইয়াও দৈন্ত ও বিনয় সহকারে দত্তে তুণ ধারণ করিয়া শ্রীমদ্‌মহাপ্রভুর চরণে গীতা-বাক্যের আদর্শ দেখাইয়া পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।

দৈন্ত বিনতি করে দত্তে তুণ লঞা ॥

‘নীচজাতি, নীচ-সদী, পতিত অধম ।

কু-বিষয়-কূপে পতি’ গোড়াইলু জনম ॥

আপনার হিতাতিত কিছুই না জানি ।

গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥

কৃপা করি’ যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ।

আপন-‘কৃপাতে’ কহ কর্তব্য আমার’ ॥

কে আমি কেন আমার জারে তাপত্রয় ।

ইহা নাহি জানি—কেননে ‘হিত’ হয় ॥

‘সাধ্য’, ‘সাধন-তত্ত্ব’ পুচ্ছিতে না জানি ।

কৃপাকরি’ সব তত্ত্ব কহত’ আপনি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯৮-১০৩)

সনাতন গোস্বামী বলিলেন,—

‘হে প্রভু, আমি নীচের মঙ্গ প্রভাবে বিষয়কূপে পতিত হইয়া সমস্ত জীবন কাটাঁয়াছি, আপনি আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধ্য বা সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেও আমার অধিকার নাই । আমি তদ্বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহি । ‘আমি’ কে ? ‘আমি’ বস্তুটাই বা কি ? আমাকে কেন প্রতিনিয়তই আধ্যাত্মিক, আধি-তৌতিক ও আধি-দৈবিক—এই তাপত্রয় জর্জরিত করিতেছে, ইহারই বা কারণ কি ? আমার কর্তব্য কি ? কি করিলে আমি প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারিব ?—এই সমস্ত বিষয় এবং আরও বাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন তাহাও আমাকে উপদেশ করুন ।’ আমার পক্ষে কোন্টী হিত বা কোন্টী অহিত তাহা কিছুই আমার জ্ঞান নাই ।

মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর দৈন্তোক্তি ও অসাধারণ বৈরাগ্য দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং প্রচুর কৃপা করিলেন—

প্রভু কহে,—“কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ।

সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্ব-ভাব ।

জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইতে ।

ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৪-১০৭)

সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—সনাতন ! তুমি, জল, আকাশ, তেজ ও বায়ু দ্বারা সংঘটিত এই জড় শরীরটী কি তুমি ? না, তাহা নহে । কিম্বা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারস্বরূপ যে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরই কি তুমি ? না, তাহাও নহে । সনাতন ! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সম্পূর্ণরূপেই কৃপা করিয়াছেন । তুমি সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞাত আছ । তুমি নিজেও ত্রিতাপ দগ্ধ নহ । তুমি তাপ রহিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হইয়াও ইন্দ্রিয় প্রশ্ন করিয়াছ । তাহা কেবল তোমার জ্ঞাতব্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্যই । সাধুগণের স্বভাবই এই প্রকার, তাঁহারা জ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন ।

সদ্ধর্ম্মশ্রাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ।

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিদ্ধতোযামভীপ্সিতঃ ॥ (নারদীয় পুরাণ)

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য ঐহাদের দৃঢ়ামতি, তাঁহাদের শীঘ্রই আভীপ্সিত সর্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে । সনাতন ! তুমি ভক্তিমার্গ প্রবর্তনের যোগ্যপাত্র । আমি তোমার নিকট ক্রমে ক্রমে সকল তত্ত্বই বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

জীবের স্বরূপ বিচার

হে সনাতন !—

জীবের ‘স্বরূপ’ হয় কৃষ্ণের ‘নিত্যদাস’ ।

কৃষ্ণের ‘তটস্থ-শক্তি’, ‘ভদাভেদ-প্রকাশ’ ॥

সূর্য্যাংগু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার ‘শক্তি’ হয় ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১১)

জীব স্বরূপতঃই কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্য-

সীমায় অবস্থিত, উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, জীব তটস্থ শক্তি। কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য-ভেদ ও নিত্য-অভেদ, উভয়বিধ সম্বন্ধই যুগপৎ সিদ্ধ। জীব অণু, শ্রীকৃষ্ণ বিভূ ; জীব মায়াদ্বারা আক্রান্ত, ভগবান্ মায়াধীশ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—

একদেশস্থিতশ্রীগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরশ্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তুত্বেনমখিলং জগৎ ॥ (বিঃ পুঃ ১।২২।৪২)

একস্থানস্থিত অগ্নির আলোক বা জ্যোৎস্না বেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎকে সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

জীব চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের অংশ-কিরণ ; অথবা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির বিস্কুলিঙ্গরূপ জ্বালাচয়। সূর্য্য একস্থানে অবস্থান করিয়াও সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করেন, একস্থানস্থিত অগ্নির উষ্ণতা বা আলোক বেরূপ বিস্তৃত ; পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি চতুর্দশ ভুবনে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। জীবগণের ভাবনার অতীত, অচিন্ত্য ও জ্ঞানাগোচর শক্তি সকল পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধা ; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিরই নামান্তর অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি ; তাহা হইতে স্বীয় ধাম-পরিকরাদি ও মায়াশক্তি হইতে জড় জগতের প্রকাশ। জল ও স্থল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থলই যেমন তট নামে খ্যাত সেইরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থ শক্তিই জীবশক্তি। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া পতিত হইয়া জড় মায়ার দাসত্বে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, আবার স্বতন্ত্রতার সদ্যবহার করিয়া চিজ্জগতের পরম মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দে নিজকে নিযুক্ত করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেও সমর্থ। জীব স্বপ্রকাশ ভাব হইতে বিচ্যুত হওয়াতেই জড় মায়ার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সংসার দুঃখ ও ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট হইতেছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

শৌক জাতি ও গুণগত জাতি

নিবারণ বাবু বৈষ্ণবকূলে উদ্ভূত হইয়াছেন, আমরা পূর্বেই জানাইয়াছি। সামাজিক হিসাবে জাতির উচ্চতা ও নীচতা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; যদিও বর্ত্তমান যুগে এই জাতিগত বৈষম্যের সহুদেগ্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া

হুংমার্গের একাকার পন্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা বাইতেছে। অবশ্য জাতিগত-বৈষম্য পূর্বকালে স্বভাব ও কর্মানুসারে গুণ বিচার করিয়া নিরূপিত হইত। বর্তমানে এই গুণ-কর্মের বিচার উঠিয়া যাওয়ায় জাতীয় বিচারটি শৌক্ৰ-বংশানুসারে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা এই বংশানুসারে জাতি বিভাগের পারমাণ্বিক মূল্য বিন্দুমাত্র দিতে প্রস্তুত নহি। তথাপি বর্তমান সাউডীর সহজিয়া দলের আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের পাণ্ডাদের বংশ-গৌরব মুখোস খুলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ নিবারণ বৈজ্ঞানিক চক্ষুলাজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া মুখোস খুলিয়া আলোচনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

সাউডীর দলে শৌক্ৰবর্ণের আদর

সাউডীর আড্ডাখানা হইতে যে সমস্ত মতবাদ জগৎ ধ্বংসের কারণরূপে প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরোধিতা অন্যতম। তাঁহার অযথা বলেন যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দৈব বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুমোদন করেন নাই। তাহার প্রমাণস্বরূপ ব্যাণ্ড-কোম্পানীর একখানা সার্টিফিকেট (Certificate) জারি করিয়াছেন। সাউডী কোম্পানী জানেন না যে ব্যাণ্ড-কোম্পানীর কোন কথাই সাধু-সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণ অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর অভিমত ব্যবসা ক্ষেত্রেই ভাল; ধর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বামন হইয়া টাঁদে হাত দেওয়ার ছায়। বাহা হউক আমরা পৌরাণিক ঘটনা হইতেও জানি যোগমায়াদেবী তাঁহার মহামায়া দ্বারা শুভ দৈত্যকে নিধন করাইয়াছিলেন। সুতরাং এইশ্রেণীর অসুর দলনের জন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক করে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি শতুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন কি? তাঁহার বাড়ীতে ত সবরকমই চলে। আমরা তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 'শুভ নিশুভবধ' প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

সাউডীর সহজিয়াদের অবৈধ প্রশংসাপত্র সংগ্রহ

আমরা সাউডী-সভ্যের সভ্যগণের প্রতি পাঠকবর্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সাউডীর রাসলীলা কোম্পানীর পাণ্ডাগণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন—সকলেই অবৈধ প্রাকৃত রাসলীলাকারী, একস্থানে সমবেত হইয়া ধর্ম (?) প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাসবিহারী দাস নামক একটা চরিত্র-হীন ব্যক্তিকে চার সম্প্রদায়ের মহান্ত সাজাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে

একটা 'ফতোয়া' জারি করা হইয়াছে। আমরা তাহার নিকট ভদ্রভাবে পুনঃ পুনঃ পত্র দিয়াও তাহার কোন উত্তর পাই নাই। আমরা সেই পত্র গোড়ীয় পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬৮-৪৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমান্ রাসবিহারী এই পত্রের জবাব দিয়া ভদ্রতা রক্ষা করেন নাই। পরে জানিলাম তিনি ঐরূপ শ্রেণীরই ব্যক্তি; ভদ্রতা তাহার নিকট আশা করা অত্যাশ। অধিকন্তু জানা গেল যে ঐলোক ঘটিত বহু ব্যাপারের জন্য তাহাকে চার সম্প্রদায়ের মহাস্ত পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এবং তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারপত্র (Hand Bill) বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মধ্যে দুই প্রকার ছাণ্ডবিল প্রাপ্ত হইয়াছি। ছাণ্ডবিলদ্বয় হিন্দী ভাষায় লিখিত; সুতরাং আবশ্যিক মত আমরা উহার অনুবাদ করিয়া উহার মর্ম্ম সকলকে জানাইয়া দিব। আরও শুনা যায়, এই ছাণ্ডবিলের মর্ম্মানুসারে ইউ. পি. প্রদেশের শাসনকর্তা গভীর তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"। সাউডীর পাণ্ডা কয়টির এমন অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছে পাঠকগণ দেখিলেই চমৎকৃত হইবেন। একদিকে উহাদের প্রধান পাণ্ডা পঞ্চানন তেলী, তাহার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া রজকিনী। অন্যদিকে রাসবিহারী দাস, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবারণ গুপ্ত মহাশয়, প্রমোদ-প্রমোদিনী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যকুলের উপদ্রবের ইতিহাস

আমরা বর্তমানে নিবারণ গুপ্তের ইতিবৃত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। নিবারণ বাবু যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার কুলজী হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম—

একজন ব্রাহ্মণ-মহিলা ধর্ম্মোপার্জনের জন্য তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে একাকিনী পাইয়া তাঁহার নিকট অসৎ প্রস্তাব করেন। ব্রাহ্মণ-মহিলা প্রচুর পরিমাণে আপত্তি করিয়াও অশ্বিনীকুমারকে নিরস্ত করিতে না পারায় শেষে ঘৃণা ও লজ্জায় উর্দ্ধ্বাশ্রমে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বিনীকুমার সেই মহিলাটিকে পলাইয়া যাউতে দেখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া কোন বনের মধ্যে লইয়া যায়। তথায় স্বরূপক অশ্বিনীকুমারের অসৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে মহিলা তীর্থভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তাঁহার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া দেন। তাঁহার স্বামী এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। এই ব্রাহ্মণ-

মহিলার পুত্র হইতেই অশ্বষ্ঠ বা বৈজ্ঞাতি প্রকাশ হইয়াছে। এইরূপ বর্ণ-
সঙ্করের ইতিহাস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বেক্রপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বঙ্গানুবাদ
সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বৈজ্ঞাতি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

বর্ণসঙ্করদোষেণ বহব্যশ্চ শ্রুতজাতয়ঃ ।

তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বাক্যং ক্রমো দ্বিজ ॥

বৈতোহশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিশ্রয়োযিতি ।

বৈজ্ঞবীর্ষ্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ ॥

তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ নন্দ্রৌষধিপরায়ণাঃ ।

দেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যালগ্রহিণো ভুবি ॥

শোনক উবাচ

কথং ব্রাহ্মণ-পত্ন্যাক্ত সূর্যপুত্রোহশ্বিনীমুতঃ ।

অহো কেন বিপাকেন বীৰ্য্যধানং চকার হ ॥

সৌভিকবাচ

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ ।

দদর্শ কামুকঃ শাস্তঃ পুষ্পোদ্যানে চ নির্জনে ॥

তয়া নিবারিতো যত্নাদ্ বলেন বলবান্ সুরঃ ।

অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীৰ্য্যধানং চকার সঃ ॥

ক্রতং ততাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ।

সন্তো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাক্ষনসন্নিভঃ ॥

সপুত্রা স্বামিনো গেহং ভগাম ব্রীড়িতা তদা ।

স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবমঙ্কটম্ ॥

বিপ্রো রোষেণ ততাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্ ।

অর্থাৎ—এই প্রকার বর্ণসঙ্কর-দোষ জন্ম এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত
বহুবিধ জাতিই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সকলের নাম বা সংখ্যা
বলিতে কেহই সমর্থ নয়। মুনিবর! অনন্তর ব্রাহ্মণীর গর্ভে “স্বকৈবজ,”
অশ্বিনীকুমারের ঔরসে বৈজ্ঞাতির জন্ম হয় এবং সেই বৈজ্ঞ হইতে
ও শূদ্রার গর্ভে বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলে গ্রাম্য
গুণাভিজ্ঞ ও নন্দ্রৌষধি-পরায়ণ। পরে তাহাদিগের সহবাসে শূদ্রাসকল
যে সমস্ত সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহারাই ব্যালগ্রাহী (জাপুড়ে) নামে

বিখ্যাত। মহর্ষি শৌনক সৌতির এইরূপ বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্ময়াবিত হইয়া কহিলেন,—মুনে! কোন্ বিপাক হেতু কি-প্রকারে সূর্য্যপুত্র-অশ্বিনী-কুমার অসদৃশ ব্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিলেন, সন্নিবেশ বর্ণন করিয়া কোতূহল দূর করুন। তখন ঋষিসত্তম সৌতি কহিলেন;—(মুনিবর! দৈবের অসম্ভব ঘটনা। একদা সেই শান্ত প্রকৃতি বলবান্ সূর্য্যকুমার এক পরম-সুন্দরী ব্রাহ্মণীকে ‘তীর্থযাত্রায়’ গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় কামাসক্ত হইলেন, এবং বারংবার বহু যত্নে ব্রাহ্মণীকর্তৃক নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক নিকটস্থ এক পুষ্পোদ্যানে আনয়ন করত, তাঁহাতে উপগত হইয়া গর্ভাধান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণপত্নী লজ্জাভয়ে ভীত হইয়া সেই গর্ভত্যাগ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দৈবপ্রভাবে সেই রমণীয় পুষ্পোদ্যানে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ এক মনোহর পুত্র জন্মিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ-রমণী পুত্রস্নেহ-বশতঃ কুমারকে কোড়ে লইয়া লজ্জিতান্তঃকরণে স্বামিনিকটে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে যে দৈবঘটনা হইয়াছিল তাহা সবিশেষ কহিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ, অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রের সহিত নিজ ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন।

নিবারণ বাবুর পূর্ব্ব ইতিহাস প্রকাশের কারণ

নিবারণ বাবু এই বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গোড়ীয় বেদান্ত সমিতি শৌক পন্থায় বংশান্তরসারে কোন জাতি স্বীকার করেন না। প্রাচীনকালে ঐরূপ সৃষ্টির-প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও আজকাল ঐ পদ্ধতির প্রচলন সর্ব্বতোভাবে বন্ধ হইয়াছে। তথাপি আমাদের মতবিরোধ হইলেও নিবারণ বাবু বা তাঁহার দলের ইহা মতবিরুদ্ধ নহে। কারণ তাঁহাদের বিচার—যে যে-কুলে জন্মগ্রহণ করিবে সে সেই কুলেই আবদ্ধ থাকে। সে গুণ-কর্ম্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। আমরা বিচার করিয়া থাকি—চাতুর্বর্ণ্যঃ মায়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ (গীঃ)। আমরা আরও বিচার করিয়া থাকি—‘যদন্ত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দেশং’ (ভাঃ) সাউড়ীর সহজিয়াদের কাহাকেও গীতা-ভাগবতের বিচার মানিয়া চলিতে দেখা যায় না। যদি সেইরূপ দেখা যাইত তাহা হইলে তাহাদের পাণ্ডাদের নামে ও পদবীতে দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী, বনচারী বা সন্ন্যাসের অষ্টোত্তর শতনামের যে-কোন একটা নামের উল্লেখ দেখা যাইত। যেখানে বংশগত পদবীর উল্লেখ নাই, একটা ভক্তিসূচক উপাধি প্রকাশ করা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে নিজে নিয়কুলে উদ্ভূত হইয়া সাধারণের নিকট শ্রেষ্ঠ সাজিবার অভিপ্রায়ে নিজবংশ পদবী গুপ্ত রাখা

হইয়াছে। আমরা যে-কারণে নিবারণ গুপ্তের পূর্বপরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম তাহা পাঠকবর্গকে নিবেদন করিলাম। নিবারণ বাবু বৈষ্ণবপর নাম ত গ্রহণ করেন নাই পরন্তু তিনি তাহার পূর্ব বংশ-গৌরব প্রকাশ করিবার জন্যই 'দাসগুপ্ত' এই পদবী লিখিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাহার পূর্বপুরুষের ইতিহাস ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছি তাহা নিবেদন করিলাম। নিবারণ বাবুর যদি তাঁহার বংশের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিত, ভক্তিকেই যদি শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার বংশ-গৌরব প্রকাশ করিবার আবশ্যক মনে করিতেন না। আমরা তাঁহার পূর্ববংশের যে রীতি তাহার দুই-একটী তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়াই এতকথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ উল্লেখ করি—তিনি তীর্থের পাণ্ডাদের প্রতি যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ তীর্থভ্রমণকারিণী ব্রাহ্মণ-মহিলাটির সঙ্গে কোন পাণ্ডা থাকিলে নিবারণ বাবুর মূল পুরুষ অশ্বিনীকুমারের উক্ত মহিলার প্রতি অত্যাচার করিবার অযোগ্য হইত না। তজ্জন্তই নিবারণ বাবু গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কার্তিকব্রত উপলক্ষে সমগ্র ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে সাধু-সঙ্গে তীর্থ দর্শনের অযোগ্য প্রদানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তীর্থের পাণ্ডাগিরির বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া নিজ বংশ-মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—যে যে রূপ চিন্তাস্রোত লইয়া জীবন-যাপন করে সে সেইরূপ সঙ্গই খুজিয়া লয়। আমরা এ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৫ পৃষ্ঠায় গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গদোষ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। তবে এস্থলে বক্তব্য এই যে গুপ্ত মহাশয়ের সাউড়ীর সঙ্গ বাছিয়া লইবার কারণ অজ্ঞসন্ধান করিলে অশ্বিনীকুমারের ক্রিয়া-কলাপের কথা স্মরণ পথে আসে। কারণ সাউড়ীর সহজিয়ারা প্রাকৃত পারকীয় রসে ডগমগ হইয়া রাসলীলায় প্রমত্ত। অনধিকারী ব্যক্তি পারকীয় রসে রাসলীলা আলোচনা করিলে তাহারা চিত্ত কখনই স্থির রাখিতে পারিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। তাহারা যে অশ্বিনীকুমারের স্থায় অবৈধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। দাসগুপ্ত মহাশয়ের সাউড়ীর দলে ঢুকিয়া পড়ায় অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি সংরক্ষিত হইতেছে। শুধু অশ্বিনীকুমার নহে, পঞ্চানন তেলী ও রাসবিহারী দাসের মহিমাও বজায় রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

আসাম প্রদেশে প্রচার

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০০ পৃষ্ঠার পর)

গৌরীপুরে পাঠের বিচার

পাঠমুখে শ্রীল আচার্যদেব বলেন—তত্ত্ব-বস্তুর ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞার মধ্যে ভগবান্ সংজ্ঞাটাই চরম ও পূর্ণতা-জ্ঞাপক। কারণ ‘ব্রহ্ম’ ও ‘আত্মা’ সংজ্ঞা দুটিকে ‘পরম’-শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিতে দেখা যায়; কিন্তু ভগবৎ-শব্দের পূর্বে এইরূপ ব্যবহার নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা—অসম্যক ও অংশ জ্ঞাপক সংজ্ঞা কিন্তু ভগবান্ সংজ্ঞা স্বয়ংই শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব-প্রকাশক সংজ্ঞা। এইজন্য শাস্ত্রে কোথাও তাহার পূর্বে ‘পরম’-শব্দের উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষিত করে নাই। তিনি আরও বলেন—ভক্তিই মুক্তির স্বভাব; ব্রহ্ম-সাম্যজ্য বা ঈশ্বর-সাম্যজ্য জীবাত্মার জীবিতাবস্থা নহে, মৃতাবস্থা বলা চলে।

শালকোচা—১লা আষাঢ়, ১৬ জুন, বুধবার—সভাপতি মহারাজ সদলে গৌরীপুর হইতে শালকোচার অন্তর্গত কুমুড়ীগাঁও নিবাসী শ্রীযুত সহর সিং বর্মণ মহাশয়ের বাসভবনে মোটরযোগে শুভাগমন করেন এবং অপরাহ্নে চাঁদডিল্লী গ্রামস্থ উচ্চ পাহাড়ের উপরে আহত সভায় বৈষ্ণব-সদাচার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—“দ্যুতং, পানং, স্ত্রিয়ঃ সূন্য”—ইত্যাদি কলি-স্থান-গুলি ধর্মশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। শরীরে ময়লা মাখিয়া যেকোন দেবসেবা সম্ভবপর নয়, তদ্রূপ অসদাচার ও অসদবিচারযুক্ত থাকিয়া ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তিও অসম্ভব। সভাপতি মহারাজের বক্তৃতার পর ত্রিবিধ মহারাজ চারাচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন। গ্রামবাসীগণের একান্ত আগ্রহে পরদিবস ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখেও সভাপতি মহারাজ ‘সনাতন-ধর্ম’ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

চাপর—৩রা আষাঢ়, ১৮ জুন, শুক্রবার কুমুড়ীগাঁও হইতে আচার্যদেব চাপরে উপস্থিত হন। স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক ও শ্রীযুত গিরীন্দ্র চন্দ্র জুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রচারকগণকে বিদ্যালয় ভবনে থাকিবার স্থানদেন এবং সকলের প্রসাদাদির সুবন্দোবস্ত করেন। এই দিন আচার্যদেব বিশ্রাম করেন এবং পরদিবস ৪ঠা আষাঢ় সভাপতি মহারাজ অপরাহ্ন ৩ঃ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ঃ ঘণ্টাকাল সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতামুখে তিনি সদাচার ও নিরামিষ আহারের

আবশ্যকতা, বাধ্যতামূলক সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভগবদ্ বস্তুর সাকারত্ব ও তত্ত্বই পারমপুরুষার্থ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার আবশ্যকতা বলিতে গিয়া আচার্য্যদেব জানান যে এই সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার দ্বারা ভারতের অতীত গৌরব পুনরায় অর্জন করা সম্ভব হইতে পারে। অতীত ভারতের কি রাজনৈতিক, কি পারমাধিক সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব পাশ্চাত্য মনীষীগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আমেরিকান জ্যোতিষবিদ 'Adamsky'র উক্তিও সকলের নিকট প্রকাশ করেন। উক্ত জ্যোতিষবিদ বলিয়াছেন “আমরা বৈজ্ঞানিক জগতে যে উন্নতি লাভ করিয়াছি তাহা বুদ্ধি (intelligence) এর অনুশীলন দ্বারা ; কিন্তু প্রাচীন ভারত শব্দ (sound) এবং শরীর (physic) এর অনুশীলন দ্বারা এতদপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।”

ভগবানের সাকারত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন—নিরাকার কোন বস্তু হইতে পারে না, বস্তু স্বীকার করিলে তাহার রূপও অবশ্যই স্বীকৃত হয়। সর্বশাস্ত্রেই মুখ্য-ভাবে এই রূপকে প্রতিপাদন করিয়াছে। এমন কি, রূপ বিরোধী খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রেও ভগবানের রূপ স্বীকার করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের ‘হাদিসের আয়াতে’ পাওয়া যায়—‘ইল্লালাহা খালাখা মিন সুরাতি হি।’ Bible বদ্যে—‘God created men out of his own image !’ অষ্টকার সভায় তিন সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। শ্রোতাদের মধ্যে বহু মুসলমান শিক্ষিত যৌনভীও উপস্থিত ছিলেন।

বিচার-সভা

পরদিবস—এই আশাঢ় স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জনৈক গুরুত্বব শ্রীক্ষেত্র-মোহন চক্রবর্তীকে একটি বিচার-সভায় উপস্থিত হইতে বাধ্য করেন এবং তাঁহার মতবাদ শাস্ত্রসম্মত কি না তাহা সভাপতি মহারাজের সমক্ষে প্রমাণ করিতে বলেন। সভাপতি মহারাজও সভায় উপস্থিত হন এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের সমস্ত বিচার আশাস্ত্রীয় ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সকলের নিকট প্রমাণ করিলেন। সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতি অনাস্থাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্ত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন। চক্রবর্তী মহাশয় একজন উচ্ছৃঙ্খল অদ্বৈতবাদী। তিনি বিচারে পরাস্ত হইয়া সভা মধ্যেই সভাপতি মহারাজের আশুগত্য করিতে স্বীকার করেন। (ক্রমঃ)

—নিজস্ব সংবাদ

জ বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে ভ্রাতৃ-পরসন্ন ।

অন্য ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৬ষ্ঠ বর্ষ

গর্ভোদশায়ী, ৫ পদ্যনাভ, ৪৬৮ গৌরান্দ
শুক্লাব্দ, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬১ ; ইং ১৭৮১৫৪

৭ম সংখ্যা

শ্রী কৃষ্ণস্তুতিঃ

[জরাসন্ধ-কারাকঙ্ক-রাজগণ-ভাষিতা]

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নান্তিহরাব্যয় ।

প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নিবিবলান্ ঘোরসংহতেঃ ॥ ১ ॥

নৈনং বাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন ।

অনুগ্রহো যত্তবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতিবিভো ॥ ২ ॥

রাঁজ্যৈশ্চর্য্যমদোন্নকো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ ।

ত্বন্মায়াগোহিতোহনিত্যা মন্যতে সম্পদোহচলাঃ ॥ ৩ ॥

যুগতৃষণং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশরম্ ।

এবং বৈকালিকীং মায়ামযুক্তা বস্ত চক্ষতে ॥ ৪ ॥

যয়ং পুরা শ্রীমদনকটদৃষ্টয়ো

জিগীষয়াস্তা ইতরেতরম্পৃথঃ ।

ব্রহ্মঃ প্রজাঃ স্বা অতিনিযুগাঃ প্রভো

মৃত্যুং পুরস্তাবিগণ্য্য দুঃখনাঃ ॥ ৫ ॥

ত এব কৃষ্ণাচ্চ গভীরবংশসা

দুরন্তবীর্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।

কালেন তথা ভবতোহনুকম্পয়া

বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরামি তে ॥ ৬ ॥

অথো ন রাজ্যং যুগতৃষিক্রপিতং

দেহেন শশ্বৎ পততা কজাং ভুবা ।

উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো

ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কণরোচনম্ ॥ ৭ ॥

তং নঃ সমাদিশোপায়ং বেন তে চরণাজয়োঃ ।

স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৭৩ তম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণস্তুতির বঙ্গানুবাদ

হে দেবদেবেশ, শরণাগতদুঃখহর, অব্যয়স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি ।
হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় খিনচিত্তে আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি
আমাদিগকে ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ১ ॥

হে প্রভো, মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোনরূপ দোষারোপ করি
না । যে হেতু, রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহস্বরূপই বলিতে
হইবে ॥ ২ ॥

নৃপতিগণ রাজৈশ্বর্যজনিত মত্ততানিবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত হইয়া স্বকীয় কল্যাণ-মার্গ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য-সমূহকে স্থির বলিয়া নির্দ্বারণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অবুধগণ যেরূপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্দ্বারণ করে, সেইরূপ অবিবেকিগণও বিকারগ্রস্তা মায়াকেই সদ্বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

হে প্রভো, পূর্বকালে আমরা ঐশ্বর্যমদান্ধ এবং ছুরভিমানবৃত্ত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্যুরূপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়-কামনায় পরস্পর-স্পর্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দয়তা সহকারে নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অচ্য অলক্ষ্যগতি ও দুর্লভ্য প্রভাবযুক্ত কাল কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং আপনার কৃপাবলে হতগর্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥ ৫-৬ ॥

হে বিভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মান এবং রোগসমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ মাত্রেই কর্ণযুগলের রুচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি অুখভোগ কামনা করি না ॥ ৭ ॥

অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ-কালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীর পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দেশ করুন ॥ ৮ ॥

হে প্রভো, আমরা প্রণতজনহুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৮ পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্ববস্তুই ভগবান্ ; তাঁহার নাম-রূপাদিতে ভেদ নাই,
তিনি অদ্বয়জ্ঞানময় ।

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে । ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণব-গণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তু সংজ্ঞা বিশেষ মনে করিয়া লন সেরূপ নহে । মায়ার অন্তর্গত বস্তু মাত্রের সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর ভেদ আছে কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ ভেদ নাই । তিনি অদ্বয় জ্ঞানময় । মায়িকজ্ঞানে ভগবানের সহ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না ।

বৈষ্ণবদর্শনসমূহের বিশেষত্ব

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠিত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্বে কালের জনকস্বরূপ বর্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই উদ্ভূত হইয়াছে। এই দুই সর্গের অপ্রকাশ কালেও তিনিই থাকিবেন। যেখানে ভগবৎ সত্তার অধিষ্ঠান নাই, ভগবৎ সত্তার বাহার অধিষ্ঠান নাই তাহাই ভগবানের মায়া। সেই মায়া প্রকাশমান হইয়া আলোক ও অন্ধকারের আয় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তায় ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ সর্বিশেষ বস্তু। স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় বিশেষত্বের নিত্য বিরাজমান। শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনে সর্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়-রূপ ভক্তে নিত্য সেব্যসেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্যসেবক সম্বন্ধরহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্য ভেদ সত্তা ভগবানে নিত্য বৈচিত্র্য সর্বদা প্রদর্শন করে। দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে চিন্ময় রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রী রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্মূল আশ্রয়গত চিৎসত্তা সেখানে নিত্যসত্তার ঘনানন্দের সম্বন্ধরূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ড দর্শনে সঙ্কোচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়। শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শকের সত্যদর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হস্তারকও হয় না। বিভূচৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক নহে। নশ্বর জড়সত্তাকে নিত্য সত্তাজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া চিদৈচিত্র্য অস্বীকৃত নহে।

নির্বিশেষবাদে ভগবত্তার কল্পনা হয় ; বস্তুতঃ ভগবানের
সর্বিশেষত্ব নিত্য

ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিরোধীদলকেই অবৈষ্ণব দার্শনিক বলা যায়।

নিরীশেষবাদে চিন্ময়বিশেষকেও বলপূর্বক মায়িক বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া দেখিলে ভগবত্তার কল্পনা হয়। ভগবানের মিত্য বিশেষ মারা উৎপন্ন হইবার পূর্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে এবং মায়াতে সেই বিশেষত্বের সামান্য প্রতিফলন ধর্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে একরূপ সুবিবার পরিবর্তে ভগবত্তাকে মায়িক মনে করা সূক্ষ্ম দর্শনাত্মক বলিতে হইবে। মায়ার রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হইবে, ভগবানে শক্তির অভাব আছে, বাহ্য জীব স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ সেকরূপ ভগবদধিষ্ঠানের মিত্য স্থিতি নাই—একরূপ আত্মস্তুতি নাই পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে।

বিভুচৈতন্য ভগবান্ এক হইয়াও অনন্ত নিত্য মূর্তিতে

অনন্ত অণুচৈতন্যের নিত্য সেবা

বিভু চৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু মায়ার অধীশ্বর, অণু-চৈতন্য দাস বৈষ্ণব মায়ার বশ্য। বিভু চৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশ আছেন, অণু চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপ্ত। অণু-চৈতন্য মায়াকে স্বীয় ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য সেবার মনোভিনিবেশ করিলেই তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশ হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্যে স্বরূপে নিত্য বৃহত্তাভাব-বশতঃ সেবা ধর্ম তাঁহাতে কোন দিনই নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র চিন্ময় বৃত্তিতে ভগবদাস্তই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবাবিমুখ তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা বা মানবরূপে অণুচৈতন্যের অধিষ্ঠান তাঁহার নিরতিশয় ক্রেশের কারণ জন্ম দণ্ডভোগ মাত্র। হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিরয়লাভ উভয়েই তাঁহার নিত্য সুখের বিষয়কারক। এই সকল অনিত্য দুখ বাসনা বা ক্রেশ পরিহারেচ্ছা জীবের অত্যন্ত উপাদেয় প্রাপ্তির অন্তরায় মাত্র।

ভগবৎ-শক্তি মায়াপরিণতিকে ভোগ্যজ্ঞানকারী জীব অভক্ত

ভগবানের নিজাববর্ণী শক্তির নাম মায়া। জীবকে আবরণ করিতে তিনি সমর্থ। জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে, কৃষ্ণদাম্পত্যের অভাবে তিনি মায়িক সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন তাঁহার এই বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্ত করিয়া স্থাপন করে। আবার হরিসেবাই তাঁহার নিত্য একমাত্র ধর্ম সুবিধে পাবিলে এইগুলি শ্লথ হইয়া পড়ে।

বস্তু নিঃশক্তিক নহেন, তাঁহারই উপাদান-শক্তি লাভ করিয়া
মায়াসৃষ্টিকারিণী

মায়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণরূপে কথিত হন। উপাদান কারণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেও ভগবানের উপাদান শক্তি মায়ায় অহিত হয় মাত্র। জলন্ত লৌহ বেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তু দহনে সমর্থ সেরূপ মায়া ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে বরিতা হন। যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত হয় এবং বস্তু নিঃশক্তিক একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। মায়িক বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত ভ্রান্তি মায়াবাদীর অবশুস্তাবী। বৈষ্ণবগণ তাহা বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা সহজিয়া বিশ্বাস বলেন।

ভগবানই রসময় বস্তু ; সেই রসের বিকৃত প্রতিফলন অভিধ্রম
করত হরিনীলায় অগুপ্রবেশই নিত্য মঙ্গল

বাঁহার ত্রিধাতুক যুতকে আত্মভ্রান্তি, কলত্রপূন্যাদিতে মমত্বভ্রান্তি, জড়ে অপ্রাকৃত চিহ্ন দ্বি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্বক বিষয় সমূহে নিজ ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণ সঙ্কল্পে সঙ্কল্পবিশিষ্ট জানিলে দ্রষ্টা প্রাকৃত বিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবোন্মুখ হন। তখন তিনি মুগ্ধ মায়াবাদীর দ্বার হরিসঙ্কল্পময় বস্তু সমূহকেও কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগময় অপর প্রাপকিক বিষয়ের সহ সমজ্ঞানে ত্যাগের পরামর্শ করেন না। সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অস্ত্রাস্ত্র বস্ত্রগণের সহ শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসস্থাপন পূর্বক জড়রসে রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা যখন বুঝেন যে জড়রসের আশ্রয়গুলি অল্পকাল স্থায়ী ও অনুপাদেয় তখন কৃষ্ণ ভিন্ন বিষয়গুলির সহিত সঙ্কল্প নির্দেশ করিয়া তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অতীর্ষসিদ্ধির অন্তরায়রূপ জীব ও ভগবানের মধ্যে বিকৃতরস ও আশ্রয় গুলিই প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তখন বিষয়জ্ঞানে মায়িক বস্তু সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নিকির্শণেববাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। ধর্ম অর্থ কাম ফলের পরিবর্তে মুক্তিই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। চিন্ময় রসরাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবান্কে রসময় বলিতেও শঙ্কিত হন। নিত্যকাল পরলোকে ভগ্নিস্তময় বিচিত্রতাহীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ব বিশ্বাসই

তাঁহাকে কংস শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া স্বীয় আত্ম-বিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত বিশ্বাস বশে কৃষ্ণসেবাবিমুখ বিচারকগণ, পুতনাদি কপটচারিণীর জ্বায়ে কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন আবার জীবনান্তে চিহ্নিষেষ রহিত হইয়া নির্বিশেষত্বে লীন হন। প্রাকৃত ভোগময় রসের বিপর্য্যয়ে জগতে যে অনিত্য অসম্পূর্ণ বিড়ম্বনার হস্তে জীব পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে রসকে স্মৃষ্টভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস মায়াবাদের অন্নভারণা করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করা বিশেষ বিচারপুষ্ঠ বলিয়া, বৈষ্ণবদার্শনিকগণ মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন যে নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিকলনক্রমে এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকার নানাপ্রকারে বিলুপ্ততা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থ সমূহ অতিক্রম করিয়া অন্ধানহকায়ে অপ্রাকৃত নিত্য রসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবদার্শনিকের নিরপেক্ষ গীতটী তাঁহার মনে সর্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিধেঃ শ্রদ্ধাযিতোহজুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

তখন বৈষ্ণবদার্শনিকের উক্তিটীও উপরিকথিত গীতের সহায়তা করিবে।

• ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ যদপাশ্রয়াম্।

যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিযোগমধোকজে ॥

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ত্রীল প্রভুপাদ

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মের সৰ্ব্বকালোপযোগীত্ব

পৃথিবীতে যে-সমস্ত ধৰ্ম্ম প্রচলিত আছে, সে-সমুদায় ধৰ্ম্ম অপেক্ষা বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও উদার। বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্মের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ঐ ধৰ্ম্ম সর্বপ্রকার অবস্থায় জীবের মঙ্গলবিধান করে। অত্যান্ত সমস্ত ধৰ্ম্মই জীবের

কোন কোন বিশেষ অবস্থায় উপযোগী ; সর্বাবস্থায় কার্য্য করিতে পারে না ।

ধর্ম্মের পঞ্চ প্রকার শ্রেণী বিভাগ

জগতে যে-সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথাঃ—

১। জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম ।

২। জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম ।

৩। জীবের অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম ।

৪। জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম্ম ।

৫। জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম ।

নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্মের পরিচয় ও প্রধান কয়েকটির নাম

জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্মের অত্র নাম—ভগবদ্ভক্তি । যে-ধর্ম্মে জীবকে ‘নিত্য’ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে এবং নিত্যানন্দই জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে, সেই ধর্ম্মের নাম—ভক্তি । সেই ধর্ম্মে ভগবৎ-তত্ত্বের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যত্ব, জীবের ভগবদ্ব্যগ্ৰ, জড়ীয় সম্বন্ধের অনিত্যতা, প্রীতি-তত্ত্বের নিত্যতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় সর্বত্র স্বীকৃত আছে । যে-সকল ধর্ম্মে উক্ত মূল বিষয়গুলি স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্ম জীবের নিত্য-সুখ-উদ্দেশক ধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য অভিহিত হইবে । যাহারা ধর্ম্ম-সকলকে বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসকল জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক । ঐ সকল ধর্ম্মে যত প্রকার অবাস্তুর ভেদ থাকুক না কেন, উহারা মূলে সমজাতীয় ।

সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্মের পরিচয় ও তালিকা

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্মটি অনেক আকারে জগতে পরিলক্ষিত হয় । তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম, পেসিমিসম্ ও কেবল অদ্বৈতবাদ প্রধান । এই মতটি সময়ে সময়ে উখিত হইয়া জগতের অনেক স্থানে ব্যাপিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার আকার ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু, ফলে ইহাতে চরম সিদ্ধান্ত সর্বত্রই এক । এই সমস্ত মতকে জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম বলা যায়, যেহেতু ঐ সমস্ত মতে জীবের সত্যই অমঙ্গলময় । জীবের সত্ত্বানাশই পরম লাভ । সত্ত্বা-নাশ দুই প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয় । এক প্রকার এই যে, বস্তু একমাত্র আছে, তাহা নিত্যই নিগুণ ও বিকারশূন্য । জীবের সত্ত্বাসমূহ, বিকার ও ভেদময়, অতএব মিথ্যা ও ক্লেশময় । যে-অবস্থায় ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ভেদ চরম অভেদ-তত্ত্বে পর্য্যবসিত

হয়, সে-অবস্থার নাম—মুক্তি বা নির্বাণ। নির্বাণই একমাত্র ভেদ-ভ্রান্তি-মুক্ত-দুঃখনাশক। সেই নির্বাণ যে ধৰ্ম্ম আচরণ করিলে লভ্য হয়, সেই ধৰ্ম্মকে জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধৰ্ম্ম বলি। জেনোফেনিস্ ও পারমিনিাইডিস্ প্রভৃতি নির্বাণবাদী পণ্ডিতগণ ঐ মত গ্রীকদেশে প্রচলিত করেন। মধ্য-ইউরোপ-প্রদেশে ঐ মত কিছু কিছু ভিন্নাকারে স্পিনুজা, ফিক্টী, সেলিং ও হেজেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-কর্তৃক প্রচারিত হয়। স্কুপেনহুয়ার ও হার্টমান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ মতকে একটী ভিন্নাকারে পেনিমিজম্ বলিয়া জগতে প্রচার করেন। অশ্বদেশে জৈনমত, বৌদ্ধমত এবং কেবল-অদ্বৈতমত ঐ মতের অন্তর্গত। নানক, শিবনারায়ণ, গোরক্ষনাথ, আউলে চাঁদ, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি আধুনিক লোকগণ ঐ মতকে উপাসনা-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। যে-আকারেই থাকুক, যে-মতে চরম লয়রূপ মুক্তিকে অন্বেষণ করে, সে-মতকে আমরা নির্ভয়ে জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধৰ্ম্ম বলিয়া উক্তি করিতে পারি।

অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মই কৰ্ম্মমार्গ; মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধৰ্ম্মে ইহা গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম অনেক আকারে জগতে লক্ষিত হয়। ইহাকেই কৰ্ম্মমार्গ বলে। এই মতে কোনস্থলে ঈশ্বর-প্রাণধান আছে, কোনস্থলে তাহাও নাই। শরীর-গত সুখ, এই শরীর পতন হইলে দিব্য-শরীর-গত বিষয়-সুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখই এই মতের তাৎপর্য। দ্রব্যসংঘটন ও বিশেষ বিশেষ কার্যদ্বারা ঐ সুখের লাভ হয়। এই মত অনেক প্রকার নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম মধ্যেও গোপনে গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান-ধৰ্ম্মটী প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম বটে, কিন্তু সেই ধৰ্ম্মের স্বর্গ-সুখের ইন্দ্রিয়পরতা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম তন্মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টান-ধৰ্ম্মে অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্মের তত প্রাবল্য নাই, কিন্তু ঐ ধৰ্ম্ম যে তাহাতে কিছুমাত্র নাই—একপ বলা যায় না। পুনরুত্থান ব্যাপারটী ভাল করিয়া বিচার করিলে আমাদের সন্দেহটী দূরতর হইয়া পড়ে। গার্ডেন অব ইডেন সম্বন্ধীয় ভাবসকলও ঐ সন্দেহকে পুষ্টি করে।

সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধৰ্ম্ম সৰ্ব্বাবস্থায় অনিত্য সুখোদ্দেশক

জীবের সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধৰ্ম্ম জড়ীয় বিজ্ঞানকে অবলম্বন করত অনেক পণ্ডিতগণের প্রিয় হইয়াছে। জড়বাদ, স্থিরপদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সমস্ত নাস্তিক

ধর্ম-সমষ্টি-স্বথবর্ধক নৈতিক ধর্মের অন্তর্গত। সমষ্টি-স্বথবর্ধক নৈতিক-ধর্ম যে পূর্বোক্ত তিনটি ধর্মে থাকিতে পারে না, তাহা নয়। যে-সময়ে সমষ্টি-স্বথবাদ পূর্বোক্ত ধর্ম হইতে স্বাধীন হইয়া মানববৃন্দকে আহ্বান করে, তখনই উহা হয় জড়বাদ বা স্থিরবাদ অথবা সমাজবাদ হইয়া পড়ে। জীবের অনিত্য-স্বথোদ্দেশক ধর্মকে সকল অবস্থাতেই এই সমষ্টি-স্বথবর্ধক-ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকে। উহা-দিগকে পৃথক করিবার হেতু এই যে, জীবের অনিত্য-স্বথোদ্দেশক ধর্ম কোন কোন অবস্থায় সমষ্টি-স্বথজনক ধর্ম হয় না কিন্তু সমষ্টি-স্বথবাদ সকল অবস্থাতেই অনিত্য-স্বথোদ্দেশক হইবে। কর্মকাণ্ডটী অনেক অংশে সমষ্টি-স্বথবাদ মতে পরিগণিত। সমষ্টি-স্বথবাদ মতে আত্মার নিত্যত্ব নাই, যে আত্মা যে কার্য্য করেন, তাহার ফল সমষ্টি জীব লাভ করে। কেহ বলেন যে, শক্তিই এই সমস্ত ফলের চালক। কেহ বলেন, অদৃষ্টই ঐ ফল প্রদান করে। কেহ বা বলেন,—‘অপূর্ব’ নামক তত্ত্বই ঐ ফল জীবকে ভোগ করান।

জড়-সামর্থ্য-সম্বর্ধক ধর্ম জড়-শরীর, লিঙ্গ-শরীর বা জ্যোতির্ময় শরীরের ক্ষতিবুদ্ধিকেই লক্ষ্য করে

জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বর্ধক ধর্ম নানাদেশে নানাপ্রকারে লক্ষিত হয়। কোন দেশে কেবল এই জড় শরীরের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেখা যায়। কোন দেশে বা কোন মতে,—এই জড় শরীরের অতীত কোন লিঙ্গশরীর বা জ্যোতির্ময় শরীরের গুপ্ত সামর্থ্য প্রকাশ করার বিশেষ উপদেশ দেখা যায়। দেশ বিদেশে যত প্রকার তান্ত্রিক, যান্ত্রিক, মুদ্রাষটিত ও যৌগিক ধর্ম-প্রথা প্রচলিত আছে, সে-সমুদায় এই মতের অন্তর্গত। ষড়ঙ্গ যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, বৌদ্ধ যোগ, থিরসফি—এ সমুদায়ই এই মতের অন্তর্গত। থিরসফি যদিও জীবের স্বথ-দুঃখ-নাশক ধর্মের সহিত অনেকটা সম্বন্ধ রাখে, তথাপি ইহার নিজভূমি এই জড়-সামর্থ্যবোধক ধর্মের অন্তর্গত।

বৈদিক আর্য্যধর্মই পূর্ণ ধর্ম

একটু গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে, যতপ্রকার ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে এবং হইতে পারে, সে-সমুদায়ই এই পঞ্চপ্রকার ধর্মের অন্তর্গত। আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ কাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই হয় উক্ত পাঁচটির মধ্যে একটী, নয় অন্যটীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৈদিক আর্য্যধর্ম ব্যতীত কোন ধর্মই উক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্মের অবস্থিতি ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বরং তন্মধ্যে একটীকেই ধর্ম

বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সমস্ত ধৰ্ম্মকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।
এমত অবস্থায় কোন ধৰ্ম্মই জীবের সকল অবস্থায় মঙ্গল বিধান করে না।
অতএব বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধৰ্ম্মই পূৰ্ণ ধৰ্ম্ম নয়।

একমাত্র বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মই অধিকারোন্নতির ক্রমোপদেশ

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে পূৰ্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধৰ্ম্মেরই যথাযোগ্য উপদেশ ও
সামঞ্জস্য আছে। জীব যে অবস্থাতেই থাকুন, বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে সেই অবস্থায়
যাহাতে নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহাতে নিষ্ঠার ও অধিকার উপস্থিত হইলে সেই
নিষ্ঠার পরিত্যাগের যথাযোগ্য বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে যে
জীবের যথার্থ মঙ্গল হয়, ইহাতে সন্দেহ কি? জীবের নিতান্ত জড়বদ্ধাবস্থা হইতে
বিগুহ্ণ চিন্ময়-অবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অনেক সোপান লক্ষিত হয়। সোপান দিয়া
উচ্চ চূড়া প্রাপ্ত হইতে গেলে ক্রম অবলম্বন না করিলে কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়
না। অন্যান্য ধৰ্ম্মে কোন একটা সোপানকে দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তন্নিম্নস্থ সোপান
অতিক্রম ক্রমে করা যাইবে, তাহার কোন পন্থা বলে না। তাহাতে ফল
এই হয় যে, ধৰ্ম্ম একটা স্বতন্ত্র জপ্য বস্তু হইয়া পড়ে। কোনক্রমেই জীবনস্বরূপ-
প্রাপ্ত হয় না। ধৰ্ম্ম যতক্ষণ ধার্ম্মিকের জীবন না হয়, ততক্ষণ তাহা একটা
আগন্তুক অতিথির গৃহে অবস্থিতি করে। তাহাতে জীবের কি মঙ্গল হইবে?
জড়বাদী জড়বাদীই থাকে, কৰ্ম্মী কৰ্ম্মীই থাকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানবাদীই থাকে;
উচ্চাধিকার লাভ করে না। বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে ঐ সমস্ত মত স্থানে স্থানে উপদিষ্ট
হইয়াছে, কিন্তু যথাধিকার কার্য্য করিবার জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে। বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়া যাহার পরম প্রেম পর্য্যন্ত উচ্চগতি
অতি শীঘ্র না হয়, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্য। বৈদিক-ধৰ্ম্মের মাহাত্ম্য এই যে,
তাহাতে অনেকেরই মঙ্গল সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য ধৰ্ম্মে মঙ্গল কদাচ ঘটে। যেহেতু
সেই সেই ধৰ্ম্মে অবস্থা-বিশেষে ধৰ্ম্মই জীবের উন্নতির বাধক হইয়া পড়ে।

বৈদিক আৰ্য্যধৰ্ম্মে সমস্ত প্রকার ধৰ্ম্মই ক্রোড়ীভূত, তদ্বিষয়ে

শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈদিক আৰ্য্য-ধৰ্ম্মে যে পূৰ্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধৰ্ম্মের যথাস্থানে বিচার ও
উপদেশ আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত বেদবচনগুলি উদ্ধৃত করা
গেল। এস্থলে বিশেষ বিচার হইতে পারে না।

জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য; যথা,—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং বদ্বিভাতি।

অন্ত্যর্থঃ—আনন্দরূপ ও অমৃত-স্বরূপ পরমতত্ত্ব বাহা নিত্যরূপে প্রকাশিত আছে, তাহা ধীরদ্বন্দ্ব বিজ্ঞানদ্বারা দর্শন করেন।

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য ; যথাঃ— (তেজবিন্দুপনিষৎ)

ন ভয়ং সুখ-দুঃখঞ্চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

এতদ্বাব-বিনির্মুক্তাং তদগ্রাহ্যং ব্রহ্মতৎপরম্ ॥

তথা চ ভাগবতে, তৃতীয়, ২৫ অধ্যায়ে :—

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে ।

অত্যন্তোপরতির্থত্র দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ ॥

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম সম্বন্ধে শ্রুতি ; যথা :—

“স্বর্গকামঃ) অশ্বমেধং যজ্ঞেত ।” “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ ।”

অনিত্য স্বর্গ-সুখকামী পুরুষগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুক ।

জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধে এক্রপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

“তদেতৎ সত্যং মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যাত্ৰাপশ্চংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সংজ্ঞানি ।

তাগ্ৰাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পত্নাঃ স্বকৃতস্ত লোকে ।”

ত্রেতাযুগে ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে, বেদবিহিত কৰ্ম্ম সাক্ষরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য ফলদায়ক হয়। সেই সকল কৰ্ম্ম আচরিত হইলে তোমাদের সমষ্টি-মঙ্গল হইবে। সেই সকলই তোমাদের একমাত্র পন্থা।

জীবের জড়-সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম সম্বন্ধে এক্রপ কথিত হইয়াছে :—

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় অমৃতবিন্দুপনিষদি, যথা—অনেন বিধিনা সম্যঙ্ নিত্যম-ভ্যস্ততঃ ক্রমাৎ । স্বয়মুৎপত্ততে জ্ঞানং ত্রিভির্মাসিন সংশয়ঃ ॥ পূর্বোক্ত যোগ-বিধিক্রমে তিনমাস অভ্যাস করিলে সমস্ত জড় বিজ্ঞান উপস্থিত হয়।

এ সমুদায় বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, জগতে যত প্রকার নাস্তিক বা আস্তিক ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই বিজ্ঞান-সহকারে বৈদিক আৰ্য্যধর্মের বিচারিত হইয়াছে। অধিকার ভেদে সকল লোকের জন্যই আবশ্যকীয় ধর্মের ব্যবস্থা দেখা যায়। অতএব, বৈদিক আৰ্য্যধর্মই জীবের একমাত্র মঙ্গলজনক ধর্ম।

বৈদিক আৰ্য্যধর্মের নাম হিন্দুধর্ম। আজকাল লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ এক্রপ উদার ধর্মের নিন্দা করিয়া থাকে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যেন কোন ধর্মের নিন্দা না করেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পঞ্চক (৮)

(ক)

প্রভুপাদ !

যে কৃষ্ণ-কৌন্তন, কলুষ-পঙ্কিল
জীব-চিত-দরপণ ।

মার্জনা করিয়া, পতিত-জীবেরে
সমর্পণ প্রেমধন ॥১॥

ভব অটবীর, মহাদাবাগ্নি,
নির্ব্বাপিত করি' তূর্ণ,
অবিচা, অনথ, করি বিদূরিত,
দন্তাদি করেন চূর্ণ, ॥২॥

জীবের পরম, মঙ্গল স্বরূপ
(করেন) কৈরব-চন্দ্রিকা দান,
অপ্রাকৃত বিচা- বধূর জীবন-
স্বরূপ যে' নাম হ'ন ॥৩॥

কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ- বর্দ্ধনকারী
(সেই) অপ্রাকৃত নামে মোর ।
নাহি রতি মতি, তাই এ গোপাল,
কাঁদে নিশি দিন ভোর ॥৪॥

(খ)

প্রভুপাদ !

“যে তোমার পদ, পূজে অবিরত
সেই হয় ভাগ্যবান ।

তাহার হৃদয়ে, ভক্তি স্থিরতরা ;
কৃষ্ণ স্মৃতি প্রাপ্ত হন ॥১॥

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম- রূপ যে ত্রিবর্গ ;
(আর) মুক্তিরূপ অপবর্গ ।

কিছুমাত্র তা'র, নাহি প্রয়োজন,
নাচাহে ভুক্তিতে স্বর্গ ॥২॥

মুক্তি দাসীসম, কৃতাজলিপুটে
করয়ে তাহার সেবা।”

নরকেতে তা'র, পতন নিশ্চয়,
তোমারে ভুলেছে যেবা ॥৩॥

অনিত্য ধর্ম্মে— সদারত চিত
মোর গতি কিবা হ'বে।

পতিত পাবন ! এ দীন গোপানে
কবে পদে স্থান দিবে ॥৪॥

(গ)

প্রভুপাদ !

(“কৃষ্ণ”) এই দু'টি বর্ণ কত অমৃতের
সহিত যে উৎপন্ন-

ইইয়াছে তাহা জানে নাহি কেহ,
(“কৃষ্ণ”) ভজে যেই সেই ধন্য ॥১॥

যবে কৃষ্ণ নাম নটীর সমান
তুণ্ডে তুণ্ডে নৃত্য করে।

তবে বহু তুণ্ড পাইবার তরে
আসক্তি বর্দ্ধন করে ॥২॥

(যবে) শ্রবণ বিবরে, করিয়া প্রবেশ,
ইন্দ্রিয় বিজয় করে।

অববুদ শ্রবণ পেতে স্পৃহা হয়,
এত শক্তি নাম ধরে ॥৩॥

হেন কৃষ্ণ নামে, চিত্ত নহে রত,
কি করি উপায় আমি।

এ গোপালে প্রভু ! করহ করুণা,
তুমি যে দীনের স্বামী ॥৪॥

(1)

ସ୍ବସ୍ଥ !

ନାମ ସମ ବ୍ରତ,

ନାମ ସମ ଛାନ୍ଦ

नामि समय नाहि फल ।

નામ સમ ધ્યાન,

ନାମ ସମ ତ୍ରାଗି,

নাম সগ নাহি বল ॥১॥

નામ સમ પૂર્ણ,

নাহি কিছু আর,

ବାସି ସମ ବାହି ଗତି ।

নামের মহিমা,

গান করিবারে,

বেদের বাহ্যিক শক্তি ॥২॥

नामई परमा

ଶାନ୍ତି-ଭକ୍ତି-ସ୍ଥିତି

ସୂକ୍ତି-ଗତି-ମତି-ସ୍ମୃତି ।

নাম জীব-প্রভ

নাম জীব-গুরু

নামই পরমা প্রীতি ॥ ৩ ॥

পরম আরাধ্য,

জীবের কারণ

ହ'ନ କ୍ଷଣ ନାମଧନ ।

হেন নাম ধনে,

বঞ্চিত গোপাল

(প্রভু) কিসে পাব পরিব্রাজ ॥৪॥

(e)

ବ୍ରହ୍ମପାଦ !

প্রকাশিত হ'য়ে,

বিশ্বাস আছে।

নাহি লভি ফল নামে ।

(নাম) অপরাধা ন্লে

দিবানিশি মোর

দক্ষ করে পঞ্চ প্রাণে ॥১॥

নামে অর্থবাদ

କରିয়া, ଅନନ୍ତ

নরকে পড়িয়া আছি ।

ନାମ-ମହିମାତେ

না করি' বিশ্বাস.

হৈনু বিষ্ঠাভোজী মাছি ॥৫॥

নাম চিন্তামনি,

নাম পূর্ণ শুদ্ধ,

নাম নিত্য মুক্ত হ'ন ।

তব কৃপাবলে,

নামে রুচি যাঁর,

তিনি হ'ন মহাজন ॥ ৩ ॥

আমার জিহ্বায়

নাম নাহি হয়,

ভাগ মাত্র নাম করি ।

ওহে দয়াময় !

পতিত-গোপালে,

দেহ শ্রীচরণ-তরী ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশানন্দ

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অতীবধি প্রায় ৪৭০ বৎসর । চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস আমূল পরিবর্তিত হইয়া দিব্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল । চেতনালোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বহু অদ্বৈতবাদি-পতঙ্গ আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল ।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে । এই সময়ে তিনি বারাণসীক্ষেত্রে মায়াবাদ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন । তাঁহার পাণ্ডিত্য গৌরবে 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' দ্বারা অদ্বৈতবাদীর নূতন জীবনীশক্তি লাভ হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বহুদূর হইতে (শ্রীধাম মায়াপুর হইতে) তাঁহার নাম ও বিচার সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া সন্নেহে বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ ।

সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৭)

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ অবতারী ভগবান্ । প্রকাশানন্দ অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত অনুসারে—ভগবান্ নিরাকার নির্বিশেষ প্রভৃতি বিচার তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা

দিলে, ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা হয়—বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। প্রতি যুগেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের কাহাকে কাহাকে বিনাশ ও কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব এযুগে পরম কৃপা করিয়া কাহারও বিনাশ না করিয়া নিজ বিশুদ্ধমতে আনয়ন বা নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এবার “প্রাণে না মারিল কারে”। তাই চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে উদ্ধারকল্পে সদলবলে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের যতদোষ উদ্ঘাটন করিয়া অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিচারকালে সরস্বতীপাদের বহু শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈতবাদী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চিত্রাপিতের স্থায় উভয়ের বিচার মনোযোগ-সহকারে অল্পধাবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বিচারের সারবত্তা ও যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সরস্বতীপাদ তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হন এবং তাঁহার নিকট মস্তক বিক্রয় করেন।

“সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন। (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৯)

প্রকাশানন্দ তাঁর আসি’ ধরিল চরণ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৬৯)

চৈতন্যদেবের কৃপায় ও প্রচারের ফলে শুধু প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এমন নহে, সমস্ত বারাণসীবাসী মায়াবাদী সকলেই নিস্তারলাভ করিয়াছিলেন। এবং বারাণসী ক্ষেত্র শঙ্করক্ষেত্র না হইয়া নিমাই-ক্ষেত্র নদীয়া-নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

“সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।

বারাণসীপুর প্রভু করিল নিস্তার ॥

নিজ লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।

বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়ানগর ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৯-৬০)

এইরূপে চৈতন্যদেব মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বেদান্তের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে স্থাপন করিয়া কাশীতে মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করিলেন।

বাসুদেব সার্বভৌম

কাশীতে যে প্রকার সন্ন্যাসিসমাজে উক্ত সরস্বতীপাদ সমাজপতি ছিলেন, তেমনি শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌমের একাধিপত্য ছিল। তিনি ষড়্‌দর্শনের এবং সর্বশাস্ত্রের বিশেষতঃ মায়াবাদের সর্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তিনি ‘সার্বভৌম’ নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীক্ষেত্রে থাকাকালীন তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণের ছল করিয়া তাঁহার উদ্ধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন। সার্কভৌম বেদান্তের অদ্বৈত বা শাক্তর ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্নমোহপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করেন। তদর্শনে সার্কভৌম মহাশয় তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যদেব সার্কভৌমের বিচারের নানা প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বমতে আনন্দন করেন। সার্কভৌম নিজমতের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন।—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।

রূপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥

দেখি' সার্কভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।

পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥

প্রভুর রূপায় তাঁর ক্ষুরিল সব তত্ত্ব।

নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব।

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০১, ২০৪, ২০৫)

চৈতন্যদেবের প্রচারের বৈশিষ্ট্য মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং শাক্তের গোবর্দ্ধন মঠ ভূগর্ভে সমাধি লাভ করে।

সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেবার্থে মায়াবাদ বিনাশের সহায়ক হইরাছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও চৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্ ভগবানু জানিয়া তাঁহার পদাঙ্কপূত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার লীলার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য কেশব-কাশ্মিরী, বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বা শ্রীধরস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বল্লভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা দুইজনই চৈতন্যদেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীর কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া চৈতন্যদেবের নিকট ভাগবত ধর্মের শিক্ষা লাভ করেন। পরিশেষে তিনি নিষ্কার্ক সম্প্রদায়ের বেদান্ত কোস্তভাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎসম্প্রদায়ের প্রভূত পুষ্টি সাধন করেন। বর্তমান সময়ে নিষ্কার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি চৈতন্যদেবের প্রচারের ফলস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

উপেন্দ্র সরস্বতী

কাশীনিবাসী উপেন্দ্র সরস্বতী অদ্বৈতবাদের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্য বল্লভ ইহাকে বিচারে পরাস্ত করার দরুণ, তাহার চিন্তে হিংসার উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে জীবন সংশয় জানিয়া বল্লভ কাশী পরিত্যাগ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিজয় নগরেও একটা মহা অদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বল্লভাচার্য্য মায়াবাদের বিনাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যসেবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও ব্যাসরায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মধব-সম্প্রদায়ের তদানীন্তনকার প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের সতিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা হইয়াছিল। রঘুবর্ষ্য তখন উড়ুপী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ব্যাসরায় রঘুবর্ষ্যের পরে ক্রমশঃ অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তিনি অতি দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। শ্রায় শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া পণ্ডিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও মতে তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এবং জীবনের শেষ ৫০ বৎসর তিনি উড়ুপী মঠের অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহা অনুমান করিতে কোনও বাধা নাই। কারণ, চৈতন্যদেব অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে উড়ুপী ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। সেই সময় আচার্য্য ‘ব্যাসরায়’ তথাকার মাধব মঠের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হইলেও আধ্যাত্মিক পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে শ্রায়-শাস্ত্রের অতিদেবতা বলিয়া জানিত। তাঁহার শ্রায় শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া রঘুবর্ষ্যতীর্থ, ব্যাসরায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের শ্রায়-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার তিনি শ্রায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের রচিত “শ্রায়ামৃত” গ্রন্থ তাহারই ফলস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচণ্ড প্রচার-প্রতাপে যে মায়াবাদের সার্বভৌম বিচার দক্ষীভূত হইয়া ভস্মসূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ব্যাসরায়ের ‘শ্রায়ামৃতে’র প্রবল স্মৃতিস্ম ধারায় বিধৌত হইয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছিল। এমন সময় অদ্বৈতবাদিকুল অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্ত ‘বিপদে মধুসূদন’ বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রাদ্ধ-মত-বিবেক

(চারি)

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ

এবার আমরা বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শাস্ত্র বলেন—
 “শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা।” অর্থাৎ যাহা দ্বারা সত্য লাভ হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা। স্মৃতরাং ঐহিক ও পারত্রিক ভুক্তি বা স্বর্গাদি শ্রদ্ধার্পণের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ স্বর্গভোগাবসানে আবার মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।” স্মৃতরাং পরম ও চরম সত্যলাভ করিতে হইলে সর্বাধীশ বিষ্ণুতেই শ্রদ্ধার্পণ ও প্রণমনতা সহকারে তাঁহারই মুখ্য আনুগত্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বিষ্ণুপ্ৰীতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহিত তন্নিবেদিত অন্ন, বস্ত্র ও তৈজসপত্রাদি দান এবং তদীয় প্রসাদ দ্বারা ভূরি ভোজনের ব্যবস্থাই শ্রাদ্ধ শব্দের তাৎপর্য্য। শাস্ত্র বলেন—

শ্রদ্ধাষিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্বাতি। (গোভিল-সূত্র)

সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতাষিতম্।

শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগৃহতে ॥ (পুলস্ত্য-বচন)

প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃত।

নাস্তি হুশ্রদ্ধধানশ্চ ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্ ॥ (দেবল-বচন)

উক্ত প্রমাণসমূহের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে গিয়াই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলিয়াছেন—‘শ্রদ্ধয়াহ্নাদৈর্যদানং তৎ শ্রাদ্ধম্’ (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)। ‘বিষ্ণুপ্ৰীতি’ অর্থে—বিষ্ণু আমার প্রতি প্রীত বা প্রসন্ন হউন—এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষা মূলক মনের সরস ভাব। দান-কার্য্যটি সকাম ও নিকাম উভয়বিধই হইতে পারে। শ্রাদ্ধের সকল উপকরণ ও উপচার বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীদ্বারা বিষ্ণুতে নিবেদিত হইয়া বিষ্ণুরই প্রীতিতে দানাদি কার্য্য নিকাম, অগ্রথায় সকাম।

এই নিকাম-সকাম লইয়াও তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। তন্মধ্যে “শ্রাদ্ধ আবার নিকাম কিরূপে হয়? অথবা কামনা ছাড়া কোন্ কার্য্য হইতে পারে?” —এইরূপ বিতণ্ডার উত্তর এই যে—জাগতিক বা পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষামূলক মনের অবস্থার নাম কাম। আর ভগবৎ প্রীণনমূলক যে মনের অবস্থা তাহার নাম প্রেম। “আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি

বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম" বিষ্ণুপ্ৰীতিতে এই নিকাম শ্রাদ্ধ দ্বারাই শ্রাদ্ধ কার্যের পূর্ণতম সফলতা হইয়া থাকে। যথা—

যথা তরোমূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

প্রাগোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ—তরুমূলে জল সেচন করিলে যেমন শাখা উপশাখা সমস্তই তৃপ্ত হয় এবং প্রাণের উপহার দানে অর্থাৎ ভোজনে সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ অচ্যুতের অর্চনাতেই দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে,—যেহেতু সমস্তই ভগবানে অবস্থিত। তাই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের এমন কি অন্ত্যাত্ম দেবার্চনাদিরও আদ্যন্তে বিষ্ণুস্মরণের বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। তাহার একমাত্র কারণ বিষ্ণুর প্রীতিসাধন ব্যতীত ইহ-পরকালে কোন সুখলাভই হইতে পারে না।

১। শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।

প্রারম্ভে কৰ্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেকরিম্ ॥

২। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ॥

৩। মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।

স্মরন্তি সাধবঃ সর্বৈ সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

৪। প্রীযতাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।

তস্মিঃস্তুষ্টে জগতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥ (মৎস্য পুরাণ)

৫। মন্ত্রতন্ত্রতচ্ছিত্রং দেশকালাহবস্তুতঃ।

সর্বং কৰোতি নিশ্চিদ্রমনুসকীৰ্ত্তনং তব ॥ (ভাঃ ৮।২৩।১৬)

৬। ন্যূনাতিরিক্তভাসিদ্ধেঃ কলৌ বেদোক্তকৰ্ম্মণাম্।

হরিস্মরণমাত্রেণ সম্পূর্ণ-ফলদায়কম্ ॥

৭। অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাস্থরেষু যৎ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং শ্রাদ্ধিতি শ্রুতিঃ ॥

৮। যস্ত স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।

ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সত্তো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥ (স্কন্দপুরাণ)

এই সকল প্রমাণের তাৎপর্য গ্রহণেই বৈষ্ণব-স্মৃতিতে বৈষ্ণবীয়মতে শ্রাদ্ধ-করণে স্মার্তগণের স্বর্গ-কামনাস্থলে শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রীতি-কামনা-মূলক মন্ত্রোচ্চারণের বিধান গৃহীত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—

“স্বর্গ অর্থে—নিরবচ্ছিন্ন সুখ, এবং ভগবান্ বিষ্ণুই সুখ-স্বরূপ। ‘আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং’, সুতরাং স্বর্গকাম বলিতে বাধা কি?” ইহার উত্তর এই যে—স্মার্তগণের ‘প্রেতত্ববিমুক্তি পূর্বক স্বর্গকাম’—এইরূপ মন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের অর্থে প্রয়োগ হয় না। স্বর্গকাম বলিতে, স্বর্গ নামক একটি পারলৌকিক স্থান-বিশেষে অবস্থানপূর্বক দুষ্কৃতি-মোচন ও পুণ্যসুখভোগ বুঝায়। যথা :—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং ন চ গ্রস্তমনস্তরম্ ।

অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখন্ স্বঃপদাম্পদম্ ॥

(একাদশীতত্ত্ব একাদশীভোগজননিন্দা প্রকরণ)

কিন্তু সেই স্থান যত উন্নতই হউক না কেন অথবা স্বর্গ অর্থে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইলেও ইহার কামনা কখনও নিষ্ফল নহে, এবং ঐ সুখের নিরবচ্ছিন্নত্ব সাময়িক। পুণ্যক্রমে স্বর্গচ্যুত হইলে ঐ নিরবচ্ছিন্ন সুখও ধ্বংস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার প্রাপ্তিও ভগবৎ করুণাসাপেক্ষ।

সুতরাং গোণভাবে শুধু বিষ্ণুস্মরণ না করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণক্রমে মুখ্যভাবে তদীয় নাম গুণ-লীলা-স্মরণযুক্ত সকল অলুষ্ঠান সম্পাদনেই সনাজ-জীবনের চরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এবং বিষ্ণুপ্রীতি কামনা মূলক মন্ত্রোচ্চারণে বিষ্ণুতে শরণ ও স্মরণ উভয় কার্যই যুগপৎ সাধিত হয়।

উপনিষদ্ বলেন—“ভূমৈব স্তুখং নাল্পে স্তুখমস্তি” অর্থাৎ ভূমাতেই স্তুখ, অল্পে স্তুখ নাই। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই ভূমা, বিভুরূপে বিশ্বজগৎ বেষ্টিত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের অন্ত্র কোনও উপায় নাই। তাই বৈষ্ণব-স্মৃতি, ‘স্বর্গকাম’ স্থলে ‘বিষ্ণুপ্রীতিকাম’ মন্ত্রের বিধানদ্বারা বিশ্বের চরম কল্যাণের পথই আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধেই আমরা আলোচনা করিয়াছি—দেশ, কাল ও পাত্রভেদে সকল শাস্ত্রের সকল বাণী সকলের পক্ষে সমান উপযোগী বা পালনীয় নহে। রঘুনন্দনের স্মৃতির আক্ষরিক বা শাক্তিক অসামঞ্জস্যের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই। এবং ইহাও আমরা আলোচনা করিয়াছি যে প্রাচীন বহু শাস্ত্র-বিধি এই যুগে রঘুনন্দনের মতেও অচল হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তরে স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে আমরা তিনটি কারণ দেখিতে পাই। যথা—(১) পিতৃপুরুষের প্রেতত্বমুক্তি (২) তাঁহাদের স্বর্গলাভ ও (৩) নিজের আনুগ্য অর্থাৎ পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তি। বহু পুরাণ-শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়—ধাম ও তীর্থাদিতে মৃত্যু হইলে এবং নারায়ণাদি

ভগবতুপাসক ব্যক্তিগণের মুক্তি-পদলাভ বা বৈকুণ্ঠে গতি হইয়া থাকে। এমন কি, শিবাदि পঞ্চ-দেবতার উপাসকগণেরও প্রেতত্ব লাভের কথা যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং তাহাদের প্রেতত্ব বিমুক্তির কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এখানে ‘প্রেত’ শব্দে ‘প্র’ + ‘ইত’ = ‘প্রেত’ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে গত—এরূপ অর্থ বুঝায় না। জীব জলোকাবৎ এক তৃণ হইতে অন্য তৃণাশ্রয় অথবা জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের স্থায় স্থলদেহ ত্যাগক্রমে অন্য একটী দেহে অবস্থান করে। যে দেহটী সে ত্যাগ করে উহাতে সে আর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং তাহাকে প্রেত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে গত বলা যায় বটে কিন্তু স্মার্ত-গণের অভিপ্রায় ইহা নহে। তাহাদের মতে ‘প্রেত’ শব্দে একটী হেয়, দুঃখদ ও ঘৃণিত দেহ বুঝায়। কোন কোন স্থলে প্রেতস্থলে পিশাচও বসে হইয়াছে। ‘প্রেতত্ব-বিমুক্তি-পূর্বক স্বর্গকাম’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রেতত্ব বিমুক্তি ও স্বর্গপ্রাপ্তি যেখানে শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য সেখানে প্রেত অর্থে প্রকৃষ্টরূপে গত—এই ব্যাখ্যা খাটে না।

কারণ প্রকৃষ্টরূপে যে ব্যক্তি গত তাহার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বাক্যে ‘সামিষ সিদ্ধান্তেন’ বলিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ ‘প্রেত’ অর্থে একটী হেয়-পদ বা ঘৃণিত অবস্থাকে বুঝায় বলিয়াই সামিষ সিদ্ধান্ত এবং তদভাবে তণ্ডুল বা কদলী দুগ্ধাদি জঘন্য বস্তু স্মার্তমতে লঘুহারীতের বচনানুযায়ী প্রেতের আহাৰ্য্য-রূপে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা—

সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধানি যোক্তবঃ।

পক্কােন্নৈব কার্য্যানি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ ॥

(শ্রাদ্ধতত্ত্ব-আত্মশ্রাদ্ধেতিকর্তব্যতা)

বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে বৈষ্ণবীয় দীক্ষা প্রাপ্ত বৈষ্ণব মাত্রেই প্রেতত্ব ঘটে না। সুতরাং প্রেতত্ব বিমুক্তির কোনও প্রশ্ন উঠে না। এতদ্ব্যতীত মায়িক স্বর্গ বৈষ্ণবমাত্রেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাহা ছাড়া জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ স্মার্তের ‘প্রেত’ পদস্থলে ‘কৃষ্ণদাস’ পদ শ্রাদ্ধমন্ত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রীতিতে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্তা ও মৃত ব্যক্তির মনে কৃষ্ণদাস্তমূলক নিজ স্বরূপের স্মৃতি জাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদ-পদ্মে উন্মুখ ও কৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদনই করিবে। ইহাই ‘প্রেত’ পদস্থলে ‘কৃষ্ণদাস’ পদ ব্যবহার করার বিশেষ তাৎপর্য।

জীব দেহী বা বিদেহী ইউক কৃষ্ণদাসত্বই তাহার স্বরূপ। ‘কৃষ্ণ’ অর্থে

আনন্দময় সত্ত্বা, এবং জীবমাত্রই আনন্দের দাস। সুতরাং কৃষ্ণদাসই সার্বজনীন। জীব তাহার আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মায়া-কবলে পতিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণদাসত্বের চিন্তন ও মনোচ্চারণ দ্বারা বিষ্ণুপ্রীতির পোষকতায় উত্তম ভক্তি যাজন করা হয়। “আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা”। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণদাস উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গহানি হওয়া তদূরের কথা শ্রীকৃষ্ণ কার্যের সূষ্ঠ্য তাই বুদ্ধি পাইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলেন—বৈষ্ণবের সালোক্যাদি মুক্তি বা পার্শদাদি দেহলাভ স্বতঃই হইয়া থাকে। তাই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপেক্ষা নাই। তবে পুত্রাদির পক্ষে পিতৃপুরুষের প্রতি লৌকিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অপেক্ষা আছে বলিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষণে প্রতিপক্ষ প্রশ্ন করিবেন বৈষ্ণব কাহাকে বলে? “বিষ্ণুরেব হি যন্ত্রেষ্ঠদেবতা স বৈষ্ণবঃ স্বতঃ”। যিনি বিষ্ণুকে ইষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন বা নিজ ইষ্টজ্ঞানে বিষ্ণুর ভজন করেন তিনিই বৈষ্ণব পদবাচ্য। এ বিষয়ে আরও দেখা যায়—

গৃহীত- বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।

বৈষ্ণবোহভিহিতোহভিজৈরিতরোহস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৪১ ধৃত পদ্ম পুরাণ বাক্য)

অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণু-পূজা পরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত, তন্নির অগ্র ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকেন। তবে অধিকার ভেদে বৈষ্ণবের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ অবস্থা আছে। বৈষ্ণব মাত্রই পরম দৈন্ত্যে নিজকে কনিষ্ঠ বা অধম বুদ্ধি করেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন মাত্র। অগ্রথায় শ্রীকৃষ্ণের কোনও যৌক্তিকতা নাই। যথা— (ভাঃ ১।৫।৪১)

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো না যমুণী চ রাজন্।

সর্বানুনা যঃ শরণং শরণ্যং গতৌ মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য কৰ্ত্তম্ ॥

অর্থাৎ—হে রাজন্! ‘বাস্তবদেব-সর্বং’ এই বুদ্ধিতে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্বতোভাবে মুকুন্দ-পদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতাগণের, ঋষিগণের, ভূতসমূহের, পোষাকুটুম্বগণের, অগ্র নরগণের ও পিতৃগণের নিকট ঋণী হন না। এবং হরিভক্ত কাহারও কিঙ্কর নহেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

সাং বিরাট, পং জলশুকা (শ্রীহট্ট)

শ্রী জন্মান্তরীণী নামের
শ্রী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে দীনার
আতি-নিবেদন

মিনতি করিয়া তুণ ধারিয়া দশনে ।
নিবেদন করো মুই শ্রীগুরু চরণে ॥
শুন প্রভু এ দাসীর দুঃখের কাহিনী ।
পতিতা অধমা আমি অতি অভাগিনী ॥
কৃপা-করি' শ্রীচরণে দিবেছিলে স্থান ।
স্বতন্ত্রতাবশে তার কৈলু অপমান ॥
বহু জন্মের পুণ্য ফলে পেয়েছিছু সঙ্গ ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥
তুমিত স্বতন্ত্র প্রভু আমি পরতন্ত্র ।
ভুলিলাম মায়ামোহে সেই মহায়ন্ত্র ॥
পতিত পাবন তুমি আমি শোচ্যতমা ।
নিজগুণে শোধি' প্রভু করি হে উত্তমা ॥
কত যে স্নেহ তুমি করিয়াছ মোরে ।
সেই কথা মনে হ'লে মদা আঁখি ঝুরে ॥
আর কি শুনিব সেই অমিয় বচন ।

কবে বা দেখিব সেই রাতুল চরণ ॥
অপরাধ ফলে মুই পড়িয়াছি দূরে ।
ভুঞ্জিতেছি কৰ্মফল মায়ী-কারণারে ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি' কর আকর্ষণ ।
তবেত কাটিবে মায়ী-পাশের বন্ধন ॥
আমি অতি দীনা হীন জান তুমি প্রভু ।
অধমা বলিয়া যেন ভুলিওনা কভু ॥
শ্রীগুরু-চরণে মোর নাহি রতি মতি ।
কেমনে সংসার হ'তে পা'ব অব্যাহতি ॥
'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।'
তব কৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তি উপবাস দিনে ।
নিবেদন করি প্রভু তব শ্রীচরণে ॥
শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে যেন গাই কৃষ্ণ নাম ।
নাম প্রভু ! নামী তুমি পুরাও মনস্কাম ॥

সেবিকাধমা—গিরিবান্ধা

দেব-দেবীর পূজা ও বলিদান

পূজার গুণানুরূপ প্রকারভেদ

পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কল্পে কল্পে অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড
সৃজন-ক্রমে নিম্নভজননিষ্ঠ ভক্তগণের ভক্তিরস আশ্বাদন করিয়া থাকেন । তৎ-
প্রসঙ্গে প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অনন্তকোটি জীবও স্ব-স্ব পূর্বাবস্থা বা
কৰ্মানুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় শুভাশুভ কৰ্মে ব্রতী হইয়া থাকেন ।
মিশ্র কৰ্মফলে মর্ত্যালোকে প্রাপ্তজন্ম জীবগণের মধ্যে মানব জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ ;
কারণ শুভকৰ্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লোক এবং পাপাদিবর্জক কার্য্যদ্বারা নরকাদি-

প্রাপ্তি মনুষ্যজাতি যাত্রেই সম্ভব । পশ্বাদি জাতির সে বানাই নাই । ভগবৎ-
সৃষ্ট মানবগণ পূর্বজন্মের সংস্কারবশে বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, এবং নিজ
নিজ শ্রদ্ধানুরূপ গুণসম্পন্ন দেবদেবীর পূজায় রত হইয়া থাকেন । যথা :—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বশ্রু শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো বচ্চু দ্বঃ স এব সঃ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যজ্ঞরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্তে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ (গীঃ ১৭।২-৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—মানবগণের দেবতা পূজাদিতে যে
শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে তিন প্রকার জানিবে ।
ইহা তাহাদের স্বভাব-জাত, অর্থাৎ পূর্বজন্মের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।
তাহা অর্থাৎ সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় এক্ষণে শ্রবণ কর । হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণের
ভারতম্যানুসারে বিবেকী ও অবিবেকী সকলেরই শ্রদ্ধাটী নিজ নিজ অন্তঃকরণ
বৃত্তির (সত্ত্ব, রজস্তমো গুণের) অনুরূপ হইয়া থাকে । যেহেতু এই লৌকিক
পুরুষ শ্রদ্ধাময় অতএব যে ব্যক্তির বৈরূপ সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ, তিনি সেই প্রকার
শ্রদ্ধাযুক্ত হন বলিয়াই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধারূপে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য বর্ণন
করিলাম । সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবন্তগণ সত্ত্ব-প্রকৃতি-দেবগণের পূজা করিয়া থাকেন ।
রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ রজঃ প্রকৃতি যজ্ঞ-রাক্ষসাদির পূজা করেন এবং
তামসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ তমঃ প্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীরাধিকার পূজা, স্তোত্র ও কবচাদি বর্ণনানন্তর তাহার
অংশ-প্রভবা শ্রীদুর্গার উপাখ্যানে সুরথকৃত পূজা প্রসঙ্গে দেখা যায় । যথা—

ভারতে ভারতীং পূজ্যাং দুর্গাং যঃ পূজয়েদ্বধুঃ ।

সোহন্তে যাতি চ তল্লোকং পরমৈশ্বর্যবানিহ ॥

কৃতা চ বৈষ্ণবীপূজাং বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ সুধীঃ ।

মাহেশ্বরীঞ্চ সম্পূজ্য শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥

সাত্ত্বিকী রাজসীচৈব ত্রিধা পূজা চ তামসী ।

ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমা-মধ্যমাধমা ॥

সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদীনাঞ্চ রাজসী ।

অদৌকিতানামসতাং বন্যাণ্যাম্ তামসী স্মৃতা ॥

জীবহত্যাবিহীনা যা বরা পূজা চ বৈষ্ণবী ।

বৈষ্ণবা যান্তি গোলোকং বৈষ্ণবীবরদানতঃ ॥

মাহেশ্বরী রাজসী চ বলিদান-সমম্বিতা ।

শাক্তাদয়ো রাজসাস্ত কৈলাসং যান্তি তে তয়া ।

কিরাতা নরকং যান্তি তামস্যা পূজয়া তথা ॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতিখণ্ড ৬৪।৪৩-৪৯)

যে জ্ঞানীব্যক্তি ভারতে পূজনীয়া কৌশিকী দুর্গাদেবীকে পূজা করে সে অস্ত্রে দেবীলোকে গমন করে এবং ইহলোকেও পরম ঐশ্বর্যবান্ হয় । সুবুদ্ধিব্যক্তি বৈষ্ণবীর পূজা করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ও মাহেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করেন । বেদে ত্রীরাধিকার পূজার ত্রায় ভগুবতী দুর্গারও সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকার উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা পূজা কথিত আছে । এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সাত্ত্বিকী পূজা, শাক্তদিগের রাজসী পূজা ও মদীক্ষিত বন্ত পশুতুল্য অসাধুগণের পূজা তামসী বলিয়া কথিত । জীব-হিংসা-রহিত শ্রেষ্ঠ পূজা বৈষ্ণবী (সাত্ত্বিকী) । বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীর বরদানে গোলোকধামে গমন করেন । আর বলিদান-সমম্বিতা মাহেশ্বরীর পূজা রাজসী । শাক্ত প্রভৃতি রাজসব্যক্তিগণ সেই রাজসী পূজাফলে কৈলাসধামে গমন করেন । কিরাতগণ সেইরূপ তামসী পূজার ফলে নরকে গমন করে ।

স্মার্ত রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে স্কান্দ ও ভবিষ্য পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায়—

শারদা চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীযতে ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥

সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাচ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতম্ ॥

পাঠস্তস্মৈ জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদেবীমুনা প্রিয়ে ।

দেবীসূক্ত-জপশ্চৈব যজ্ঞোবাহিষু তর্পণম্ ॥

রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সান্নিযৈস্তথা ॥

সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা ।

বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্ত্রাং কিরাতানাঞ্চ সম্মতা ॥

অর্থাৎ, শারদীয়া দুর্গাপূজা—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ

রূপেই কথিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। সাত্ত্বিকী পূজা জপ, হোম ও নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে ভগবতীর যে নানাতা বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করাই জপ। দেবীচরণে তন্মনস্ক হইয়া উহা পাঠ করিবে। এবং দেবীস্তুতপাঠকেও জপ বলা হয়। অগ্নিতে যতাহুতিদানই যজ্ঞ নামে কথিত। পশুঘাত পূর্বক সামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজাই রাজসী পূজা। এবং কীরাতগণের অনুষ্ঠিত জপ, যজ্ঞ ও যজ্ঞাদি-বিহীন স্মরা ও মাংসাদিসহ পূজাই তামসী পূজা নামে অভিহিত।

এই সমস্ত পুরাণ-বচন পর্যালোচনায় দেখা যায়—সাধারণতঃ পূজায় পূজকের কুচি বা গুণভেদে ত্রৈবিধ্য থাকিলেও সাত্ত্বিকী পূজাই সর্বপূজা শিরোমণি, তাহার ফল অক্ষয়, দুঃখলেশ-বিবর্জিত, পরিণামে সুখদ ও মুক্তিপদাদির প্রাপক। রাজসী পূজা আপাত সুখদ হইলেও ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখদরূপেই পরিদৃষ্ট হয়। তামসী পূজার ত কথাই নাই। তাৎপর্য্য এই যে—মায়াসৃষ্টদেহধারী মানব-মাত্রেরই মায়ার ত্রিগুণযুক্ত। তবে যাহার সত্ত্বগুণ প্রধান অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধাংশ সত্ত্বগুণ এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ রজস্তমো গুণ তাহাকেই সাত্ত্বিক বলা যায়। এবং তৎকৃত পূজাই সাত্ত্বিকী পূজা। সেইরূপ রজোগুণপ্রধান রজোগুণীকৃত পূজা রাজসী ও তমোগুণপ্রধান তমোগুণীকৃত পূজা তামসী। গীতায় ভগবান্ নিজে অর্জুনকে সত্ত্বাদিগুণযুক্তগণের পূজার ফলভেদ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ (গীঃ ১৪।১৮)

অর্থাৎ, যাহাদের সত্ত্বগুণ প্রধান তাহারা উর্দ্ধে (স্বর্গাদি হইতে উত্তরোত্তর উর্দ্ধলোকে) গমন করে; রজোগুণী লোকসমূহ মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করে এবং যুগ্য তমোগুণী তামসিক লোকগণ নরকাদি নিম্নতর লোকে গমন করে।

এই ভগবদ্বাক্যেও প্রতীতি হইতেছে যে, যিনি যে-গুণযুক্ত হন, তিনি সেইরূপ গুণযুক্ত দেবতার পূজাটীও নিজগুণানুরূপ ভাবেই সম্পন্ন করেন। তাহার ফলে ভুক্তি, মুক্তি, স্বর্গ ও নরকাদি যথাযোগ্যভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক দুর্গাপূজারই ত্রিবিধ বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবী (যোগমায়া) রূপা দুর্গার সাত্ত্বিকী পূজায় সত্ত্বগুণসম্পন্ন বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীর বরে গোলোকে গমন করেন বলিয়াছেন। আবার রজোগুণী শাক্তাদিজনগণ ঐ দুর্গারই অংশভূতা মাহেশ্বরী-রূপা মহামায়ার বলিদানাদিরূপ পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ

প্রাকৃতিক লয়ে বিনাশশীল অনিত্য কৈলাসপর্বতে গমন করেন। আর যদি ঐ বলিদানাদিরূপ পূজায় বলিবিঘ্নাদি ঘটে তবে স্তফল প্রাপ্তি ত দূরের কথা সবংশে বিনাশ-প্রাপ্তই হইয়া থাকেন।

বলির প্রতিনিধি গ্রহণীয় কি না ?

পঞ্চোপাসকগণের পক্ষে দুর্গাপূজা মহাপূজা নামে অভিহিত। যথা—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। (চণ্ডী ১২।১২)

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃ কৰ্ম্মময়ী শুভা।

তাং তিথিক্রমাসাত্ত কুর্যাদুক্ত্যা বিধানতঃ ॥ (লিঙ্গ পুরাণ)

অর্থাৎ শরৎকালীন দুর্গাপূজাই মহাপূজা নামে অভিহিত। তাহা স্বপন অর্থাৎ মহাস্নান, পূজন, বলিদান ও হোম—এই চারিটি কৰ্ম্মাঙ্গিকা ও মঙ্গল-দায়িনী। সপ্তম্যাদি তিথিক্রম অবলম্বন করিয়া মঙ্গলকাগী জনগণ ভক্তির সহিত যথাবিধি ত্রীদুর্গার ঐ মহাপূজা সম্পন্ন করিবে।

এই সব বচনানুযায়ী তাঁহারা বলেন—দুর্গাপূজায় বলিদান করিতে হয় ; নচেৎ একটি অঙ্গের আচরণের অভাবে মহাপূজার হানি হয়, স্ততরাং বৈধ বলিতে দোষ নাই (?)। বৈধ বলির দোষ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন বলি কাহাকে বলে দেখা যাউক—

“বলিঃ পূজোপহারঃ”। পূজার উপহার বা নৈবেদ্যাদিকেই বলি কহে ; যথা—কাকবলিঃ, শিবাবলিঃ প্রভৃতি। বলিঃ—“দেবতৌদ্দেশেন যথাবিধি পূজোপহারত্যাগঃ।” দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া যথাবিধি পূজোপহার নৈবেদ্যাদি-দানই ‘বলি’ শব্দের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য। অমরকোষে দেখা যায়—‘করোপহারয়োঃ পুংসি বলিঃ’ অর্থাৎ রাজার কর ও উপহারকে বলি কহে। এই অর্থে বলি শব্দ পুংলিঙ্গ হয়। ভারতেরও ইহাই অভিमत।

ইহাতে মৎস্য-মাংস ভোজনলোলুপ শাক্তগণ বলিবেন—‘পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ’ ইত্যাদি চণ্ডীর বাক্যে পশুবলি দিবারই বিধি রহিয়াছে। বিশেষতঃ স্বধৰ্ম্মপরায়ণ বহু হিন্দুই ধৰ্ম্মভীরু ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ। তাহারা শাক্তদের ঐ সব কথায় ভ্রমে পতিত হইয়াই হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিয়াও পূজায় বলিদান ও দেবীর প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ঐ ভ্রম-সংশোধন ও কল্যাণার্থ একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি। ‘তারা প্রদীপে’র দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে—

সাধকো জীব হত্যাক্ষ কদাচিন্মৈব কারয়েৎ।

ইক্ষুদণ্ডঞ্চ কুর্যাদুৎ তথা রক্তাফলানি চ ॥

পিণ্ডক্ষীরৈঃ শালিচূর্ণৈঃ পশুং কুত্বা দদেৎ বলিम् ।

তত্ত্বং ফলবিশেষেণ তৎপশুং কল্পয়েৎ সদা ॥

অর্থাৎ—সাধক কদাচিৎ জীবহত্যা করিবে না। যদি বিশেষ কলোদ্দেশে বলিদান একান্ত কর্তব্য মনে করেন, তবে ইক্ষুদণ্ড, কুশাণ্ড, রস্তাদি সুমিষ্ট ফল বলিদান করিবে। অথবা ক্ষীরপিণ্ড ও শালি-তণ্ডুলচূর্ণ প্রভৃতিদ্বারা নিজাভীষ্ট পশুর আকৃতি নির্মাণক্রমে বলি প্রদান করিবে।

কালিকা পুরাণেও উক্ত আছে। বথা—

কুশাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদুমাসব এবচ ।

এতে বলি সমাঃ প্রোক্তাঃ প্রোক্তাঃ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ ॥

কুশাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদু ও মধু—এই সকল বলি দান করিলে ছাগবলির তুল্য ফল ও দেবতার তৃপ্তি উভয়ই লাভ হয়। তবে ‘মদুমপেয়মদেয়মনিগ্রাহম্’ এই উপন্যাস্ত্র বাক্যদ্বারা মদুকে অদেয় বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত বচন-সমূহের তাৎপর্য্য জানা যাইতেছে পশুঘাতন বাতীতও ইক্ষুদণ্ডাদিদ্বারাই ছাগ-বলির ফল লাভ ও শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা হয়। নিজ নিজ উদর পূর্তির জন্য পশুহিংসায় বরং নরকপাতাদিরূপ অধঃপতনই হইয়া থাকে।

তথাপি তাঁহারা যদি সমাংসকৃধির-দানরূপ অঙ্গহানির প্রশ্ন উঠান, তবে—

“প্রধানস্তাক্রিয়া যত্র সাক্ষং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ ।

তদঙ্গস্তাক্রিয়ায়াস্ত নাবৃত্তি ন চ তৎক্রিয়া ॥” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব-ছন্দোগ-বচন)

অর্থাৎ প্রধান কার্য্য যদি কোনও বিঘ্নাদিতে বাদ পরে, তবে সর্বাঙ্গের সহিত পুনরায় তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, আর প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে দুই একটি অঙ্গের অন্তর্গতান জন্য পুনরায় তাহার (সেই অঙ্গের) আবৃত্তি বা সেই প্রধান ক্রিয়াবৃত্তি কিছুই প্রয়োজন হয় না।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে সপিণ্ডীকরণ-প্রসঙ্গে ধৃত ছন্দোগ-পরিশিষ্টের এই বচনানুযায়ী বলিব—মহাপূজার চারিটী কার্য্যমধ্যে প্রধান কার্য্য বা অঙ্গী দুর্গাপূজা। স্নপন বলিদান ও হোম তাহার অঙ্গ এবং সমাংসকৃধির দানটী বলিদানরূপ অঙ্গেরও অঙ্গ-স্থানীয়। এমতাবস্থায় বলিদান কার্য্যটী ইক্ষুদণ্ডাদিদ্বারা সম্পন্ন করা হেতু সমাংসকৃধির দানরূপ সামান্যঙ্গের বৈকল্যেও পূজাফল নিশ্চিতই লাভ হইবে। এই সামান্য একটী অঙ্গ রক্ষার্থ নৃশংসভাবে পশুহত্যা করা শুধু দেবতা পূজার অজুহাতে নিজ নিজ জিহ্বা-লালসা পূর্ণ করা তির পরমার্থ কিছুই নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনরীণচন্দ্র চক্রবর্তী, স্মৃতি-ব্যাখ্যকরণতীর্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপসনাতন

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ভগবদ্বৈমুখ্যই বন্ধতার হেতু

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

সাধু-শাস্ত্র-রূপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ (চৈঃ চঃ যঃ ২৩।১১৭-১২০)

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই নিত্য দাসত্বের স্থলে নিজ প্রভুত্বের অভিমানই মায়ার বন্ধন । তটস্থানশক্তি জীব মায়া-ভোগ-বাসনায় লিপ্ত থাকিয়া, নিজের অগুহ্য হেতু বিভূতত্বের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত অনাদিকাল হইতেই পরতত্ত্ববিমুখ । এই 'বহির্মুখতাই জীবের ছিদ্র । এই ছিদ্র দ্বারাই মায়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন । সেই মায়ার প্রকোপেই জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায় । স্বরূপজ্ঞানের অভাব-বশতঃ তাঁহার কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে । কৃষ্ণবিস্মৃতি-ঘটিলেই মায়াদেবী জীবগণকে নিজ ত্রিগুণাত্মক রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া দণ্ডাই ব্যক্তির তায় সর্ববিধ সংসার-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন । সুতরাং কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবদিগের ত্রিতাপের হেতু ।

এই অনিত্য সংসার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান জীবগণের ঈশ্বরবৈমুখ্য নৈসর্গিক । “মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান ॥” কৃষ্ণবিস্মৃতিজনিতই জীবের আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায় । নিজ-স্বরূপজ্ঞান অন্তর্হিত হইলেই বিপর্যয় ঘটে । তাহা হইতে স্থল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ দেহে আত্মাভিমান আনয়ন করে, ইহাই জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত বন্ধন ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তই মায়াজয়ী

দ্বিবিধ দেহ দ্বারাই জীবের বন্ধন হয় । স্থল-সূক্ষ্ম দেহে অভিনিবেশ জন্মিলেই, সত্ত্বগুণরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খল, রজোগুণরূপ রৌপ্য-শৃঙ্খল ও তমোগুণরূপ লৌহ-শৃঙ্খলের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় । হে সনাতন ! অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি দেহ বন্ধনের ভয় হইতে মুক্তি লাভেচ্ছায় শ্রীগুরুকে 'দেবতা' ও প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া অব্যক্তি-চারিণী ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরের ভজনা করিবেন ।

মায়ামুগ্ধ জীবের আপনা হইতেই কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।

দৈবী হেষ্টি গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

পরমেশ্বরের এই ত্রিগুণময়ী দৈবীমায়া অতীব দুরত্যা। যিনি ভগবানে শরণাগত হইয়া তাঁহাতে প্রপত্তি স্বীকার করেন, কেবলমাত্র তিনিই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন।

সেই জন্তই করুণাময়-ভগবান্ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বেদ ও তদর্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাও জীবের বোধগম্য নহে, বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রদর্শক আচার্য্যগুরু ও অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে জীবকে নিজতত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্র ও সৎগুরু হইতেই জীবের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। তখনই সে বুঝিতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রভু ও ভাগকর্ত্তা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু, তাতা’—জীবের হয় জ্ঞান ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৩)

সাধু, গুরু ও শাস্ত্র অভিন্নজ্ঞানে, তাঁহাদের উপদিষ্ট বত্মাবলম্বনে যিনি একবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেন, তিনিই সৌভাগ্যক্রমে মায়ার বন্ধন হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন।

বেদশাস্ত্র কহে—‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’, ‘প্রয়োজন’।

‘কৃষ্ণ’ প্রাপ্য-সম্বন্ধ, ‘ভক্তি’ প্রাপ্যের সাধন ॥

অভিধেয়-নাম-‘ভক্তি’, ‘প্রেম’—প্রয়োজন।

পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ।

কৃষ্ণে সেবা করে কৃষ্ণরস আন্বাদন ॥

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।

‘সর্বজ্ঞ’ আসি’ দুঃখ দেখি’ পুছয়ে তাহারে ॥

তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।

তোমাতে না কহিল, অত্ন ছাড়িল জীবন ॥

সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।

এছে বেদ-পুরাণ জীবে ‘কৃষ্ণ’ উপদেশে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪-২৯)

সমস্ত বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটি জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাণী শ্রীকৃষ্ণ, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সাধনের নামই-‘ভক্তি’, ভক্তিরই নামান্তর ‘অভিধেয়’ বা সেবাবৃত্তি। কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে যে ‘প্রেম’ উদয় হয়, তাহার নাম প্রয়োজন। এইজন্তই শ্রবণাদি সাধন ভক্তিকে অভিধেয় এবং প্রেমরূপ সাধ্য ভক্তিকে প্রয়োজন বা পুরুষার্থ বলা হয়। প্রেমরূপ মহাধনই পুরুষার্থের শিরোমণি। “প্রেম”—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি চতুর্বিধ পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ। প্রেমের নামান্তর পঞ্চম পুরুষার্থ।

গুরু ও শাস্ত্রোপদেশই মঙ্গললাভের হেতু

মায়াযুক্ত জীবের কৃষ্ণবহির্ভূতাক্রমে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইলে, পরমধন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে না, তদ্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

একদা কোন এক দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে একজন সর্বজ্ঞ উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—তুমি এত দুঃখ করিতেছ কেন? তুমি ঈদৃশ দুঃখভাগী নহ। তোমার পিতা তোমার জন্ত প্রচুর ধন যত্নিকাত্মক প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাহার সন্ধান জ্ঞাত নহ। ঐ ধন তোমার গৃহমধ্যেই প্রোথিত আছে।

বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।

সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥

‘এইস্থানে আছে ধন’ বলি’ দক্ষিণে খুদিবে।

‘ভীমরুল-বকলী’ উঠিবে, ধন না পাইবে ॥

‘পশ্চিমে’ খুদিবে, তাহা ‘যক্ষ’ এক হয়।

সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥

‘উত্তরে’ খুদিলে আছে কৃষ্ণ ‘অজগরে’।

ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥

পূর্বদিকে তাতে মাটি অগ্ন খুদিতে।

ধনের বারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি’।

‘ভক্ত্যে’ কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি’ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩১-৩৬)

বেদ ও তদনুগ পুরাণ শাস্ত্র সমূহের মধ্যে অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বকলীরূপ কর্মকাণ্ড, কোনদিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোনদিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগ-কৈবল্য,

আবার কোনদিকে রক্ষিত-ধনের ভাণ্ডরূপ ভক্তি অল্প প্রয়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদশাস্ত্র যথাক্রমে কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ মার্গ পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র ভক্তি পথেই কৃত্য প্রাপ্তি হয় ইহা বলিয়াছেন। সর্বজ্ঞের বাক্যানুসারে দরিদ্র ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার দুঃখের অবসান হয়; সেইরূপ শাস্ত্র-বাক্যের অনুকূলে কৰ্ম সকল আচরণ করত মায়া মুক্ত জীব সংসার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।

কাণ্যকৰ্মই ভক্তিপথের প্রথম কণ্টক

ফল ভোগপর কৰ্মকাণ্ডই দক্ষিণ-মার্গ। দক্ষিণা প্রদান করত কৰ্মাদুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া দুঃখনাশ ও সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা নিফল হইয়া থাকে। কৰ্মমার্গকে সংসার দুঃখ নিবারণের অবলম্বন মনে হয়, কিন্তু কৰ্মদ্বারা কখনও সংসার-দুঃখ নিবারিত হইতে পারে না। এই কৰ্মমার্গে জীব ভোগ বাসনারূপ ভীমরুল-বোলতা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কেবল ক্লেশ ভোগ করেন। ইহাতেও তাহার ভোগের আশা পূর্ণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর ভোগ বাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় মাত্র।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবত্বেব ভূয় এবাতিবদ্ধতে ॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৪)

যত সংযোগে অগ্নি যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কাম্য বিষয় ভোগ করিতে থাকিলে কাম প্রবৃত্তি নিবৃত্ত না হইয়া বরং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

“স্বকৰ্মফলভুক পুমান্”—কৰ্মের ফল অবশ্যভাবী। পাপ কৰ্মের ফল নরকাদি দুঃখ ভোগ, পুণ্য কৰ্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি সুখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্য কৰ্মের ফল স্বর্গ সুখাদি হইলেও ইহা ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নহে। অতএব বিহিত পুণ্যকৰ্মের দ্বারাও দুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব।

ব্রহ্মসামুজ্য ভক্তিপথের দ্বিতীয় কণ্টক

উত্তর-মার্গীয় সাধনই সিদ্ধিবাস্তা-পর যোগমার্গ তাহাতে কেবল্যরূপ কৃষ্ণ-বর্ণ অজগর সর্প গুহ জীব-সত্তাকে গ্রাস করে। আবার কাহারও মতে উত্তর মার্গীয় সাধনই নিষ্কাম জ্ঞান মার্গ, তথায় গুহজীব-সত্তা ব্রহ্মসামুজ্যরূপ-কৃষ্ণসর্পের দ্বারা গ্রস্ত। জ্ঞান মার্গটি ফল কামনা রহিত হইলেও, তাহাতে নির্বাণ মুক্তি অথবা ব্রহ্মসামুজ্যরূপ অজগর বাস করে। জ্ঞানী সিদ্ধ-অভিমান করিলেই সামুজ্যরূপ অজগর তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। অজগর-গ্রস্ত জীবের নিজ সত্তা পর্যন্তও বিলুপ্ত করিয়া দেয় ইহাই উত্তর-মার্গীয় জ্ঞানীর চরমাবস্থা।

যোগ সাধনাই ভক্তিপথের তৃতীয় কণ্টক

অষ্টাঙ্গ যোগই সাধনাক্ষেত্রে পশ্চিম মার্গ। ঐ সাথে সিদ্ধিরূপ প্রকাণ্ড এক বক্ষ বাস করে। বক্ষ ধন আগলাইয়া থাকে অর্থাৎ ধনের পাহাড়াদার বা রক্ষাকর্তা—ধন-প্রদাতা নহে। তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, ধনলাভের পরিবর্তে প্রাণ-বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ বক্ষ জীবনস্তার সংহারক। একটি উদাহরণে বলা যাইতে পারে—কোনও বালক কদমাক্ত স্থানে বহুক্ষণ খেলা করিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া নূতন খেলনা প্রার্থা হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা তাহার সঙ্কেত বুঝিয়াই অল্প একটি নূতন ধরণের খেলনা বালকের সম্মুখে ধরিয়া দিল; বালক তাহা পাইয়াই আনুহারা হইয়া মাতাকে ভুলিয়া মাতৃহারা হইল। সেই প্রকার অষ্টাঙ্গ যোগিগণ সিদ্ধিরূপ বক্ষের উপদ্রবে ভক্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

অগ্নিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা।

প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং চাষ্ট সিদ্ধয়ঃ ॥ (অমরকোষ)

ইহাই ভগবানের বঞ্চনারূপ অষ্টসিদ্ধি, সাধন সময়ে উখিত হইয়া সাধককে অভিভূত করিয়া ফেলে; তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীশ্রীনন্দোৎসব

অজের জনম গুণিতে বিষম চর্য্য চূর্ণ লেহ পের আদি ভোজ্য
গোকুলে নন্দের ঘরে ভুঞ্জিছে আজি সবে।

অচিন্ত্য শক্তি বুঝে কোন্ ব্যক্তি • শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ পদে পদে স্বাদ
কৃষ্ণ কৃপা করে যারে মত্ত সবে মহোৎসবে ॥

সে পারে বুঝিতে তার গুণ চিন্তে খাও খাও খাও দাও দাও দাও
আবিভূত হয় হরি। লও লও লও ধনি।

শ্রীনন্দ উৎসব চিদানন্দ সব দিতেছে সবারে আজ অকাতরে
আহা সে যে কি মাধুরী ॥ দধি ক্ষীর ছানা ননী ॥

দধি দুগ্ধ ছানা কত গিঠাপানা কত যে পড়িল তাহা না জানিল
পায়স মথনি সর। অঙ্গন কদমময়।

ক্ষীর মাখন ননী মাঠা শিখরিণী সেবামগ্ন চিত্ত সবে শুদ্ধ সত্ত্ব
পুরীতে পুরিল ঘর ॥ আবেশে পরিবেশয় ॥

দেবতা দানব	গন্ধর্ব মানব	সুন্দর বদন	সুন্দর লোচন
যক্ষ রক্ষ	কিন্নর ।	সুন্দর পদ	দু'খানি ॥
পশু পক্ষী যত	হলো সমাগত	সুন্দর দশন	সুন্দর হাসন
অনন্ত ভূচর	খেচর ॥	সুন্দর সে কলধ্বনি ।	
নন্দ-যশোদার	ভাণ্ডার উজার	সুন্দর নটন	সুন্দর গঠন
কোণী হস্তে করে ব্যয় ।		সুন্দর বরণ থানি ॥	
আশ্চর্য ভাণ্ডার	শেষ নাহি তার	নাসিকা সুন্দর	কপোল সুন্দর
সদা তাহা পূর্ণ রয় ॥		সুন্দর নয়ন-মণি ।	
শ্রীনন্দ উৎসবে	ব্রজবানী সবে	সুন্দর গোপাল	সুন্দর দুলাল
সর্বস্ব অর্পণ করে ।		সুন্দরের সব খনি ॥	
দেখিয়া বালকে	স্নেহের আলোকে	নিত্য তোমা নমি	ওগো জন্মাষ্টমী
ভাসে সবে প্রেম নীরে ॥		অহো ধনু তিথিবরা ।	
ধনু পুত্রবতী	মাতা যশোমতী	করিলে প্রকাশ	অবতারা বাস
কোণী নমস্কার পার ।		(আজি) আনন্দ-পূরিত ধরা ॥	
ধরিলে জঠরে	অসীম অপারে	যশোদা জীবন	শ্রীনন্দনন্দন
বেদে ভাগবতে (ইহা) গায় ॥		সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ।	
তুমি বিশ্বোদরে	ধরিলে উদরে	আমি ভাগ্যহীন	দুরাচার দীন
অজের জনম হয় ।		তাই শ্রীপদে বিভূষ ॥	
অসীম অনন্ত	প্রেমে হ'য়ে সান্ত	নন্দের হৃদয়	হইল উদয়
তব দিব্য গর্ভে রয় ॥		চিদ্মন শ্রামরায় ।	
সবে পুত্র ষাঁর	পিতা নন্দ তাঁর	তাই মহারাজ	করিতেছে আজ
অতি অপূর্ব এ কথা ।		মহোৎসব মধুময় ॥	
বিরুদ্ধ ষিচিত্র	হইল একত্র	দেখিয়া বালক	জগৎ অলোক
অহো ভাগ্য মহোদয় ॥		নাহিক স্নেহের ওর ।	
লাবণ্যের খণি	নন্দ-নীলমণি	নন্দ যশোমতী	আনন্দেতে মাতি
ভূষণ-ভূষণ অঙ্গ ।		উৎসবে হৈল ভোর ॥	
কিবা সে সুষমা	নাহিক উপমা	ওগো বাবা নন্দ	বন্দি পদ বন্দ
তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ ॥		ভাগ্য মন্দ মোর অতি ।	
স্বিস্থফল জিনি	রক্তাধর থানি	ভোমার নন্দনে	সদা সর্বক্ষণে
যশোদার ষাট্ঠমণি ।		থাকে যেন মম মতি ॥	

—শ্রীযুত বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরসারস্বত মঠ, পোঃ বড়দিয়া (যশোহর)

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীমথুরাধামে উর্জ্জ্বল পালন

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেমজন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সুঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২-১২৫।১২৬)

—শ্রীমন্নহাশ্রমের এই শিক্ষা পালন করিয়া ধন্য হউন ।

এই পরিক্রমার বিশেষ মাহাত্ম্য—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে নাম-
সঙ্কীৰ্তন এবং সাধু-মুখবিগলিত শ্রীভাগবত কথা শ্রবণ ।

পরিক্রমা ও উর্জ্জ্বলতে মোট এক মাস সময় লাগিবে । তবে
যাঁহারা একমাস মথুরায় অবস্থান করিতে সক্ষম হইবেন না, তাঁহারা
কেবলমাত্র পরিক্রমা করিয়াই ফিরিতে পারিবেন । ব্রতের দ্বিতীয়
সপ্তাহে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে । এবার মোটর বাসযোগে
পরিক্রমা করা হইবে ; তজ্জন্য পদব্রজে অশক্ত এবং গৃহ হইতে
একমাসকাল অনুপস্থিত থাকিতে অসমর্থ যাত্রীপক্ষে ইহা বিশেষ
সুবিধাজনক । যাতায়াতপথে কতিপয় তীর্থ দর্শনেরও ব্যবস্থা
হইতে পারে (১) হাওড়া হইতে যাতায়াত রেল ভাড়া, বাস ভাড়া,
দুইবেলা প্রসাদ ও কুলি প্রভৃতি ব্যয় বাবদ প্রতি যাত্রীকে ১৬০
টাকা ভিক্ষা স্বরূপ দিতে হইবে । আগামী ২২শে আশ্বিন,
১ অক্টোবর, শনিবার রাত্রি ৮।০ টায় হাওড়া স্টেশন হইতে
রিজার্ভ গাড়ীযোগে সমিতির সদস্য ও যাত্রীগণ যাত্রা
করিবেন । অবিলম্বেই আপনার নাম তালিকাভুক্ত করুন ।

পত্রাদি বিনিময়ের ঠিকানা—
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) ।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস ও শ্রীনন্দোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কার্যালয় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য শাখামঠ সমূহে বিগত ৭ জ্যৈষ্ঠ, ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট, শনিবারে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস-অনুষ্ঠান বিগেব যত্নসহকারে ও মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। এই দিবস ভক্তবৃন্দ যথাবিধি নিরন্তর উপবাসী থাকিয়া সর্বদা কৃষ্ণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন করেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী নামক বঙ্গভাষায় পঢ়ানুবাদ গ্রন্থ-খানির ১০ম স্কন্ধ উষঃকাল হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের আনুগত্যে পারায়ণ হইয়াছে। মধ্যরাত্রে মূল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয় এবং বিশেষ সমারোহে সঙ্কীর্তনমুখে বিবিধ উপচারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ভোগপূজাদি সম্পাদিত হইয়াছে। পরদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সমাগত শত শত ভক্তগণকে বহুবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতোৎসব

বিগত ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার, শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতোৎসবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ ও অনুগত ভক্তবৃন্দ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া শ্রীরাধারানীর তত্ত্ব ও মহত্বের বিষয় শ্রবণ কীর্তন করেন। প্রাতঃকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সমবেত ভক্তমণ্ডলীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠমুখে শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তৎপর মহাসমারোহে শ্রীরাধারানীর সেবাপূজান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দকে দিব্য প্রসাদান্নাদি প্রদান করা হয়। সকলেই শ্রদ্ধাপূত চিত্তে তৎপ্রসাদের সেবা ও সন্মান করত ধন্য হন।

— শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় শ্রীরাধাষ্টমীর পারণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিকুশল শ্রমণ মহারাজ সম্পাদিত শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকায় বর্তমান বর্ষে বিগত ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার তারিখে “পূর্ববাহু ৯।৩১ গতে শ্রীরাধা অষ্টমীর পারণ”—এইরূপ পারণকাল নির্ণিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠস্থিতি গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিনাসে শ্রীরাধারানীর আবির্ভাবে

উপবাসের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। তথাপি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ কোন কোন ভক্ত শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতিতে উপবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু পরদিবস যথা সময়ে পারণ না করিলে উপবাসী ভক্তগণের ব্রত-বৈজ্ঞান্য হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বাঁহারা শ্রীমৎ শ্রমণ মহারাজের পঞ্জিকামতে এইবার শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রতবৈজ্ঞান্য দোষে পতিত হইয়াছেন। কারণ ঐ দিবস ৯৩১ গতে পারণকাল নির্ণিত হওয়া কখনই শাস্ত্র-যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। এইরূপ আরও কয়েকটি ভ্রান্তি আমরা শ্রীমৎ শ্রমণ মহারাজের প্রকাশিত ঐ পঞ্জিকায় লক্ষ্য করিয়াছি। আশা করি শ্রমণ মহারাজ ঐ সমস্ত ভ্রম সংশোধন করিয়া একটা তালিকা প্রকাশ করিয়া ব্রতচারী ভক্তবৃন্দের বিমুক্তভাবে ব্রতপালনে সহায়তা করিবেন।

আমাদের শ্রীযুত পরমানন্দ ভায়া যদি তাঁহার দলের নিজস্ব পঞ্জিকা দেখিয়া দেন তবে ভাল হয়। নচেৎ জন্মাষ্টমী ব্যতীত আরও অনেক অষ্টমীতে উপবাস লেখা হইয়া যাইতেছে—ইহা ত তাঁহার নিতান্ত মতবিরুদ্ধ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নলিখিত তিনজন ব্রহ্মচারী শ্রীল জীবগোস্বামি বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

উত্তীর্ণ ব্রহ্মচারি-বিদ্যার্থিগণের নাম—

- ১। শ্রীমদ্ব বিজয় ব্রহ্মচারী
- ২। শ্রীসত্যদ্যান ব্রহ্মচারী
- ৩। শ্রী শ্রীহরি ব্রহ্মচারী

আসাম প্রদেশে প্রচার

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

অভয়াপুরী—৬ আষাঢ়, ২১ জুলাই, সোমবার—অদ্য সন্ধ্যার পূর্বেই সভাপতি মহারাজ সদলে চাপর হইতে অভয়াপুরী উপস্থিত হইলেন। অভয়াপুরী রাজ এষ্টেটের মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর পূর্ব হইতে সভাপতি মহারাজ ও তাঁহার অনুগত জনগণের থাকিবার স্থান ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার বিশেষ যত্নে প্রচারকগণ ৩ দিবস তথায় প্রচার কার্য করেন।

৭ই আষাঢ়, ২২ জুলাই তারিখে স্থানীয় বাণিকা বিদ্যালয় 'হলে' আচার্য্য

দেবের বক্তৃতা এইরূপ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে, বহুব্যক্তি একবাক্যে বলেন—
শ্রীল সরস্বতী মাকুরের অপ্রকটের পর তদ্রূপ বক্তৃতা এই প্রথম শ্রবণ করিলাম।
বহু প্রচারক বৎসরে এতদেশে আগমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ বক্তৃতা
আর আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিবস মাননীয়
মহারাজা-বাহাদুরের সহিত তাঁহার অভয়াপুরী রাজ-প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন।
রাজাবাহাদুরের বিনয় ষ্টম্ভ ব্যবহার, আড়ম্বরহীন জীবন, সত্য-প্রিয়তা, দানশীলতা,
সর্বোপরি সরল ধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরবিশ্বাস বিশেষ প্রশংসনীয় এবং প্রত্যেক ভূম্যধি-
কারী ধনী-ব্যক্তিগণের পক্ষে আদর্শস্থানীয়। আমরা মহারাজের দানশীলতার
পরিচয় পৃথক প্রবন্ধে প্রদান করিব।

৮ই আগষ্ট, ২৩শে জুলাই তারিখেও সভাপতি মহারাজ উক্ত স্থানে বক্তৃতা
করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা
আলোচনা করেন।

ছোকাপাড়া—৯ আষাঢ়, ২৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার আচার্য্যদেব সগোষ্ঠী
অভয়াপুরী হইতে ছোকাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দাস মহাশয়ের
গৃহে উপস্থিত হন। রাত্রে স্থানীয় বিদ্যালয়ে এক বিরাট সভায় বক্তৃতামুখে শ্রীসভা-
পতি মহারাজ সকলকে জানান যে—ত্যাগী কোপীন-ধারীর স্ত্রীলোক সহ আখড়া
প্রভৃতিতে বসবাস করা অশাস্ত্রীয় ও অপরাধজনক। তাহাদের সমাজে কোন
প্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। বৈষ্ণবগণ কখনই মৎসাদি ও মাদকদ্রব্যাদি
ব্যবহার করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। সদাচার সম্পন্ন হইয়া
শুদ্ধভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ না করিলে কখনই শ্রীনামের কৃপা সম্ভব নহে।

বঙ্গাইগাঁও—১০ই আষাঢ়, ২৫ জুলাই শুক্রবার—ছোকাপাড়া হইতে
সভাপতি মহারাজ বঙ্গাইগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে শুভাগমন করেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবু শ্রীল আচার্য্য-
দেবের নানা প্রকার সেবা করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তিনি শ্রীল
আচার্য্যদেবকে তৎপ্রদেশে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্ত
বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১১ই আষাঢ়, তারিখে তথায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিবার পর শ্রীল
সভাপতি মহারাজ সদলে ট্রেনে আরোহণ করেন ও রথযাত্রা উৎসব করিবার
জন্ত ১৩ই আষাঢ় তারিখে চুচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

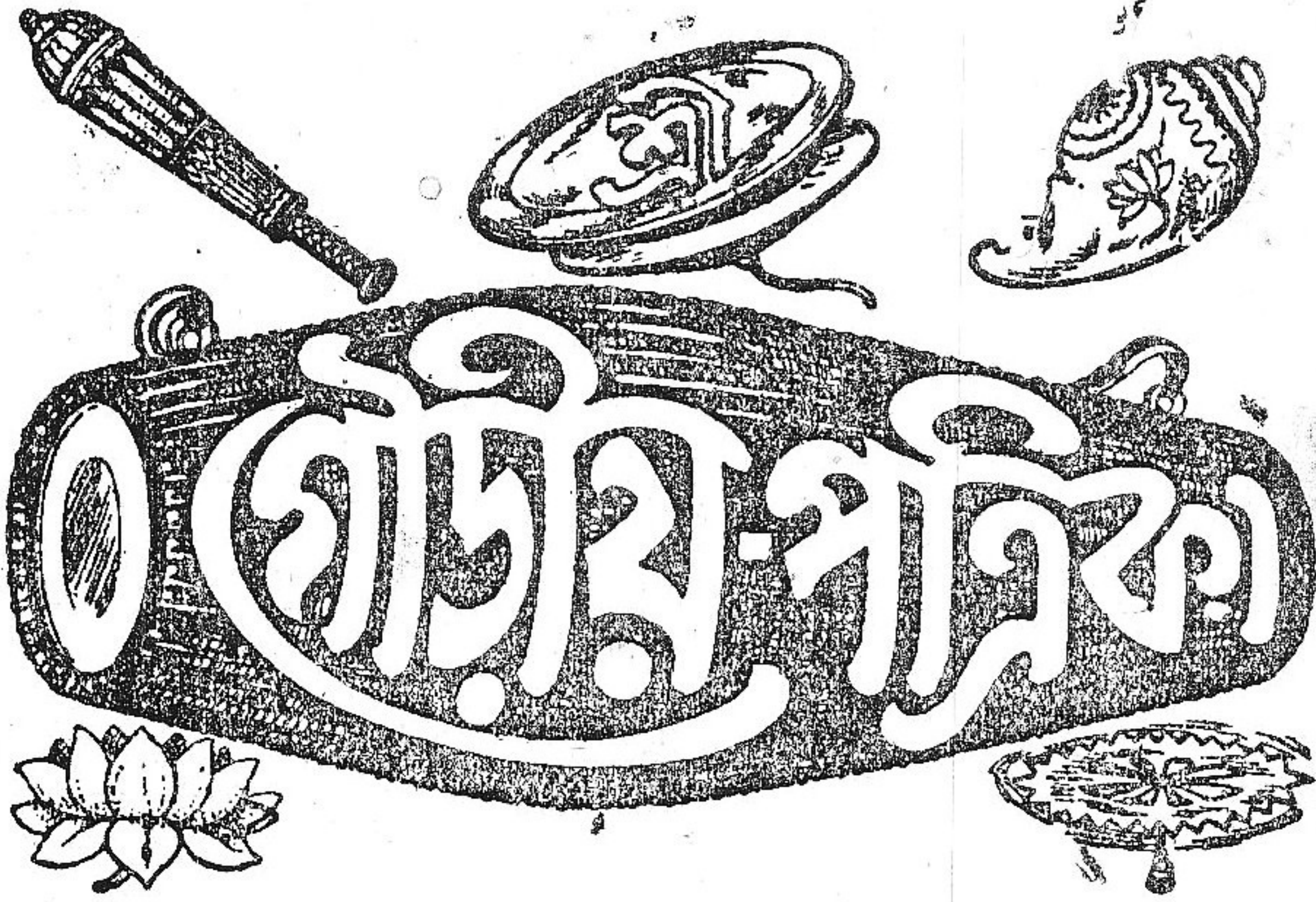
—নিজস্ব সংবাদ

*

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষা জ ।

*

ধর্মঃ স্নুতিতঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাসু যঃ



নোৎপাদয়োদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

*

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

*

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।

অন্য ধর্ম সুপুরুষে পালে যেই জন ।

অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৬ষ্ঠ বর্ষ

কাশ্মদেব, ৫ দামোদর, ৪৬৮ গৌরাক্ষ

রবিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৬১ ; ইং ১৭।১০।৫৪

৮ম সংখ্যা

ইন্দ্রকুট-শ্রীকৃষ্ণস্ততি

বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং

তমোময়ং ধবস্ত-রজস্তমস্কম্ ।

মায়া-ময়োহয়ং গুণ-সম্প্রবাহো

ন বিদ্যতে তেহগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ১ ॥

কুতো নু তদ্বৈতব স্পৃশ তৎকৃত্য

লোভাদয়ো যেহবুধ-লিপ্স-ভাবাঃ ।

তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্য খল-নিগ্রহায় ॥ ২ ॥

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যঃ কাল উপাত্ত-দণ্ডঃ ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুয়ন্ জগদীশ-মানিনাম্ ॥ ৩ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশ-মানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেহভয়মাশু তন্মদম্ ।

হিত্যর্য্য-মার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেহনুশাসনম্ ॥ ৪ ॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্নু তস্ত
কৃতাগসস্তেহবিদুষঃ প্রভাবম্ ।
ক্ষন্তং প্রভোহথাইসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূমতিরীশ মেহসন্তী ॥ ৫ ॥

তবাবতারোহয়মধোক্কেজেহ
ভুবোভরাণামুরুভার-জন্মনাম্ ।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুগ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্ ॥ ৬ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭ ॥
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্তয়ে ।
সর্ববৈশ্ণে সর্বব-বীজায় সর্বব-ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৮ ॥
ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠ-নাশায়াসার-বায়ুভিঃ ।
চেপ্তিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥ ৯ ॥
ত্বয়েশানুগৃহীতোহস্মি ধবস্ত-স্তম্ভো বৃথোত্তমঃ ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মনং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৭শ অধ্যায়

ইন্দ্রকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তুতির বঙ্গানুবাদ

হে দেব, তোমার স্বরূপ অপরিবর্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময়, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় । অজ্ঞানানুবন্ধজনিত, মায়াময় এই গুণ-প্রবাহ (অর্থাৎ মায়ামিশ্রিত দেহ বা সংসার) তোমার নাই ॥১॥

হে ঈশ, তোমার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন তোমাতে দেহ-সম্বন্ধ-ভূত এবং অত্ম দেহোৎপত্তির মূল-কারণস্বরূপ অজ্ঞানীর চিহ্ন লোভাদি দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায় ? তথাপি আপনি ধর্মরক্ষা এবং দুষ্ট-দমনের জন্য দণ্ড-ধারণ করিয়া থাকেন ॥২॥

জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ববিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতার-সমূহের প্রকট করেন ॥৩॥

আমার ত্যায় যে সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগপূর্বক নিরহঙ্কার-ভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে । অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা খলব্যক্তিদিগের শিক্ষাস্বরূপ ॥৪॥

হে প্রভো, আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেই জন্যই ঐশ্বর্যাগর্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি । আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ । হে ঈশ ! আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্নতি না হয় ॥৫॥

হে দেব ! অধোক্ষজ, গুরুভারজনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসৈন্যাদি-পতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্যই এই মর্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছেন । অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৬॥

আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আপনাকে নমস্কার । আপনি সর্বাস্তুর্য্যামী, সর্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বায়ুদেব, সাত্বতদিগের অধিপতি, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞানময় । অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া আপনি সর্বরূপ, সকলের মূল-কারণ এবং সর্বভূতের আত্মস্বরূপ । আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

হে ভগবন্, আপনি আমার যত্ন নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত

ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠবিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিল। ॥১০॥

হে ঈশ, তোমার প্রয়াস বার্থ এবং গর্ব নষ্ট করিয়া আপনি অন্তগ্রহই করিয়াছেন। সম্ভ্রান্তি আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম ॥১০॥

ভাই সহজিয়া

অনর্থ থাকা কালীন কৃত্রিম সিদ্ধ-প্রণালী অমঙ্গল-জনক

ভাই সহজিয়া! তুমি বল আমি গুরুর কার্য্য করি না; কেবল মাত্র সিদ্ধ-প্রণালী দিয়া জীবকে সাধন-দশা হইতে মুক্ত করি। আমাদের দলে সকলেই সৌভাগ্যবান ভক্ত—রাগানুগ ভক্ত। তাহারা পারমাত্মিক মন্ত্রের তোয়াক্ষা রাখে না। গুরু নিজেই শিষ্যের শিষ্য; সুতরাং বৈধ ভক্তের কাণাচ দিয়াও হাঁটে না। তুমি বল যে—শিষ্যানুবন্ধে ভক্তি থাকে না, তবে কেন তোমার ঐ প্রয়াস? তুমি বল—আমি শিষ্য করি না; তাহা কি সত্য? আজ-কালকার দিনে আট আনা (১০) দিলে সিদ্ধ-প্রণালী পাওয়া যায়। মন্ত্র দিবার আগেই সিদ্ধ-প্রণালীর দাম দস্তুর হইয়া যায়। সিদ্ধ-প্রণালী না পাইলে সাধকের কোন মঙ্গল নাই। তুমি বল, রাগানুগ ভক্তের অনর্থ নিবৃত্তির পূর্বেই সিদ্ধ-প্রণালী পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনর্থ থাকাকালে সিদ্ধ-প্রণালীকে অনর্থ-জড়িত করা কি তোমার ভাল? ফুল হইবার আগেই পাতায় ফল ধরিবে, এরূপ বুঝান কি শঠতা নহে?

যথা-তথা রস কীর্ত্তন ও ভজন-কথা ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ

ভাই সহজিয়া! তুমি যথায় তথায় রস-গান শিখাও, রস-গান শুনিতে যাও, রস-গান গাহিয়া নিজেকে রসিক মনে কর; হাটে-ঘাটে, বাজারে রসের কুসুম বিছাইয়া দেও। তোমার কি 'রস' ভাল লাগে না? তুমি অপ্রাকৃত রসের এত অনাদর করিতে শিক্ষা করিলে কেন? ভজন-রহস্য কি বাহিরে প্রকাশ করিতে আছে? ("আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা")

বিভিন্নাংশ জীব স্বরূপ অনুযায়ী 'মঞ্জরী' হইলেও 'সখী' হইতে পাবেন না।

ভাই সহজিয়া! তোমার প্রদত্ত সিদ্ধ-প্রণালী পাইয়া মঞ্জরীগণ অনেক সময় নিজের সেবা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে সখী অভিমান করিয়া বসিয়া

থাকেন। ভাই! তুমি কি 'পাদাজ্যোস্তব বিনা' শ্লোকটি ভুলিয়া গেলেন? ভাই মঞ্জরীরা তো কখনও আপনাদিগকে সখী বলে না; মঞ্জরীর পরিচারিকারা নিজের গুরুকে সখী অভিধান করেন। তবে কেন তুমি মঞ্জরীর হৃদয়ের ভাব এবং সেবা ভুলিয়া গেলেন? যাহাকে মঞ্জরী রূপে পরিণত করিলে, সে কেন 'দাস্য' বিস্মৃত হইয়া গৌরবময়ী 'সখী' হইল, সে কেন মঞ্জরী-বৃত্তি ছাড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমান করিল? সে কেন কিশোরী-ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রবীণা বৃদ্ধা বর্ষীয়সী হইল?

কৃত্রিম-ভাবে বসন-ভূষণের কল্লনা সাধকের অহিতকর

ভাই সহজিয়া! তোমার বাক্য-প্রদত্ত 'বসন', 'উত্তরীয়' তাহার কেন ভাল লাগিল না? সে কেন কালিন্দী-তট-কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত গৃহে প্রবেশ করিল? সে কেন প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়নার গোপনে পুরুষাভিমান করিয়া ফেলিল?

**সহজিয়াগণ কামুক বিধায় তাহারা বাৎসল্যাদি রসের
অস্তিত্ব অস্বীকার করেন**

ভাই সহজিয়া! তোমার বিচারে বাৎসল্য সখ্য দাস্য রস বাতিল হইয়াছে; মানুষ দেখিলেই তুমি মধুর রসে পারঙ্গত বলিয়া বুঝিয়া থাক স্মৃতিরানন্দের আশ্রিত জনকে, চিত্রক রক্তক পত্রকের আশ্রিত ভক্তকেও তুমি মঞ্জরী সাজাইয়া দিয়া থাক এবং নিশাস্ত-লীলার গান শুনাইয়া ককথটীর আনুগত্য শিখাও; এ-সকল তুমি ভাল বোঝ; কেন না, তোমার অভিমানে তাদৃশ যোগ্যতা আছে!

প্রাকৃত বস্তু জড়ীয়গুণে অপ্রাকৃত হয় না

ভাই সহজিয়া! তুমি কেন অপ্রাকৃত অর্চা মূর্তিকে, অপ্রাকৃত হরিনামকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা কর? ভগবানের বৈকুণ্ঠ নাম ও শ্রীমূর্তি কখনই প্রাকৃত নহে, তবে তুমি তাহাকে কেন প্রাকৃত বুঝিয়াছ? ভাই তুমি বলিয়াছ যে, জড় দ্রব্য-গুণে প্রাকৃত বুদ্ধিটি অপ্রাকৃত হইবে। শ্রীবিগ্রহে শিলা ও কাষ্ঠ বুদ্ধি করিলেও, নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত, চিৎস্বরূপ অভিন্ন-নামনামী হরিনামে জড়ীয় অক্ষর বুদ্ধি করিলেও, অর্থাৎ অর্চায় শিলাবুদ্ধি ও অপরাধযুক্ত অক্ষর উচ্চারণ-প্রভাবে সকলেরই গোলোক লাভ হইবে। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন তাহা নিষেধ করিয়াছেন কেন? তুমিত জান সেবোন্মুখ হইলেই কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, শিলা শুদ্ধ-চিদেহে স্মৃতি প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরও বিকার উৎপন্ন করে।

জড়দেহে আত্ম-বুদ্ধি বা সিদ্ধ-দেহ-বুদ্ধি গর্দভতা।

‘যন্ত্যাত্মবুদ্ধিঃ’ (১০।৮৪।১৩) শ্লোক হইতে তুমি ত জানিয়াছ যে তোমার জড় শরীরকে সিদ্ধ দেহ মনে করিলে গর্দভতা হয়, তোমার পত্নী-পুত্র-বন্ধুদিগকে তোমার নিজের জ্ঞান করিলে তোমার গোখরত্ব হয়, অর্চ্য মূর্তিকে প্রাকৃত জানিলে তোমার নির্বুদ্ধিতা হয়, কৃষ্ণচরণামৃতকে অপ্রাকৃত না জানিলে তোমার রাসভূতা হয়, আবার ‘যেষাং জ এধ ভগবান্’ (ভাঃ ২।৭।৪২) শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে—কুকুর-শৃগাল খাওয়া দেহটাকে যিনি নিজের সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহ বলিয়া জানেন তিনি মায়ার হাত হইতে পরিভ্রাণ পান না, তিনি ভগবানের দয়া পান না, তিনি কপটতার মধ্যে পতিত হন। ‘অর্চেয় বিমেষী শিলাধীঃ’ (পদ্মপুরাণ) শ্লোকে তুমি জানিয়াছ যে হরিনামে অক্ষর-বুদ্ধি করিলে, শ্রীমূর্তিতে কাষ্ঠ-শিলা বুদ্ধি করিলে, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিলে, অপ্রাকৃত ভগবানে প্রাকৃত জীব বুদ্ধি করিলে, গুরুদেবে মরণশীল জীব বুদ্ধি করিলে, চরণোদকে জল বুদ্ধি করিলে, জীব প্রাকৃত নরকে পতিত হয়।

ফনোগ্রাফ্ নাম (?) করিলে গোপী বা রসিক হয় না।

এ ছাড়া ‘প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন (বঃ সং ৫।৩৮) শ্লোকটি ভুলিয়া গিয়া অপ্রাকৃত গুরুর পাদপদ্ম ছাড়িয়া সহজিয়াদের গুরুর পদে বরণ করিলে? যে সকল মারাবাদীকে দেখিলে তুমি শিহরিয়া উঠিতে, সেই সহজিয়াদিগের ধামা-ধরা হইয়া আজ কিনা ভাই! তুমি বল—‘অপরাধময় নামের শক্তি হইতে ‘ফনোগ্রাফ্’-যন্ত্র গোপী হয়। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্তী হইয়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ও ব্যভিচার করিতে করিতে জীব নরকে যাইবার পরিবর্তে গোলোকে যায়!’ শাস্ত্র সকল অন্বেষণ করিয়া তোমাকে গালাগালি দিয়াছে, তজ্জন্ম ভক্ত ও ভক্তি-শাস্ত্রের অপরাধ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অপরাধ হইয়াছে! এখন হইতে আমরা আর হরিনাম না করিয়া যাবতীয় ‘ফনোগ্রাফ্’ দিগকে রসিক ভক্ত করিয়া গোলোকে পাঠাইব। আর আমরা যে-যার নিজের বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব, আর ভাই সহজিয়া! তোমরা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে।

বিদ্বগঙ্গলের উদাহরণে সহজিয়ার ক্রম-লঙ্ঘন অশাস্ত্রীয়

— ভাই সহজিয়া! তুমি বল শ্রদ্ধাতো সামান্য কথা, তাহাদের ‘লোভ’ হইয়াছে তাহাদের আবার ক্রম কি? ‘লোভ’ হইলেই ত বিদ্বগঙ্গলের ঞ্চায়

সকলেই শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব প্রভৃতি সাধন ক্রম ত্যাগ করিবে—ভাবানুরাগের লক্ষণ তাহাতে প্রকাশের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক প্রাকৃত-সহজিয়া, প্রত্যেক ‘চিন্তামণি’-গুরু (নিকট রূপালাভ করিয়াই প্রেমের স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একেবারে বিলম্বজল-ঠাকুর হইয়া অনুরাগ-সম্পত্তির অধিকারী হয়। তুমি কথায় কথায় পার্শ্বপাশ্চ লম্পটগণকে প্রেমের দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেমের পঞ্চমস্তর অনুরাগের মালিক মানিতেছ। ইহা কি ভাই রূপানুগ পথ? তুমি ভাই ‘ভক্তি-রসায়ন’ ও ‘উজ্জল’ নান না কেন? বিশেষতঃ লোভ-মূল্য শ্রদ্ধা, লোভমূল্য সাধুসঙ্গ, লোভমূল্য ভজন-ক্রিয়া, লোভমূল্য নিষ্ঠা প্রভৃতি টপকাইয়া তথাং সকলেই বিলম্বজল হয় না।

বৈধক্রম অবলম্বন করিলেই রাগ ও লোভ জন্মে ; বিলম্বজলের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল

বিধিমূল্য অর্থাৎ শাস্ত্রশাসন-ভরমূল্য শ্রদ্ধার ক্রম বৈধ-ভক্তিক্রম। আর লোভমূল্য শ্রদ্ধা হইতে রাগানুগার ক্রম তোমার বুদ্ধিতে নাই কেন? চরিতামৃতে মধ্য ত্রয়োবিংশে রাগানুগ ভক্তের প্রেমোদয়ের লক্ষণ বর্ণন করিতে গিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন—কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়। সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থনিবর্তন। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাচ্ছ রুচি উপজয়। রুচি হইতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হইতে চিন্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যাকুর। সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম। (কান্তি প্রভৃতি নয়টি) এই নব প্রীত্যাকুর যার চিন্তে হয়। প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাই হয়। প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়। রাগানুগ-মার্গীয় ‘চিন্তামণি’-গুরু সকলেরই ভাগ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যাইবে—এরূপ নহে।

“সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতত্ত্বক্ৰয়োস্তথা।

প্রসাদেনাভিধন্যানাং ভাবো দ্বেষাভিজায়তে ॥

আত্মস্ত প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ে বিরলোদয়ঃ।”—সুতরাং ভাই সহজিয়া! তুমিহঁতো জান অনর্থবৃত্ত বৈধ সাধক যাত্রাই রাগানুগ-মার্গীয় পরম’দুলভ কৃষ্ণভক্ত প্রসাদজন্মের বিলম্বজল নহেন।

সাধন বা ক্রমপথ ব্যতীত সিদ্ধি হয় না।

ভাই সহজিয়া! সাধনভক্তি রাগানুগার নাই একথা তোমার নিতান্ত ভুল। তুমি একটি বিনম্রজলের উদাহরণ দিয়াই রাগানুগা মার্গের সকল সাধককে একেবারে অজ্ঞানাগে উঠাইয়া দিবে, একথা শ্রীরূপ গোস্বামী বিশ্বাস করেন না। তোমার এইরূপ ভ্রম-বিশ্বাস শুনিয়া আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কোন ভৃত্য নিতান্ত ক্ষিপ্ততা সহকারে কোন দূরদেশ হইতে অত্যন্ত কালের মধ্যে পদব্রজে আগত হইলে তাহার প্রভু বিষয় সহকারে ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তদুত্তরে ভৃত্য কহিলেন তাহা হইলে আমি বোধ করি হাঁটিয়া আসিবার কালে খানিক পথ ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি। ভাই সহজিয়া! তোমার ভক্তিমাগে হাঁটুটাও কি এইরূপ? সকলে কিছু বেলুনে চড়িয়া নির্দিষ্ট পথ বাদ দিতে পারে না। সেতুর সাহায্য ব্যতীত লঙ্কার পৌছান সকলের ভাগ্যে ঘটে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু

রঘুনাথের জন্ম-কুল ও গৃহভ্যাগ

এ বৎসর ২২শে আশ্বিন শনিবার ১৩৬১, ইং ১৯০৭৫৪ * শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরো-ভাবোৎসব। রঘুনাথ দাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব। ঐ মহাত্মা যৌবন কালেই শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রচুর সম্পত্তি ও সর্বগুণসম্পন্ন পূর্ণ-যৌবনা ভাৰ্য্যাকে মলবৎ পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যপথ দিয়া তিন দিবসের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমধামে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করত তাহাকে সম্পূর্ণ রূপা করিলেন।

দাস-গোস্বামি-প্রভুর বৈরাগ্য ও অযাচক বৃত্তি

রঘুনাথের বৈরাগ্য বড়ই কঠিন ছিল। মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, “রঘুনাথের বৈরাগ্য জীবে না সন্তবে”। রঘুনাথ

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বর্ষে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর তিরোভাব ‘৪ঠা কাতিক মঙ্গলবার’ ছিল।—সম্পাদক

অযাচক ছিলেন ; তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহ-
দ্বারে বন্ধাজলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। লোকে তাঁহার সেই বন্ধাজলিতে
মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দিত। অঞ্জলিপূর্ণ প্রসাদ হইলেই তিনি স্বস্থানে আসিয়া ভক্ষণ
করিতেন। রঘুনাথ ঐরূপ নিয়ম করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তিনি মনে
করিলেন যে, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকা ব্যভিচারিণীর স্থায় কার্য্য
হইতেছে। তাহারাত (বেষ্ণুরাত) ত জীবন রক্ষার জন্ত স্বদ্বারে দণ্ডায়মানা থাকে।
অতএব আমি উক্ত প্রকার নিয়মাবলম্বন না করিয়া পরিত্যক্ত পৰ্যুষিত প্রসাদ
লইয়া ভক্ষণপূর্বক জীবন ধারণ করিব। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ তাহাই করিতে
আরম্ভ করিলেন।

মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপনে শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্য

একদিন দয়াল চৈতন্যদেব রঘুনাথকে সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিতে
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “রঘুনাথ ! তুমি কি ভক্ষণ করিতেছ ?” রঘুনাথ
চৈতন্যদেবের বাক্যের অন্ত কোন উত্তর না দিয়া অক্ষুটস্বরে বলিলেন,—
“আজ্ঞা ?” তখন সর্বাস্তুর্যামী চৈতন্যচাঁদ হাস্ত করিতে করিতে তাঁহার পাত্র হইতে
একমুষ্টি প্রসাদ লইয়া ভক্ষণপূর্বক বলিলেন যে, “রঘুনাথ ! তুমি আমাকে বঞ্চিত
করিয়া একাকী এমন অমৃত ভক্ষণ করিয়া থাক ?” রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐ
প্রকার ব্যবহারে বিশেষ কুণ্ঠিত হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের পুরুষোত্তম
বিহার বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের অবিদিত নাই।

রঘুনাথের রাধাকুণ্ড গমন ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড খনন-রহস্য

রঘুনাথ মহাপ্রভুর অনুমত্যানুসারে পুরুষোত্তম হইতে শ্রীবন্দাবনধাম গমন
করিয়া তথায় সনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধা-
কুণ্ড-তীরে অবস্থান করিলেন। অকস্মাৎ একদিবস স্বপ্নবৎ তাঁহার হৃদয়ে উদয়
হইল যে, “শ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড” পুনর্বার খনন হইলে ভাল হয়। পাঠক !
ভক্তের বাসনা পূরণ করিবার জন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বাধ্য আছেন—বদরিকাশ্রম
হইতে শ্রীশ্রীনারায়ণদেব কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা জনৈক ব্যক্তিকে দিয়া আদেশ
করিলেন যে, “তুমি এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি ব্রজধামে ‘আরিট’ গ্রামস্থিত বৈষ্ণব-প্রধান
রঘুনাথ দাসকে দিবে। যদি তিনি গ্রহণে অস্বীকার হন, তাহা হইলে কহিবে
যে, এই স্বর্ণমুদ্রা শ্রীনারায়ণ বদরিকাশ্রম হইতে পাঠাইয়াছেন। আপনি এই
মুদ্রা লইয়া শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড খনন করান্।”

বলরীনারায়ণ কর্তৃক অর্থ প্রেরণ ও কুণ্ড খণ্ডনের পরামর্শ

নারায়ণের আদেশক্রমে সেই ব্যক্তি আরিটগ্রামে আসিয়া রঘুনাথকে মুদ্রা-
গুলি অর্পণ করিলে, রঘুনাথ তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তদনন্তর
নারায়ণের প্রেরিত লোক তাঁহার সম্মিথানে নারায়ণনোক্ত সমস্ত কথা নিবেদন
করিল। রঘুনাথ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ‘হা প্রভো ! হা নাথ !
হা শরণাগত-বাহুপরিপূরক’ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ পূর্বক রোদন করিতে
লাগিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ স্থির-ভাবালম্বন করিয়া ব্রজবাসিগণকে আহ্বান
করত কুণ্ডদ্বয় খননের পরামর্শ আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কর্তৃক রঘুনাথের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত

পরামর্শ কালীন সকলে বলিলেন যে, শ্রামকুণ্ডতীরে যে প্রাচীন বৃক্ষটি
রহিয়াছে, উহাকে ছেদনান্তর শ্রামকুণ্ডের চতুষ্কোণ সমান করিয়া খনন করিতে
হইবে। তাঁহাদের ঐক্লপ স্থির হইলে রাজা যুধিষ্ঠির সেই রাত্রে স্বপ্নহলে
রঘুনাথকে বলেন যে, “আমাদিগকে ছেদন করিবেন না। আমরা পঞ্চভ্রাতা
বৃক্ষরূপে শ্রামকুণ্ড তীরে অবস্থান করিতেছি।” রঘুনাথ সেই কারণে বৃক্ষ ছেদন
করিতে দিলেন না। এই নিমিত্ত শ্রামকুণ্ড বক্র করিয়া খনন করা হইল।
শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অদ্ভুত চরিত্রাবলী বৈষ্ণবমণ্ডলীর অজ্ঞাত নাই।
অতএব আমরা এইস্থানে লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

—জগদগুরু শ্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রার্থনা-পত্রিক (২)

(ক)

প্রভুগাদ !

কলিযুগে জীব,

হেলায় তরিবে,

শ্রীনাম কীর্তন গাই।

বর্ণাদি বিচার,

দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-

বিধি-বাধা কিছু নাই ॥ ১ ॥

যাঁর মুখে সদা,

শুনি বামুদেব,

জগন্নাথ নারায়ণ।

শরনে-স্বপনে, কৃষ্ণ নাম করে,

পূজ্যগুরু সেইজন ॥ ২ ॥

চলিতে বসিতে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে,

সেই পূজ্য সর্ববদতে ।

নাম সঙ্কীৰ্তনে, সর্বসিকি লাভ,

হয় এ ধন্য-কলিতে ॥ ৩ ॥

হেন কৃষ্ণনামে, রুচি নাহি মোর,

অসত্তের সঙ্গ করি ।

এ দীন গোপালে, হে দয়াল প্রভু !

রক্ষাকর কৃপা করি' ॥ ৪ ॥

(২)

প্রভুপাদ !

সর্ব-শক্তিমান—

নাম কৃষ্ণ-সম ;

যেই কৃষ্ণ সেই নাম ।

নাম ভগ্নাত্মা,

কৃষ্ণের সকল-

শক্তি, নামে বর্তমান ॥ ১ ॥

সাংখ্য-অক্টোঙ্গাদি,

যোগ কিবা ছার,

মুক্তিও সামান্য ফল ।

গোবিন্দ-কীর্তন,

হেলায় করিলে,

মুক্তি পায় ভীষ সকল ॥ ২ ॥

দান-ব্রত-তপ-

তীর্থ-রাজসূয়—

অশ্রমেধে (ব্রত) শক্তি ছিল ।

সে সব শক্তি,

কৃষ্ণ নিজ নামে,

সব আকর্ষিয়া নিল ॥ ৩ ॥

হেন নাম ধনে,

বঞ্চিত গোপাল,

ঘটে নাম অপরাধ ।

করুণা করিয়া,

নামে দেহ রুচি,

কুমি' মোর ভ্রম-পরমাদ ॥ ৪ ॥

(১)

প্রভুপাদ !

শ্রী-শূদ্র-পুঙ্খ,

যবনাদি যদি,

কৃষ্ণনাম সদা গায় ।

সেও লব-মাত্রে,

ব্রহ্মাণ্ড তারয়ে,

সেও গুরু-পূজ্য হয় ॥ ১ ॥

সকল প্রকার,

ধর্ম্মশূন্য হ'য়ে,

নাম-জল্পী যদি হয় ।

তার যে সুগতি,

বর্ণিতে না পারি,

(তাহা) সর্ব ধার্ম্মিকের নয় ॥ ২ ॥

যজ্ঞে দানে স্নানে

জপে তপাদিতে,

কালের নিয়ম আছে ।

কালাকাল চিন্তা,

মহা ভ্রম মাত্র,

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাছে ॥ ৩ ॥

সদা কৃষ্ণনাম,

অপরাধ বিনা,

নিয়মাদি নাহি নামে ।

হেন কৃষ্ণনাম,

চাহয়ে গোপাল,

নাহি চাহে অন্য কামে ॥ ৪ ॥

(২)

প্রভুপাদ !

হরিনাম বিনা,

এই ত্রিজগতে,

কেহ নাহি মুক্তি দাতা ।

'হরি'-দু' অক্ষর,

বল একবার,

নামই জীবের ত্রাতা ॥ ১ ॥

জিতনিদ্র হ'য়ে,

যেই মহাশয়,

একবার হরি বলে ।

শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে,

সেই নর শ্রেষ্ঠ,

ভকতির পথে চলে ॥ ২ ॥

এ ঘোর সংসারে, বিবশ হইয়া, .
যদি বলে 'হরে হরে' ।

সদ্যমুক্ত হয়, ভয় নাহি রয়,
ভয় তা'রে ভয় করে ॥ ৩ ॥

সংসারে মজিয়া, হেন কৃষ্ণ নাম,
সদা আছি বিস্মরিয়া ।

এ দীন গোপালে, করি' অনুরাগী,
নাম দেহ সংশোধিয়া ॥ ৪ ॥

(৬)

প্রভুপাদ !

মৃত্যুকালে যেই, বিবশ হইয়া,
(করে) কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ।

বহু জন্মার্জিত, পাপ দূরে যায়,
পায় সে পরম ধন ॥ ১ ॥

যেমন তেমনে, অপরাধ হীন,
কৃষ্ণনাম ল'ন যিনি ।

ভাঁহারে সদাই, কৃষ্ণ প্রীতি করে,
করুণা-নিদান তিনি ॥ ২ ॥

এ মহী-মণ্ডলে, ভক্তির প্রকার,
যত শাস্ত্রে দেখা যায় ।

ভাহাদের মাঝে, কৃষ্ণ নামাশ্রয়,
সর্বশ্রেষ্ঠ বলি গায় ॥ ৩ ॥

ভুবন তারণ, কৃষ্ণ নাম-ধনে,
আশ্রয় নাহিক করি ।

পামর গোপাল, নরক-আগুণে,
পুড়ে তিল তিল করি' ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন
নারায়ণ (মেদিনীপুর)

শ্রাদ্ধ-মত-বিবেচক (পাঁচ)

(পূর্ব প্রকাশিত ষষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ-নীতি

এইবার আমরা বৈষ্ণবীয় শ্রাদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বৈষ্ণব-
স্বতি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস বলেন—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগম্নঃ ভগবতেহর্পয়েৎ ।

তচ্ছেষেনৈব কুর্কীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯৮৪)

অর্থাৎ—ভগবন্তুজ্ঞান শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সেই দিনে প্রথমতঃ অন্নাদি
সমস্তই ভগবৎ সমীপে নিবেদন করত ভগবন্নিবেদিত সেই অন্নাদি দ্বারাই শ্রাদ্ধ
কার্য সম্পাদন করিবেন। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—

বিষ্ণোনিবেদিতান্নেন যষ্টবাং দেবতাস্তুরম্ ।

পিতৃভ্যাশ্চাপি তদেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯৮৭ ধৃত)

অর্থাৎ, বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা দেবতাস্তুরের পূজা করিতে হইবে এবং
পিতৃলোককেও সেই হরি-নিবেদিত অন্নই দিতে হইবে—ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ
হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্ । :

তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী-বিমিশ্রানাকল্প-কোটিং পিতরঃ স্মৃতপ্তাঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯৮৯ ধৃত)

অর্থাৎ, শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষ অর্থাৎ তৎপ্রসাদান্ন ভক্তির সহিত পিতৃগণ
ও দেবতাগণকে অর্পণ করিলে এবং তুলসী সমন্বিত মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড অর্পণ
করিলে তদীয় পিতৃগণ কোটিকল্প পর্যন্ত সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করেন।

স্কন্দ পুরাণে শিবের উক্তিতেও বর্ণিত হইয়াছে—

দেবান্ পিতৃন্ সমুদ্दिशु যদ্বিষ্ণোবিনিবেদিতম্ ।

তান্নুদ্दिशु ততঃ কুর্যাৎ প্রদানং তস্ম চৈব হি ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯৯০ ধৃত)

অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রথমতঃ হরিকে অন্নাদি সমস্ত দ্রব্য
নিবেদন করত তত্বেদেবতা ও ততৎ পিতৃগণকে তাহাই অর্পণ করিবে। হরিকে
নিবেদিত বস্তু ব্যতীত অণু কোন বস্তু কখনও কোন দেবতা বা পিতৃগণকে
দিবে না।

স্কন্দ পুরাণে আরও দেখা যায়—

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া ।

এবং কৃতে মহীপাল না ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ ॥

(স্কান্দে শিবোক্তি, হঃ ভঃ বিঃ ৯৯১)

হে মহীপাল ! এইরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসাদান্নাদি দ্বারা অন্ন দেবতার্চন বা পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিলে, দেবগণের ও পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।

উক্ত প্রমাণসমূহ ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সর্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্বিবেদিত অন্নাদি দানমূলক শ্রাদ্ধ-করণে পিতৃ-যজ্ঞের পূর্ণতা বিধান হইয়া থাকে ; শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপুরুষগণের অশেষ কল্যাণ হয় ।

একাদশীতে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ

স্মৃতি-শাস্ত্র-বিহিত আদ্য শ্রাদ্ধটী বৈষ্ণবীয় মতে করিতে হইলে ঐ দিনেই বৈষ্ণবীয় আনুষ্ঠানিক নাম-যজ্ঞ, গীতা-ভাগবতাদি পারায়ণ ও বৈষ্ণব ভোজন প্রভৃতি কার্যগুলি করিতে হইবে । তবে এখানে একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় এই যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে করণীয় আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক-ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ, পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ, পতিত শ্রাদ্ধ, ও সাঙ্ঘ্যন্দরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে কোনও শ্রাদ্ধই উপবাস-যোগ্য একাদশ্যাदिতে উপস্থিত হইলে সেই দিন পরিত্যাগ করিয়া পারণদিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । মনুষ্যকে অধিকার অনুযায়ী আত্ম অস্থায়ী ফলভোগ জন্ম কর্মমার্গে প্রবৃত্ত হইবার যেমন বৈদিক ও পৌরাণিক বিধি আছে, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রকেই ভগবৎ-প্রীতি লাভের জন্ম ভক্তিমার্গে প্রবর্তিত করিবারও বৈদিক এবং পৌরাণিক বিধি রহিয়াছে । তাই একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস সম্বন্ধেও ‘স্মার্ত্ত’ ও ‘গোস্থামী’—এই দুই প্রকার মতই প্রচলিত আছে—যদিও স্মার্ত্তমতের ফল অনিত্য ও গোস্থামিমতের ফল নিত্য, সনাতন ও অভুলনীয় ।

বৈষ্ণবীয় মতে একাদশীর ইতিকর্তব্যতা ও মহিমা হরিভক্তিবিলাস সর্বিশেষ বর্ণন করিয়াছেন । বৈষ্ণবের গক্ষে বিষ্ণুপ্রীতিমূলক হরিবাসর ভ্রত-পালন অপেক্ষা পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রেষ্ঠ নহে । তাই পদ্মপুরাণ পুষ্করখণ্ডে বলিতেছেন—

একাদশ্যাং যদা রাম ! শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ ।

তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২২)

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন “হে রাম ! একাদশীদিনে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেইদিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে (পারণ দিনে) শ্রাদ্ধ করিবে ।”

এখানে শ্লোকোক্ত নৈমিত্তিক শব্দটির একটু আলোচনার প্রয়োজন । কৰ্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান চারিপ্রকার । যথা—নিত্য, কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যকাম্য । যাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, তাহা নিত্য । বিশেষ কোন ফললাভের আশায় করণীয় কার্য—কাম্য । আগন্তুক কারণে করণীয় কৰ্ম্ম—নৈমিত্তিক এবং না করিলে প্রত্যবায় ও করিলে বিশেষ ফল যাহাতে, তাহাই নিত্যকাম্য । উক্ত নিত্যকাম্যাদির ব্যাখ্যা রঘুনন্দন-স্মৃতি শাস্ত্রেও বিহিত আছে ।

অহরহঃ করণীয় শ্রাদ্ধকে নিত্য বলা যায় । “অহরহঃ শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বীত ফলেন উদকেন বা ।” “শ্রাদ্ধং কুৰ্য্যাৎ দিনে দিনে” ।—এইসব বিধিগুলি পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে । উহা নিত্য করণীয় । পঞ্চযজ্ঞ যথাঃ—দেব-যজ্ঞ, ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ও নৃ-যজ্ঞ । দেবার্চনা—দেব-যজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ—ব্রহ্ম-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—পিতৃ-যজ্ঞ, পশু-পক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দান—ভূত-যজ্ঞ, অতিথি সংকারাদি—নৃ-যজ্ঞ । এই পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধকেই নিত্য বলা যায় ।

“অহন্থহনি যং শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে”

স্মৃতি-শাস্ত্রমতে একজনকে বা ততোধিকজনকে নিমিত্ত বা উদ্দেশ করিয়া আত্মাদি যে-কোনও শ্রাদ্ধ করা হউক না কেন, তাহাই নৈমিত্তিক । “একো-দ্দিষ্টন্তু যং শ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে ।” তাই সনাতন গোস্বামিপাদ হরিভক্তি-বিলানে “একাদশ্যাং যদা রাম !”—ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন— “একাদশ্যাং যদা রামেত্যদিনা উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধম্ ।” এখানে ‘শ্রাদ্ধ’-শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করার সকল প্রকার শ্রাদ্ধই নিষিদ্ধ বুঝাইতেছে । স্কন্দপুরাণেও উক্ত আছে—

একাদশী যদা নিত্য শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ ।

উপবাসং তদা কুৰ্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৯ ধৃত)

শ্রীকৃষ্ণবৈপায়নব্যাসদেব স্বয়ং স্কন্দপুরাণে বলিতেছেন—একাদশী নিত্য ও শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক । স্মৃতরাং শাস্ত্র-মতে নিত্য একাদশী ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ যখন

যুগপৎ একদিনে উপস্থিত হইবে, তখন নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য একাদশাদির উপবাসই পালন করিবে। অনন্তর পারণদিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

নিত্য ও নৈমিত্তিক লইয়া স্মার্ত্ত-মহোদয়গণ যে-কোন বিতণ্ডাই উপস্থিত করুন না কেন, তাহাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, বিষ্ণুতিথির অমর্যাদা অত্যন্ত অপরাধময় বিগহিত কার্য্য। যে-হেতু শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যের ফলদাতা একমাত্র বিষ্ণু, তাঁহার তিথির মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডীয় যে কোন কার্য্যেরই অকরণে প্রত্যবায় ঘটবার আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ পান্দোত্তর খণ্ডে ঐক্লপ উপবাসদিনে দত্ত শ্রাদ্ধানকে গহিতান্ন বলিয়া নিন্দাই করিয়াছেন। যথা—

একাদশান্ত প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোমৃতৈহহনি।

দ্বাদশাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্ৰচিৎ।

গহিতান্নং ন চাশ্বস্তি পিতরশ্চ দিবোকসঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২২ ধৃত)

অর্থাৎ মাতাপিতার শ্রাদ্ধ উপবাসযোগ্য একাদশীতে উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতেই পিণ্ডদান করিবে; কদাচ একাদশী দিনে করিবে না। কারণ পিতৃগণ ও দেবগণ গহিতান্ন কখনও ভোজন করেন না।

শ্লোকোক্ত “মাতাপিত্রোমৃতৈহহনি” এই বাক্যদ্বারা মাতাপিতার মৃত-তিথি বা মরণ-নিমিত্তক শ্রাদ্ধদিন উভয়ার্থই গৃহীত হইয়া থাকে। এমন কি, বুদ্ধি নিমিত্তে আভ্যুদয়িক প্রভৃতি সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধই উপবাসদিনে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে—বিভিন্ন লোকের দ্বারা একই শ্লোকের বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্য গৃহীত হইয়া থাকে; কারণ অর্থ গ্রহণ করায় বুদ্ধি সকলের সমান নহে। যিনি যেক্লপ শুদ্ধাশুদ্ধ ধর্ম্মপন্থী তিনি সেইক্লপ মতের অনুকূল টীকা বা ভাষ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বক্তব্য এই যে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত যেক্লপ সর্বাপেক্ষ সুন্দর, স্মার্ত্তমত যেক্লপ নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। স্মার্ত্তগণের মতে একাদশীর গুরুত্ব অতি অল্প—যদিও সর্বশাস্ত্র মতে একাদশাদি হরিবাসর অবশ্য পালনীয়। এমন কি, অপালনে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। তথাপি তাহারা সাধবা নারীর উপবাস নিষেধ করিয়াই শুধু ক্ষান্ত নহেন, কক্ষা একাদশীতে পতিত-শ্রাদ্ধ উদ্ধার করিবারও বিধান দিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রবৃতি-মার্গীয় তামসিক রাজসিক পুরাণাদির বচন সংগ্রহ করিয়া যে নব্য স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা ভক্তি-সম্বন্ধ বিবর্জিত বলিয়া ভক্তি-অধিকারী বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে সকল ক্রিয়া-কর্ম্মের লক্ষ্য যেখানে

বিষ্ণুপ্ৰীতি, সেখানে হরিবাসরের অনর্থ্যাদা কখনই কোনও অবস্থাতেই করা যাইতে পারে না।

মাধব স্মৃতিগ্রন্থ স্মৃত্যর্থসাগর বলিতেছেন—

“একাদশাদৌ প্রসক্তং শ্রাদ্ধং পার্ণদিনে কার্যম্।”

স্মৃত্যাদৌ যথা শ্রাদ্ধং স্মৃত্যকালে বিধীয়তে।

তথৈবৈকাদশীশ্রাদ্ধং দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ ॥

একাদশাদিযে কোনও উপবাসাই দিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে ঐ দিন শ্রাদ্ধ না করিয়া তাহার পর দিন অর্থাৎ পার্ণ দিনেই করণীয়। যেমন অশৌচ মধ্যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে, অশৌচান্তে করিতে হয়, সেইরূপ একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে দ্বাদশীতেই করিবে। এই বাক্যেও নিত্য নৈমিত্তিকের কোনও শাদ্ধিক ব্যবহার না থাকায় উপবাসদিনে সকল প্রকার শ্রাদ্ধেরই নিষেধ বুঝাইতেছে। এবং এই সিদ্ধান্ত দ্বারা একাদশীতে শ্রাদ্ধ অকরণ সম্পর্কিত সকল তর্কেরই অবসান ঘটে।

হারীত-স্মৃতিগ্রন্থেও আছে—“পিতৃশ্রাদ্ধং ন কুর্বাতি হ্যুপবাসদিনে কচিৎ” অর্থাৎ উপবাসদিনে কিছুতেই পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে না।

বৃসিংহপরিচর্যা-গ্রন্থে আছে—“একাদশী-শ্রাদ্ধং যৎ-তিথ্যভাবে দ্বাদশ্যামেব কুৰ্য্যাৎ।” একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে যৎ-তিথির (ব্রতের অযোগ্য একাদশীর) অভাবে দ্বাদশীতেই করিবে। অর্থাৎ একাদশীটী উপবাসাই না হইলে, ঐ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যথায় দ্বাদশীতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহের বিধান বাহারা লঙ্ঘন করিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলিতেছেন—

যে কুর্বন্তি মহীপাল! শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।

ভ্রয়ন্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥

অর্থাৎ, একাদশীতে (উপবাস দিনে) শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তা নিজে, শ্রাদ্ধান্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণ ও মৃতব্যক্তি—এই তিনজনই নরকে গমন করেন।

‘অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিবস’ পরিবর্তন যোগ্য

উক্ত প্রমাণসমূহ আলোচনা করিয়া স্মার্তগণের বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্তন করাই একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাঁহারা গোঁড়ামীবশতঃ অসঙ্গত বুক্তি দ্বারাই তাঁহাদের নিজপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন। আমরা এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। স্মার্তগণ উপবাস দিবসেই শ্রাদ্ধের দিন নির্ণয় করিতে

গিয়া সঙ্কল্প বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন—

মাস-পক্ষ-তিথিনাঞ্চ নিমিত্তানাঞ্চ সর্বশঃ ।

উল্লেখনমকুর্বাণো ন তন্ত ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

অর্থাৎ, মাস, পক্ষ, তিথি ও নিমিত্ত প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়—অন্যথায় কার্যফল লাভ হয় না । শ্রাদ্ধদিনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে গিয়া তাঁহারা ‘অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি’—এইরূপ বাক্য উদ্ধার করিয়া তাহার সংরক্ষণ জন্য বলেন যে, অশৌচের অন্তিম দিনই অশৌচান্ত প্রথম দিন । সুতরাং দ্বিতীয় দিনই শ্রাদ্ধকার্য্য একান্ত কর্তব্য । অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবস উপবাস হইলেও উপবাস ভঙ্গ করিয়া বা ব্রত নষ্ট করিয়াও একাদশাদিতেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে ।

আমরা এস্থলে বলিতে চাই—‘অশৌচান্তাং দ্বিতীয়ে অহি’ বাক্যের বলবত্তা রক্ষা করিতে গিয়া উপবাসযোগ্য ব্রত নষ্ট করা কখনও কর্তব্য নহে । যদি এরূপ বুঝা যাইত যে স্মার্তগণ এরূপ ‘অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিন’কেই রক্ষাকবচ করিয়া সর্বত্র সকল অবস্থাতেই তাহা মানিয়া লইয়াছেন তাহা হইলে যুক্তির খাতিরে না হয় তাহা মানিয়া লইতাম । কিন্তু স্মার্ত-মতেও দেখা যায়—উক্ত ‘দ্বিতীয়-দিনে’ অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে যদি জন্ম-মরণাদি কোনও অশৌচ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে আর অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিনেই শ্রাদ্ধের দিন বলিয়া মানিতে হয় না—উহা তৎক্ষণাৎ পিছাইয়া গিয়া পরবর্তী অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ-দিন নির্ণিত হইয়া থাকে । তখন তাঁহারা তাঁহাদের রক্ষাকবচরূপ উক্ত সঙ্কল্প-বাক্যের মর্যাদা হানি করিতে বা তাহার পরিবর্তন * করিতে বাধ্য হন । জন্ম-মরণাদি অশৌচে যদি শ্রাদ্ধের দিন পরিবর্তন করা চলে, তবে শ্রাদ্ধদিবসে উপবাসযোগ্য একাদশী-জন্মাষ্টম্যাди উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধের দিন বদল হইবে না কেন ? অশৌচের কি এতই শক্তি যে, শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিতে পারে ? আর উপবাসযোগ্য ব্রতাদি কি অশৌচ অপেক্ষাও হীনবীৰ্য্য যে, সে শ্রাদ্ধদিনের কিছুই করিতে পারিবে না ? শাস্ত্রপ্রমাণের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় স্মার্তগণের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্বল এমন কি বিচার-সহ নহে ।* এবিষয়ে বৈষ্ণবগণের বিচার সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর ।

* স্মার্তগণ ‘অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি’-বাক্যের পরিবর্তে ‘আঠৈকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধ-বাসরে’—এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকেন । আমরা বলি—শেষোক্ত বাক্যটি সর্বক্ষেত্রেই অন্ততঃ একাদশাদি উপবাসযোগ্য ব্রত দিবসেও ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি ?—সম্পাদক

এখানে আরও বিচার্য্য এই যে মৃত বৈষ্ণব-পিতা জীবিতাবস্থায় একাদশী প্রভৃতি উপবাস দিনে প্রাণান্তেও অন্ন গ্রহণ করেন নাই। উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া পুত্রের কি ঐ দিন তাঁহাকে অন্ন বা পিণ্ডাদি গ্রহণ করান সম্ভব হয়? সৎপুত্রের ইহা কখনই কর্তব্য নহে। সেই জন্যই “একাদশ্যাং বদা রাম” —এই শ্লোকের টীকায় সনাতন গোস্বামিপাদ “বৈষ্ণবপিতৃণামপি ত্রিবিম্বদিনে শ্রাদ্ধগ্রহণাযোগাৎ” এই বাক্য দ্বারা দেখাইতেছেন যে —বৈষ্ণব পিতৃগণ উপবাস দিনে প্রদত্ত সেই শ্রাদ্ধের গ্রহণ করেন না। সুতরাং উপবাসদিন পরিত্যাগ পূর্বক তৎপরদিন শ্রাদ্ধ করাই সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত।

স্মার্তমতে আমিষ শ্রাদ্ধ

স্মার্তগণের মতে আমিষ দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্বন্ধেও পরম ভাগবত শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণাশ্রমধর্ম বর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

ন দত্তাদামিষং শ্রাদ্ধে ন চাত্মান্নত্ববিৎ ।

মুত্নৈঃ স্যাৎ পরাপ্রীতির্যথা ন পশুহিংসরা ॥ (ভাঃ ৭।১৫।৭)

অর্থাৎ, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে কখনও আমিষ দিবেন না, নিজেও কখন আমিষ ভক্ষণ করিবেন না। কারণ নিবার-তণ্ডুলাদির দ্বারা যেমন পরম তৃপ্তিসাধন ও দেহ রক্ষাদি হইয়া থাকে, পশুহিংসা (মৎস্ত-মাংসাদি) দ্বারা কখনও সেরূপ হয় না।

স্মার্তগণ এখানে আবার প্রশ্ন উঠান—বৈষ্ণব সম্বন্ধে একরূপ বিধি হইলেও অবৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিকে আমিষ দিতে বাধা কি? তদুত্তরে বলিতে চাই—যিনি জীবিতকালে লোভ-মোহ বশতঃ বহু অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজন করিয়াছেন, কোনও সৎপুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া, যদি তাঁহার সেই লোভ-মোহের উপকরণ—আমিষাদিই দান করেন, তবে একরূপ শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির কোনও প্রকার মঙ্গল করা হয় না।

বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক অবৈষ্ণব হইলেও নির্জলা একাদশীব্রত ও আমিষ-বর্জন সর্বদাই করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে আমিষ দিতে গেলেও যিনি বৈধব্যাবস্থায় জীবিতকালে আমিষ আহার করেন নাই, পুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া তাহাকে আমিষ ভোজন করাইলে—অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকলের পক্ষেই অল্প দেবার্চন ও পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য নিরামিষ বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা সম্পন্ন করিলেই দাতা ও ভোক্তা উভয়ের পরম তৃপ্তি ও মঙ্গল বিহিত হইয়া থাকে। নচেৎ যে ব্যক্তি

পিতৃপুরুষের আদ্যকার্যে হরির উচ্ছিষ্ট প্রদান না করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্বদা
বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। যথা—

যো ন দত্তাদ্বরেভুক্তং পিতৃণাং আদ্যকর্মণি ।

অশান্তি পিতরন্তস্ত্রি বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥

(গোপালভট্টকৃত সংক্রিয়াসার দীপিকা)

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র সিদ্ধান্তিধি, কবিভূষণ

সাং বিরাট, পং জসস্তকা (শ্রীহট)

বিষ্ণু-মায়া

শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে ;—

দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন,—

আমার এই সত্ত্ব, রজস্তমোগুণময়ী ত্রিগুণালিকা মায়া, দেবতাদেরও মোহ-
কারিণী ; অত্বের কা কুথা, এই ত্রিলোকস্থ সমস্ত জীব-জন্তুই এই বিশ্ব-বিমোহিনী
মায়া হইতে নিস্তার পাইতে পারে না ; তবে ষাহারা নিরুপটে আমার অর্থাৎ
ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই দুর্জয়ের মায়া হইতে পরিত্রাণ
পাইতে সমর্থ হয় । অবটন-ঘটন-পটিরসী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়া ইন্দ্রজালের
গ্রাস তাহার মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া আবরণী-শক্তি দ্বারা জীব-বৃন্দকে
আবৃত করে, পরিশেষে বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ হইতে জীবকে বিচ্ছিন্ন
করে, জীবের জ্ঞান-চক্ষু আবৃত করে, গৃহাঙ্ক-কূপে নিক্ষেপ করে । শ্রীন ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর কীর্তন করিয়াছেন,—

শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি করাও সংসার ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সানুখ্য বা'র ভাগ্যক্রমে হয় ।

তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥

একই মায়া, তাহার স্বরূপ-শক্তি এবং বহিরঙ্গা-শক্তিরূপে দুইটী দিক ।

স্বরূপ-শক্তির নাম যোগমায়া এবং বহিরঙ্গা-শক্তির নাম মহামায়া । ভক্তগণকে
যোগমায়া অমায়ায় রূপা করেন, ভগবদ্ভক্তি দেন,—জীবকে মায়া-কারাগার

হইতে মুক্ত করিয়া মায়াভীত বৈকুণ্ঠে লইয়া বিমল ভগবৎ সেবানন্দ প্রদান করেন। আর অভক্তগণকে মহামায়ারূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোরূপে নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া ভীষণ সংসার-গারদে আবদ্ধ করেন। তাহাতে জীবের ত্রিতাপ জালা ভোগ করিতে হয়। এই দারুণ সংসার জালায় পীড়িত হইয়া জীব যদি নিকপটে সাধু গুরুর চরণে শরণাপন্ন হয় তবে শ্রীভগবান্ গুরুরূপ তাহার এই মায়াবন্ধন ছেদন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন।

“তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে, ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীকপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহৃতিকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—“হে মাতঃ! আমার এই দুস্পারা মায়া শ্রী-রূপিনী; চুপক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেই প্রকার শ্রীরূপিনী মায়া, তাহার রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শরূপ গুণ দ্বারা জীববৃন্দকে সর্বদাই আকর্ষণ করে। ইহার প্রভাব অনন্ত, এবং ইহা অমিত-শক্তিশালিনী। জীব অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল, স্বভাবতঃই সে মায়াবশ। মায়াধীশ ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব নিজ-শক্তিদ্বারা কখনই এই দুর্জয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। জীব তমঃ এবং রজোগুণাত্মিক মায়াকে কিছু কিছু বুঝিতে পারে কিন্তু সত্ত্বগুণ বাহ্য ধর্মের আবরণে প্রকাশিত হয়, তাহাকে সহজে ধরিতে এবং বুঝিতে পারে না।

মায়া অর্থে ছায়া। অর্থাৎ বাহ্য সত্য নয়, তাহাকে সত্যের মত প্রতীতি করায়। যেমন মরুভূমিতে সূর্যের আলোক-পতনে তপ্ত বালুকারাশি জলের মত প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে উহা জল নহে। মূর্থ হরিণ যেমন জল পিপাসায় সেই মরুভূমিতে ঐ মায়ামরীচিকায় জন ভ্রমে জল পান করিতে ধায়, কিন্তু জল না পাইয়া, উত্তপ্ত রোদ্রে ছটফট করিয়া প্রাণে মারা যায়; তদ্রূপ মায়ামুগ্ধ জীব, ভগবানের মায়ায়চিত এই প্রপঞ্চ বিশ্বে, মায়ার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ ভোগ করিতে যায়, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে পারে না এবং পরিণামে ঐ হরিণের মত মায়ার অসহ ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হইয়া পরিশেষে পঞ্চস্থ লাভ করে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ দুইটি আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি—

(ক) শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে,—শালুরাজ তপশ্চায় দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া একটি মায়া-নির্মিত লৌহযান প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ

যানে আরোহণ করিয়া যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যাদবগণ সাক্ষাতেই যেন দেখিতে পাইল শাল্বরাজ বসুদেবকে বন্ধন করিয়া আনিয়া সকলের সম্মুখে তাঁহার মুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিল, যাদবগণ এই নিদারুণ দৃশ্যে হাহাকার করিয়া উঠিলে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বদর্শন চক্র প্রয়োগ করিলে কুজ্জাটিকার গায় ঐ মায়া সহসা অন্তর্হিত হইল।

(খ) রক্ষঃরাজ দশানন মায়া-সীতাকে লইয়া যখন তাহাকে দ্বিখণ্ড করিল, তখন কপিরাজ সুগ্রীব বুঝিতে না পারিয়া, রাম, লক্ষণ, হনুমান, বিভীষণ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ ইত্যাদি বানর সৈন্য ক্রন্দন করিয়া উঠিল; কিন্তু অচিরেই ঐ মায়া জলবিম্বের গায় বিলীন হইয়া গেল।

উক্ত উদাহরণ হইতে জানা যায়—শ্রীভগবানের এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া ভক্তের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কিন্তু অভক্তের উপর আপন বিক্রম প্রকাশ করত তাহাদের চিত্ত চিরতরে মুগ্ধ করিয়া থাকে। এজন্ত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন তুমি আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণিপাত কর, আমাকে পত্র, পুষ্প, জল দিয়া শ্রদ্ধাসহকারে পূজা কর, আমার প্রসন্নতায় তুমি আমার এই দুর্জয়া মায়া অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। তাই কবি শ্রীতুলসীদাস কীর্তন করিয়াছেন,—“চলতি চকী সবকোই দেখে, কীল না দেখে কোই। যো কীল পাকড় রয়ে সবুদ রয়ে সোই ॥” এই সংসাররূপ চক্রে মার্য্যরূপ ঝাঁতা ঘুরিতেছে। ঝাঁতার শস্ত্র সমূহ চূর্ণিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে সকল শস্ত্র ঝাঁতার মধ্যস্থিত কীলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা কখনও চূর্ণ হয় না। সেই প্রকার, যে সকল জীব, শ্রীহরি-গুরুর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা এই মায়ায় ভীষণ চাক্ষা দ্বারা চূর্ণ হইবেন না, অল্প সকলেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

একদিন এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া স্বীয় অঙ্গবাস্তির দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত করিয়া নামাচার্য্য সিদ্ধ মহাত্মা ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে মোহিত করিবার জন্ত নানা-রূপ অঙ্গ-ভঙ্গী ও বিচিত্র কুটীল হাবভাব দেখাইয়াও যখন কিছুতেই শ্রীহরিনাম পরায়ণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে বিচলিত বা মুগ্ধ করিতে পারিল না তখন মায়াদেবী তাহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া তাহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া বলিয়াছিল—“হে ঠাকুর! আমাকে কৃপা করুন।

“ব্রহ্মাদি শিবেরে আমি সকলে মোহিল।

একলা তোমায়ে আমি মোহিতে নারিল ॥”

ভক্তরাজ উকুব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—হে ভগবন্! আপনার এই দুর্জয় মায়া কেহই জয় করিতে না পারিলেও আমি আপনার প্রসাদী নিম্নাল্য এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই এই দুস্পারা মায়া হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব। শ্রীভগবৎ প্রসাদের অনন্ত মহিমা, ইহা সাধারণ লোক বুঝিতে অসমর্থ। ইহা বুঝিতে না পারার কারণ—মায়ার প্রভাব। দর্পণ যেমন মনদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, অগ্নি যেমন ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ নিজ মায়া দ্বারা আবৃত থাকেন বলিয়া কেহ তাহাকে জানিতে পারে না। শ্রীরামায়ণে বর্ণিত আছে বলিয়া এরূপ একটি প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে—যখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধে তাহার লক্ষাধিক সেনানীকে এবং পুত্র-পৌত্রাদিকে বিনাশ করিলেন, তখন এত সাধের লক্ষাপুরী শ্মশানের মত দৃশ্য ধারণ করিল। দশানন পুত্র ও অগণিত বজ্রতুল্য সেনানীর বিয়োগে শোকে অধীর হইয়া হাহাকার রবে স্বর্ণসিংহাসন হইতে ভূতলে পড়িয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। কিঞ্চিৎ সন্ধিৎ পাইয়া বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হায়! আমার লক্ষাপুরে এমন কি একটিও বীর নাই যে, কল্যকার যুদ্ধে বানর-সৈন্য সহ শ্রীরামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে পারে? রাবণের মন্ত্রীদ্বয় শুক ও সারণ রাবণকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভয় নাই, আপনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন; আপনার স্বরণ-মন্ত্র প্রভাবে সে অনতিবিলম্বে লক্ষাপুরে আগমন করিয়া আপনার মনোভীষ্ট পরিপূরণ করিবে। তখন মন্ত্রীর পরামর্শে রাবণ পুত্রকে স্বরণ করিলে, পুত্র মহীরাবণ পাতালপুরী হইতে আসিয়া রাবণকে প্রণাম করিয়া কহিল—পিতঃ! একি লক্ষার ভীষণ অবস্থা দেখিতেছি! আমাকে কেন এতদিন সংবাদ দেন নাই? আমি মায়াবলে শ্রীরামচন্দ্রকে হরণ করিয়া আমার উষ্টদেবী ভদ্রকালীর নিকট বলি দিতাম। রাবণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিজয় মাল্য প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! তুমি আমার এই শেষ বাঞ্ছা পূরণ কর। লক্ষার পুরবাসীগণ মহীরাবণের বিদায় সময় নানা দীপ, মাল্য, জুগন্ধি-দ্রব্যদ্বারা বরণ ডালায় বরণ পূর্বক তাহাকে বিদায় করিল।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষ হইতে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া, রাবণের ঐ সকল দৃষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিল। বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে এই সকল কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি মন্ত্রী জাম্বুবান সহ মন্ত্রণা করিয়া তাহাকেই লক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। রাবণের পুত্র মহীরাবণ শ্রীরাম লক্ষণকে হরণ করিয়া পাতালপুরীতে লইয়া বিনাশ করিবে—এই চিন্তায় সকলেই

বাকুল হইলেন। গভীর মন্ত্রণার পর স্থির হইল, অদ্য রাত্রে সতর্কতার সহিত গড় রক্ষা করিতে হইবে। হনুমান তাহার বিশাল লাজুল কুণ্ডলী পাকাইয়া একটা ক্ষুদ্র গড়ের মত করিলেন। তাহার মধ্যে শ্রীরাম-লক্ষণকে অতি সন্তুর্পণে রক্ষা করিলেন। চতুর্দিকে বানর সৈন্যগণ ঐ গড় বেষ্টিত করিয়া রাত্রি জাগরণ পূর্বক পাহারা দিতে লাগিল। হনুমান কুণ্ডলীর উপর বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার ভীষণ হুঙ্কারে চতুর্দিক কাঁপিতে লাগিল। বিভীষণ গড়ের চতুর্দিকে পাহারি করিয়া কে কোথায় যায়-আসে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিভীষণ হনুমানকে গোপনে বলিলেন,—“সাবধান, কাহাকেও আমার নিকট না জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার লেজ-কুণ্ডলীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিবে না।” রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে মহীরাবণ আসিল; এই দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিয়া ত তাহার চক্ষু স্থির!—তথাপি সে ভয় পাইল না। বিভীষণ একটু দূরে গমন করিলে মহীরাবণ মায়াবলে শ্রীরামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যার রূপ ধারণ করিয়া হনুমানের নিকটস্থ হইয়া অশ্রুধারায় বক্ষ তাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—
বাপ্ হনু! তুমি একবার লেজটা গুটাও, আমি আমার পুত্রের চাঁদ-বদন দেখিয়া বক্ষ শীতল করি।”

শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান বলিল—“মাতঃ ক্ষণেক বিলম্ব কর, বিভীষণ আসিলেই আমি তোমাকে প্রবেশ করিতে দিব।” এদিকে বিভীষণ আসিবা-মাত্রই কৌশল্যারূপিণী মাতা পলাইয়া গেল। বিভীষণ বলিল,—কেহ আসিতেছে কি? হনুমান সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে বিভীষণ কহিল—‘সাবধান! ও মায়া! আমার বিনা অনুমতিতে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না!’ এইরূপে মহীরাবণ পুনরায় দশরথের বেশে দরশন দিল। কিন্তু বিভীষণ আসিতেই সে পলাইয়া গেল। কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন ঐ দুষ্ট মায়াবী বিভীষণ একটু দূরদেশে গমন করিলে, বিভীষণের বেশে আসিয়া কহিতে লাগিল, আমি শ্রীরামচন্দ্রের শিরে ‘রক্ষা’ বাঁধিয়া দিব,—তুমি লাজুল উত্তোলন কর। হনুমান ঐ মায়া বুঝিতে না পারিয়া যেমন লাজুল উঠাইয়া লইল, তখন বিভীষণ-রূপী মহীরাবণ নিমেষের মধ্যে মন্ত্রবলে সুরঙ্গ করিয়া রাম-লক্ষণকে পাতাল-পুরীতে লইয়া গেল।

অতএব বলিতেছি যে মায়া সাত্ত্বিক ধর্মের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া থাকে: তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন। দারুণ কলিকাল উপস্থিত—সাধু সাবধান!!
এই ধর্মের বেশে মায়া বহু মূর্তিতে আবিভূতা হইয়া জীববৃন্দকে

মোহিত করিতেছে । এ সমস্ত 'মায়া' ভগবানেরই বলিয়া ইহাকে বিষ্ণুমায়া বলে ।

মায়াই করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।

সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায় ॥ (সাঃ কঃ)

ত্রিদিগ্ভিষ্মাণী—শ্রীমন্তকিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ।

ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য

একদিন হোশেন সা বাংলার মোশ্লেম রাজা

বসে যবে রাজসভা মাঝে,

খবর আনে হেনকাল নগরের কোতোয়াল

পথে পথে জয়ধ্বনি বাজে ।

“রামকেলি নগরে রয় সাধু এক জ্যোতিষ্ময়

অবিরাম গাহে কৃষ্ণনাম,

কত লোক অগণন পাছে তার সর্ববক্ষণ

হল্লা করে ছাড়ি' ঘর-গ্রাম ।

মনে মোর বড় আশঙ্কা এ বুঝি বিদ্রোহ-ডঙ্কা

কেড়ে নেবে তব রাজাসন,

চিন্তা কর মহারাজ টুটে যাবে স্ফূর্তি আজ

নির্ভয়ের জীবন যাপন ।

পরিচয় শুন প্রভু সাধু যেন সাক্ষাদ্ বিভু

হাসি তার বড় মনোহর,

বসন অরুণ-বরণ পদ নখ যেন দর্পণ

রূপ তার ভরে দিগন্তর ।”

এতেক কহিয়া বাণী রাজা-কাছে বিদায় মানি’

চলে গেল কোতোয়াল যবে,

শুধালেন মহারাজ কেশব ছত্রীয়ে আজ ।

“এসেছে এ সন্ন্যাসী কবে ?”

ছত্রী জানে মুসলিম রাজা হিন্দুদের দেয় মাজা

তথ্য তাই করিল গোপন,

কহিল—“শুনেছি আমি, এইটুকু জানি স্বামী,

এসেছে ভিক্ষুক একজন।”

রাজা কহে, “যার পাছে এত লোক বুর যাচে

তুমি তাঁরে দিলে না সম্মান,

জানি তব এ কারণ বৃথা এ তথ্য গোপন

মিথ্যা কেন কহে তব প্রাণ ?

যদি রাখি মাসহারা আমারে ছাড়িবে ত্বরা

না রহিবে মোর পাছে আর,

হের এই চির-ভোলা চোখে যার জ্যোতি জ্বালা

বিনি দানে এত লোক তার ।

আদেশ রহিল মোর আজ হ’তে সাধু’পর

যেরো না অত্যাচার গ্রহণে ;”

সেদিন সন্ধ্যার পর ডাকিলেন গোড়েশ্বর

দবির খাস সাধু সনাতনে ।

শুধাতে সাধুর কথা মন্ত্রী পেলেন ব্যথা

কহিলেন,—শুন হে রাজন্

তোমাতে বিষ্ণুর অংশ করে সদা সৃষ্টি, ধ্বংস

সত্য জেনো তব প্রাণ-মন

যা’ ভেবেছ ইনি তাই ভাষ্যে তব টের পাই

ঈশ্বর ইনি, নাহিক সংশয় ;

রাজার গম্ভীর বদন যেন ভাবে নিমগন

কহিলেন,—“এ দেবতা নিশ্চয়।”

এ সাধু ব্রহ্ম চিন্ময় সদানন্দ প্রেমময়

এ যুগে শ্রীচৈতন্য অবতার,

হরিনাম সংকীৰ্ত্তন কর সবে সর্ববক্ষণ

নত হও চরণে তাঁহার ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, সাং পাণ্ডুয়া (হুগলী)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫২ পৃষ্ঠার পর)

মধুসূদন সরস্বতী

মায়াবাদের আর্তনাদ নিবারণের জন্ত ভাস্কীভূত মায়াবাদের ভঙ্গ লইয়া পণ্ডিতকুলচূড়ামণি ‘মধুসূদন’ ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’রূপ সমাধি মন্দির নির্মাণ করিলেন। মধুসূদন পূর্ববঙ্গে করিমপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার উনসিয়া নামক একটি গল্পীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপে গ্রাম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে শ্রীরাম-তীর্থের নিকট বেদান্তের মায়াবাদপর ভাষ্যসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং আচার্য্য ব্যাসরায়ের ‘শ্রীয়ামৃত’ গ্রন্থের খণ্ডন চেষ্টায় “অদ্বৈতসিদ্ধি” নামক এক সহৃদ্বিশালী বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার পর মধুসূদন মনে মনে ইহার খণ্ডন সম্ভাবনা জানিয়া অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের নিকট ইহা কখনও অধ্যয়নের জন্ত দিতেন না। সর্বদাই অতি গোপনে রাখিতেন। ব্যাসরায়ের শিষ্য ব্যাসরাম তাঁহার ছুরতিসিদ্ধি জানিয়া ছদ্মবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়নের ছল করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করেন; এবং শ্রীয়ামৃতের “তরঙ্গিনী” নামী টীকা রচনা করিয়া মধুসূদন নির্মিত “অদ্বৈতসিদ্ধি”রূপ মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। তৎকালে অচিন্ত্যভেদোভেদাচার্য্য পণ্ডিতকুলমুকুটমণি শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু প্রকট ছিলেন। মধুসূদনের সহিত শ্রীকাশীধামে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্ত মধুসূদনের নিকট বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন। সে বাতাই হউক মধুসূদনের ও শ্রীল জীবপাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। কাশীতে অবস্থান কালে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার হইয়া ছিল। সেই বিচারের ফলে মধুসূদনের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে। এবং তাঁহার রূপায় তিনি ভাগবত-ধর্মের অর্থাৎ ভক্তি-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তিস্বরূপ “ভক্তিরসায়ন” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে তিনি ভক্তিকেই একমাত্র পরম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পূমর্ধন্থ
পরমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং ‘বদন্তি’।
নিরুপমসুখ-সম্বিক্রপমস্পৃষ্টহুঃখম্
তমহমখিল-তুষ্টো শাস্ত্রদৃষ্টো ব্যনজি ॥

অর্থাৎ “শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া জীবের চরম কল্যাণরূপ অখিলতুষ্টির নিমিত্ত দুঃখসম্পর্কশূন্য অতুলনীয় সুখ ও সখিৎ-শক্তি স্বরূপা মুকুন্দে ভক্তিযোগে যে ভক্তিযোগকে (শ্রীজীব গোস্বামিপাদের দ্বারা) গুরুবর্গ নবরসমিহিত এবং একমাত্র (কেবলম্) পরম পুরুষার্থ বলিয়া ইহ জগৎকে জানাইয়াছেন তাহাই বর্ণন করিতেছি।”

উক্ত শ্লোকের ‘বদন্তি’ এই বহুবচনান্ত শব্দের দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামিপাদকেই তাহার গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে মধুসূদন মায়াবাদের কেবল-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থতার বিচার ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানাইয়াছেন।

জয়পুরে মায়াবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অদ্বৈতবাদের নির্বাণের পরে মধুসূদনের নির্মিত সমাধিমন্দির শ্রীজীবপাদ ও ব্যাসরাম কর্তৃক ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে প্রেতাচার্য্য দ্বারা কতিপয় প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী জমায়েৎ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-বিরোধী সম্প্রদায় জয়পুরের রাজগৃহে উৎপাত করিতেছিল। সেই উৎপাত নিবারণার্থ বৃন্দাবন হইতে গোড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের প্রতিনিধি-স্বরূপ গোড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু আহুত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ তখন তথাকার অধিপতি ছিলেন। গোবিন্দ নাম ব্যতীত প্রেতাচার্য্য ও রাধা-বিরহিত ঐশ্বর্য্যপর তত্ত্বের সেবকগণের কল্যাণ নাই জানিয়া শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া মায়াবাদের ও ঐশ্বর্য্যবাদের কুদৃষ্টি হইতে রাজপুরীকে রক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বলদেবের রূপায় জয়পুর মায়াবাদ ও ঐশ্বর্য্য-সেবাবাদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে মাধুর্য্যময় ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রেচছন্ন রক্ষিত হইল।

মায়াবাদের প্রেতাচার্য্য

চৈতন্যদেব ও তদুত্তরাগণের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকৃত মায়াবাদী স্থূলতঃ দৃষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে যাহাদিগকে মায়াবাদান্ত্রিত বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে অশরীরী বায়ুভূত নিরাশ্রয় স্বরূপ মায়াবাদের প্রেতাচার্য্য বা তাহার তর্পণকারী বলিয়াই মনে হয়। উক্ত প্রেতাচার্য্যগণের উদ্ধারের জন্যও বৈষ্ণব ওবাগণ সময় সময় আবিভূত হইয়া ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। রামানুজ সম্প্রদায়ের রামশাস্ত্রী শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী সচ্চিদানন্দকে বিচারে পরাস্ত করেন।

প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য উক্ত সম্প্রদায়েরই আর একজন পণ্ডিত। তিনি দ্বিগ্বিজয়ের জন্ত বহির্গত হইয়া বারাণসী-ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীদ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন। মাধব সম্প্রদায়ের সত্যধ্যান তীর্থও কানীতে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া “অদ্বৈতমতবিমর্ষ” ও “ত্রিপুণ্ড্রধিকার” নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

পঞ্চভঙ্গী

ব্যাসতীর্থের ‘জ্যায়ামৃত’ গ্রন্থের প্রতিপক্ষে মধুসূদন সরস্বতীর “অদ্বৈতসিদ্ধি”, ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’র খণ্ডনে মধব সম্প্রদায়ের ব্যাসরামতীর্থ রচিত “তরঙ্গিনী”, তরঙ্গিনীর প্রতিপক্ষে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মানন্দ লিখিত “ব্রহ্মানন্দীয়” এবং তাহার খণ্ডনরূপে মধব-সম্প্রদায়ের “বনমালামিশ্রিয়” গ্রন্থপঞ্চক ‘পঞ্চভঙ্গী’ নামে প্রসিদ্ধ আছে। শুনাযার মহীশূর রাজগ্রন্থাগারে এখনও উহা সংরক্ষিত আছে। এই পঞ্চভঙ্গী মায়াবাদ ও তাহার যাবতীয় খণ্ডন প্রমাণিত করিয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্য ব্যতীত অন্যান্য মনীষিগণ কর্তৃক মায়াবাদ খণ্ডন

মায়াবাদের অসং সিদ্ধান্তের প্রতি বৈষ্ণবগণ ব্যতীত নৈয়ায়িক, মীমাংসক, শৈব, সাংখ্য মতের আচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণও কটাক্ষ করিয়া বিশেষ নিন্দাবাদ, দোষ প্রদর্শন ও খণ্ডন করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, রাখালদাস জায়রত্ন, নারায়ণ ভট্ট (যিনি অদ্বৈতবাদী নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য নারায়ণ আশ্রমকে সমুখ বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন), ভাস্করাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের অবস্থা

আধুনিক যুগে মায়াবাদ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মূর্তিতে জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত যোগসূত্র স্থাপন হওয়ায় ভারতীয় মায়াবাদ বিভিন্ন দেশের মায়ার রঙ্গমঞ্চে নানাধরনের অভিনয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া মায়াবাদের বিচিত্র রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিলেও এবং কাহারও কাহারও মতে মায়াবাদের আপাতবিরুদ্ধযুক্তি থাকিলেও উহারা বিভিন্নভাবে মায়াবাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। তত্ত্ববিদগণ বলেন মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতমত ভারতহইতেই পৃথিবীর সর্বদেশে ব্যাপ্ত হয়। আলেক-জাণ্ডারের সহিত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতে আসিয়া এই কেবলাদ্বৈত মত শিক্ষা করিয়া যান। এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

‘পঞ্চোপাসনা’ ও ‘সমস্রয়বাদ’ মায়াবাদের দুইটি আধুনিক অবৈধ সম্ভান। রাজনীতি কুশল আকবর তাহার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সমস্রয়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাহার “দীনইলাহি” ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক ও প্রচুর রাজনৈতিকগণ সুবিধাবাদ সংগ্রহের জন্য মায়াবাদ-কুলগোরব সমস্রয়বাদের আদর করিয়াছেন। আবার বৈষ্ণবধর্মের নাম করিয়াও মায়াবাদের নানারূপ তাহাতে প্রচুরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখিতেকী, অতিবাড়ী, চুড়াধারী, গৌরাজনাগরী প্রভৃতি মতবাদিগণ বহুরূপী প্রচুর মায়াবাদী। উড়িষ্যার অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস, আসামের শঙ্করদেব সকলেই নানাধিক বিগ্রহ-বিরোধী ও প্রচুর মায়াবাদী। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর উদিত রামানন্দ, কবীর নানক, দাছু প্রভৃতি সমস্রয় পন্থিগণ সকলেই নানাধিক মায়াবাদী। এই মায়াবাদ যে আধুনিক জগতে কত বিচিত্র মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও তৎপরে গোড়ীয় মঠাচার্য্য জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নির্ভীককণ্ঠে ও সিংহহৃদয়ে বিশ্লেষণ ও প্রচার করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে কেবল গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গ্রন্থসমূহ প্রচার করিয়া এই মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন—এরূপ নহে; পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্ত-গ্রন্থাদি প্রকাশ, প্রচার ও আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়া বহুরূপী মতান্ধকারকে শ্রীচৈতন্য সিদ্ধান্তবাণী ও ভাগবতাক্ষরীচিমালায় প্রথরতম তেজে ভগ্নীভূত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

অমর ও অমরবাদ সহ

“শ্রীশ্রীদামোদরচরিতাম্”

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব সংস্করণ।

হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।

বৈষ্ণব মাত্রেই সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

ভিক্ষা—৥০ আনা মাত্র

শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্য।

অনুরক্তি

হে দেবতা ! তুমি আসিবে
 বলিয়া রেখেছি হৃদয় মাঝারে
 আসন খানি যে পাতিয়ে ॥
 বারতা দিয়াছে তোমার স্বজনে
 আগমনী গীতি গাহিয়ে,
 মুছায়ে আমার নয়নের জল
 করুণায় বাণী শুনায়ে,
 জালিয়া দীপের উজল আলোক
 হৃদয়ের তমঃ নাশিবে,
 ভাসিয়া আমার মোহের আগার
 তোমার মাঝারে স্থাপিয়ে,
 ভকতি-সুখমা- স্মৃতিতল ছায়া
 কৃপা করি মোরে দানিয়ে,
 তোমার স্বজন তোমা নহে আন
 সে-কথা আমারে লিখায়ে ॥
 তাই আজি মোর আঁখি ভরা নোর
 করুণা-মুরতি চিনিয়ে
 পূজিতে যে আশ তোমার পাশেতে
 তাহারেও হৃদে বসায় ॥
 জানি না তোমার কিসে হয় পূজা
 তাই তো রেখেছি ভাবিয়ে ।
 কুসুমের মালা গাঁথি দিব তারে
 সে দিবে তোমারে পরায় ॥
 রহিব আড়েতে প্রতীক্ষা করিয়া
 সেবার আদেশ লভিতে ।
 সেবিব-যুগল অমুগা হইয়া
 ভাসিব সতত প্রেমেতে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিদ্রম

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭০ পৃষ্ঠার পর)

স্মার্তমতে বৈধ-হিংসার অধিকারী নির্ণয়

বৈধহিংসা ক্রতি-পুরাণাদির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিনিধি বা অনুকল্প ইক্ষু-
বৃক্ষাদি গ্রহণ করিতে শাক্তগণের অনিচ্ছা ও আপত্তি দেখা যায়। এতদনুকূলে
তাহারা ভবিষ্যপুরাণ হইতে বলেন ; যথা :—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাং ।

গ্রীণরেদ্বিধিবদুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ ॥

তথা—স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ।

রুধিরেণোরণশ্চেহ তর্পিতা বিধিবল্পপ ॥

অজস্র দশবর্ষাণি রুধিরেণ স্তুতর্পিতা ।

মাহিষেণ শতং বীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ॥

সহস্রং তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বদেহরুধিরেণ চ ।

তর্পিতা বিধিবদুর্গা ভীত্বা বাহুরুজজ্যকম্ ॥

নারেণ শিরসা বীর পূজিতা বিধিবল্পপ ।

তৃপ্তা ভবেত্তৃশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু ॥

অর্থাৎ, ছাগ-পশু, মহিষ ও মেষ বলিদ্বারা বিধিবৎ দুর্গাপূজা করত সমাংস-
রুধির-তর্পণাদির দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। হে নৃপ! মেষ বলি ও
তাহার রুধিরের দ্বারা বিধিবৎ তর্পিতা বরদা দুর্গাদেবী এক বৎসরব্যাপী তৃপ্তিলাভ
করেন। ছাগপশু ও তাহার রুধিরদ্বারা তর্পিতা হইলে দশবৎসরব্যাপী তৃপ্তি
এবং মহিষ বলিদ্বারা শতবৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ করেন। স্বদেহরুধিরের দ্বারা
সহস্র বৎসরব্যাপী তৃপ্তি লাভ হয়। অতএব বিধিবৎ নিজের বাহু, উরু কিম্বা
জজ্যা ছেদন করিয়া সেই রুধির দান করিবে। হে বীর, হে নৃপ, নরশিরের
(নরবলির) দ্বারা বিধিবৎ দুর্গা দেবী পূজিতা হইলে, লক্ষবর্ষব্যাপী তাহার অতীব
তৃপ্তি হইয়া থাকে। কালিকাপুরাণে দেখা যায় :—

মহামায়ে জগন্মাতঃ সর্বকাম-প্রদায়িনি ।

দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব ॥

ইত্যুক্ত্বা মূলমস্ত্রেণ নতিপূর্বাং বিচক্ষণঃ ।

স্বগাত্ররুধিরং দত্তান্মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ ॥

হে জগন্মাতা, হে মহামায়া, সর্বভোগপ্রদানকারিণী, আমি তোমাকে নিজ
দেহরুধির দান করিতেছি ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই বলিয়া প্রণাম-

পূর্বক বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজগাত্ররুধির দান করিবে । ইহাতে ঐ রুধির দানকারী সর্বসিদ্ধি লাভ করেন ।

উক্ত ভবিষ্যপুরাণ-বচনে পুনঃ পুনঃ ‘বীর’, ‘নৃপ’ ইত্যাদি সম্বোধন পদদ্বারা উক্ত বলি-বিধান ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি জাতির সকাম রাজসিক পূজা সম্বন্ধেই জ্ঞাপিত হইতেছে । বিষয়ে প্রগাঢ় মগ্ন হেতু তন্নাশে দুঃখিত সমাধি নামক বৈশ্য ও রাজ্যদ্বয়ে সুরথ রাজার পূজা প্রসঙ্গেও চণ্ডীতে দেখা যায় ।—

ভৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্ ।

অর্হণাক্রতুস্তৃপ্তাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ।

দদতুস্তৌ বলিকৈব নিজগাত্রাস্বশুক্কিতম্ ॥ (চণ্ডী ১৩।১০-১১)

অর্থাৎ, সুরথ রাজা বৈশ্যের সমভিব্যাহারে সেই নদীতীরে দেবীর মূর্তী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুষ্পধূপাদির দ্বারা পূজন, অগ্নিতে যতাহতিধারা হোম সম্পাদন করত তিন বৎসর যাবৎ পূজা করিয়াছিলেন । ঐ সময়ে তাহার কখনও নিরাহারী কখনও বা (ফল-মূলাদি দ্বারা) সংযতাহারী হইয়া তন্মনস্ক ও সংযতেন্দ্রিয় থাকিতেন এবং নিজ নিজ গাত্রের রক্ত বলিরূপে উপহার দিয়াছিলেন ।

সুরথ রাজার লক্ষ বলিদান বিষয়ক একটি উপাখ্যান শ্রীত পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে । এতৎ সম্বন্ধে উদ্ধাক্ষার সংহিতাতেও দেখা যায় —

ছাগং যো হস্তি তং হস্তি ছাগোভূত্বা চ খড়গভূৎ ।

সুরথং পরলোকে হি পশবো জঘ্নুরিত্যুত ॥

যে ছাগকে হনন করে, ছাগও পরজন্মে খড়গধারী হইয়া তাহাকে বধ করে । ‘বলি’-প্রদত্ত সমুদয় পশুই পরলোকে সুরথ রাজাকে হনন করিয়াছিল । সংহিতার এই বচন অনুসারে সুরথ রাজা লক্ষ ‘বলি’ দিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও পরিণামের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় ভগবতীর বর ও সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও সুরথ রাজা পশুঘাতনরূপ পাপের ফল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই ; পরন্তু তিনি তৎ-ফলভোগ ভ্রম নরকে গমন করিয়া সেই সব পশুর অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পশু বলিদানের এইরূপ পরিণতি নারায়ণ ঋষিও শ্রীদুর্গাপূজার ফল ও কালাদিবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ।—

বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতিভবেনৃণাম্ ।

হিংসাজন্তুঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১০)

অর্থাৎ, হে নারদ ! বলিদানসহ শ্রীদুর্গাপূজা করিলে ভগবতী দুর্গাদেবী প্রীত হন নত্যা কিত্ত জীব-হত্যা-জনিত পাপও হইয়া থাকে এবং এই পাপের ফল পূজকে ভোগ করিতেই হইবে,—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যত্র সিংহস্ত ব্যাঘ্রস্ত নরস্ত বিহিতো বধঃ ।

ব্রাহ্মণোক্তস্ত বল্যাদৌ তত্রায়ং বিহিতঃ ক্রমঃ ॥

কুত্বা স্তময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ ভৈরব ।

অথবা পুপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা ।

যাতয়েচ্চত্বাহাদেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতম্ ॥

(কালিকা পুঃ ৬৭।২-৫৫)

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ নিজগাত্ররুধির দান করিলে আত্মহত্যারূপ পাপ-ভাগী হয়। মন্ত্র দান করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। যে যে স্থানে সিংহ, ব্যাঘ্র বা নরবনের বিধি আছে সেই সেই স্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিম্নলিখিত ক্রম জানিবেন। হে ভৈরব ! বলির প্রতিনিধি স্তময় ব্যাঘ্র, নর বা সিংহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া অথবা স্তময় পিষ্টক বা যবচূর্ণের দ্বারা ব্যাঘ্র, মনুষ্য বা সিংহ নিৰ্ম্মাণ ক্রমে পূর্বোল্লিখিত মন্ত্র দ্বারা তাহার সংস্কার পূর্বক চত্বাহাদ (খড়্গ) দ্বারা ছেদন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে বোঝা যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে মন্ত্র-মাংস-রুধিরাদির দ্বারা দেবীপূজা নিষিদ্ধ। কোনও ব্রাহ্মণ রজস্তুমোণ্ডে অভিভূত হইয়া যদি বলিদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পিষ্টক নিৰ্ম্মিত প্রতিনিধি দ্বারা ঐরূপ বলিদান করিতে পারেন। অতরাং বৈধ হিংসাও তাঁহার পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণও স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া বাইতেছে ; যথা—

বৈধ-হিংসা ন কৰ্ত্তব্য। বৈধ-হিংসা তু রাজসী ।

ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কৰ্ত্তব্য। যতন্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ ॥

(শ্রীক-বিবেক-টীকা-কৃদ্ গোবিন্দানন্দধৃত বৃহন্নাল-বচন)

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের বৈধহিংসা করাও কৰ্ত্তব্য নহে। বৈধহিংসা রাজসৌন্দর্য্যের রাজসিক কার্য্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা কখনও কৰ্ত্তব্য নহে ; যেহেতু তাঁহার সাত্ত্বিক বলিয়াই নির্গীত হন ; সাত্ত্বিকগুণ ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

উক্ত কালিকা পুরাণে ব্রাহ্মণের স্বগাত্ররুধির দান—আত্মহত্যাতুল্য বলাতে, জানা বাইতেছে—ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকভাবে পূজাই প্রশস্ত। তবে যদি কেহ কামনা বাসনার দান হইয়া রাজসিক ভাবে বলিদানাদিসহ পূজা করেন তথাপি স্বগাত্ররুধির দিবেন না।

“বলিদানেন সততং জয়েচ্ছত্ৰান্ নৃপাং পঃ” । (কালিকা ৬৭।৬)

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয় রাজা নিত্য বলিদান করিয়া শত্রুরাজগণকে জয় করিবে ।

“বলিং দত্ত্বাৎ নরাধিপঃ ॥” (কালিকা ৬৭।৪৯)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজা বলি দান করিবে ।

মহাভারতের শাস্তিপর্বেও দেখা যায়—

আনন্ত-জজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবিষজ্ঞা বিশাঃ স্মৃতাঃ ।

পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্ত তপোযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ (শাস্তি পঃ ২৩।৬৩)

উক্ত শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকা :—‘আনন্তঃ—পশুহিংসা, হবিষীহাদিকং, পরিচারস্বৈবণিকসেবা, তপোব্রহ্মোপাসনম্’ ।

অর্থাৎ,—ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মোপাসনাই যজ্ঞ, দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ পশু-হিংসাই ক্ষত্রিয়গণের যজ্ঞ, দেবদ্বিজের তৃপ্তি-সাধনোদ্দেশে শস্ত্রোৎপাদন করাই বৈশ্যগণের যজ্ঞ এবং এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্র জাতির যজ্ঞ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

এখন আরও বিচার করা যাউক—বেদের ভাষ্যরূপে সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ রচিত হইলেও, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত । সাত্ত্বিক কোনও পুরাণে বলিবিধান দেখা যায় না । বরং ভূয়োভূয়ঃ নিষেধই দেখা যায় । রাজসিক ও তামসিক জনগণের জন্ত বিরচিত রাজসিক বা তামসিক পুরাণেই বলিবিধান দৃষ্ট হয় । পূর্বদর্শিত ব্রহ্মবৈবর্ত, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, কালিকাপুরাণ প্রভৃতির কতকগুলি রাজস ও কতকগুলি তামস বলিয়াই তাহাতে রাজসিক ও তামসিকজনের সাময়িক উপাদেয় বলিদানবিধি কথিত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই রাজসিক-তামসিক-বিধি লঙ্ঘন করত সাত্ত্বিকভাবে পূজা করাই বেদের বা পুরাণের তাৎপর্য্য ।

স্মার্ত্তগণ শাস্ত্র-বহিভূত হইয়া বলিতে চাহেন—

শারদীয়া দুর্গাপূজা অকালে ব্রহ্মার প্রদত্তবিধি অনুসারে রাবণকে বধ করার জন্ত সর্বপ্রথমে নাকি শ্রীরামচন্দ্রই করিয়াছিলেন । কিন্তু বাল্মীকীকৃত মূল রামায়ণে উহা কোথাও দেখা যায় না । এমন কি, পরবর্ত্তিকালের তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ গ্রন্থেও ঐরূপ অসঙ্গত প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই । সুতরাং “রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ । অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা ॥”—ইত্যাদি বোধন-পাঠ্য যে মন্ত রহিয়াছে, তাহা কোনও শাস্ত্র-পণ্ডিত বিরচিত প্রক্ষিপ্ত বাক্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে । ঐরূপ বাক্যের সত্যতা

নানিয়া লইলেও, “রামশ্রু অনুগ্রহায় চ” এই বাক্যে রামচন্দ্র ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্তও অকালে দুর্গাপূজার বিধান হইয়াছে। তাহা ছাড়া, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র নিজে ঐক্লপ ক্ষত্রিয় বিহিত সকাম পূজা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতে কোনও বলিদান না করিয়া যথার্থ সাত্ত্বিকভাবেই পূজাটা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এবং ব্রজস্থ গোপ-কুমারীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় যে কাত্যায়নী নামা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন; তাহাদের ঐ পূজাতেও পশুবলির কোনও উল্লেখ নাই।

সুতরাং সকাম-নিস্কাম সকল পূজাই সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিলে প্রকৃত পূজার ফল লাভ হয়। তদন্তরায় পাপ-পুণ্য দুইটাই লাভ হয়। অর্থাৎ রাজসী ও তামসী পূজা আপাত মধুর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্তমান কালে সত্ত্ব-প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও রজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি নিজ নিজ গুণচ্যুত হইয়া তমঃ-প্রধান শূদ্র প্রায় হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কৃত পূজাকে রাজসী বল চলে না। রাজসীর অন্তর্করণ মাত্র। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ

সাঁউড়ী-শালার ভিত্তে গলদ

আমরা গত ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪০০ শত পৃষ্ঠায় সাঁউড়ীর ‘ইঁচড়ে-পাকা সহজিয়া সম্প্রদায়’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধটি সাঁউড়ীর সহজিয়া-দলন প্রসঙ্গের ভূমিকা-স্বরূপ। তাহাতে আমরা এটি প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করিব বলিয়াছি। তন্মধ্যে ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ‘সাঁউড়ী-শালার ভিত্তে গলদ’ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি—উক্ত শিরোনাম পাঠ করিয়া কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, আমরা সাঁউড়ীর সহজিয়া দলকে শ-কার ব-কার করিতেছি অথবা সাঁউড়ীর সহজিয়া দলের প্রধান ব্যক্তিগণকে উল্লরূপে আক্রমণ করিতেছি। আমাদের উক্ত শিরোনামের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। অতঃ সেই সম্বন্ধে দু’একটি কথা পাঠক-মণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিব।

সাউডী শালা বলিলে সাউডী-গৃহকেই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। আমাদের পূর্ববঙ্গীয় পাঠকগণ সাউডী বলিতে শাউডীকে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জামাতার প্রতি সাউডী-শালার মধুময় ব্যবহার সম্বন্ধেই উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। ইহাও কিন্তু সর্বদা সত্য নহে। তবে মধুময় ব্যবহার লিখিত হইবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-সাউডীগৃহে রাসলীলার ছড়াছড়ি ও প্রমোদ-কাননে ছড়াছড়ি, সেখানে মধুময় ব্যবহারের অভাব হইবে না।

‘শালা’ অর্থে অমরকোষ গৃহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মেদিনীকোষ বৃক্ষশাখা অথবা গৃহের কোন অংশ বা কক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি অমরকোষ ও মেদিনীকোষের প্রদর্শিত অর্থ লইয়াই উক্ত প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি। কেহ কেহ শ্যালক শব্দের অপভ্রংশ ‘শালা’ শব্দ বলিয়া থাকেন। আমরা সেরূপ অর্থ বর্তমানে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য আমরা পরে নিবেদন করিব।

‘ভিত্তে গলদ’ বলিলে ভিত্তিতে গলদ অর্থাৎ পাতিত্ব বা দোষ বুঝায়। সুতরাং কোন গৃহের ভিত পত্তনে (Foundationএ) দোষ থাকিলে সে-গৃহ কখনও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। এমন কি, সেই গৃহস্থিত গৃহীব্যক্তিগণের কোন মঙ্গল হইতে পারে না। আমরা এস্থলে সাউডী-গৃহাশ্রিত ব্যক্তিগণের কোন প্রকার মঙ্গল হয় নাই, হইবেও না তাহা শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন করিব। যেহেতু এই গৃহ নিৰ্ম্মাণকারী ব্যক্তির ভিতরেই সহজিয়া মত প্রবেশ করায়, তাঁহার আশ্রিত জনগণেরও সহজিয়া ধর্মো লিপ্ত হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

মাননীয় শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র জমিদার মহোদয়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত বসবাস করিবার গৃহটিকেই সাউডীর সহজিয়াগণ ‘প্রপল্লাশ্রম’ নাম দিয়া তাহার ছবিখানি সজ্জন-সঙ্গিনী পত্রিকার প্রচ্ছদপটে বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। আমরা ইহাকে সীতানাথ বাবুর বসতবাটা বলিয়াই জানি এবং তাঁহার দেহান্তের পর তাঁহারই পুত্র পৌত্রাদি

এই গৃহের সম্বন্ধিকারী হইয়াছে ও হইবে। সুতরাং সাঁউড়ীর এই গৃহটিকে শালা বলিয়া পরিচয় দিলে কোন অত্যাচার হইবে না।

আশ্রম বলিতে সাধারণতঃ সাধু-সন্ন্যাসীর আবাসস্থলী অথবা ত্যাগী ভগবদ্ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণের আবাস-স্থলীকেই বুঝায়। যদিও একথা সর্বতোভাবে স্বীকৃত—প্রকৃত গৃহস্থগণের গৃহকেও আশ্রম সংজ্ঞা দিলে অশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা হইবে না। তথাপি সেটিকে গৃহস্থাশ্রমই বলা হইয়া থাকে, প্রপন্নাশ্রম বলা হয় না। প্রপন্নাশ্রম বলিলে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে বাঁহারা সর্বতোভাবে প্রপত্তি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত প্রপন্ন। এইরূপ প্রপন্নগণের আশ্রম সবত্রই স্থাপিত হউক ইহা সকলেরই কাম্য। গৃহস্থগণের স্ত্রী পুত্র লইয়া বসবাসের গৃহকে প্রপন্নাশ্রম সংজ্ঞা দেওয়ার পদ্ধতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচারিত প্রথার অনুমোদিত নহে। আমরা তজ্জন্যই উহাকে সাঁউড়ী-শালা বা সাঁউড়ী-গৃহ বলিয়াছি।

ভাবে কেহ হয়ত বলিবেন—সীতানাথ বাবুর গৃহে যদি কোন কোন মুক্ত মহাপুরুষগণ পদ্যর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি উহা আশ্রম বলিয়া স্বীকৃত হইবে না? ইহার বিচার এই যে—

‘মহান্তের স্বভাব হয় তারিতে পামর। নিজকার্য নাই তবু বান তার ঘর ॥’ এই বিচারে মহাজনগণ সর্বত্রই জীবের মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য পৃথিবীর সমস্ত স্থানগুলিকেই আশ্রম সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। মহাজনগণের পদ্যর্পণ মাত্রেরই স্থানের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ বিশুদ্ধতা সংরক্ষিত না হইলে তাহা পুনরায় অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই শাস্ত্রে ‘তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি’ শ্লোকের অবতারণা দেখা যায়। পান্না পুকুরে ঢিল ছুড়িলেই ঢিলের শক্তিতে পান্না বিদূরিত হইয়া নিম্নল জল প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই পান্না আসিয়া স্বস্থান অধিকার করিয়া নিম্নল জলকে আবৃত্ত করিয়া ফেলে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সাঁউড়ীগৃহে পদ্যর্পণ করিয়া সীতানাথ বাবুর চিত্তের সাময়িক শোধন করিয়া থাকিলেও পরিশেষে তিনি উক্ত

মহাজন ঘরের আনুগত্য পরিত্যাগ করায় প্রপন্নাশ্রম গৃহমেধী-গৃহে পরিণত হইয়াছে। আমরা তজ্জন্যই ইহাকে সাউড়ী-শালা আখ্যা দিয়াছি। ‘ভিত্তে গলদ’ বলিতে আমরা মাননীয় শ্রীযুত সীতানাথ বাবুর আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে গলদ বা ভ্রান্তি চুকিয়াছে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। আমরা তাহার প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিচার-যুক্তিহীন অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি একটি একটি করিয়া জন-সমাজে প্রকাশ করিব। সাউড়ী-শালার ভিত্তি বলিতে সীতানাথ বাবুকেও বুঝিতে হইবে। তিনি যে তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার-বিচার-ধারা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-মত বা সহজিয়া-মত গ্রহণ করিয়া গলদ করিয়াছেন তাহা আমরা প্রদর্শন করিব।

আমরা মাননীয় সীতানাথ বাবুকে যথেষ্ট সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। সুতরাং কোন গৌরবান্বিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে আমরা নিজস্ব-লেখনী সম্প্রতি স্তব্ধ রাখিয়া পূর্ব মহাজনগণের লিখিত প্রবন্ধগুলির উপরই অধিক নির্ভর করিতেছি। এস্থলে সীতানাথ বাবুর আচার-ব্যবহার ও ধর্মমতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সহজিয়া মতের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ স্বরং যে-সমস্ত প্রবন্ধ তাঁহাকে ও জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আমাদের তাহাই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং আমরা আমাদের মে বর্ষের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথা—

১। প্রাকৃত রস-শতদূষণী—৭২৪৩, ৮২৮৪, ২। প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে—১১৮০৪, ৩। (সাউড়ীর ভক্ত সম্প্রদায়)—১২৮৪৩, ৪। ভাই সহজিয়া—৬২০৪ প্রভৃতি। উক্ত প্রবন্ধ সমূহ জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লিখিত। বর্তমান সংখ্যার ২৮৪ পৃষ্ঠায় ভাই সহজিয়া সম্বন্ধে পুনঃ ২য় প্রবন্ধের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণ বিশেষ ধীরভাবে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। (ক্রমশঃ)।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, বাৎসরিক ২৥০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৥০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সুমালোচনা আদরণীয়া।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (ভগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী দামোদর ঠাকুর

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ৥০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)
মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট-সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯৮ নয় টাকা।

যুধি তুরগরজোবিধূম্বিষক-

কচলুনিভশ্রমবার্যলক্ষ্য তাশ্চে ।

মম নিশিতশরৈর্বিভিচ্ছমান-

ত্বচি বিলসৎকবচেহস্ত কৃষ্ণ আত্মা ॥ ৩ ॥

সপদি স্থিতিবচো নিশম্য মধো

নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য ।

স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষা

হতবতি পার্থসথে রতির্মাস্তু ॥ ৪ ॥

ব্যবহিতপূতনামুখং নিরীক্ষ্য

স্বজনবধাদিমুখস্ত দোষবুদ্ধ্যা ।

কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া য-

শচরণরতিঃ পরমস্ত তস্ত মেহস্ত ॥ ৫ ॥

অনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-

মৃতমধিকতুর্মবল্লভো রথস্থঃ ।

ধৃতরথচণোহভ্যয়াচ্চলদগ্ধ-

ইরিরিব হস্তমিভং গতৌত্তরীয়ঃ ॥ ৬ ॥

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ

ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে ।

প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং

স ভবতু মে ভগবান্ গতিমুকুন্দঃ ॥ ৭ ॥

বিজয়রথকুটুম্ব আততোত্রে

ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রুয়েক্ষণীয়ে ।

ভগবতি রতিরস্ত মে মুমূর্ষো-

বমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্ ॥ ৮ ॥

ললিতগতিবিলাসবল্লহাস-

প্রণয়নিরীক্ষণকল্লিতোরুমানাঃ ।

কৃতমনুকৃতবত্য উন্মত্য উন্মদান্কাঃ

প্রকৃতিমগমন্ কিল যন্ত গোপবধবঃ ॥ ৯ ॥

মুনিগগনৃপবর্যাসমুলেহন্তঃ-

সদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্

অহংমুপপাদ ঈক্ষণীয়ে

মম দৃশি গোচর এষ আবিরাভা ॥ ১০ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং

হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকলিতানাম্ ।

প্রতিদৃশামিব নৈকধার্কমেকং

সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে নবমে-

অধ্যায়ে ভীষ্মকৃত ভগবৎস্তুতিঃ ।

ভীষ্মকৃত ভগবৎস্তুতির বঙ্গানুবাদ

শ্রীভীষ্ম কহিলেন, কখনও লীলাবিলাস করিবার জগৎ যে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি-
পরম্পরা হইতেছে, সেই মায়ায় প্রতি ঈক্ষণ স্বীকার করিলেও জীবের জ্ঞান যিনি
আবৃত-স্বরূপ বা পরতন্ত্র হন নাই, যাঁহা অপেক্ষা বিরাট আর কেহ নাই, সেই
পরাংপর স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দময় ষাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানা
ধর্মাদি উপায়ে আমার কর্মবুদ্ধি সমর্পিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র সুন্দর তামালের জ্ঞান নীলবর্ণ, প্রাতঃকালীন
সূর্য্যাকিরণের জ্ঞান নিশ্চল পীতবসন-বিভূষিত, কুন্তল-রাশিদ্বারা আবৃত-মুখপদ্ম-
শোভিত শরীরধারা এই অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার অহৈতুকী ফলাভি-
সন্ধিরহিতা চিত্তবৃত্তি হউক ॥ ২ ॥

যুদ্ধে অশ্বখুরোথিত ধূলি-ধূসরিত ইতস্ততঃ বিস্রস্ত-কুন্তলবিকীর্ণ ঘর্ম্মজলে
যাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত এবং আমার বাণসমূহে যাঁহার গাত্রত্বক্ ক্ষতবিক্ষত
হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক ॥ ৩ ॥

“হে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর—যাঁহাতে যুদ্ধস্থলে
অবস্থিত যুযুৎসু এই বীরগণকে নিরীক্ষণ করিতে পারি”—সখা অর্জুনের এই

বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম ও শত্রুপক্ষের সৈন্তের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করত কালদৃষ্টি-প্রভাবেই শত্রু দুর্ব্যোধনের পক্ষীয় যোদ্ধ-গণকে ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার ছলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ু অপহরণপূর্বক অর্জুনের জয়লাভ সম্পাদন করাইয়াছিলেন, সেই অর্জুন-সখ্য শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ॥ ৪ ॥

দুরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীর-গণকে দর্শন করিয়া পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক ॥ ৫ ॥

‘আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব’—এইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্র ধারণ করাইব’ আমার এই প্রতিজ্ঞা যাহাতে সত্য হয় তদ্রূপ বিধান করিবার জন্ত যিনি অর্জুনের রথে অবস্থান করিতে করিতে সহসা অবতীর্ণ হইয়া রথচক্রে গ্রহণপূর্বক ক্রোধবশে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ায় স্বীয় নরলীলাভিনয় বিস্মৃতিবশতঃ উদরস্থিত নিখিল প্রাণী ও ব্রহ্মাণ্ডের ভারে প্রতিপদ-ক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত ও বিচলিত করিয়া পৃথিবীতে উত্তরীয় বসন ফেলিয়া হস্তীকে বধ করিবার নিমিত্ত সিংহ যেমন প্রবলবেগে ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং যিনি তৎকালে বিশ্বয়াপন্ন ধনুর্ধারী আমার তীক্ষ্ণশরে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় বিধবস্তকবচ হইয়া কধিরব্যাপ্ত কলেবরে অর্জুনের নিষেধসত্ত্বে তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে আমাকে বধ করিবার জন্ত আমার অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি লোকদৃষ্টিতে অর্জুনপক্ষীয় লোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও আমাকে অমুগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার অবলম্বন হউন ॥ ৬-৭ ॥

আনি দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে দেখিলাম যে, এই বুদ্ধে যে-সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছে তাহারা সকলে যাহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্য নামক মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই অর্জুনের রথের রক্ষাকারী কশাধারী অশ্বাবল্লাধারী সারথিক্রূপে শোভমান, প্রাকৃত দৃষ্টিতে অন্তরাচারণ হইলেও অচিন্ত্যস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যুসময়ে আমার প্রীতি হউক ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সূচাক্ষর মঞ্জুগতি রাসাদিবিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুরমান বদ্ধিত হওয়ায় যাহারা উৎকট মদবিহ্বল হইয়া ভদেকচিত্ততাহেতু তাঁহার গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন সেই গোপবধুগণ যাহার

স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক ॥ ৯ ॥

মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ-ব্যাপ্ত সভামধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজস্বয় যজ্ঞে যিনি সেই মুনিগণ প্রভৃতি সমবেত জনগণের সর্বিস্বয়ে অবলোকনের পাত্র হইয়া পূজা পাইয়াছিলেন, সেই এই বিশ্বাত্মা কৃষ্ণ আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া একট হইয়া আছেন ; অহো ! আমার কি সৌভাগ্য ॥ ১০ ॥

স্বয়ং একটি প্রাণিগণের প্রতিহৃদয়ে বর্তমান থাকিয়া একই সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান-ভেদে বহুবিধরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সেই অনাদি জন্মরহিত সমুখস্থিত এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাকৃত-ভেদজ্ঞান-প্রসূত মোহমুক্ত হইয়া সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

ভাই সহজিয়া

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

সাউড়ীর সীতানাথ বাবুর সহজিয়া-মত ও তাহার হেয়ত্ব

ভাই সহজিয়া ! তোমার কথায় আমি বুঝিয়াছি—অপরাধ-যুক্ত নাম ও শুদ্ধ নামে তোমার অভেদ জ্ঞান । আমি বুঝিয়াছি—ভোগময় বিলাস-কাননই তোমার বিচারে বৃন্দাবন, সংসারক্ষেত্র—তোমার শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনবদ্বীপ ভূমি—অণু কর্ম ভূমির গ্রায় প্রাকৃত বসাবিনয়ের রঙ্গমঞ্চ, তোমার পুয়-শোণিতময় দেহখানাকে—অপ্রাকৃত বলিয়া তোমার বিশ্বাস, কপটভাব প্রদর্শনে কৃত্রিম অচেতন হওয়াই তোমার অন্তর্দৃশ্য, থিয়েটারে বেশ্যার মুখে হরিনাম শুনিয়া ভূমি এই সংসার পার হইবে, পেশাদার নর্ত্তকী গায়ক রসগান করিয়া তোমাকে পারকীর ভাব শিখাইয়া হরিনাম শুনাইবে, পেশাদার কথক পয়সা লইয়া তোমাকে ভাগবতের গল্প করিয়া তোমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিবে, আচার্য্য বংশীয় ব্যবসায়ী গুরুর নিকট ভূমি কতিপয় রজত ভেট দিলেই তোমার বৈষ্ণবতা সুসিদ্ধ হইয়া যাবতীয় ছঃসঙ্গকে হজম করিবার মন্ত্র পাইবে,—তুমিও জল আচরণীয় হইবে—তোমার ‘সকড়ি’ স্পৃষ্ট হইবে, তোমার পক্ষে তাহারা এবং তাহাদের পেটেলগণ ওকালতি করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-গিরিই ভাগবত-ধর্ম বলিয়া গগনভেদী চিৎকার করিবে, সুর-মান-তাল-রাগ শিখিলেই অপরাধময় কীর্ত্তন তোমাকে হরিকীর্ত্তনীয়

করিবে, থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় তোমার পোষক, মায়াবাদীগণ তোমার চাতুরী বুদ্ধিতে অক্ষম, সুতরাং তুমি তোমার সাধুতার ছলে ব্যবস্যাটো বেশ চালাইতে পারিবে। এ সকল করিলে তো তোমার আসল পাওনা কমিয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতেছ না কেন ?

নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ ও গ্রন্থ-ব্যবসায়ী সহজিয়ায়ণ-দুঃসঙ্গ

(ভাই সহজিয়া!) দেখ, তোমার জন্ম শ্রীজীব গোস্বামী ৯১ সংখ্যায় ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

“নামগ্রহণাদীন্তপি যদি কস্মাদৌ তৎসাদানুগ্যাত্ত্বং প্রযুক্ত্যন্তে

তদা তন্ত্ৰ (ধর্ম্যন্ত্ৰ) পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্ত্যন্তেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ ।

তথৈব ক্ষমিকুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ ।”

হরিনাম-গায়ক-সজ্জায় ‘নাম’ বিক্রয় করিয়া, মন্ত্রজীবী হইয়া ‘মন্ত্র’ বিক্রয় করিয়া, দেবল হইয়া ‘অর্চন’ বিক্রয় করিয়া, (কৌপীন লইয়া স্বীয় জিহ্বাপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের তরে ভিক্ষা করিয়া), আচার্য্য পণ্ডিত গোস্বামী হইয়া ‘শ্রীগ্রন্থ বিক্রয়’ করিয়া সেই সেই অর্থ দক্ষোদরের সেবায়, কুটুম্ব ভরণের উদ্দেশে, প্রতিষ্ঠা ও দলবৃদ্ধি-কামনায় নিযুক্ত করিলে কি উপকার হইবে ? শুদ্ধ-ভক্তগণ ও সাধারণ লোকে সহজিয়াকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে ত্যাগ করিবে।

সাউরীর সহজিয়ার অকালপকতা ও গুরুদ্রোহীতা

ভাই সহজিয়া! তুমি ইন্দ্রিয়-দমনে অপারক হইয়া সিদ্ধির ভাণে রাধা-গোবিন্দের লীলা-রহস্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিশৃঙ্খল লোক-সমাজে গান গাইয়া ‘সেবা-কল্পনা’র * নামে কবিতা লিখিয়া কাঞ্চা-রসের † দোকান খুলিতেছ।—কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে, তোমার গুরু প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন এবং সেই চক্রবর্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া-গুরু তোমাকে উহাই শিখাইয়াছেন, বল। তুমি ভক্তির অনধিকারী ; সুতরাং ক্রম-পস্থা ছাড়িয়া উচ্ছৃঙ্খলতাই হরি-ভক্তির তাৎপর্য্য, অনধিকারীকে শিখাইতেছ।—ইহাতে কি ভাই! তোমার অপরাধ হইতেছে না।

* সীতানাথ বাবুর রচিত ‘সেবা-সঙ্কল্প’ নামক সহজিয়া গ্রন্থের প্রতিবাদ।
—সম্পাদক।

† ‘কাঞ্চারস’ শব্দটা ‘কান্তারস’ শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাতে কাঁচা-রস বা কাঞ্চন-রসও বুঝাইতেছে। —সম্পাদক

‘বিক্রীড়িতং’ ও ‘অনুগ্রহায়’ শ্লোকের অছিলায় সহজিয়ার ‘কুচেষ্টা’

‘বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ’ শ্লোক ও ‘অনুগ্রহায় ভক্তানাং’ শ্লোকের বিকৃতার্থই সহজিয়াকুলের মূলমন্ত্র বলিয়া তোমার শুদ্ধ-ভক্তি বিনাশ করাটা কি ভাই ভাল হইল ? ভাগবতের শ্লোক-সাহায্যে বৈকুণ্ঠবস্তুর মায়িক বস্তুমাত্র বলিয়া সাব্যস্ত করাটা কি ভাই তোমার সাধুর ধর্ম প্রচার হইল ? ভাই সহজিয়া ! তোমার-আমার মত কতশত হরি-বিমুখ বিষয়-লোলুপ রাবণ, অভিমহু প্রভৃতি ‘কন্যা-গেরো’ (শূন্যগ্রন্থি) হরি পাইয়াও প্রাকৃত বুদ্ধিতে জড় দুঃখে কষ্ট পাইয়াছে । তবে কেন ভাই ! দেখিয়া-শুনিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব পরমহংস-ধর্মকে কলঙ্কিত করিতেছ ? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেছেন,—এক বৃদ্ধা অন্তিমকালে তাহার মুমূর্ষু পুত্রের মুখে স্বত ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন বাবা ! বল হইতেছে ? সকলেই বলে ঘি খাইলে বল হয় । প্রাকৃত সহজিয়াদিগের ‘বিক্রীড়িতং’ ও ‘অনুগ্রহায়’ শ্লোকের ব্যাখ্যাধারা আত্মপ্রবঞ্চনাও এই বুড়ির চায় বিচার ।

অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য রাস-লীলাগানে অনর্থ বৃদ্ধি

ভাই সহজিয়া ! তুমি বিচার দেখাও যে সাধনে অনর্থযুক্ত কামী, রাসলীলা গান করিলে তাহার অনর্থ ছাড়ে ; যাহার অনর্থ নাই তাহার সম্বন্ধে রাসলীলা শ্রবণের আবশ্যকতা অপেক্ষা প্রাকৃতসহজিয়ার আবশ্যকতা বেশী । তোমার আরও যুক্তি এই যে—অনর্থশ্রোত কখনই রুদ্ধ হইবে না ; সুতরাং অনর্থ থাকিতে থাকিতে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিতই ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য । অনর্থের বোঝা ঘাড় হইতে নামাইবে না, তাহাকে বানর-শিশুর গ্রায় ক্রোড়ে রাখিয়া কৃষ্ণের সেবা-বৃত্তিচরিতার্থ করিবে ; তাহা হইলে আর অনর্থ তো কোনদিন তোমাকে ছাড়িবে না ।

এঁ চড়েপাকা সহজিয়ার অনর্থবৃদ্ধির কারণ

উহাকে গর্হণ করিতে কবিত্তে ক্রমপন্থায় হরিসেবা প্রবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই ক্ষান্তি আসিলে অনর্থ ছাড়িয়া যায় । তবে শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথম মুখে সাধনকালে এঁ চড়ে পাকাইবার উদ্দেশ্য প্রাকৃত রস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে, রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না । সজ্জনকে অসাধু বুদ্ধি ও অনর্থময় সহজিয়াকে সাধু জ্ঞান হইবে । সুতরাং অসৎকে সাধু মনে করিয়া তাহার নিকট সাধুত্বের নামে অসাধুতা শিথিলে অপ্রাকৃত রাসলীলা ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত হয় । ইন্দ্রিয়-পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া অনর্থ বাড়ে ।

আবার সাধন কালের অগ্রে রাসলীলা প্রবণের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি একথা কোম ভক্ত বা শাস্ত্র বলেন না।

কৃষ্ণ-লীলা-স্বৃতির ক্রম বিচার

ত্রীনাশ অপরাধ-মুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে অন্তঃকরণ প্রাকৃত বিষয় বা অনর্থ হইতে অবসর পায়, তখন কৃষ্ণরূপের স্বৃতি হয়। কৃষ্ণরূপ স্বৃতি হইলে কৃষ্ণগুণের উদয় হয়। কৃষ্ণগুণের স্বৃতি হইলে পরিকর-সেবায় উল্লাস হয় এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলীলায় চিত্ত প্রবেশ করে।

রাসলীলার অধিকারী ও অনধিকারী

ভাবুক ও রসিকগণকেই ভাগবতীয় রাসলীলা পাঠের অধিকারী বলা হইয়াছে, প্রাকৃত সহজিয়াকে বা কামুককে রাসলীলা পড়িতে বলা হয় নাই। যাহারা অনর্থে মগ্ন, কামে ভ্রান্ত, তাহাদের জন্য ভাগবতের রস নহে। “যদি হরি-স্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলায় কুতূহলং”, তাহা হইলে গীতগোবিন্দ পড়, নতুবা মায়ার স্মরণে ভোগময় ইন্দ্রিয়পর হইয়া জয়দেবের বর্ণিত অপ্রাকৃত রস আশ্বাদনে অনর্থ হইলে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িবে।

আমি বলি—রাসলীলা আরম্ভ করার বদলে, অনর্থ থাকা কালে অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীহরিনাম করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা স্বৃতি হয় না। অনর্থকালে প্রথমেই রাসলীলা নহে।

শাস্ত্র-প্রমাণ গোপন রাখিয়া সহজিয়াদের বৈষ্ণব সাজিবার অপচেষ্টা

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে কর—তোমার মত প্রাকৃত সহজিয়াগণই বৈষ্ণব (এবং) সহজিয়াকে হরি-বিমুখ বলিলে শুদ্ধভক্তের অপরাধ হয়। ‘অচ্যে বিষ্ণো শিলাধীঃ’, ‘যশ্চান্ন বুদ্ধিঃ কুণপে’, ‘নৈবাং মমাহমিতিধীঃ স্ব-শৃগালভক্ষ্যে’ প্রভৃতি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ভক্তগণ না করুন, তাহা হইলে তুমি লোক ঠকাইয়া ভক্ত-সাজে আদর পাইতে পার। তুমি বল—তুলসী পাতার ছোট বড় ভেদ নাই; শুদ্ধ-বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, ভক্তের প্রচুর শত্রু, ভক্ত নামের কলঙ্ক, মায়াবাদী, অভিনয়কারী কপট-বৈষ্ণব—সকলেই এক।

সহজিয়াগণ সমাজ-চক্ষে ঘৃণিত, এমন কি,

তাহাদের মুখ-দর্শনে পাপ

আমরা জানি, তোমার এরূপ শত্রুতা করিবার উদ্দেশে সহজিয়াদিগকে বৈষ্ণব মনে করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবকে লোক-চক্ষে ঘৃণিত করা তোমার উচিত

নহে। তুমি সাধারণ জীবের চক্ষে প্রথমেই ধূলি দিতে পার, সত্য; কিন্তু ভগবানকে বা শুদ্ধ ভক্তকে কতক্ষণ ঠকাইবে? তোমার হৃদয়ের ভাব ও অসাধু-বৃত্তি তাহাদের অপরিজ্ঞাত নহে। সোজাসুজি প্রাকৃত সহজিয়া মত ছাড়িয়া দাও। ভগবানে বিশ্বাস কর। উচ্ছৃঙ্খল কপট প্রেমচেষ্টা দেখাইতে গিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র-বিধি ছাড়িয়া দিলেই তোমার উৎপাতে ভক্তগণ তিষ্ঠিতে পারিবেন না। সহজিয়াগণ পাপ করায় তাহাদের মুখদর্শনে ধার্মিক অভভক্তগণেরও পাপ হয়, ভক্তগণের অপরাধ হয়। অরণ্যান্তে সহজিয়ারা পাপের সমুচিত শাস্তি পায়। ইহলোকে সমাজে লোকে ঘৃণা করে। তাহাদিগকে সংপথে আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা গুণাকাজীকে শত্রু জ্ঞান করে। তাহাদের পুণ্যময় সংসারে কোন আস্থা নাই, বৈধ ধর্মের অমর্যাদা করাই তাহারা ভক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। মূর্খতা ও বিশৃঙ্খলতাই অনুরাগের পথ সহজিয়াগণ মনে করেন। ভক্তের শত্রু বলিয়া ভগবান সহজিয়ার প্রতি নারাজ।

সীতানাথ বাবুর অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধিহেতু ও দলবদ্ধির জন্য

সাহজিক-মতে প্রবেশহেতু আক্ষেপ

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে কর—বিষ্ণু-কলেবর, শ্রীনামকে, কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমূর্তিকে প্রাকৃত মনে করিলেও কিছু কিছু সফল হয়। (কিন্তু আমরা বলি—) মঙ্গল কিছুই লাভ হয় না—লাভের মধ্যে অপরাধমাত্র লাভ ঘটে। ভাই! বিপথগামী তোমার দলে লোক বাড়াইবার জন্য তুমি সহজিয়া মত কেন গ্রহণ করিলে? পাছে দলে লোক কমিয়া যায়, শুদ্ধভক্তির কথা না বুঝিয়া পাছে তোমাকে ছাড়িয়া দেয়, এই ভয়ে কি ভাই! কৃষ্ণের নিত্য সৌন্দর্য্য ও মধুরিমা ভুলিয়া সহজিয়া মতে প্রবেশ করিতে হয়? সহজিয়ারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাণ্ডল-স্বরূপ তোমাকে যে অবৈধ উৎকোচ দিয়াছে, তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তোমার ক্রম-পন্থায় কাঁটা দিয়াছে, তাহাতেই তুমি ধন্য হইয়াছ,—বৃষভানু-নন্দিনীর অমল সেবা ছাড়িয়াছ; প্রাকৃত রসগানে মত্ত হইয়াছ, তাহাদের বাধ্য-বাধকতা তোমাতে এত বেশী কেন হইল?

সীতানাথ বাবুর সঙ্গদোষে সহজিয়ামত-গ্রহণ

ও শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ

সহজিয়ারা দেহারামী, দ্রবিরামী, জনতারামী, লোভারামী, পাষণ্ডারামী। ভাই! বিপথগামী তোমাকে কেন সহজিয়ারা 'ভুল ভুলাইয়ার' (তাহাদের)

মধ্যে ঢুকাইল, গোলোক-ধাঁদার মধ্যে ফেলিল ? তুমি কেন তোমার নিজ অপ্রাকৃত স্বরূপকে প্রাকৃত-সহজিয়া বলিয়া সনাক্ত করিলে ? শুদ্ধভক্তের বিরোধী কেন জানিলে ? প্রাকৃত-সহজিয়ার সেবাকলে, ঐশ্বর্য্যে, লোকবলে, মোহিনী শক্তিতে কেন তুমি মূঢ় হইলে ? প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া কেন তোমার মাধবেন্দ্র-পুরীর নির্ম্মল প্রেমে জঞ্জাল আনাইল ? প্রাকৃত ভাগকে কেন তুমি অপ্রাকৃত বলিলে ? স্বরূপ-দামোদরের প্রেমভক্তি ভুলিয়া তুমি কেন মায়াবাদকে প্রেম মনে করিলে ? প্রতিষ্ঠাশার বশবর্তী হইয়া কপটকে প্রেমিক বলিলে ? তুমি কেন জড় ভূত-প্রেতবাদ লইয়া শ্রীরূপের উপদেশামৃতকে ছাড়িয়া দিলে ? জড় জগতে প্রাকৃত-সহজিয়ার বল বেশী, বিশেষতঃ কলিকালে হরিকথার ছলেও কলি অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করেন । তাই সহজিয়া ! তোমাকে দূর হইতে দণ্ডবৎ । দয়া করিয়া তুমি যে বিষয় লোপুপ হইয়া নিত্যকালের জন্ম শুদ্ধ ভক্তগণকে ছাড়িয়াছ, তাহা কক্ষের অমায়ায় দয়ারই পরিচয় । একাদশের ভিক্ষুর গানের মধ্যে আমার মনে পড়ে এই শ্লোকটি আছে—

“নুনং মে ভগবাংস্তুঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ ।

যেন নীতো দশ্যামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥” (ভাঃ ১১।২৩।২৮)

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

শ্রীনিবাসের জন্ম-কুল ও তাঁহার বৈরাগ্য-গ্রহণ

১৮ই কার্তিক বৃহস্পতিবার* শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাবোৎসব । শ্রীনিবাস আচার্য্য জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চাখুন্দী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন । শ্রীনিবাস বাল্যকালে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত স্বীয় পিতার মুখে মহাপ্রভুর গুণগান শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং যৌবনাবস্থা প্রাপ্তেই তিনি পিতামাতার আদেশ লইয়া বৈরাগ্যশ্রম গ্রহণ করেন ।

বৈরাগ্যপথে নবদ্বীপে আগমন এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও

বংশীবদনানন্দ প্রভুর সহিত মিলন

শ্রীনিবাস বৈরাগ্য-পথে পদার্পণ করিয়া সর্বাগ্রে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর শক্তি শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে ও তাঁহার রক্ষক মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ

শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থানসকল দর্শনাভিলাষী হইয়া নবদ্বীপে আগমন করেন। শ্রীনিবাস নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার মন্দিরে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া বংশীবদনানন্দের নিকটে মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ ও তাঁহার লীলাস্থান সমস্ত দর্শন করেন।

শ্রীনিবাসের পুরুষোত্তম গমন ও তৎসম্বন্ধে মতভেদ

তদনন্তর বিষ্ণুপ্রিয়া ও বংশীর নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক দ্বাদশ পাট এবং চৈতন্য-ভক্ত-বিরাজিত অত্যন্ত পাটসকল দর্শন করেন। এইরূপ কিছুদিন ভক্ত-মণ্ডলীর সহিত সাক্ষাতাদি করিয়া তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গমন করেন। তথায় মহাপ্রভুর পার্বদসকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নিত্য শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও মহাপ্রভুর কথা কীর্তন, শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কোন গ্রন্থের মতে, শ্রীনিবাস বৈরাগ্যাবলম্বন করত প্রথমেই শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করেন। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নাই।

শ্রীনিবাসের ব্রজে গমন এবং তথা হইতে গোড়-দেশে

প্রত্যাগমন ও দুর্গতি-দমন

শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম হইতে গোড়-মণ্ডলে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তৎপরে বৃন্দাবন ধাম দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। শ্রীনিবাস ব্রজধামে উত্তীর্ণ হইয়া, গোস্বামী প্রভুদিগের সংযোগে ব্রজপুর দর্শন ও নিত্য নব নব ভাবোপভোগ করিতে লাগিলেন। এই নিয়মে বহুদিন ব্রজে অবস্থান করিয়া, চিন্তামণি-ভূমি গোড়মণ্ডলে প্রত্যাগমনপূর্বক দুর্গতি লোকসকলকে উদ্ধার করেন। শ্রীনিবাসের অলৌকিক জীবনী শ্রীচৈতন্য-প্রেমলীলামৃত ও ভক্তিরত্নাকরে বিস্তার বর্ণনা আছে।

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোমণী মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বর্ষে শ্রীল আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার ছিল। —সম্পাদক

সার্থনা-পঞ্চক (১০)

(ক)

প্রভুপাদ !

এই কলিকালে,

মহাভাগবত

বলিয়া তাঁহারে কয় ।

শ্রীনাম-কীর্তনে

হরি ভজে যেই

সেই ভবে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ১ ॥

চিদাত্মক নাম

বারেক উচ্চারে,

যেই ফল লাভ হয় ।

শিব ব্রহ্মা তা'র

মাহাত্ম্য কহিতে

কোন কালে না পারয় ॥ ২ ॥

নাম উচ্চারণে,

যে মাহাত্ম্য তাহা,

অদ্ভুত বলিয়া গায় ।

উচ্চারণ মাত্র,

বদ্ধজীব গণ

পরম ত্রীপদ পায় ॥ ৩ ॥

হেন কৃষ্ণনাম

পরিহারি সদা,

পাপ অনুষ্ঠানে রত ।

হইয়া গোপাল

করে আত্ম-নাশ,

(ভুঞ্জে) নরক যাডনা শত ॥ ৪ ॥

(খ)

প্রভুপাদ !

সঙ্কেত ও হেলা,

পরিহাস, স্তোভ—

হয় নামাভাস চারি ।

কহে সুধীগণ

এই নামাভাস

অশেষ কলুষ হারী ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ নাম-সূর্য

আপন-আভাসে,

সংসার অঁধার নাশে ।

তদ্বাক্ত মানব, (কৃষ্ণ) ভক্তি বিষয়ক
মুক্তি পায় নামাভাসে ॥ ২ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, খণ্ড উচ্চারিত
যে ভাবে হউক নাম ।

নাম-গ্রহীতাকৈ অবশ্য উদ্ধার
করিবেন শুদ্ধ নাম ॥ ৩ ॥

হেন কৃষ্ণনামে, তোমার কৃপায়
রতি যেন জন্মে প্রভু ।

এই সে প্রার্থনা করয়ে গোপালে
নাহি চাহে (অন্য) কিছু কভু ॥ ৪ ॥

(৭)

প্রভুপাদ !

এক কৃষ্ণনাম সর্ববাপ হরে
অনায়াসে ভব ক্ষয় ।

অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লৈলে নাম
কৃষ্ণ-প্রেমধন পায় ॥ ১ ॥

কৃষ্ণের 'শ্রীনাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—
এই তিন একরূপ ।

এই তিনে ভেদ নাহি কোন কালে
তিন চিদানন্দ রূপ ॥ ২ ॥

শ্রীহরি-কীর্তন সাধ্য ও সাধন
কহেন আচার্য্যগণে ।

কৃষ্ণনাম-গুণে পশু-পাখী-কীট
আদি তরে জীবগণে ॥ ৩ ॥

করুণা করিয়া (হেন) কৃষ্ণনাম দিয়া,
উদ্ধারহ এ গোপালে ।

তুমি দয়াময় ! পতিতপাবন
জগতের লোক বলে ॥ ৪ ॥

(২)

প্রভুপাদ !

সত্যযুগে ধ্যানে, যজ্ঞে ত্রেতাযুগে,

(যাহা লাভে)—অর্চনে দ্বাপর যুগে ।

নাম সংকীর্ণনে, হয় তাহা লাভ,

এই ধন্য কলিযুগে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তা- মণির স্বরূপ

নাম স্বয়ং কৃষ্ণ হ'ন ।

নাম মায়াতীত, নাম নিত্য মুক্ত,

কৃষ্ণভক্তগণে ক'ন ॥ ২ ॥

চৈতন্য-রস- বিগ্রহ পূর্ণ

বলিয়া জানহ নাম ।

মুক্ত কুলেরও উপাসিত নাম

নাম হ'ন মোক্ষধাম ॥ ৩ ॥

হেন কৃষ্ণনাম অপরাধ-ফলে

শমন ধরেছে কেশে ।

কাঁদিয়া গোপাল কহে প্রভুপাদ,

(মোর) গতি কি হইবে শেষে ? ॥ ৪ ॥

(৩)

প্রভুপাদ !

তাপক্লিষ্ট হ'য়ে করয়ে তপস্তা

(করে) ভৃগুপাত অনুষ্ঠান ।

বহু বহু তীর্থ করে বিচরণ,

করে বহু যজ্ঞ দান ॥ ১ ॥

অনন্তকালে যদি শ্রীহরি-স্মরণ

নাহি করে কোন জন ।

তা' হ'লে কখন মৃত্যুকে না পারে

করিবারে অতিক্রম ॥ ২ ॥

নাম সংকীৰ্তনে

যেই ভক্তিযোগ

ভগবান্ বাসুদেবে ।

জীবের তাহাই

পরম সুধৰ্ম—

বলিয়া জানহ সবে ॥ ৩ ॥

আমি সে পাপগু

মত্ত পাপার্জনে,

(হেন) নাম নাহি করি কভু ।

(তাই) চরণে ধরিয়া

কহিছে গোপাল

(মোর) কি হ'বে উপায় প্রভু ? ৪ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩৯৭ পৃষ্ঠার পর)

স্মার্তগণের বৈধ—বলির দোষ উল্লেখ

পুরুষ দেবতার মধ্যে ভৈরবের উদ্দেশে বহুস্থানে বলির প্রথা আছে দেখা যায়। ভৈরব-লীলারই অবতার বিশেষ। 'বৈষ্ণবানাং যথা শত্ৰুঃ'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জানা যায়—তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বা পরম ভাগবত। তাঁহার উদ্দেশে বলিদান বা ঐ বলির পক্ষাপক মাংস-রুধিরাদি দান যে কতদূর ধৃষ্টতা, তাহা ভাবায় ব্যক্ত করা যায় না। এমন কি, ইহাতে বৈষ্ণবাপরাধই উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করি। এরূপ সকাম পূজায় পুণ্যের পরিবর্তে মহৎ পাপেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। যথা—

ক মদ্যং ক শিবে ভক্তিঃ ক মাংসং ক শিবার্চনম্ ।

মৎস্ত-মাংস-রতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ (কাশীখণ্ডম্)

অর্থাৎ, কোথায় মদ্য, আর কোথায় শিবভক্তি ! মাংস কোথায়, আর শিবার্চন কোথায় ! যাহারা মৎস্ত-মাংস ভোজন করে, শিব তাহাদের নিকট হইতে দূরেই অবস্থান করেন ; অর্থাৎ তাহাদের কখনও শিবপ্রাপ্তি হয় না।

শিব যেমন বিষ্ণুপ্রসাদ তির মাংসাদি গ্রহণ করেন না, সেইরূপ শিবগতী দুর্গাও বিষ্ণুপ্রসাদই কামনা করিয়া থাকেন ; যেহেতু তিনি বৈষ্ণবী ও সতীসাক্ষী ।

মৎস্ত-মাংসাদি কিছুই তাঁহার গ্রহণীয় নহে—যেহেতু শিব তাহা গ্রহণ করেন না। অথচ এই পশুবধ-জনিত পাপে পূজকের অধঃপতনাদি শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্য-পুরাণের উত্তরথণ্ডে দেবী ভগবতী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। বথা—

যে মমার্চনমিত্যুক্তা প্রাণি-হিংসন-তৎপরাঃ।

তৎপূজনং মমামেধাং যদোষাত্তদধোগতিঃ ॥

মদর্থে শিব কুর্বন্তি ভাগসা জীবহাতনম্।

আকল্পকোটি-নিরয়ে তেবাং বানো ন সংশয়ঃ ॥

মম নাম্মাথবা বজ্রে শস্ত্র-হত্যাং করোতি যঃ।

কাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুন্তীপাকমবাপুয়াৎ ॥

দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণি-হিংসনম্।

কল্প-কোটি-শতং শস্ত্রো রৌরবে স বসেৎ ক্রবন্ম ॥

(পদ্য পুঃ ১০৪ অঃ)

অর্থাৎ, যাহারা আমি শক্তি, আমার পূজায় বলি দিতে হয় এই বলিয়া প্রাণি-বধ-তৎপর, তাহাদের পূজা আমার পুরীষ (বিষ্ঠা) তুল্য জানিবে; কারণ ঐরূপ পূজায় পূজাফল লাভ করা ত দূরের কথা, ঐ পাপে তাহাদের অধোগতিই হইয়া থাকে। হে শিব! তামস-প্রকৃতির মানবগণই আমার উদ্দেশ্যে জীবহত্যা করে এবং ঐ বধ-জনিত-পাপে আকল্পকোটি নরকে বাস করে—ইহাতে সংশয় নাই। আমার পূজা উপলক্ষে অথবা বজ্রে যে-ব্যক্তি পশুবধ করে, ঐ পাপে কোথাও তাহার নিষ্কৃতি নাই। সে কুন্তীপাক নামক নরকে পতিত হয়। হে শস্ত্রো! দেবতা উদ্দেশ্যে, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে, অথবা নিজের উদরপূর্ত্তিজন্তু যে-ব্যক্তি জীববধ করে, শতকল্প-কোটি-কাল সে নিশ্চয়ই রৌরব নামক নরকে বাস করে।

আরও দেখা যায়—

মমোদ্দেশ্যে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসজেৎ।

যো মূঢ়ঃ স তু পূয়োদে বসেদ্ যদি ন সংশয়ঃ ॥ (পঃ পুঃ ১০৪ অঃ)

অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে পশুবধ করিয়া যে ব্যক্তি সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে, সেই অজ্ঞান মানব তৎপাপে পূয়োদ নরকে বাস করে। ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

যজ্ঞাদিতে বলিদ্বারা কেবল ঘাতকই দোষী হন এরূপ নহে, পরন্তু এতৎ সংশ্লিষ্ট অনেকেই তুল্য দোষী হইয়া থাকেন। বথা—

হন্তা কর্তা তথোৎসর্গকর্তা ধর্তা ভথৈব চ ।
 তুল্যা ভবন্তি সর্বৈ ভে ক্রবং নরকগামিনঃ ॥
 উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্তা ধর্তা চ বিক্রয়ী ।
 উৎসর্গকর্তা জীবানাং সর্বেষাং নরকং ভবেৎ ॥
 মধ্যস্থ্য বধায়াপি প্রাণিনাং ক্রয়-বিক্রয়ে ।
 তথা ব্রহ্মীশ্চ সূনয়াং কুন্তীপাকং ভবেদ্ ক্রবন্ ॥

(পদ্ম পুঃ ১০৪ অঃ)

অর্থাৎ—হন্তা (খড়গাঘাতকারী), কর্তা (যাহার পূজা), উৎসর্গকারী
 ব্রাহ্মণ ও পশুকে ধারণকারী—ইহারা সকলেই সমান পাপী ; এই
 পাপফলে নিশ্চিত তাহাদের সকলের নরকে গমন হইয়া থাকে ।
 জীববধের উপদেশদাতা, হন্তা, কর্তা, ধর্তা, বিক্রয়ী (বিক্রয়কারী) ও
 উৎসর্গকর্তা ব্রাহ্মণ—ইহারা সকলেই নরকে গমন করেন । বধের
 নির্মিত্ত প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় কালে যিনি মধ্যস্থ থাকেন, আর বধজন্য
 যূপকাষ্ঠে যোজিত পশুকে যিনি দর্শন করেন, তাহাদের কুন্তীপাক
 নামক নরকে নিশ্চয়ই গমন হইয়া থাকে ।

দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাক্সলাকর্ম্মণি ।

তশ্চৈব নরকে বাসো য় কুর্য্যাজ্জীবঘাতনম্ ॥ (পদ্মঃ ১০৪ অঃ)

দেবযজ্ঞে, পিতৃশ্রাদ্ধে এবং পুত্রানুপ্রাশন ও বিবাহাদি বিবিধ শুভকর্মে
 যে ব্যক্তি ছাগাদি পশুবধ করে, তাহার নরকেই বাস হইয়া থাকে ।

আরও দেখা যায়—

মদ্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষ্যেৎ সহবন্ধুভিঃ ।

তদগাত্রলোমসংখ্যাকৈরসিপত্রবনে বসেৎ ॥

আবয়োরনুদেবানাং নান্না চ পরকর্ম্মণি ।

যঃ সম্পোষ্য পশূন্ হত্বাং সোহিহুতামিহুতাপ্পুয়াৎ ॥

পশূন্ হত্বা তথা ত্বাং মাং যোহিহুতয়েন্যাংসশোণিতৈঃ ।

তাবৎ তন্নরকে বাসো যাবচ্ছদ্মদিবাকরৌ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদোক্তর খণ্ড ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ, আমার পূজার ভাগ করিয়া পশুবধপূর্বক যে ব্যক্তি বন্ধুগণসহ সেই
 মাংস ভোজন করে, সে এই পশুগাত্রের লোমসংখ্যা পরিমিত বৎসর পর্যন্ত অসিপত্র
 নামক নরকে বাস করে । তোমার, আমার বা অন্য দেবতার নাম করিয়া

পরবর্তী কার্যোদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পশুকে পোষণ করিয়া বধ করে, সে অন্ধতামিশ্র নরকে গমন করে । সেইরূপ পশুবধ করিয়া ঐ পশুর মাংস-শোণিত দ্বারা যে ব্যক্তি তোমার বা আমার অর্চনা করে, যতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে পূর্ব্বোক্ত অন্ধতামিশ্র নরকে বাস করে ।

পশুহত্যার আরও বিশেষ দোষ দেখা যায়—

‘যে হতাঃ পশবঃ লোকৈরিহ স্বার্থেবু কোবিদৈঃ ।

তে পরত্র তু তান্ হন্যস্তথা খড়্গেন শঙ্কর ॥

আত্মপুত্রকলত্রাদি-স্বসম্পত্তি-কুলেচ্ছয়া ।

যো দুরায়া পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়েৎ স তু ॥ (পাদ্ম ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি হইয়াও যাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতা-পূজায় যে-সকল পশুকে বধ করে, হে শঙ্কর ! পরলোকে সেই সকল পশুগণও খড়্গদ্বারা সেইরূপ তাহাদিগকে বধ করে । যে দুরায়া নিজের আত্মার মঙ্গলেচ্ছায় অথবা স্ত্রী, পুত্র, উত্তম সম্পত্তি ও বংশবৃদ্ধি কামনা করিয়া পশুবধ করে, সে ঐ পাপাচরণ জন্ত আত্মাদিকে নাশই করিয়া থাকে ।

শাস্ত্রবিধির প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া বংশপরম্পরায় বজ্রোত্তরী শাক্তগণ ঐ পশুবধরূপ অকার্য্যটী করিয়া আসিতেছেন ; তাহার ফলেই দুর্গোৎসব ও কালিকাপূজারত বহু রাজবংশ ও ভদ্রবংশ ‘রাজ্যং দেহি’, ‘ধনং দেহি’ ইত্যাকার পুনঃ পুনঃ বহু প্রার্থনা সত্ত্বেও দারিদ্র্যই লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে নির্ব্বংশও হইয়াছেন । শাক্তগণ ইহার কারণরূপে কালপ্রভাবকে উদ্দেশ্য করেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতাভিমানী শাক্তগণ তামস-রাজস পুরাণ-কথিত দুই-চারিটী প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক ‘বৈধ ত্রিংশয় দোষ নাই’ বলিয়া থাকেন । কিন্তু এই পদ্মপুরাণাদি সর্ব্বমান্ত্র গ্রন্থে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলিতেও তাহারা অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারিবেন কি ? আমরা বলি, তাহাদের ঐরূপ কার্য্যের অভ্যন্তরে জিহ্বার লোলুপতা ভিন্ন, প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । তাহাই উক্ত পুরাণে দেবী পুনরায় জানাইয়া দিতেছেন ।—

সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছু কঃ পুমান্ ।

কদাচিৎ প্রাণিণো হত্যাং ন কুর্যাৎ তত্ত্ববিৎ স্মধীঃ ॥

মানবো যঃ পরত্রেহ তত্ তু মিচ্ছেৎ সদাশিব ।

সর্ব্ববিষ্ময়ত্বেন ন কুর্যাৎ প্রাণিনাং বধম্ ॥

বধাদ্রক্ষতি যো মর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞধর্ম্মবিৎ ।

কিং পুণ্যং তস্য বক্ষ্যেহহং ব্রহ্মাণ্ডং স তু রক্ষতি ॥

যো রক্ষেন্ন যাতনাং শস্তো জীবমাত্রং দয়াপরঃ ।

কৃষ্ণপ্রিয়তমো নিত্যং সর্বরক্ষাং करोति सः ॥

একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং তেন রক্ষিতম্ ।

বধাৎ শকর বৈ যেন তস্মাদ্রক্ষেন্ন যাতয়েৎ ॥ (পান্ন, উঃ ১০৫ অঃ)

অর্থঃ—যথার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গাদি সুখলাভেচ্ছায় কি সম্পাদে, কি বিপদে কখনও প্রাণিবধ করিবে না! হে সদাশিব! যে মানব ইহকালে ও পরকালে পরিভ্রাণ পাইতে ইচ্ছা করে, সে সকল জগৎ বিষ্ণুর জানিয়া কখনও কোন প্রাণীকে বধ করিবে না। তত্ত্বজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ যে ব্যক্তি জীবগণকে বধ হইতে রক্ষা করে, আমি তাহার পুণ্যের কথা আর কি বলিব; সে ব্যক্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে রক্ষা করিয়া থাকে। হে শস্তো! যে মানব দয়াপরবশ হইয়া জীব-মাত্রকেই বধ হইতে রক্ষা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়তম হইয়া থাকেন এবং তিনি সর্ব রক্ষাকারী হন। অধিক কি বলিব, যিনি একটি মাত্র জীবকে বধ হইতে রক্ষা করেন, হে শকর! তাঁহাকে ত্রিলোকের রক্ষাকারী বলিয়া জানিবেন। সুতরাং সকলেই জীবরক্ষা করিবে, কখনও বধ করিবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, স্মৃতি-ব্যাকরণভীর্ষ

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৮১ পৃষ্ঠার পর)

বহুদিন পরে আমরা বন্ধুদ্বয়কে পুনরায় মিলিত হইতে দেখিতেছি। দেবেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া নরেন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ও তাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিল। পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে আলাপন আরম্ভ হইল।

নরেন্দ্র—ভাই দেবেন্দ্র, তোমাকে পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা তুমি বুঝিবে না। তুমি একজন ত্যাগী, আমি দেহধর্ম্মাশুরাগী কুটুম্বাসক্ত। আমাদের ভালবাসা তোমাকে পরাভূত করিতে পারে না, তাই তোমার পক্ষে এত সুদীর্ঘকাল দূরে অবস্থান করা সম্ভবপর। আমরা চাই, তুমিও আমাদের মধ্যেই থাকিয়া যাহা হয় কর। কিন্তু তোমার আত্মীয়তার গণ্ডী আর সঙ্কোচিত নহে, সুদূর-প্রসারী; তাই আমাদের ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করিতে পার না। প্রতিদিনই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকি ও তোমার অমৃতময়ী বাণীগুলি

স্বরণ করি। মনে কত প্রকার তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। তুমি আসিলে তাহার মীমাংসা করিয়া লইব—স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

দেবেন্দ্র—ভাই, তোমাদের ভালবাসার জন্ত আমি তোমাদের নিকট চির-
ঋণী; এবং সেই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় ভগবদ্ভক্তি—ইহা জানিয়াই
ভক্তিত্যাগের অনুকূল ত্যাগীর আশ্রম স্বীকার করিয়াছি। “দেববিভূতাপ্তনৃণাম্”
—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির বিচারই পরম-মত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি।
ভাই ‘পরিত্যক্ত্য কৰ্ত্তম্’ অথবা শ্রীগীতার ‘সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য’ এই বাক্যকে
উল্লেখন করিতে পারি না। মঙ্গলময় ভগবান্ সকলেরই মঙ্গল করেন। তিনি
কৃষ্ণ, সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু দুর্দৈবগ্রস্ত জীব তাঁহার আকর্ষণ বা
কৃপা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইতেছে। তজ্জন্ত তাঁহার শ্রীচরণে ইহাই প্রার্থনা
যে তাঁহার কৃপায় জীবের এই দুর্দৈব বিদূরিত হউক।

নরেন্দ্র—ভাই, তুমি আমার বন্ধু, সে বিশ্বাস যদি আমার থাকে, তাহা
হইলে আমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রশ্ন হইতেছে
যে, মন্দিরে চোখ বুঁজিয়া না বসিয়া যদি দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, দুঃস্থ, গৃহহীন প্রভৃতি
মন্ত্ৰশ্রুকে অন্ন-বস্ত্র-ঔষধপথ্যাদি প্রদান করা হয়, তবে তাহা ভগবৎ-সেবা হয়
কিনা? আমার মতে দরিদ্র নারায়ণের সেবাই শ্রেষ্ঠ। মন্দির-নিৰ্ম্মাণ
অপেক্ষা হাঁসপাতাল খুলিলে শ্রেষ্ঠ সেবা হইবে।

দেবেন্দ্র—ভাই, তোমার এই বিচারের উত্তর বিশদভাবে না হইলেও পূর্বে
সামান্যভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি তাহা ধরিয়া উঠতে পার নাই; যাহা
হউক, অণু বিশদভাবে সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি;—তুমি নিরপেক্ষ
হইলে তাহা ধরিতে পারিবে। আমার মনে হয়,—কোন প্রাকৃত কবির রচিত
ছড়াকে তুমি ব্যাসদেব প্রভৃতি শাস্ত্রকার ও ভগবদবতারের বাক্য হইতেও শ্রেষ্ঠ
সম্মান দিয়াছ। ইহা তোমার দুর্দৈব বলিয়াই বুঝিতেছি। শ্রীভগবন্মন্দিরে
শ্রীবিগ্রহের সেবা যে কি বস্তু, তাহা যাহার উপলব্ধি হয় নাই সেই ব্যক্তিই এই
প্রকার অপরাধময় বিচার প্রকাশ ও প্রচার করে। যাহাদের হৃদয় রজস্তম্ভে
গুণে সমাচ্ছন্ন, সত্ত্বগুণের সান্নিধ্য মাত্রও লাভ করে নাই, সেই সকল হেয় কন্মি-
গণই ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক
ভোগবাদ বা অসত্ত্ব্যকে ভগবদ্ভক্তির আবরণে চালাইতে চেষ্টা করে। তোমার
যে চিন্তাস্রোত, সেটী সোজাসুজি সমষ্টিগত সমাজের আশু ইন্দ্রিয়-তর্পণ। সমাজ
উপেক্ষণীয় নহে, তাহার রক্ষা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সেই সমাজ সংরক্ষণের

তাৎপর্য্য বিষয়ে প্রকৃত অভিজ্ঞ না হইলে, মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে সমাজ প্রস্তুত করিতে গেলে ঐহিক অস্থায়ী সুখই তাহার লক্ষ্য হয়। তদ্বারা পরাশান্তি বা ভগবদ্ভক্তি লভ্য হয় না। অস্বদেশীয় ঋষিগণ যেভাবে সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার ফল পরাশান্তি। তাঁহারা ঐহিক সুখের জন্য সমাজ ব্যবস্থা করেন নাই। পরন্তু ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়ক বা অনুকূল করিয়াই সমাজ নির্মাণ ও রক্ষণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু সেই ভগবদ্ভক্তিকে নাশ করিয়া তৎপরিবর্তে ঐহিক যে সুখ-চেষ্টা, তাহা কখনই জীবের মঙ্গলময় বা শান্তিময় হয় না। কারণ ভগবদ্ভক্তি বাস্তব ইন্দ্রিয়লৌকিক বা পারলৌকিক সমস্ত বস্তুই নশ্বর ও অমঙ্গলজনক। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ—একরূপ নহে। পরন্তু গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করত শরীর রক্ষা করিতে হইবে এবং সেই শরীর দ্বারা ভগবৎ-সেবা করাই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের তাৎপর্য্য। তুমি হয়ত বলিবে, অগ্রে শরীর রক্ষা না হইলে কিরূপে ভগবৎ-সেবা হইতে পারে? তজ্জন্তু অন্ন-বস্ত্রাভাবগ্রস্ত বর্তমান ভারতে অগ্রে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই একান্ত কর্তব্য, ভগবৎ-সেবা এখন বন্ধ রাখা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—স্বামী-স্ত্রী পতিসেবা করেন। অন্ন-বস্ত্র যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের একজনের উপযুক্ত। এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য? পত্নী কি বলিবেন—আমি আপনার সেবা করি; সেহেতু অগ্রে আমার আহার বিহারাদিই প্রয়োজন; সমস্ত আহাৰ্য্য আমিই গ্রহণ করিব—এখন আপনি উপবাসী থাকুন। না নিজে উপবাসী থাকিয়া স্বামীকে সমস্ত আহাৰ্য্য প্রদান করিতে মনস্ত করিবেন? ভাই, সেবা বস্তুটী এতই মহৎ ও মধুর যে তাহা জাগতিক কোন অভাবের দ্বারা ব্যাহত হয় না। সেবা—আত্মার বৃত্তি। সেই বৃত্তির উন্মেষ-ক্রমেই সেবা-সামর্থ্য প্রকাশিত হয়। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরও সেবা বিষয়ে পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গীঃ ৯।২৬)

সুতরাং, যাহার গৃহে কোন উপকরণ নাই, তিনি একটি তুলসী-পত্র এবং একগুণ জলদ্বারাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন। দরিদ্রতার জন্য ভক্তিযাজন ব্যাহত হয় না।

ভগবান্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সেবা বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্তে মনুষ্য-দেহের ইন্দ্রিয়-

তর্পণ করাটী তজ্জন্তু চরম নাস্তিকতা। ভগবান্ এবং ঋষিগণ দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে বিধি দিয়াছেন। 'দরিদ্রান্ ভর কোন্তেয়'—বাক্য প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কেননা, এইরূপ কার্যাদির দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ উদারতা লাভ করিবে। কিন্তু শাস্ত্রে কোথায়ও একথা বলেন নাই যে, ভগবানের সেবা ও দরিদ্রের-সেবা একই। ভগবান্ বস্তুটী অখোক্ষজ—অপ্রাকৃত তত্ত্ব, আর দরিদ্র—জড় মাষার গুণজাত বস্তু; সুতরাং তাহাকে এক করা অতীব মূঢ়তা। ভগবান্ মায়াধীশ, আর দরিদ্র মায়াবদ্ধ রজস্তমো গুণের প্রকাশ; সুতরাং কি বিচারে উভয়কে এক করা যায়? নারায়ণ—লক্ষ্মীপতি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ধন-সম্পদের মালিক, তাঁহার কখনও অন-বস্তুতাব নাই, কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্তা; তাঁহার পক্ষে দরিদ্রতা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি দরিদ্র নহেন এবং দরিদ্রও কখনও নারায়ণ নহে; সুতরাং দরিদ্র-নারায়ণ একথাটী অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক, 'সোনার পাথর বাটী'র ত্রায় বাক্য-বিশেষ।

নরেন্দ্র—তুমি কি বলিতে চাহ, মানুষের মধ্যে ভগবান্ নাই? যদি মানুষের মধ্যে ভগবান্ থাকেন, তবে মানুষের সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা কেন হইবে না?

দেবেন্দ্র—ভাই, একথা আমি পূর্বে একদিন কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক তাহার কিছু পুনরালোচনা করিতেছি, শ্রবণ কর। মানুষের মধ্যে ভগবান্ আছেন সত্য, কিন্তু মানুষের দেহ বা মন ভগবান্ নহেন। দেহ বা মন জড় বস্তু। জড় বস্তুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা পূর্ণ-চেতন ভগবানের সেবা হইতে পারে না। তুমি কেবল দরিদ্রকে নারায়ণ বলিয়া সেবা করিতেছ; কিন্তু ধনীকে নারায়ণ বলিয়া ধনী-নারায়ণের সেবা কর না কেন? ভগবান্ যে কেবল মনুষ্য দেহেই অবস্থান করেন, এমন নহে। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৎস্য, ছাগ, কুকুট প্রভৃতি সমস্ত দেহেই তাঁহার অধিষ্ঠান আছে। তজ্জন্তু মাছ, ছাগল, মুরগী প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিয়া কেবল দরিদ্রকে ২১ দিন খিচুড়ী খাওয়াইলেই কি নারায়ণ-সেবা হইবে? ভাই, তোমার 'দরিদ্র-নারায়ণের' জন্তু প্রাণ আকুল, কিন্তু পাঁঠা-নারায়ণ, মোরগ-নারায়ণ, মৎস্য-নারায়ণের প্রতি তুমি এত অকরণ, কেন বল দেখি? তাহাদের প্রাণনাশেও তোমার হাত কাঁপে না। আর তোমার দরিদ্রকে যদি নারায়ণ জ্ঞানই থাকে, তবে নিজে উত্তম গৃহ-মধ্যে উত্তম আসনে বসিয়া চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেছ, পেয় ভোগ কর, আর দরিদ্র-নারায়ণের বেলায় খিচুড়ী ও কুমড়ার ঘ্যাট রাস্তায় বসাইয়া খাওয়াও কি বিচারে? ধন্য তোমার দরিদ্র-

নারায়ণে ভক্তি ! হায় ! হায় ! কাল কলি ; তাই তোমারই জয়ডঙ্কা বাজিতেছে ।
তুমি হাঁসপাতাল খুলিয়া সেবার বহর দেখাইতে চাহ, কিন্তু আমি দেখি—আমাদের
কংগ্রেস তোমা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক ও সুন্দর হাঁসপাতাল ও স্কুল স্থাপন
করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন । আমি তোমা অপেক্ষা কংগ্রেসকেই শ্রেষ্ঠ সাধু
বলিব । ভাই, এইসব কাপট্যের কি প্রয়োজন ? নিজ দুর্কৃতি জন্ত জীব দরিদ্র
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কষ্ট পায় । তাহার দুঃখে তাহাকে সাহায্য করা পুণ্যজনক
কর্ম ; কিন্তু তাহাকে ভগবান্ সাজাইলে অনন্ত অপরাধ হইবে ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, তোমরাও ত সমস্ত বস্তুতে ভগবদর্শন কর । অকুর
সর্বত্রই ভগবদ্ দর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর দৃষ্টিতে দেখিতে পাই—

স্থাবর-দ্রব্য দেখে, নী দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফুটি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮২।৩)

আরও মহাভাগবতের দর্শন সম্বন্ধে দেখা যায় —

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেত্তগবদ্ভাবমাশ্রয়ঃ ।

ভূতানি তগবত্যাত্মন্যেব ভাগবতোক্তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

দেবেন্দ্র—বৈষ্ণবগণ সমস্ত বস্তুতে ভগবদর্শন করেন; ইহার অর্থ সমস্ত বস্তুই
ভগবান্—তাহা নহে । তাঁহারা সমস্ত বস্তুতে নিজ উপাস্ত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর
সম্বন্ধ দর্শন করেন । সমস্ত বস্তুই তাঁহার আরাধ্য বস্তুর সেবার উপকরণ দর্শন
করিয়া তাহার প্রতি নিজ ভোগবুদ্ধি পরিহার করেন এবং তত্তদ্বস্ত্ব দ্বারা
আরাধ্যের সেবা করেন । মহাভাগবত দর্শন করেন—সমস্ত বস্তুতে তাঁহার
আরাধ্যের অধিষ্ঠান রহিয়াছে এবং তাঁহার আরাধ্য হইতে কোন বস্তুই স্বতন্ত্র
নহে । প্রহ্লাদ মহারাজ স্তম্ভের মধ্যে স্বীয় আরাধ্যের দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু
তিনি স্তম্ভকে কখনও স্বীয় আরাধ্য শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই ।
তিনি নৃসিংহদেবের সেবা করিতে গিয়া স্তম্ভকেই সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ।
কিন্তু হিরণ্যকশিপু সেইরূপ দর্শন লাভ করে নাই বলিয়া স্তম্ভকে আঘাত করিয়া
নৃসিংহদেবকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু স্তম্ভই নৃসিংহদেব নহেন
বলিয়া স্তম্ভের ধ্বংসে নৃসিংহদেবের ধ্বংস সাধিত হয় নাই । যে রূপ স্তম্ভের
ধ্বংসে নৃসিংহদেবের ধ্বংস সাধন হয় নাই, তদ্রূপ স্তম্ভের সেবার নৃসিংহদেবের
সেবাও হয় না । সোজা কথায় আধার ও আধেয় এক নহে । ঘটীর মধ্যে
জল আছে বলিলে ঘটী ও জল একই—বিচার করা কখনই ঠিক নহে । সেইরূপ
সমস্ত বস্তুতে ভগবান্ আছেন বলিলে সমস্ত বস্তুই ভগবান্ নহেন । বস্তু আধার-
স্বরূপ এবং ভগবান্ আধেয়—ইহারা কখনও এক নহে ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা, যদি মনুষ্যের সেবায় ভগবানের সেবা না হয়, তবে তোমরা কেন বৈষ্ণবের উত্তম উত্তম আহার্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা কর ?

দেবেন্দ্র—আমরা বৈষ্ণবের সেবা করি সত্য। কিন্তু বৈষ্ণবকে আমরা বিষ্ণুকোটি মধ্যে গণনা করি না ; বৈষ্ণব বিষয়জাতীয় ভোক্তা বা ভগবান্—এরূপ বিচার পোষণ করি না। তবে বৈষ্ণব ভগবানের বা বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন যে, আমার সেবায় আমি যত সন্তুষ্ট হই, আমার ভক্তের সেবায় তদপেক্ষা আমার অধিক সন্তোষ বিহিত হইয়া থাকে। বদ্ধজীব বৈষ্ণবের সেবা করেন, সে ত দূরের কথা ভগবান্ নিজেই বৈষ্ণবের সেবা করিয়া আনন্দিত হন। ভক্ত তাঁহার এত প্রিয় যে, তিনি তাঁহার ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্যণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৫)

অর্থাৎ—হে উদ্ধব ! ব্রহ্মা, সঙ্কর্যণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নহি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।

ভগবান্ নিজেই তাঁহার ভক্তের পূজা তাঁহার নিজ পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—“মদ্বক্তৃপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ” ॥ (ভাঃ ১১।১৯।২১)

শিব পার্বতীর প্রতিও এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণারাদনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি ! তদায়ানাং সমর্চনম্ ॥ (পদ্মপুরাণ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ

তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ॥ (ভাঃ ৫।৫।২)

ভাই, এইজন্য মহদুপগতির অর্থাৎ সাধু-বৈষ্ণবগণের সেবাই সকলের কর্তব্য। তদ্বারা বিমুক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়। আর শ্রীসঙ্গীর সহিত (ভোজনাদি) সঙ্গক্রমে তমোদ্বার (নরক) লাভ ঘটে। সুতরাং পাপাত্মা ব্যক্তিকে আহার্যাদি দান ও সাধু-বৈষ্ণবদিগের সেবাকে সমুত্তম করা অতীব মূঢ়তা—নাস্তিকতার চরম এবং ঘোরতর অপরাধজনক। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগুশ্রামী শ্রীমদ্বক্তৃবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

মায়াবাদের স্বরূপ

শ্রীভগবানের ক্রোধ হইতে মায়াবাদের জন্ম। স্বীয় ধামে ভগবান্ চিন্তা করিলেন—আমার অভক্ত, বহির্নৃত্য, ভক্তদেবী, পাষণ্ডীগণকে কিরূপে মোহন করা যায়, তাহারা ত' আমার সেবা করিবে না, পরন্তু আমার ভক্তগণকে নানা প্রকার ক্লেশ ও নির্যাতন করিয়া থাকে। এজন্য তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীশঙ্করকে আদেশ দিলেন,—তুমি অবিলম্বে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া,—মোহন-শাস্ত্র প্রণয়ন করত অসুরগণকে একরূপ বিমোহিত কর, যেন কোন কালেই তাহারা আমার সন্ধান না পায়। শ্রীভগবানের একরূপ আদেশ পাইয়া ভক্তপ্রবর শ্রীমহাদেব অমুমান ৮ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে কেরল দেশের অন্তর্গত চিদম্বর নামক গ্রামে বিশিষ্টা নারী জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু। শিবগুরুর পুত্রই জগদ্ বিখ্যাত শ্রীশঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার কি অপূর্ব মেধা-শক্তি! নবম বর্ষ (?) বয়সেই তিনি সমস্ত বেদ, বেদান্ত,—উপনিষদাদি শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেবল উপনিষদ্ মন্থন করিয়া শারীরিক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে ভগবদ্-ভক্তির কোন গন্ধ নাই। তিনি নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’—এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি,—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—নাই; ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা নাই; সেব্য, সেবক ও সেবা নাই; দ্বিতীয় না থাকায়,—ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবার কোন কামনা নাই।

শ্রীকৈলাস ধামে শ্রীশঙ্করদেব পার্বতী দেবীকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা ॥

(পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২৫অ, ৭ম শ্লোক)

মহাদেব কহিলেন, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র বিধান করিব। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলিতেন,—

মায়াবাদী জন, . . . ক্রোধেত্তর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষণব।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

ভক্তির স্বরূপ—বিষয় আশ্রয়।

মায়াবাদী অনিত্য বলি' যে কয় ॥

ভক্তির 'বিষয়',—অদ্বিতীয় ভোক্তা, স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং 'আশ্রয়'-জাতীয়-বিগ্রহ—শ্রীবৃষভানুন্দিনী শ্রীমতী রাধারানী—এই যুগল-মূর্তিকে মায়াবাদী মায়িক শরীর বিশিষ্ট অনিত্য বিনশ্বর বলিয়া ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদের শরীর মায়ানির্মিত নয়—শুদ্ধ চিন্ময়, চেতন অর্থাৎ মায়িক জড় শরীর ইহাদের নাই। শঙ্কর পন্থীরা ইহা স্বীকার করেন না; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মায়াবাদী বলে। অক্ষর্জ জ্ঞানে জড়ীয় চক্ষু-চক্ষু দ্বারা কেহ কখনও ভগবানকে দেখিতে পান না। সদগুরুর কৃপায় জীবের দিব্যচক্ষুতে চিন্ময় বিগ্রহ দৃষ্ট হন। প্রেমরূপ অঙ্গন এবং ভাক্তযুক্ত চক্ষুতেই ভগবদ্ দর্শন লাভ হয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজস্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ইহারা দুইজনেই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু ইহাদের অদ্বৈতবাদ ভক্তির বিরোধী নয়। এজন্ত তত্ত্ববিদগণ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচার ও অদ্বৈতবাদকে কেবলাদ্বৈতবাদ এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং রামানুজস্বামীর প্রচারিত অদ্বৈতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকেন। ইহাদের প্রভেদ এই যে,—ইহাদের অদ্বৈতবাদে সেব্য, সেবক এবং সেবার কথা আছে বলিয়া ভক্তির বিরোধী নয়, পরন্তু খুবই অনুকূল হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন,—‘সোহং’ আমিই সেই ব্রহ্ম। আমিই বৃহৎ অর্থাৎ ভগবান্! আমি কেন ছোট দাস, সেবক হইতে যাইব? যেখানে শুধু একের বিচার, সেখানে সেব্য, সেবক ও সেবা নাই—ভক্তি নাই। সুতরাং মায়াবাদ ভক্তিবিরোধী। শ্রীরামানুজ বলেন,—একের মধ্যেই স্বগত স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদের কথা আছে; তাহাতে ‘অদ্বৈত’ নষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণে বলিবে—ইহাও অতি বিরুদ্ধ কথা, একের ভেদ হইলে ত দ্বৈতবাদ হইল—অদ্বৈত থাকিল না। এই জটিল তত্ত্বটী মায়াবদ্ধ জীবের সক্ষীর্ণ বুদ্ধিতে প্রবেশ যোগ্য নহে।

এখন স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের বিষয়ে আলোচনা হউক; শ্রীরামানুজ স্বামীর ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈত মত। দৃষ্টান্ত যথা—

একটি মনুষ্য বলিলে মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত সবটী লইয়া একটি মানুষ; কিন্তু সে এক হইলেও তাহার স্বগত ভেদ আছে; যথা—তাহার চক্ষু আছে, কণ ও আছে। চক্ষু কিছু কণ নহে, চক্ষু ও কণের ভেদ আছে। একরূপ নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ ও উদরের ভেদ সত্ত্বেও তাহার (মনুষ্যের) একত্বের হানি হয় না। সে চক্ষু দিয়া দেখিতে পায়, কিছু কণ দিয়া দেখিতে পায় না। এখানে স্বগত ভেদ দেখানহইল। এখন স্বজাতীয় ভেদের কথা আলোচনা হউক। একটি

মনুষ্যের সহিত অন্য একটা মনুষ্যের ভেদ বর্তমান আছে, একের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সহিত অন্যের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার তফাৎ আছে। বিজাতীয় ভেদ, যথা—মনুষ্যের সহিত বৃক্ষ, প্রস্তরের ভেদ বর্তমান। সেই প্রকার শ্রীভগবান্ এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও অপর তত্ত্ব হইয়াও—তাঁহার মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির ভেদ বিদ্যমান আছে। অন্তরঙ্গা শক্তি কিছু বহিরঙ্গা নহে, বহিরঙ্গা কিছু তটস্থা শক্তি নহে। শ্রীভগবান্ বিভূ-চৈতন্য, আর জীব তাঁহারই অংশ তটস্থা-শক্তি জাত অণুচৈতন্য। অণু-চৈতন্য জীব—দাস, আর বিভূ-চৈতন্য ভগবান্ তাহার প্রভু। দাসের কর্তব্য—প্রভুর সর্বৈচ্ছিতদ্বারা সেবা করা। এই সেব্য, সেবক এবং সেবা সম্বন্ধই ভক্তি। মায়াবাদীর অদ্বৈতবাদে এই সেব্য, সেবক এবং সেবা নাই অর্থাৎ ভক্তির গন্ধ মাত্রও নাই।

মায়াবাদী প্রথমে মনস্থির করিবার জন্য গুরু, বিগ্রহ, ঠাকুর ইত্যাদি তাহাদের মনোমত তৈয়ার করিয়া লয়। এবং লোক সংগ্রহের জন্য তাহার স্তব-স্তুতিও করিয়া থাকে; কিন্তু ভক্তির স্বরূপ যে ‘বিষয়-আশ্রয়’-বিচার, তাহা মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া স্থির করে অর্থাৎ সিদ্ধিতে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ষিহু তার কৃষ্ণ-সেবা, শ্রবণ ও কীর্তন।

ইহাতে কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধ হানা হইল—ইহা প্রকৃত স্তব নহে। মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে শ্রীবিগ্রহকে ভাঙ্গিয়া জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। কেবল এক-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান—‘সোহং’ এই তাহাদের বুলি, তাহারা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী। উহাদের কথা শুনিতে তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণব-সঙ্গ করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। মায়াবাদী নিজেকে মুক্ত অভিমান করিলেও বস্তুতঃ সে বদ্ধ ভূমিকাতেই থাকে। একটা ইঁদুর পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়াছে, সে নিজের চেষ্টায় মুক্ত হইতে পারে না। সে খাঁচার বাহিরে লেজ কিম্বা মুখ বাহির করিয়া মুক্ত মনে করিলেও সে প্রকৃত বদ্ধই থাকে। যাহার খাঁচা তিনি যদি মুক্ত করিয়া দেন তবেই সে মুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব যদি দয়া করিয়া বদ্ধ জীবকে মায়ার পিঞ্জর হইতে ছাড় করিয়া দেন, তবেই সে মুক্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। এই সম্পর্কে একটা গল্প আছে—

একটা মায়াবাদী, সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের উপদ্রবে জ্বালাতন হইয়া—দূর ছাই, এ মায়ার সংসারে আর থাকিব না বলিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পড়িয়া, হিমালয় পর্বতের এক নিভৃত গুহায় বসিয়া ব্রহ্ম-ধ্যান জুড়িয়া দিল। তাহার জুদয় কান্তি, তাহাতে আবার মস্তকের চুলগুলি ক্রমশঃ

জটার পরিণত হইয়া এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহার একখানি গীতা-পুস্তক সঙ্গে থাকিত। সাধু যেখানে তপস্যা করিতেন সেই গহবরে একটি লেংটা ইন্দুর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এই গর্ত হইতে উঠিয়া—রাত্রিকালে, সাধুর জটার অধিকাংশই কর্তন করিয়া ফেলিল, গীতারও অনেকটা পাতা ধ্বংস করিল। সাধুর এই জটা এবং গীতা বইখানাতে আসক্তি থাকায় এবং তাহা ইন্দুর নষ্ট করিয়া দেওয়ার সাধুর ক্রোধের আবির্ভাব হইল। শ্রীগীতার লিখিত আছে, ভোগের বিষয়-সমূহ ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে জীবের আসক্তি জন্মে, সেই ভোগে বাঁধা পাইলেই, ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে সাধুর ক্রোধের উদয় হওয়ায়, ইন্দুরকে জব্দ করিবার জন্য একটি বিড়াল পুষিতে আরম্ভ করিলেন। বিড়ালের ছন্ধের জন্য গ্রামে কিছু কিছু ভিক্ষা করিতেন, তাহাতে ক্লেণ হওয়ায় একটি গোয়ালিনী ঠিক করিলেন—সে কিছু ছন্ধের যোগান দিত। কালক্রমে সাধুর এই স্ত্রীলোকটির প্রতি আসক্তি হওয়ায় ক্রমে ক্রমে তাহার কিছু সম্ভান-সম্মতি জন্মগ্রহণ করিল। এক দিবস এই সাধুর গুরু আসিয়া এই সমস্ত দেখিয়া কহিল,—‘বাবা! এইসব কাহার?’ শিষ্য সাধুটী করজোড়ে বলিলেন—‘গুরুদেব! এ-সব গীতার সংসার।’ সাধুর গুরুদেব একটু হাস্ত করিয়া ‘ওহো! একি বিষ্ণুমায়া’ বলিয়া অতৃত্র চলিয়া গেলেন।

আর দুইটি মায়াবাদী সাধু, শ্রীবদরীকাশ্রমে শ্রীনারায়ণ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। সেই উন্নত মস্তক পর্বতোপরি আরোহণ করিতে হইলে, চড়াই উত্তরাই করিতে হয়। একবার কিছু পর্বতের উচুতে উঠিতে হয়—একবার কিছু নামিতে হয়। সাধুদের আর কিছু না থাকুক, একটি লোটা আর একটি কন্ডল—এই দুইটি সম্বল থাকিবেই। এই দুই মায়াবাদী সাধুর মধ্যে একটি সাধুর লোটা-কন্ডল আছে, আর একটি সাধুর মাত্র লোটা আছে—কন্ডল নাই। যে-সাধুর কন্ডল নাই, তাহার শুধু কন্ডলের চিন্তা কিসে একটি কন্ডল পাই। উত্তরাথণ্ডে অত্যন্ত শীত, বরফে পর্বত আচ্ছাদিত থাকে; পাহাড়ের উপর উঠিতে শীতে সর্বদা কাঁপিতে থাকে। পাহাড়ের চতুর্দিকে বরফ গলিয়া অল্প অল্প জলস্রোত-মিশিয়া একটি নদীর আকারে পরিণত হইয়াছে। একটি সাধু পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছে, আর একটি সাধু কিছু নিরে আছে। যে সাধুটির কন্ডল নাই, সে দেখিতে পাইল, নদীর স্রোতে একটি কাল কন্ডল ভাসিয়া বাইতেছে; তাহা দেখিয়া সাধুর আর আনন্দের সীমা নাই—‘বাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী’। যে যেমন চিন্তা করে, সে তাহাই পাইয়া থাকে। জয় ভগবান্ বলিয়া সাধুটী কন্ডল লইবার জন্য

যেমন নদীতে লক্ষ্য দিয়া কঙ্কলটী ধরিয়াছেন, অমনি কঙ্কলরূপী ভল্লুকটী তাঁহাকে
 ছড়াইয়া ধরিল। ওটি কঙ্কল নয়, একটি ভল্লুক জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।
 উপরের সাধুটী দেখিল—বিষম বিপদ!—সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—
 ‘ভাইয়া কঙ্কল ছোড়্ দেও।’ জলের মধ্যস্থিত সাধু বলিতে লাগিল—‘আরে
 ভাইয়া! হাম্ ত ছোড়্ দিয়া, লেকিন্ কঙ্কলী ত হাম্কে ছোড়্ তা নেই।’
 (অর্থাৎ আমি ত কঙ্কল ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কঙ্কল আমাকে ছাড়িতেছে না।)
 সেই প্রকার আমি জোড় করিয়া মায়া ত্যাগ করিলে কি হইবে?—মায়া ত
 আমাকে ছাড়িতেছে না।—পূর্বোক্ত মায়াবাদী জোড় করিয়া সংসার ত্যাগ
 করিয়া আসিয়া মনে করিল, আমি মায়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু মায়া ত
 তাহাকে ছাড়ে নাই। তুমি গৃহেই থাক, আর জঙ্গলেই যাও, শ্রীহরি-গুরু-
 বৈষ্ণবে শরণাগতি ভিন্ন মায়া ছাড়াইবার আর অণু কোনও উপায় নাই।

মাযারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।

সাধু-গুরু কৃপা বিনা নাহিক উপায় ॥ (চৈঃ চরিতামৃত)

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
 শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দীনের আবেদন

(১)

আসিয়ছি আজি অকপট মনে তোমার চরণে জানাতে বেদনা।
 আজিকার মত এহেন সুযোগ লক্ষ জনমে হয় ত পাব না ॥
 কি মোহ মদিরা পানে হ’য়ে ভোর, ভাবিনি কে আমি? কি মোর কাজ।
 কোটা জন্ম বয়ে গেছে মম তাই ত চিন্তা এসেছে আজ ॥
 পাপ-প্রলোভন চিত্তে জাগিয়া কঙ্কু আবর্তে ফেলিল টানি।
 পড়িয়া সুদৃঢ় বাসনার জালে আপনার দোষে মজিনু আপনি ॥

(২)

কত না দণ্ড করিতেছি ভোগ, পিশাচী মায়ার কবলে পড়িয়া।
 নরকে ডুবিয়া মরতে ভ্রমিয়া স্বরগের পুষ্প-শ্রন্দনে চড়িয়া ॥
 জন্ম, মরণ, জ্বর-রোগ-শোক দিতেছে আমারে কতই যাতনা।
 তবুও বিষয়-বিষ-পানরত তবুও যায়না ভোগের বাসনা ॥

জানি না কোথায় যুগ যুগ ধরি চলেছি কি আশে আপনা পাশরি ।
অরণ্য ভীষণ স্থাপদ গর্জনে গভীর আঁধারে তরাসেতে মরি ॥

(৩)

কেগো তুমি ওই জ্যোতির্ময় প্রভু বন্ধু বিহীন সংসার কাননে ।
কি মন্ত্র শুনালে জ্বলিল আলোক আঁধারে পতিত হতাতনের প্রাণে ॥
নিবিড় তামস পলকে নাশিয়া ভয়ে ভীত জনে করিলে নির্ভয় ।
(তাই) তোমার মহিমা মধুর বাক্যে গাহে বনে বন-বিহগ নিরয় ॥
বরষে বরষে পরিক্রমা করি' ভক্তি রস-স্রোতে মানবে ভাসালে ॥
কত দুঃখী তাপী তোমার চরণ পূজিছে হরষে ভক্তি-শতদলে ॥

(৪)

শুনিতে তোমার শ্রীমুখের বাণী হৃদয়ের সব দুয়ার খুলিয়া ।
বিশ্ব ছুটিছে আকুল পরাণে ফেলিয়া সংসার ব্যগ্র হইয়া ॥
অভাগা আমার করমের ফল বিষম বিপথে ফেলিল টানি ।
বাঁধিয়া রাখিল দৃঢ় মায়া-পাশে শুনিতে দিল না তোমার বাণী ॥
তবু বাসনার নাহিক শেষ মনটি আমার সেজেছে কর্তা ।
সমূহ বিশ্ব ভোগিবারে চার রক্ত মাংসের হয়েছে ভর্তা ॥

(৫)

আমি হরিবিশ্বস্থ হায়! তাই মায়া দেবী মোরে নদীতে ফেলিয়া ।
কত যে বাতনা কেমনে বর্ণিব ডুবায় উঠায় মারিয়া মারিয়া ॥
পেয়ে নানাবিধ দুঃখ দেবীধামে হ'ল নাক তবু সুবুদ্ধি উদয় ।
এমনি করিয়া মায়া পিষাচিনী করিয়াছে হায় আমারে জয় ॥
এ জগতে যত পতিত পামর তব কৃপাবলে হইল অমর ।
জগতের দুঃখ নাশিবার লাগি' এই প্রপঞ্চেতে উদয় তোমার ॥

(৬)

দয়াময় তুমি আদি যে পামর আমার সমান কেহ নাহি আর ।
তুমি বিনা আর কে করিবে দয়া (আমি) ঘৃণিত পতিত-পশু-দুরাচার ॥
পূর্ব সঞ্চিত পাপরাশি যত পলে পলে মোরে টানিতেছে পিছে ।
শত অপরাধী, 'নাম' নাহি হয় আত্মসমর্পণ সবই মোর মিছে ॥

(হরি) গুরু-পদে যেন ভক্তি থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর এ দীন পামরে।
(যেন) বৈষ্ণবের পদরেণু শিরে ধরি' ভজনের পথে চলি, ধীরে ধীরে ॥

(৭)

বৈষ্ণব-জন-শিরোমণি তুমি কোটা কোটা নতি তোনারি পদে।
নাহি কিছু মোর পূজার সম্ভার ভরা হৃদি, সদা লোভ মোহ মদে ॥

(৮)

কাল কলুষিত হৃদয় আমার সদা পাপাণ্ডনে জলিয়া যায়।
ভরসা মাত্র করুণা তোমার নতুবা আমার নাহিক উপায় ॥

ভবদায়ক রূপপ্রার্থী - শ্রীহরিদাস রায়, নারায়ণ (মেদিনীপুর)

গৌড়ীয়ার বিজয়া দশমী

আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথি গৌড়ীয়গণের পরম আদরের। কারণ
ব্রহ্ম-মাক্ষ-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দর্শন-মূল আচার্য্য শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞমুনি
গৌড়ীয়ের ভাগ্যাকাশে সমুদিত হইয়া, সুসিদ্ধান্তালোকে জগদ্ উদ্ভাসিত করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার অন্য নাম গৌড়পূর্ণানন্দ। এইজন্য মাক্ষগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব।
অধেবর শুভবিজয়-হেতুই বিজয়া দশমী। ইহা ছাড়াও এই তিথিকে
আশ্রয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র, বিষ্ণুশক্তিতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ অসুরশ্রেষ্ঠ রাবণের
ধ্বংস সাধনোদ্দেশে শমীবৃক্ষের তল হইতে লঙ্কাভিমুখে বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে
শুভবিজয় করিয়াছিলেন বলিয়াও এই তিথির নাম বিজয়া দশমী। সুতরাং এই
তিথি বৈষ্ণব মাত্রেই আদরণীয়। ইহা ব্যতীত প্রাকৃত স্মার্তগণের মুখেও
একপ্রকার আখ্যায়িকা শুনা যায় যে, যে-দিবস জগজ্জীবগণ অঘটন-ঘটনপটীরসী
বিমুখ-মোহিনী মহামায়া-দুর্গাদেবীর বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে
নানাপ্রকার আনন্দের আবাহন করিয়া থাকেন, সেই দিনই বিষ্ণুশক্তি সীতা-
দেবীতে ভোগবুদ্ধিকারী রাবণকে বিনাশ করিবার পর, রামভক্তগণ অসুরকুলের
উপর ভক্তকুলের বিজয়-ব্যঞ্জক উৎসব করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা ভক্তের
বিজয়, ভক্তির বিজয় ও ভগবানের বিজয়।

বৈষ্ণবস্বতি শ্রীহরিভক্তিবিনাস, আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী তিথিকে বৈষ্ণবগণের
অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—

আশ্বিনশ্রু সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ ।

কর্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সাদ্ধং সর্বত্র বিজয়াধিনা ॥ (বিঃ ১৫।২৭৪)

অর্থাৎ সর্বকালে সর্বত্র বিজয়প্রার্থী বৈষ্ণবগণের আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমী তিথি একান্ত পরিপালনীয় । পরম পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশক্রমে রাবণানুজ বিভীষণ এই তিথিতে শ্রীরামভক্ত বানর-সৈন্যগণকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া আনন্দোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন । সুতরাং বিজয়ার বিজয়োৎসবে ভক্তির বিজয়তা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গৌড়ীয়গণকে বিজয়ার শুভ সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি । এই তিথিকে অত্যাতিলাষ পরিমুক্ত শুদ্ধাভক্তি ভক্ত ও ভগবানের বিজয়োৎসব বলা হয় । অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরি বিজয়াদশমীতে আশ্রয়-লীলা-প্রদর্শন করিয়া, বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন । আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনী সঞ্চালনের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ পাইতেছি যে—

বিজয়া-দশমী—লক্ষা-বিজয়ের দিনে ।

বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥

হনুমান-আবেগে প্রভু বৃক্ষ-শাখা লঞা ।

লক্ষা-গড়ে চড়ি' ফেলে লক্ষা ভাঙ্গিয়া ॥

‘কাইঁারে রাব্ণা’ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।

‘জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সর্বংশে ॥’

গোসাক্রির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার ।

সর্ব লোক ‘জয়’ ‘জয়’ করে বার বার ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫)

এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, কৃষ্ণভক্তির বিজয়-পতাকা উড্ডীন করাইবার নিমিত্ত এই শুভ-তিথিকে কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে রক্ষণ ও পালন করিয়া থাকেন । তাই আজ গৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়ামক, সম্পাদক, লিখক ও পাঠক-গণসহ শ্রীগৌরাস্ত্রের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্মের অনুশীলনকারী ভক্তগণের চরণে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি এবং নিবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সকলেই, বিষয়-মদাক্ত ও কৃষ্ণ-সেবোপকরণে ভোগবুদ্ধি পরায়ণ মাদৃশ জনের উপর কৃপাপরবশ হইয়া শুভদৃষ্টিপাত করেন,—

“বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণদয়াময় ।

এছেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥”

পরম দয়াল পতিত-পাবন বৈষ্ণবগণ আমার জন্য কৃষ্ণের নিকট আবেদন

করিলে, নিশ্চয়ই দয়াময় কৃষ্ণ আমার গ্রাম পামরের প্রতি সদয় হইবেন।
তাহাতেই আমার বিজয়া দশমীর শুভকৃত্য সম্পাদন হইবে ও কৃত-কৃতার্ক হইব।

—শ্রীরানবিহারী ভিষগরত্ন, কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

সাউডী-শালার ভিত্তে গলদ

(প্রক-প্রকাশিত ৪ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩২০ পৃষ্ঠার পর):

ইঁচড়ে পাকা, সহজিয়া ও গুরুদ্রোহী

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'ভাই সহজিয়া' প্রবন্ধটি বর্তমান সংখ্যার ৩২৫ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইল। ইহার পূর্ব-অংশ গত ৮ম সংখ্যার ২৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি আদৃত্ত বিশেষ দীর্ঘভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য পাঠকগণের নিকট গত সংখ্যায় নিবেদন জানাইয়াছি। সুতরাং ইহা বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় পাঠকগণের প্রতি ঐক্যপ অমুরোধ এই সংখ্যাতেও পুনরায় জানাইতেছি।

আমরা সিদ্ধমহাপুরুষের শিষ্য; সুতরাং সিদ্ধমহাপুরুষগণের আদেশ-পালনে ও তাঁহাদের সেবা-সংরক্ষণে সিদ্ধ-হস্ত না হইলে শিষ্যগণের গুরুসেবা ভঙ্গ হইবে। গুরুসেবাই ভক্তিরাজ্যের সর্বোত্তমতা এবং সর্বোত্তম সোপান। সাউডীর দল যদি তাঁহাদের গুরুসেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পনায় পরিচালিত হন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে গুরুদ্রোহী বলিলে আদৌ অগ্রায় হইবে না। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—সাউডীর দলের ভিত্তি-স্বরূপ প্রধান পাণ্ডা মাননীয় সীতানাথবাবু যে তাঁহার গুরুপাদপদের আচার-বিচার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? আমরা পূর্ব সংখ্যায় ৩২০ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছি গৌরবান্বিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে পূর্ব-মহাজনগণের লেখনীর উপরেই নির্ভর করা কর্তব্য। তজ্জন্তই আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে পূর্ব-মহাজনের উক্তি নিয়ে উদ্ধার করিব। পূর্বেই বলিয়াছি—গুরুদাস্তই একমাত্র ভক্তি। সুতরাং আমাদের গুরুপাদপদ জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লিখিত 'ভাই সহজিয়া' প্রবন্ধই আমাদের প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। সুতরাং আমাদের গুরুপাদপদ যদি কাহাকেও 'ইঁচড়ে পাকা' বলেন আমরাও সেই গুরুপাদপদের বাক্য সংরক্ষণ-কল্পে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'ইঁচড়ে পাকা' বলিব। আমাদের গুরুপাদপদ যদি কাহাকেও 'সহজিয়া' বলিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাকে 'সহজিয়া' বলিবই। আমাদের গুরুপাদপদ যদি

কাহাকেও গুরুদ্রোহী বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, আমরাও তাহা বুঝিয়া লইয়া তাহাকে ‘গুরুদ্রোহী’ বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না। আমরা যদি তাহা না বলি, তাহা হইলে আমাদের গুরুদাস্ত হইবে না।

এইরূপ স্থলে একটি তর্ক উপস্থিত হইতে পারে—তাহা হইলে সাউড়ীর দলেরই বা দোষ কি? সীতানাথ বাবু যদি সহজিয়া-গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গও সহজিয়া হইবেন—তাহাতে আর দোষ কি? এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে শ্রীমন্নহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত নাম করিয়া ১৩টী অপসম্প্রদায় চলিতেছে। তাহারা স্ব-স্ব সম্প্রদায় অনুযায়ী আপন আপন পরিচয় দিলে কোন গোল থাকে না। সহজিয়া যদি শুদ্ধভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা হইলেই শুদ্ধভক্ত তাহা আপত্তি করিবেন। সাউড়ীর দল নিজকে সহজিয়া বলিয়া পরিচয় দিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহারা যদি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাহা হইলেই আমরা তাহাদের জিহ্বা স্তম্ভন করিব। ছুনিয়ার অসদ্ গুরু-সম্প্রদায় নিজেদের অসৎ আদর্শে গঠিত শিষ্য-পরম্পরার দ্বারা যে গুরু-পরম্পরার আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা, সর্বতোভাবে অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, অবৈধ ও অসঙ্গত। এই প্রকার গুরু-পরম্পরা স্বীকৃত হওয়ার ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে ধর্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসার লাভ করিয়াছে। আমরা এই গুরু-প্রণালীর ভিতরে ‘সখা-ভেকী’ ও ‘সখী-ভেকী’ নামক অপসম্প্রদায়দ্বয়ের পরম্পর সম্মিলন দেখিতে পাই। যদিও তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব গুরু-পরম্পরা বিভিন্ন দেখাইয়া থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত-পরম্পরায় অবস্থিত থাকার অভিমান করিয়া যদি কেহ উক্ত অপসম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দিতে থাকেন, আমরা তাহা হইলে তাহাদিগকেও অপসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সংজ্ঞা দিতে বাধ্য হইব এবং গুরুদ্রোহী বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় সীতানাথ বাবুর সম্বন্ধে বর্তমান যার ৩২৯ পৃষ্ঠায় যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদের স্বরণপথে আনিয়া দিতেছি—

“শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথম মূখে সাধনকালে এঁচড়ে পাকাইবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃত রস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। সজ্জনকে অসাধু বুঝি ও অনর্থময় সহজিয়াকে সাধু-জ্ঞান হইবে।”

শ্রীল গুরুপাদপদের এই বাক্য হইতেই আমরা সীতানাথ বাবুর দলকে 'ইঁচড়ে পাকা' সম্প্রদায় বলিয়াছি। উক্ত বাক্য হইতে কেবল মাত্র 'ইঁচড়ে পাকা' এই সংজ্ঞাই প্রকাশ পায়—তাহা নহে, 'সহজিয়া ও গুরুদ্রোহী' ইহাও এই বাক্য হইতে প্রকাশ পায়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই প্রবন্ধটি শ্রীল প্রভুপাদ মাননীয় সীতানাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। উক্ত বাক্যে 'সজ্জনকে অসাধু বুদ্ধি' ও 'সহজিয়াকে সাধুজ্ঞান' বাক্যদ্বয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এস্থলে সজ্জন বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং 'সহজিয়াকে সাধুজ্ঞান' এই বাক্যের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ কোন প্রসিদ্ধ সহজিয়াকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উক্ত বাক্য হইতে জানা যায় সীতানাথ বাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচার-বিচারে সন্দিহান হইয়া কোন প্রসিদ্ধ সহজিয়াকেই শিক্ষাগুরুরূপে স্বরণ করিয়াছেন। অবশ্য এ ঘটনা শ্রীল ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেই ঘটিয়াছিল। এই সম্পর্কে আমাদের এই প্রকার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট প্রমাণও আমরা শ্রীল গুরুপাদপদের লেখনী হইতে প্রদান করিতেছি।—

“ভাই সহজিয়া! তুমি ইন্দ্రిয়-দমনে অপারক হইয়া সিদ্ধির ভাগে রাধা-গোবিন্দের লীলা-বহুশ্রু ইন্দ্రిয়-পরায়ণ বিশৃঙ্খল লোক-সমাজে গান গাইয়া 'সেবা-কল্লনার' নামে কবিতা লিখিয়া 'কাঞ্চা-রসের' দোকান খুলিতেছ। কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে, তোমার গুরু প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন এবং সেই চক্রবর্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া-গুরু তোমাকে উচাই লিখাইয়াছেন, বল।” (গৌঃ পঃ ৬বঃ ৩২৬ পৃঃ)

উক্ত বাক্যসমূহ যথেষ্ট 'সেবা-কল্লনা' ও 'কাঞ্চা-রস' বাক্যদ্বয়ের পাঠটীকাও পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। উহাও অকাল-পদ্ধতি ও সহজিয়া-চিন্তাশ্রোতের প্রতিবাদ-স্বরূপ। 'কেহ তোমাকে বাধা দিতে আসিলে'—এই বাক্যদ্বারা 'প্রবন্ধলেখক শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ংই সীতানাথ বাবুকে সহজিয়া পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন' বুঝায়। এস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সীতানাথ বাবুর, বিরূপ সম্বন্ধ ছিল—তাহা বলা আবশ্যিক। সীতানাথ বাবুর গুরুপাদপদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ; তাঁহারই যোগ্যতম অন্তর শ্রীল প্রভুপাদ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেহরক্ষা করিবার পূর্বে তাঁহার শিষ্য ও অনুগত সকলকেই মুক্ত কর্তে জানাইয়া গিয়াছিলেন যে—‘আমার অবর্তমানে সিদ্ধান্ত পরমহীম (শ্রীল প্রভুপাদের) নির্দেশ ও শিক্ষা অনুসারে তোমরা সকলে ধর্ম্যজীবন অতিবাহিত করিবে’। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ সীতানাথ বাবুর

শিক্ষাগুরু। ঠাকুরের উক্ত নির্দেশ ছাড়াও শ্রীহরিতত্ত্ববিলাসের গুরুতত্ত্বের বিচার অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ সীতানাথবাবুর অভিন্ন গুরুপাদপদ্য। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রভুপাদ তাঁহার নিজ কর্তব্যের অনুরোধে সীতানাথ বাবুকে তাঁহার গুরুপাদপদের বিরুদ্ধাচরণ-কার্যে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে বাধা অগ্রাহ্য করিয়া “চক্রবর্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া গুরু”কেই গুরুরূপে গ্রহণ করায় গুরু-দ্রোহিতা হইয়াছে। “চক্রবর্তী-জীবী বৃন্দাবনস্থ সহজিয়া গুরু” বাক্যটি হৈয়ালী-স্বরূপে সীতানাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য-কুল-মুকুটমণি শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন। আমরা ইহার প্রত্যক্ষদর্শী এবং আমরা এই হৈয়ালীর মূল উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম। এই বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি শ্রীল তত্ত্ববিনোদ ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া সহজিয়া গুরু করেন, তজ্জন্তই আমরা তাঁহাকে ‘গুরুদ্রোহী’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। (ক্রমঃ)

আচার্য্য

‘আচার্য্য’—অভিধা বৈদিক। আচারবান্ ব্যতীত অন্তে আচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। বৈদিক আচার-সম্পন্ন ব্যক্তিই আচার্য্য। কিন্তু বর্তমানে এই অভিধার অপব্যবহার দেখিতে পাই। প্রত্যেক তথা-কথিত ধর্ম সম্প্রদায়ে যাহাকে তাহাকে আচার্য্য বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপ আচরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হয় তাহার নিরাকরণ করিলে কিঞ্চিৎ বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

আচার্য্যের লক্ষণ সম্বন্ধে স্মৃতি-শাস্ত্রকার মহর্ষি মনুর যে বিচার তাহা এইঃ—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়োদ্বিজঃ।

সকল্লং সরহস্তঞ্চ তন্মাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥ (মনু ২।১৪০)

অর্থাৎ, যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন-সংস্কার দান করেন, যজ্ঞবিদ্যা এবং উপনিষদাদি সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকেই ‘আচার্য্য’ নামে অভিহিত করেন।

এখন সে ব্রাহ্মণটি কে? এবং কেই বা সেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে সক্ষম, ইহার বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে একটি বিচার দেখিতে পাইঃ—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্বিজ উচ্যতে।

বেদ-পাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ ॥

ভাৎপর্য্য এই যে, শৌক জন্মের পবিত্রতা নাই। সেই হেতু ব্রাহ্মণ কুলে

জন্ম নিলেই পবিত্র হয়—এইরূপ বিচার সাধু শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। যোনির পবিত্রতানুগে ব্রাহ্মণ জাতির যে পবিত্রতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সর্বতোভাবে শুদ্ধ নহে। ঠিক ইহার জন্তই সমাজে ধর্মের নামে আত্মরিক ভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দুর পরমাথ সম্পদকে অতি শোচনীয়রূপে বিড়ম্বিত করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম-প্রচারকগণের প্রচারের ফলে অধুনা বিজ্ঞ সমাজে দৈব-বর্ণাশ্রম আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে।

‘জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ’—জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা আর শাস্ত্রে থাকিত না। অপবিত্রকে পবিত্র, অশুদ্ধকে শুদ্ধ এবং অসংস্কৃত পাপযুক্ত শূদ্রকে সংস্কৃত করিবার জন্ত শাস্ত্রে বিধি আছে। এই বিধি সকল প্রকার জন্মের প্রতিই প্রযোজ্য এমন কি শূদ্রাদি নিম্ন কুলের প্রতিও প্রযোজ্য। উক্ত ‘জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ’—বাক্যটিতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্রেরই শূদ্রত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে একরূপ নহে—পরন্তু যে কোনও বর্ণে যে কোনও পুত্রেরই শূদ্রত্ব স্থচিত হইয়াছে। এবং সেই প্রকার সকল শ্রেণীর শূদ্রেরই সংস্কারের অধিকার বা প্রয়োজন আছে। তাহারা সকলেই সংস্কৃত হইলেই বিজ্ঞ হইবে। সুতরাং সংস্কৃত শূদ্রই ‘দ্বিজ’ নামে অভিহিত।

আচার্য্য হইতে এই সংস্কার লাভ করিতে হয়। সংস্কারের অর্থ কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে বহন করাই নহে। উপনয়নের অর্থ নিকটে আনা অর্থাৎ আচার্য্যই উপনাত শিষ্যকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া বেদ-বেদান্তের রহস্যতে উদ্বুদ্ধ করান। উপনয়ন-সংস্কার ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদ-জ্ঞানের প্রতীক। সুতরাং গুরু বা আচার্য্যকে শব্দ-ব্রহ্মে ও পরব্রহ্মে নিষ্কাত হইতেই হইবে।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতো ন দ্বিজায়াং পরে যদি।

অনন্তশ্চ শ্রমকলো হৃদেহুমিব রক্ষতঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।১৮)

অর্থাৎ, শব্দ-ব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদ তাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভীকে রক্ষার জায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন, কেবল পণ্ডিত হইয়া থাকে। বেদ পাঠ করিলে ‘দ্বিজ’ ‘বিপ্র’ নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন বিপ্রের নাম ব্রাহ্মণ।

বেদ জ্ঞানময় বস্তু। সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিন ভাগে বেদ-জ্ঞান বিভক্ত। সম্বন্ধ রূপে কৃষ্ণের বিচার, অভিধেয় রূপে কৃষ্ণ-ভক্তির বিচার এবং প্রয়োজন রূপে কৃষ্ণ প্রেমের বিচার বেদে পরিলক্ষিত হয়।

বেদে শিরোভাগ উপনিষৎ । উপনিষদের সার মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষা শ্রীমদ্ভাগবত । ভাগবতের আনুগত্য বা ভাগবত জীবন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় মূর্তি ।

‘এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র ।

আর ভাগবত বড় ভক্তিরস পাত্র ॥’

ভাগবত-জীবন-যাপনকারী মানব তিনভাগে বিভক্ত—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ভাগাত । উত্তমাদিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমের মহাজন । ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইবার পরে । অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর ব্রাহ্মণের যদি কৃষ্ণভক্তি আলোচ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে কাষ্টময় হস্তীর আয় এই বিপ্রেস ‘ব্রাহ্মণ’-অভিধা মাত্রই সার—প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন । ব্রহ্মজ্ঞান ভগবজ্ জ্ঞানেতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । বৈষ্ণবেতে ব্রাহ্মণ লক্ষণ নিত্য বর্তমান থাকিয়াও ব্রাহ্মণের দুর্লভ অচিন্ত্য মঙ্গলরাশি তাঁহাতে অধিকতর সমুজ্জলরূপে প্রকাশিত হন । ভক্ত এবং ভক্তি জগতের সুদুর্লভ বস্তু । জীবের একমাত্র স্বরূপ-সিদ্ধ ধর্ম কৃষ্ণ-ভক্তি । এই ভক্তি লাভের জন্যই ভক্তের নিকট উপদেশ লওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই আছে ।—বিষ্ণোরয়ং যতো হাসীতস্মাদৈষ্ণব উচ্যতে ।

সর্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

অর্থাৎ, বৈষ্ণব সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব বর্ণের গুরু । ‘ন বৈষ্ণবাং পরো জ্ঞানী’—বৈষ্ণবের অপেক্ষা আর কেহ অধিকতর জ্ঞানী নাই । বৈষ্ণব যদি শ্রীকৃষ্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন তাহা তাঁহার দীনতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানিতে হইবে ।

বৈষ্ণবাচার্য্যের অপার কৃপায় অত্যাশ্রিত সকলে বৈষ্ণবতা লাভ করেন । বিষ্ণুর অভক্ত অবৈষ্ণব কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না । ব্রহ্মণ্যদের শ্রীভগবানের ভক্তের বিদ্বেষী ব্রাহ্মণাভিমानी ব্যক্তি স্বয়ং অসংস্কৃত এবং অপরাধ পক্ষে নিমজ্জিত । সুতরাং তাঁহাদের আচার্য্য হইবার অধিকার কোথায় ?

মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।

সহস্রশাখাধারী চ ন গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৪০)

অর্থাৎ মহাকুল-প্রসূত, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র-শাখাধারী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইবে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না । ‘নাহংবিপ্রো ন চ নরপতি নাপি বৈশ্ণো ন শূদ্রো’—অর্থাৎ বৈষ্ণব আপেক্ষিক বা সামাজিক বর্ণাশ্রম ধর্মের অতীত, অর্থাৎ যাবতীয় প্রাকৃত ধারণার অতীত ।

‘বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শক্তি’—দেবতাও বৈষ্ণব চিনিতে পারে না । বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারিলেই বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় ।

গুণ এবং কর্মই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব প্রভৃতির মধ্যে ভ্রম এবং ব্যতিরেকভাবে জগতে পরিচয় করিয়া দেন। বস্তুর স্বভাবেই বস্তু পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বলের রক্ষক, শত্রুদমনকারী ব্যক্তি বীর এবং বুদ্ধের নাম গুণিলে মুচ্ছিত হয় যে ব্যক্তি সে ভীক বা কাপুরুষ। সেই প্রকার যে-ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং যে-ব্যক্তি বিস্মৃভক্তি পরায়ণ, সে-ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলা হয়। পুনঃ যে-ব্যক্তি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত আচার্য্য আচারমুখে অগ্রে উদ্ধার করেন, তিনিই বৈষ্ণবাচার্য্য। আচরণই আচার্য্যকে প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।

স্বয়মাচরণে বস্বাদাচার্য্য স্তেন কীর্তিতঃ ॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমাগ্রুপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন, এইরূপ আচারবান্ তদ্বিৎ পুরুষ ‘আচার্য্য’ নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।

যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ (গীঃ ৩।২১)

অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠলোক যে-রূপ আচরণ করেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তদনুকরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহার অনুবর্তী হয়।

সুতরাং আচারেই আচার্য্যত্বের প্রকাশ। আচার্য্যই শাস্ত্রসম্প্রদায় আচারের দ্বারা সমাজে ধর্ম প্রবর্তন করেন। আচার-হীন আচার্য্য-ঋষি-সম্প্রদায় সমাজে যে-প্রকার আসন সংগ্রহ করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে অধ্যর্মের বীজ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে হিন্দু-সমাজে ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে যে উদানীত দেখা যায়, তাহার মূলে এই গুরুকৃত সম্প্রদায়ের আচার-হীনতাই প্রধান।

কৃষ্ণপ্রেমিক মহাভাগবতগণের ভজন মুদ্রা অভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচারের বিষয় নয়। মহাভাগবত জড়ভরতের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পান্ডী-বাহকের কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। দুর্কাসা-ঋষি মহাভাগবত অশ্বরীষের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট ভীষণ অপরাধ করিয়া বসিয়াছিলেন। তজ্জগাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—‘বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজে না বুঝায়’। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। এমন কি, অক্ষজ্ঞানীর নিকট মহাভাগবতের বাহুভাগ এবং ত্যাগের যে অভিনয় প্রতিভাত হয়, তাহা তাহাদের গায় মূঢ় লোকের বঞ্চনার কারণ বলিয়াই জানিতে হইবে। কৃষ্ণভক্ত ভোগীও নন, ত্যাগীও নন; তিনি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকারী। কৃষ্ণ-

ভক্তিই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ, আচারাদি—তটস্থ লক্ষণ। মহাভাগবতের ভিতরে আচারাদি বাহ্য ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তাহা তাঁহার পক্ষে ভক্তির ব্যতিচার নহে। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ কার্যেতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত আছেন। আত্মজ্ঞির প্রীতির কামনা তাঁহার ভিতরে আদৌ নাই। ইচ্ছাতে বলা উচিত যে, মহাভাগবত আচার্য্যরূপে জীব-শিক্ষা-কার্যে নিযুক্ত হন, তিনি শাস্ত্রাচার কখনও লঙ্ঘন করেন না। ইহাই তাঁহার দয়ার পরিচয়। আমি গুরু, অতএব আমি সব করিতে পারি; তুমি শিষ্য, অতএব তুমি কিছুই করিতে পারিবে না—এইরূপ বিচার তাঁহার নয় এবং ইহা হইতেও পারে না। গুরু সমাজের আদর্শ। তাঁহার আচার এবং বিচার অনুবর্তন করিলেই শিষ্যগণ সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন।

আচার্য্য এই জগতের বস্তু নন, তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবান্। সাধারণ জীব কখনও আচার্য্য পদবী দাবী করিতে পারে না। গণমতের সংখ্যাধিক্যের অনুমোদন লাভ করিয়াও হঠাৎ আচার্য্য বা বড় হওয়া যায় না। তিনি বদ্ধ-জীবের কল্পনার কারখানার তৈয়ারী বস্তু নহেন। তিনি স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ ভগবানেরই নির্বাচিত। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ভিতরে সাধারণ জীবগত অসম্পূর্ণতা নাই। জগতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আসিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহার সমান কেহ নাই বা তাঁহা হইতে বড় আর কেহ নাই। আচার্য্য বস্তুতঃ এইরূপ।

আমরা কি প্রকারে গুরু চিনিব? বদ্ধজীব আমরা, আমাদের বদ্ধতা গাইয়া কোন কথাই নাই। চক্ষু লইয়া আমরা গুরুর নিকট যাইতে পারি না। রূপ-দর্শন ও রূপের পূজা সিদ্ধের বিচার তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কারণ অপ্রাকৃত চক্ষু ছাড়া প্রাকৃত চক্ষুর অপ্রাকৃত রূপ-দর্শন নাই। সুতরাং আমরা মাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়েরই ব্যবহার করিব। গুরুর আচার ও গুরুর বিচার শাস্ত্র-সঙ্গত হইলেই আমরা গুরু বরণ কার্যে অগ্রসর হইব। গুরু বরণ সময়ে শাস্ত্র-বিচার না করিয়া যে-ব্যক্তি গ্রামা-প্রথানুসারে গুরু-বরণ কার্যে নিযুক্ত হন, অথবা শ্রৌত-ধারার অনুবর্তন করিয়া গুরুর অমুপযুক্ত পাত্রকেই গুরু বলিয়া বরণ করেন, তাহার ইহা কখনও পরমার্থপ্রদ হইবে না।

—শ্রীমদেবকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। কান্তন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪ টাকা, বাৎসরিক ২৥০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৥০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা আদরণীয়া।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পুন্ড্র-চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রীশ্রীদামোদরোষ্টকম্

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলিত, কার্ত্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেয়ই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ৥০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(জিদগিষ্ণামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯ নয় টাকা।

নটতুল্যাসেন কচিদপি গণৈঃ সৈঃ প্রণয়িত্তি-
স্তৃণাদিব্রহ্মান্তঃ জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ ॥২॥

ততো বুদ্ধিব্রাহ্মা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো !

ভবেৎ সোহয়ং কান্তঃ কিময়মহমেবাস্মি ন পরঃ ।

অহঞ্চেৎ ক প্রেয়ান্মম স কিল চেৎ কাহমিতি মে
ভ্রমো ভূয়ো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী ॥৩॥

প্রিয়ে ! দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ কুতুকিনি ! ময়া দর্শিতচরী
রমেশাচ্চা মূর্তীন' খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ ।

কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং

তথা ভ্রান্তিং ধত্তে স হি ভবতি কো হন্ত ! কিমিদম্ ॥৪॥

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষণমথ পরামৃশ্য রমণো

হসনাকৃতজ্ঞং ব্যনুদদথ তং কোস্তম্ভমগিম্ ।

তথা দীপ্তং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টমিব ত-

দ্বিলাসানাং লক্ষ্মং স্থিরচরগণৈঃ সর্ববমভবৎ ॥৫॥

বিভাব্যাথ প্রোচে প্রিয়তম ! ময়া জ্ঞাতমখিলং

তবাকৃতং যত্ত্বং স্মিতমতনুথাস্তত্ত্বমসি সঃ ।

স্মৃটং যন্মাবাদীর্ঘদভিমতিব্রতাপ্যহমিতি

স্মুরন্তী মে তস্মাদহমপি স এবোত্যনুমিমে ॥৬॥

যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কোস্তম্ভমগিং

প্রদীপ্যাত্রেবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্ ।

অশক্ত্যাবিভূ'য় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং

নিগচ্চ প্রেমাকৌ পুনরপি তদাধাস্তসি জগৎ ॥৭॥

যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা

ভবেৎ পীতো বর্ণঃ কচিদপি তবৈতন্ন হি মৃষা ।

অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-

ত্ত্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোহসি তদতম্ ॥৮॥

পিবেদ্ যন্ত স্বপ্নামৃতমিদমহো ! চিত্তমধুপঃ
 স সন্দেহস্বপ্নাহুরিতমিহ জাগতি স্মৃতিঃ ।
 অবাঞ্ছৈচ্চৈতন্যং প্রণয়জলধৌ খেলতি যতো
 ভৃশং ধত্তে ভস্মিন্নতুলকরণাং কুঞ্জনৃপতিঃ ॥৯॥

স্বপ্নবিলাসামৃতাক্ষকের বঙ্গানুবাদ

কোন একদিন নিশাবসানে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রিয়তম !
 আমি অতীত স্বপ্নে দেখিলাম যে, কোথাও যেন ঠিক যমুনার স্থায় কোন একটি
 নদী অর্থাৎ এই যমুনা যেমন বৃন্দাবন পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ সে দেশীয় সেস্থান সেই
 নদীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । এ বৃন্দাবনে যেমন পুলিন সেখানেও তেমন
 পুলিন, এ বৃন্দাবনে যেমন অনেকেই নৃত্যবিষয়ে পারদর্শী সেখানেও এমনই
 দেখিলাম । এখানে যেমন বৃন্দাদিবাণ্ড সেখানেও এইরূপ বাণ্ড দেখিলাম ।
 এখানে যেমন তুমি ও আমি, তদ্রূপ সেখানে এক দ্বিজমণিও দেখিলাম ।
 বিদ্যুতের স্থায় গৌরাদ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন এ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমসাগরে
 ডুবাইতেছেন ॥১॥

সেই গৌরাদ কোন সময় রোদন পূর্বক হে কৃষ্ণ ! বলিয়া প্রলাপ করি-
 তেছেন, কখন বা হা হা হা রাধে ! তুমি কোথায় রহিলে বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস
 পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও ভূতলে পতিত হইতেছেন, কখন বা ধৈর্যশূন্য
 হইতেছেন, কোন সময় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কখন কখন নিজ
 প্রণয়িগণের সহিত প্রলাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, ভূমিতে পতন, অচেতন, নৃত্য ও
 রোদন এই সকল দ্বারা তুণাদি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত রোদন
 করাইতেছেন ॥২॥

এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইল । তাঁহাকে হে
 রাধে ! তুমি কোথায় আছ ইত্যাদিরূপে আমার নাম গ্রহণাদি করিতে দেখিয়া
 মনে করিলাম এই পুরুষ কি আমার প্রাণবল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ, যদি তাই হয় তবে
 আমি কোথায় ? এইরূপে হে কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় রহিলে ইত্যাদি কার্য
 দেখিয়া ভাবিলাম, এই দ্বিজমণি আমিই, অতীত কেহ নহে । যদি আমিই হই, তবে
 আমার প্রিয়তম রাধা কোথায় ? এইরূপে বারম্বার আমার ভ্রম হইতে
 লাগিল, অনন্তর নিদ্রাভিভূত হইলাম ॥৩॥

এইরূপে শ্রীরাধার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে প্রিয়ে কুতূহিনী ! আমি তোমাকে অনন্তশায়ী নারায়ণাদি বহুবিধ মূর্তি দর্শন করাইয়াছি, তাহা দেখিয়া তুমি কখনও বিস্মিত হও নাই, এখন সে ব্রাহ্মণ কি প্রকারে তোমার বিশ্বাস জন্মাইতে সমর্থ হইলেন ? আর কেনই বা তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল ? কি আশ্চর্য্য ! সে বিপ্রই বা কে হয় ?

তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন সময় বাগ্‌ভঙ্গিচ্ছলে শ্রীরাধা বলিলেন, হে মাধব ! আমাকে নারায়ণ মূর্তি দেখাও এবং রঘুনাথ মূর্তি দেখাও । এইরূপ প্রিয়র কোতুকময় বাক্য শ্রবণান্তে শ্রীকৃষ্ণ, সেই সেই মূর্তি দেখাইয়াছিলেন, এমন কি অচ্যাবদি শ্রীকাম্যবনে শেষশায়ী নারায়ণ-মূর্তি বর্তমান রহিয়াছেন এবং কোন দিবস কোতুকবশে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়তম ! যেমন রহস্যলীলাজনিত সুখাদি পুরুষের চাক্ষু্যভাব দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ জানিতে পারে, তেমন পুরুষগণ স্ত্রীদিগের মনোগত ভাব জানিতে পারে না । তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন প্রিয়ে ! আমি একমূর্তিতে সর্বদাই তাহা অনুভব করিয়া থাকি । তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন, প্রাণনাথ ! তুমি সকলই মিথ্যা বলিতেছ । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি । শ্রীরাধিকা পুনর্বার বলিলেন, তবে আমাকে সেই মূর্তি দর্শন করাও, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে পূর্বোক্ত শ্লোকে ছলনা বাক্য বলিয়া তৎপর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্বক স্বীয় অভিপ্রায়জ্ঞ সেই কোস্তুভ মণিকে সঞ্চালন করিলেন । অনন্তর তৎক্ষণাৎ সেই মণি এইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যে, শ্রীমতী স্বপ্নাবস্থাতে যেদ্রুপ দর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্থাবর জঙ্গমের সহিত তাহার বিলাসের চিত্র সকল সম্যক্রূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ॥৫॥

তৎপর শ্রীরাধিকা স্বপ্নাবস্থায় যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, প্রকাশিত কোস্তুভের প্রভাবে জাগরিতাবস্থাতেও সেই সকল দেখিতে পাওয়ার, “আহা ! প্রাণবল্লভের চাতুর্য্যের এত প্রাচুর্য্য যে তাহার পরিসংখ্যা করাও অসাধ্য” এইরূপে নানাবিধ জল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে প্রিয়তম ! আমি তোমার সকল অভিপ্রায়ই জানিতে পারিলাম । আমি স্বপ্নে যে গৌরকান্তিধারী বিজয়মণিকে দেখিয়াছি, সেই বিজয়ন্তম গৌরাজ সাক্ষাৎ তুমিই, যেহেতু তুমি ঈষৎ হাস্য করাতো সেই গৌরাজ তুমিই বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়াছ । কিন্তু তাহা আমার নিকট স্পষ্ট কিছুই প্রকাশ কর নাই, সেই হেতু আমারও দেহে অভিমান

স্মৃতি পাইতেছে-যে আমি ও ঐ গৌরানন্দ । উভয়ের এইরূপ অভিমান হওয়ায় বোধ হয় তুমি ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়াই ঐ রূপ হইয়াছি ॥৭॥

হে প্রিয়তম ! যেহেতু তুমি এই কৌজুভমণিকে প্রকাশিত করিয়া ঐ মণিতেই আমাদিগের রতিপদ অর্থাৎ রতির স্থান জীবসকলকে বারম্বার দেখাইয়াছ, এখন বোধ হইতেছে যে, স্বয়ংই নিজশক্তিগণের সহিত আবিভূত হইয়া আপনাকে ও আপনার নিখিল লীলাকে প্রত্যেক লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার এই চরাচর জগৎকে প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিবে ॥৭॥

শ্রীমতী বলিলেন—হে প্রিয়তম ! ইতিপূর্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার নামকরণকালে বেদজ্ঞ গর্গাচার্য মহাশয় শ্রীব্রজপতি নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, হে নন্দ ! তোমার পুত্র কোনকালে শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল, এখন কৃষ্ণবর্ণ হইল, পুনর্ব্বার কোনযুগে পীতবর্ণও ধারণ করিবে, এই বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয় । অতএব আমার স্বপ্নও সত্য এই বিষয়ে আমার কোন ভ্রমও হয় নাই । এই গৌরানন্দ সাক্ষাৎ তুমিই অনুভবনীয় হইতেছ, তাহাও সত্য ॥৮॥

যাঁহার চিত্তভ্রমর এই আশ্চর্য্য স্বপ্নামৃত অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসামৃত পান করিবে, সেই স্মৃতি অচিরে এই সন্দেহ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবেন । অর্থাৎ শ্রীনন্দ-নন্দনই শ্রীশচীনন্দন কি না এইরূপ সন্দেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পরে শ্রীচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে বিহার করিবেন, যেহেতু সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অসীম করুণা ধারণ করেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হইবেন ॥৯॥

অপ্রাকৃত

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কৰ্ম্ম এই পাঁচটি অর্থ বর্ণিত আছে । বিভূসম্বিৎ ঈশ্বর, অণুসম্বিৎ জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি, ত্রৈগুণ্য-শূন্য জড়দ্রব্য কাল, ও পুরুষ-প্রবৃত্ত-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দ-বাচ্য কৰ্ম্ম । রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত । এজন্ম হরিবিমুখ অণুসম্বিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্ম্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অনুভূতির অভাব । তথায় নিত্যধর্ম্ম প্রবল, প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিৎ ধর্ম্মের মিশ্রভাব বর্তমান । অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ প্রাকৃত গুণ

গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদ্বয়ভাবে মিশ্রিত হন না। যেখানে অণুসন্নিহিত গুণ সহ মিশ্রিত বাপন তথায় উহা বদ্ধাভিমান ও নশ্বরধর্মসংশ্লিষ্ট। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্তমান, অবিমিশ্র চেতন বর্তমান। তথায় অণুচিদ্রস্মে অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম নিত্য নহে এবং অবিমিশ্র চেতনের অভাবপ্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নশ্বর জগতের মিশ্রানন্দে প্রীতির পূর্ণাঙ্গ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেই-স্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতন ধর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্তমান। সেজন্য অপ্রাকৃত রাজ্যকে ‘সচ্চিদানন্দ’ অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের লীলাভূমি হওয়ায় ইহা বদ্ধজীবের বিহার-ক্ষেত্র। এখানে বিভূচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ডকালের অভ্যন্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্যই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধজীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা অচিজ্জগতের অন্ততম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়-গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার স্পষ্ট অবিমিশ্র অণুসন্নিহিত নিত্যাধিষ্ঠানে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিদ্রস্ম অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর ত্রায় তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসন্নিহিতের কেবল্যবৃত্তি ভগবৎসেবা স্পষ্ট থাকায় তদভাববৃত্তিতে কর্ম ও জ্ঞান-পথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসন্নিহিতের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্তে নিত্য ভোগ্যবুদ্ধি ও বিভূসন্নিহিত ভোক্তবুদ্ধি প্রবল। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভূসন্নিহিতরূপে নিত্যভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসন্নিহিত জীবকে ভোগ করেন তাহা নশ্বর স্বর্গ বা কর্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগপর

নির্বিশেষ রাজ্য নহে । সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে । প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে । প্রাকৃত কালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক খণ্ডকাল বা নশ্বর ধর্মবিশিষ্ট বলে । অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিবিধ খণ্ডকালের যুগপৎ অবস্থান । অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভূসম্বিৎ ও অসংখ্য অণুসম্বিৎ । প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণত্রয়বিপন্ন অণুসম্বিৎ ।

অণুসম্বিদের ধর্মো নিত্য অণুসম্বিৎ অধিষ্ঠান আছে । অণুত্ব-প্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগ্যতা খণ্ডকালের অভ্যুত্থারে সিদ্ধ । নশ্বর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্ত নহে, যেহেতু জড়ব্যোমে নশ্বরতা ধর্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্তনশীল । পরব্যোমের দ্রষ্টা নিত্যধর্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল । প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিৎ জীবই অজ্ঞানতা বশতঃ বিভূসম্বিদের স্বায়ত্তীকৃত ভোক্তৃধর্মো চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুত্বপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিভূত । সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কৃষ্ণের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে । তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন হলাদিনীসারসমবেত-বিগ্রহ বৃষভাণু-নন্দিনীর সহিত চিহ্নিলাসবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্শ্বদ অণুসম্বিৎগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত । সেবা বিষয়জাতীয় বিভূসম্বিৎ এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভূসম্বিৎশক্তি নানা প্রকারে পাঁচটী রস বিস্তার করিয়াছেন । নির্বিশেষ ব্রহ্মধামের স্থায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট । প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব । ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ । স্তূতরাং এক পাদ দ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্বাধীন হয় না ।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিৎ জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন । অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উষ্মাধিভয় দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে । দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা অরণ করিতে গেলে কর্ম ও জ্ঞান রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন ঘটে । কর্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইলে অণুসম্বিৎ জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভূসম্বিৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাবে অনুশীলন করেন । অন্ত্যাবিল্লাষ, কর্ম ও জ্ঞান অণুসম্বিৎ জীবকে প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায় । সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত । নিত্য আত্মবৃত্তির অনুসরণীয় পথই ভক্তিপথ । তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত,

কৃষ্ণসেবা বিস্থিতি ফল জীবের ভোগময়ী ও ত্যাগময়ী প্রবৃত্তি পুনরায় অবিমিশ্র অগুদম্বিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম বদ্ধজীবের দেহ-মনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নির্বিশেষজ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংসবিষয়ক আত্মার ধর্ম অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভুক্ত ও অগুদ্বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোনপ্রকার প্রাকৃত, হেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাজ্যে ঐগুলিই অবস্থিত। অগুদম্বিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্যে ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অগুদম্বিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থানকালে প্রাকৃত সহজধর্ম্য তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দ থাকেন।

—জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

গর্ভ স্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব চক্রিকা

“সত্যব্রতং সত্যপরং” হইতে “ভারং ভুবো হর বদন্তম বন্দনং তে” পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত বহুপূর্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই জীবগণ চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞান স্বরূপ বহুদেব প্রথমে ভগবত্ত্বাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাষাটী অর্পণ করেন। এতনিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাহুদেব হইয়াছে। বাহুদেব বিগুঢ় জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সর্কার জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাহুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য অতএব জ্ঞান কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা হয়,

এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভূ অনুগ্রহ পূর্বক জীবের জ্ঞানের আত্ম প্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনো মধ্যে বিচরণ করেন। অবিবেচক লোকেরা জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যাক্ত হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাব কালীন যে দেব-স্বৃতি তাহা যে অমৃত তুল্য ইন্দ্রিতে সন্দেহ কি?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমাদের শ্রায় ক্ষুদ্র লোকের নাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্বস্ব জগদগুরু শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রদাদাং যাহা কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির শ্রায় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত ব্যাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়াদ্র চিত্ত পাঠকগণ স্বামী প্রদত্ত ইঙ্গিতাবলম্বিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা; যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন। ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্ত যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্ত সত্যং স্বতঃসত্যেন্দ্রং, সত্যাত্মকং স্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব-শক্তিমান্ ও পূর্ণ স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটি শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না। এই তিনটি শক্তির নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিচ্ছক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ মায়াবিমুখ ধর্ম যোগ্য। চিচ্ছক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতির অসম্পূর্ণ লক্ষণ, এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতির বিপরীত অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড় জগতকে প্রাকৃত কহা যায় এজন্য ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার

না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণ সকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্বিকার ও সৃষ্টি করণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অক্লান্ত পরিচালনা একই কালে নির্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল, এ প্রযুক্ত জড় জগতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমনত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননার গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্রে ব্রহ্ম হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বতৃষুগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে নীর্মাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের নীর্মাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে। মানব জীবনের সারভূত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীব সকল ভ্রমকূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধ্যা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার জন্ত পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্থায় চিচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতি-কালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুত অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুযন্ত্রিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন, যেহেতু শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি

প্রকার প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ব-বাদী বৈষ্ণবগণ ও ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্কান্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটী পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ভ্রুটি বলিতে হইবে, যে হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্বে বরণ করেন নাই। পরিণামেরও পরিণাম হইবার সম্ভাবনা অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্বতঃ স্বীকৃত। তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটী অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলিতে পারেন না যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমাক্ষ ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্ত অনেকানেক মহাত্মাগণ চিং ও অচিং অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কেও নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে “সত্যপরং” বলিয়া সম্বোধন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে যদি সত্যব্রত শব্দদ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতাদিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু ‘সত্যব্রতং সত্যপরং’ এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অত্যান্ত জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তাকরত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে “সত্য্যন্ত্ৰ যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্য্যন্ত্ৰ সত্যং” এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপুর তুমি

এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আছে অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়জগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুখণ্ডে পরব্রহ্ম বৈশ্বরূপ্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এরূপ বেদসকলও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করিতে না পারিয়া ‘ওতপ্রোত’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃত-ভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্তন ও সংস্বরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণু খণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহৎস্তু ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ তাঁহাকে ‘সত্যশ্চ সত্য’ উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। জগদীশ্বর ইহার সত্য স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিবেন। এই সাময়িক সত্যের পর্য্যবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না। তখন একমাত্র সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সৃষ্টির পূর্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটী অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরে লক্ষ্য হয় অতএব এস্থলে ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মাগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্তব্য এরূপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। জীব ও

জড়ের প্রাগ্ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাকালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিবে। এস্থলে কালত্রয়ের মধ্যে কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইপ্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই যদি ঈশ্বরের একমাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ-রূপে সামান্য হইয়া উঠে। হ্যাঁ! আমরা ঈশ্বরকে এইপ্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এইপ্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এইপ্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, যাঁহাকে সত্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতা-গণ কহিলেন হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিহিত হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপ ভগবচ্চরণামৃত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন। ১৥

—জগদগুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

—***—

বন্দি আজি হে প্রভুপাদ! তব জগৎ বন্দিত চরণ কমল।

বিরহ-বাসরে শ্রীপাদযুগলে নিবেদিব শ্রদ্ধা-ভক্তি-শতদল ॥১॥

প্রভুপাদ! বিশ্ব পূজিছে আজি আকুল পরাণে,

গাহে তব গুণ-গাথা অনন্ত ভুবনে;

রবি-শশী-গ্রহ-তারা নির্মল কিরণে,

তোমার বিরহ-স্মৃতি জাগায় কেবল ॥২॥

কতজনে কতবিধ উপচার লইয়া,

আনন্দ লভিছে তব শ্রীচরণ পূজিয়া ;

আমি অতি দীন-হীন পূজিব গো কি দিয়া,

দহিছে হৃদয় মোর দুঃখের অনল ॥৩॥

অনুপম করুণার তুমি মূর্ত অবতার,

(লহ) করুণা করিয়া মোর প্রীতি-ভক্তি-উপহার ;

আজিকার অপ্রকট-বাসরেতে ফুলহার,

গলে দিয়ে বন্দি তব চরণ যুগল ॥৪॥

(আজি) কামনা করিয়া আসিয়াছি নাথ ?

(তব) অতুল-রাতুল চরণের তলে ।

পূজিতে তোমার চরণ-সরোজ,

অগুরু-বাসিত বিকচ কমলে ॥৫॥

তুলি' নব নব কুসুম শেফালি,

মল্লিকা-মালতী-গোলাপ-চামেলী ।

নব অনুরাগে গাঁথি' চারু-হার,

যতনে তোমার পরাইব গলে ॥৬॥

যা কিছু আমার এনেছি যতনে,

সবই নিবেদিব তোমার চরণে,

দয়া করি' যদি লহ নিজগুণে,

তবে ত ভজনে সুকুশল ফলে ॥৭॥

কোটা জনমের আকুল বাসনা,

পূর্ণ করগো করিয়া করুণা,

এই অকিঞ্চনে চরণে ঠেলো না,

স্থান দিও ওই চরণ কমলে ॥৮॥

তব দীন সেবক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নারমা (মেদিনীপুর)

অবধূত কাহিনী

এক দিবস মহারাজ যদু একটি নিষ্কিঞ্চন পরমহংস অবধূতকে দেখিয়া, মাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত কহিলেন, মহাত্মন! আপনাকে দেখিতেছি আপনি নিশ্চেষ্ট, কোন কার্যেরই চেষ্টা করেন না অথচ আপনি হাত্মমুখ, সদা সন্তুষ্ট, নির্ভয় এবং উদাসীন—ইহার কারণ আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমি যদি শ্রবণের যোগ্য হই তবে কৃপা-পূর্বক সবিশেষ কীর্তন করুন।

মহারাজ যদুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধূত ইষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,— মহারাজ ইহার কারণ আমি বলিতেছি আপনি মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।

আমি ২৪ চক্রিশতী শিক্ষাগুরু করিয়াছি। তাহাদের প্রধান প্রধান কয়েকটির কথা বলিতেছি।

আমি অজগরকে গুরু করিয়াছি। অজগর কেমন নিশ্চেষ্ট, সে নড়িতে-চরিতে পারে না, সম্মুখে যদি কোন খাত আইসে, তবে সে তাহা গ্রাস করিয়া প্রাণধারণ করে, তদ্রূপ ভগবদ্ ইচ্ছায় বিনা চেষ্টায় যাহা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।

আমার দ্বিতীয় গুরু হইতেছে সাগর। সাগর প্রশান্ত, কত নদনদী আসিয়া তাহাতে মিলিত হয়, ভাটার সময় কত শত নদী তাহাতে প্রবেশ করে, আবার জোয়ারের সময় চলিয়া যায়, তথাপি সে অচঞ্চল স্থির ও গভীর। তদ্রূপ ভগবদ্ ইচ্ছায় কত চর্য্য, চূষ্য, লেহ্য, পেষ্য নানাবিধ সামগ্রী আসিয়া থাকে, কখন বা উপবাসী থাকি, সমস্ত অবস্থায়ই আমি সাগরের স্থায় স্থির ও ধীর, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করি না।

আমার তৃতীয় গুরু পতঙ্গ। রূপজ মোহে রূপের নেশায় কি সর্বনাশ হয় তাহা পতঙ্গের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। পতঙ্গ অগ্নির রূপের নেশায় আত্মহারা হইয়া, তাহাতে যেমন পতিত হয় অননি সে ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

আমার চতুর্থ গুরু হইতেছে কুরঙ্গ। হরিণ স্তম্ভুর শব্দ শুনিতে ভালবাসে! নিষ্ঠুর ব্যাধ হরিণকে ধরিবার জন্য কাঁদ পাতিয়া স্তম্ভিষ্ট বংশীধ্বনি করিয়া থাকে। অবোধ হরিণমণ্ডলী বুঝিতে না পারিয়া, ঐ বংশীর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া পরে দুরন্ত ব্যাধের হস্তে পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে হত হয়। কত কত মায়াবদ্ধ জীব ঐরূপ শ্রীহরিকথা শ্রবণ না করিয়া, যাত্রা, থিয়াটার ও সিনেমার মধুর বাস্তব শ্রবণ করিয়া পরিশেষে ধমালয়ে নীত হয়।

আমার পঞ্চম গুরু হইতেছে ভ্রমর । ভ্রমর যেমন গন্ধ লোভে, প্রভাতে পদ্ম মধ্যে মধু পান আশায় প্রবেশ করে ; দিনমণি অবসানেও তাহার কোন হুঁস থাকে না, অবশেষে পদ্ম সঙ্কুচিত হইলে তাহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে । সেইরূপ সর্বনাশের কথা চিন্তা করিয়া কাহারও কোন লোভের বশবর্তী হওয়া উচিত নয় ।

আমার ষষ্ঠ গুরু হইতেছে মধুমক্ষিকা । মধুমক্ষিকা সমস্ত দিবস অক্লান্ত পরিশ্রমে, ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া চাকে মধু সংগ্রহ করে, এবং তাহার কাচা-বাচাকে প্রতিপালন করে । এইরূপ নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিলেও, সহসা একদিন কোন মধুহা অর্থাৎ মধুসংগ্রহকারী ব্যক্তি আসিয়া তাহার সাধের ঘর বাড়ী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার সঞ্চিত মধু সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যায় । তদ্রূপ কোন বিষয়ে আসক্তি করিতে নাই, যদি করি তবে ঐ মক্ষিকার ন্যায় কোনদিন আমার আসক্তির বিষয় সমূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে । তাই কোন অপ্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—“স্বখের লাগিয়া এঘর বাঁধিলু অনলে পুড়িয়া গেল,

অমিয় সঙ্গরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ।”

আমার সপ্তম গুরু হইতেছে মৎস্ত । মৎস্ত বড় লোভী । অতি লোভের পরিণাম বড়ই বিষম । যাহারা মৎস্ত খাইতে ভালবাসে, তাহারা মৎস্ত ধরивার জন্য বড়শীতে মৎস্তের লোভনীয় কেঁচো গাঁথিয়া জলে ফেলিয়া দেয় ; হতভাগা মৎস্ত লোভের বশবর্তী হইয়া ঐ টোপ গিলিয়া ফেলে ও পরিণামে মৎস্তাশীর হস্তে পড়িয়া জীবন হারাইতে বাধ্য হয় । যাহারা লোভের বশবর্তী হইয়া ভগবৎ প্রসাদান্ন গ্রহণ না করিয়া অমেধ্যভোজী হয়, তাহারা পরিণামে ঐ মৎস্তের ন্যায় যমদূতের হস্তে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে ।

আমার অষ্টম গুরু হইতেছে কুররী পক্ষী । একটি কুররী পক্ষী একখণ্ড মাংস আহরণ করিয়া যেমন খাইতে লাগিল, অমনি আর একটি শিকারী পক্ষী মাংস লোভে তাহাকে আক্রমণ করিল ; সে প্রাণভরে ছুটীতে ছুটীতে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল, অসংখ্য পক্ষী মাংসের লোভে তাহার পশ্চাতে আসিতেছে । হঠাৎ তাহার মুখের মাংস পতিত হওয়ায়, পক্ষীরাও চলিয়া গেল । তখন কুররী পক্ষী নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার নীড়ে ফিরিয়া গেল ।

আমার নবম গুরু হইতেছে কুমারী । একটি বিবাহ যোগ্যা কুমারী উদুখলে ধান কুটিতেছিল, তাহাতে তাহার হস্তস্থিত কঙ্কণগুলিতে বান্ বান্ শব্দ হইতেছিল ; তখন বাড়ীতে অন্ত কেহ ছিল না । ঐ কুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ

নইয়া একটি আগন্তুক বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছে জানিয়া চতুরা কুমারী মনে মনে বিবেচনা করিল—ঐ ভদ্রলোকটী আমার কঙ্কণের শব্দ শুনিয়া মনে করিবে ইহারা গরীব, ধান ভানিতেছে, ইহাদের ঘরে চাউল নাই। তখন সে দুইটী করিয়া বালা রাখিয়া অণুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তাহাতেও যখন শব্দ হইতে লাগিল, তখন শুধু দুই হাতে দুইটী মাত্র বালা রাখিয়া ধান কুটিতে লাগিল, তখন আর কোনপ্রকার শব্দ হইল না। এইরূপ বহুলোকের একত্র বসতিতে কলহের সম্ভাবনা। একাকী হইলে কোন কলহের সম্ভাবনা নাই। এ দৃষ্টান্ত শ্রীহরিনাম কীর্তনকারীর পক্ষে নহে। বহু লোকে মিলিত হইয়াই সঙ্কীৰ্ত্তন হয়। ‘একাকী আমার নাহি পায় বল, শ্রীহরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে’ (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)।

আমার দশম গুরু হইতেছে উৰ্ণনাভ। উৰ্ণনাভ নিজমুখ হইতে লাল নিঃসৃত করিয়া কেমন সুন্দর জাল নির্মাণ করে, পরিশেষে জাল নির্মাণ করিয়া ঐ জালের মধ্যেই বসতি করে; কিছু দিবসপর ঐ জাল গুটাইয়া পুনরায় নিজ উদর মধ্যে টানিয়া লয়—সেইপ্রকার শ্রীভগবানের লীলা-রহস্য কিছু জানিতে পারিলাম, তিনিও ঐ উৰ্ণনাভের দ্বারা নিজ হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বাহির করিয়া ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেই বাস করেন। পুনরায় প্রলয় সময়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া আপনাতেই লীন করেন।

আমার একাদশ গুরু হইতেছে ইষুকার। ঐ ইষুকার অর্থাৎ বাণ নির্মাতা এরূপ একাগ্র মনে বাণ নির্মাণ করিতেছিল যে তাহার পার্শ্বে রাজাধিরাজের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারে নাই। শ্রীভগবানে সেইরূপ একাগ্র ভাবে মনোনিবেশ না করিলে শ্রীভগবানের দর্শন মোলা অসম্ভব।

আমার দ্বাদশ গুরু হইতেছে পেশকার কীট। ঐ কীট (যাহাকে কাঁচ পোকা বলে) সুন্দর বর্ণে চিত্রিত। সে যখন তৈলপায়িকাকে (তেলাপোকা) ধরে, তখন ঐ তৈলপায়িকা ভয়ে পেশকারকে দেখিয়া ভাবিতে ভাবিতে তদ্রূপ রূপই প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তেলাপোকা কাঁচপোকায় রং-ই ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপ সাধক ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে তৎসাম্যে তাহার সেবা করিতে পারে।

আমার ত্রয়োদশ গুরু হইতেছে হস্তী। হস্তীসকল পর্বত-কাননে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। তাহারা অত্যন্ত বলশালী, কাহার সাধ্য নাই যে বলপূর্বক তাহাদিগকে ধরিতে পারে। কিন্তু যাহারা হস্তী ধরে, তাহারা বুদ্ধি-কৌশলে একটি কলার বাগান তৈয়ার করে, ঐ কলার বাগান ঘিরিয়া একটি হস্তী ধরিবার

ফাঁদ প্রস্তুত করে; তাহার দুইটি দরজা; একটি প্রবেশ করিবার জন্ত, অণ্ড
একটি বাহির হইবার জন্ত থাকে। হস্তী পালক একটি কুটনী হস্তিনী অর্থাৎ
স্ত্রী-হস্তীকে বশীভূত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেয়, তৎপর তাহাকে কাননস্থ
হস্তীদলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ঐ সকল মদমত্ত হস্তী কুটনী হস্তীর
স্পর্শলোভে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পরিশেষে ঐ খোঁয়ারে আবদ্ধ হয়,
হস্তীপালকগণ কোশলে ঐ কুটনী হস্তিনীকে পশ্চাৎ দরজা দিয়া বাহির করিয়া
লয়। ঐরূপ শ্রীভগবানের মায়ানির্মিত সংসার কারাগারে মায়া ভোগ করিবার
জন্ত লোভের বশবর্তী হইয়া বদ্ধ হইয়া জীবসকল চৌরাশী লক্ষ্যোনি ভ্রমণ
করিতে থাকে, পরে জীবের স্মৃতি বশতঃ সাধু-শুক্র-বৈষ্ণবের কৃপায় এই দুঃসু
গোলক ধাঁধাঁ-রূপ সংসারচক্র হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ধার পায়।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭)

ত্রিদাণ্ডস্বামী—শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রাচীনযুগেও বৈধ পশুবলি দোষাবহ

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পূর্বোল্লিখিত বেদ-পুরাণের বিধি-নিষেধ মহর্ষিদের
প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল হইলেও তাহা আজকাল খেয়ালে পরিণত হইয়াছে।
তাহার একমাত্র কারণ, সেই ঋষিবংশজাত ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার পরিত্যাগ
করিয়া বৈদেশিক চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা ও আহার-বিহারে রত হইয়াছেন।
তাহার ফলে ব্রহ্মতেজ হারাইয়া বিষহীন ভুজঙ্গের ন্যায় জীবিত আছেন মাত্র—
শাস্ত্রীয় কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞাবস্থায় তাহাদের উপদেশবাক্য
কে শুনিবে? বিশেষতঃ তাহারা প্রায় সকলেই শাক্ত, মৎস্য-মাংসলোলুপ।
কাহাকেও কোন উপদেশ দিতে গেলে নিজের প্রথমতঃ সে আচরণ থাকা
প্রয়োজন। ব্রাহ্মণের সেই সাত্ত্বিক আচরণ নাই বলিয়াই আজ কেহ তাহাদের
কথায় কোনও কর্ণপাত করে না। কিন্তু পূর্ব-পূর্ব যুগে বেদ, পুরাণ বা ঋষির
বাক্যে কেহ কোন প্রকার সন্দিহান হইলে যোগবলে ঋষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহা

প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ ও সন্দেহ দূর করাইতেন।

ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে 'শ্রীনারদ-প্রাচীনবর্হি' সংবাদে দেখা যায় শ্রীনারদের প্রিয় শিষ্য ধ্রুবের বংশজাত মহারাজ বর্হিষৎ বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এবং যজ্ঞীয় পূর্বাগ্ন কুশাস্তুরণে ক্রমে ক্রমে ধরণীতল আচ্ছাদিত করিয়া 'প্রাচীন-বর্হি' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ কৃপালু হইয়া রাজার ঐ কৰ্মনিষ্ঠার পরিণতি যোগবলে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাইয়া কৰ্মশ্রেয়োরূপ ভ্রম দূরক্ৰমে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশু ত্বয়াধ্বরে।

সংজ্ঞপিতান্ জীবসজ্জান্ নিঘৃণেন সহস্রশঃ ॥

এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে অরন্তো বৈশসং তব।

সম্পরেতময়ঃকুটৈশ্চিদন্ত্যথিতমন্তবঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৫।৭-৮)

হে প্রজাপালক রাজন্! তুমি নির্দিয় হইয়া যজ্ঞে সহস্র সহস্র পশুবধ করিয়াছ; সেই সকল জীবকে ঐ দেখ। তুমি ইহাদিগকে বধজন্তু যে পীড়া দিয়াছ তাহা স্বরণ পূর্বক ইহারাও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তোমার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি পরলোকে উপস্থিত হইলেই ইহারা লৌহযন্ত্রময় শৃঙ্গসমূহদ্বারা অবিলম্বে তোমাকে চিন্নভিন্ন করিবে।

আদি চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি চরক, তৎকৃত প্রধান গ্রন্থ চরক সংহিতার 'অতিসার'-চিকিৎসায় উনবিংশ অধ্যায়ে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—পূর্বকালে ঋষিদের যজ্ঞে পশুবধ করা হইত না। যথা—

“আদিকালে খলু যজ্ঞেষু পশবঃ সমালম্বনীয়্য বভূবুর্নালম্ভায় প্রক্রিয়ন্তে অ। ততো দক্ষযজ্ঞঃ প্রভাবরকালঃ মনোঃ পুত্রাণাং মরিষ্মনাতাগেক্ষাকু-বিশাশ-যযাত্যাदीनां क्रतुषु पशूनामेवाभ्यनुज्জानां पशवः प्रोक्षणमेवापुः” ॥ ৩৥

অর্থাৎ পূর্বকালে যজ্ঞ করণার্থ পশুদিগকে বলিযোগ্য করা হইত, কিন্তু বলি দেওয়া হইত না। দক্ষযজ্ঞেরও বহুকাল পরে মরিষ্মমান্ (মৃত্যুমুখী) নাভাগ, ইক্ষাকু, বিশাশ ও যযাতি প্রভৃতি ঋতুপুত্রদিগের যজ্ঞে পশুগণেরই অনুজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে মাত্র প্রোক্ষণ করা হইয়াছিল, হত্যা করা হয় নাই।

বিশেষতঃ সিন্ধু মহর্ষিগণ কোন কোন যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকিলেও যোগ-বলে তাহারা সেই পশুকে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত ও নবযৌবন প্রদান করিতেন। সুতরাং তাহা জীবহত্যার মধ্যে গণ্য নহে; পরন্তু সেই সেই পশু নব-যৌবন প্রাপ্ত হইয়া লাভবানই হইত। সুতরাং তাহাদের আদর্শ সাধারণের অনুকরণীয়

নহে । “তেজীয়সাং ন দোষায় বহুঃ সর্বভুজো যথা ।” অগ্নি শুদ্ধাশুদ্ধ সকল বস্তু ভক্ষণ (দধ) করিয়াও যেমন দোষী হন না, সেইরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন মহাবিগ্ণ কদাচিৎ অবৈধ কোন কার্য্য করিলেও, তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিত না । বর্ত্তমানযুগে তপস্বাদিহীন, নিঃশক্তিক ও গৃহধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যমাত্রেরই সাত্ত্বিক উপচারে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করাই বিধেয় । সাত্ত্বিকভাবে পূজা ও সাত্ত্বিক আহারাদিদ্বারাই ক্রমে ক্রমে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় । ঐকৃত পূজাফল লাভের ইহাই একমাত্র উপায়স্বরূপে বেদপুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে । যথা—

যো মোহাদথবাহজ্ঞানাং বলিমন্তঃ প্রযচ্ছতি ।

বধ এষ ফলং তস্ত নাশ্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং লভেৎ ॥ (যুক্তিকল্পতরু)

যদি কেহ অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা মোহ বশতঃ অন্য বলি (নৈবেদ্যাদি ভিন্ন জীবহত্যারূপ বলি) প্রদান করে তবে ঐ জীববধ জনিত পাপরূপ ফলটাই তাহার লাভ হয় । সে ব্যক্তি অন্য কোনও পূজাফল প্রাপ্ত হয় না ।

মহর্ষি মনুও নিজ সংহিতায় পশুবধ অবৈধ দেখাইতে গিয়া তৎসংশ্লিষ্ট সকলকেই যাতকতুল্য পাপী নির্ণয় করিয়াছেন । যথা—

অনুমত্তা বিশমিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী ।

সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি যাতকাঃ ॥ (মনু সং ৫।৫১)

পশুহত্যার অনুমোদনকারী, মাংস কর্ত্তনকারী অর্থাৎ যিনি মাংসকে খণ্ড খণ্ড করেন, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকারী ও ভোক্তা ইহারা সকলেই যাতক বলিয়া কথিত হন । মহাত্মারতের অনুশাসন পর্বেও দেখা যায়—যো হি খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈবিগাম্ ।

হতানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ ॥ (মহাঃ অনুঃ ১১৫।৩৯)

মৎস্য ও ছাগাদি পশু অন্য কর্ত্তক হতই হউক অথবা স্বয়ং মৃতই হউক, জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক হইয়া (অর্থাৎ প্রাণ-বাচাইবার জন্তও) যদি কেহ কোনও প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সে হত্যাকারীর তুল্য পাপভাগী হয় । ঐ প্রসঙ্গে আরও উক্ত হইয়াছে যে এই বধ-সংশ্লিষ্ট সকলেই সমান পাপভাগী হয় । যথা—

আহর্ত্তা চানুমত্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী ।

সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ যাতকাঃ সর্ব এব তে ॥ (মঃ অঃ ১১৫।৪২)

আহার্য্য হত্যা করিবার জন্ত পশু আহরণ করে, পশুবিনাশে অনুমতি দান করে, মাংস কর্ত্তন অর্থাৎ মাংসকে খণ্ড খণ্ড করে এবং ক্রয়-বিক্রয়-পাক ও ভোজন করে তাহার সকলেই যাতকের সমান পাপভাগী হয় । কুলার্ণবের দ্বিতীয় অধ্যায়

শিব বাক্য । যথা—

অনুমত্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী ।

সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ ॥

ধনেন চ ক্রেতা হস্তি খাদিতা চোপভোগতঃ ।

ঘাতকো ঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ ॥

অর্থাৎ পশুবধে অনুমতি দাতা, মাংস কর্তনকারী, পশুহত্যাকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেষক ও ভোজনকারী—এই আট জনই প্রাণিঘাতক । স্বহস্তে বন্ধন ও খড়্গাঘাত করার জন্য একমাত্র ঘাতকই যে বধকর্তা তাহা নহে, ধনদ্বারা ক্রয়কারী ও জিহবার লালসাবশে ভক্ষণকারী—এই তিনজনই সমান বধকর্তা বলিয়া জানিবে । যেহেতু এই বধ-কার্য্যটি উক্ত তিন প্রকারেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ।

বৈধ বলি বেদবিহিত বলিয়া বেদজ্ঞ ঋষিগণ পূর্বকাল হইতেই তাহা আচরণ করিয়া আসিতেছেন, এইরূপ বাক্য ও ক্রিয়ার সুযোগ লইয়া বৈধ বলি বা মাংস ভোজন দোষণীয় নহে বলিয়া অনেকে ধারণা করেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টম ও নবম খণ্ডে বৈধ পশুবধেরও নিবেদনমূলক কয়েকটি মন্ত্রই রহিয়াছে । নিয়ে ভাষ্যসহ তাহার দুই-একটি উদ্ধৃত হইল—

১ । “সর্বৈষাং বা এষ পশূনাং মেধেন যজতে যঃ পুরোডাশেন যজতে” ইতি ।

সায়ন-ভাষ্য :— পুরোডাশযাগ এব সর্বপশুসম্বন্ধিযজ্ঞযোগ্যহবির্যাগঃ । সর্বপশুসম্বন্ধশ্চ পুরুষং বৈ দেবা ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতঃ ।

অর্থাৎ যিনি পুরোডাশ (যবাদিচূর্ণনির্মিতপিষ্টকবিশেষ) দ্বারা যজ্ঞ করেন পশুরীরস্থ যজ্ঞীয় ভাগসকলের মেধ্য (পবিত্র) অংশদ্বারা তাহার যজ্ঞ করা হয় ।

২ । “তন্মাদাহঃ পুরোডাশসত্রং লোক্যমিতি” (৬।৯ পূর্বোংশ)

সায়নভাষ্য—যন্মাং পুরোডাশযাগঃ সর্বপশুসারভূতস্তন্মাং পুরোডাশানুষ্ঠানং লোক্যং প্রেক্ষণীয়মিতি যাজ্ঞিকা আহঃ । অতএব প্রৈষমজ্ঞে পুরোডাশমলঙ্কৃষি-
ভ্যেবমায়াতম্ ।

অর্থাৎ—যেহেতু পুরোডাশ (পিষ্টক) যাগই সর্বপশু যাগের তুল্য অতএব পুরোডাশদ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞই লোক্য (দর্শনীয় বা শাস্ত্রসম্মত) এবং সেইজন্য ঐ পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞই ইহলোক ও পরলোকের হিতকর বলিয়া ঋষিগণের অভিমত ।

বেদের এইসর মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন সময়ে অজ্ঞাদি পশুদ্বারা যজ্ঞবিধি প্রবর্তিত থাকিলেও তন্নিমিত্ত দোষের সম্ভাবনা বশতঃ ঋষিগণ তাহার পরিবর্তে ব্রীহাদি (ধাতাদি) দ্বারা যজ্ঞ করাই সমীচীন ও পরলোকের হিতকর বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে একটি পুরাতন ইতিহাসও মহাভারতের শাস্তি পর্বে বর্ণিত রহিয়াছে।—

উপরিচর বসু ও বসুধারার ইতিহাস

দেবগুরু বৃহস্পতির প্রধান শিষ্য মহারাজ উপরিচর বসু সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করত ইন্দ্রের মত পৃথিবী পালন করিতেন। বৃহস্পতি প্রমুখ প্রধান প্রধান বহু ঋষিগণের পৌরোহিত্যে তিনি মহাসনারোহের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসুরাজ অহিংসা পরায়ণ ছিলেন, সেইজন্ত তিনি ঐ যজ্ঞে পশু-হত্যা করেন নাই। অরণ্য সমুদ্র ব্রীহাদি (ধাতাদি) দ্বারাই সমুদয় যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার ঐক্লপ যজ্ঞে ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া অত্রের অলক্ষ্য মহারাজকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিস্মৃভক্ত মহাত্মা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন স্বর্গভ্রষ্ট ও ভূগর্ভে নিপতিত হইয়াছিলেন। (মহাঃ শাঃ ৩৩৬ অঃ)

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজা উপরিচর বসু অতিশয় বিস্মৃভক্ত ছিলেন। তিনি কি নিমিত্ত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন? ভীষ্ম কহিলেন—
ধর্ম্মরাজ! এক সময়ে দেবগণ ও ঋষিগণে বিবাদ উপস্থিত হয়। দেবগণ অজ (ছাগপশু) ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ঋষিগণকে বলেন। তদুত্তরে ঋষিগণ বলেন বেদে বীজের (ধাতাদির) দ্বারাই যজ্ঞ করার বিধি রহিয়াছে। ঐ বীজের নামই অজ। অতএব ছাগপশু বধ করা কখনও কর্তব্য নহে। পশু-ছেদন কখনও সাধুগণের ধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের এইরূপ পরস্পর বাদান্তুবাদ সময়ে মহারাজ উপরিচর বসু তথায় উপস্থিত হন। তখন ঋষিগণ দেবগণকে বলিলেন—বেদাদি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দান-যজ্ঞ-ব্রতাদিনিষ্ঠ ও সর্বভূত-হিতপ্রিয় এই বসুরাজ নিশ্চয়ই সত্য নির্দেশ পূর্বক আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিবেন। ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। এই বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ একত্রে উপবেশন পূর্বক উপরিচর মহারাজকে সভাপতি করত উভয় পক্ষের মত জ্ঞাপন করেন। রাজা নিজে পশুদ্বারা কখনও যজ্ঞ করেন নাই। ছাগপশু বলিদান তাঁহার অভিপ্রেতও নহে; তথাপি দেবগণের পশুবলির ইচ্ছা জানিয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করত, তিনি ‘ছাগপশুদ্বারা যজ্ঞ করাই বিধেয়’ এইরূপ নিজ অভিমত

প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সূর্য্যভূল্য তেজস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে 'স্বর্গভ্রষ্ট হও' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। ঋষিগণের শাপে বহুরাজ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গচ্যুত হইয়া একেবারে ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। রাজা বিস্মতক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। দেবতাসকল দেখিলেন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াই রাজার এইরূপ অধোগতি সংঘটিত হইল। তখন দেবতাগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—মহারাজ! তপস্বী ঋষিদের শাপ অব্যর্থ, তবে আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমরা আপনাকে বরদান করিতেছি যে, অভিশাপ দোষে যতদিন ভূগর্ভে থাকিবেন ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে স্বতধারা প্রদান করিবেন, সেই স্বত ভক্ষণে আপনার ক্ষুৎ-পিপাসা দূর হইবে। এবং এই ধারাকে লোকে 'বসুধারা' বলিয়া কীর্তন করিবে। আপনি হরিভক্ত, আমাদের বরে শ্রীহরি শীঘ্রই আপনাকে শাপমুক্ত করিবেন। (মঃ শাঃ ৩৩৭ অঃ)

গৃহভিত্তিতে বসুধারা কিজন্ত দেওয়া হয় অনেকেই তাহার কারণ অবগত নহেন। এই প্রবন্ধ পাঠে আশাকরি বসুধারা দিবার সময়ে সকলেই স্মরণ করিবেন যে—দেবতাদেশে যজ্ঞাদিতে পশুবধের কেবল মাত্র অনুমোদন করিয়াই রাজা উপরিচর বসু শাপগ্রস্ত ও ভূগর্ভে পতিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্ত বসুধারা নামক এই স্বতধারা প্রদান করিতেছি।

দেশাচার ও কুলাচার-মত নিরসন

শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অনেকেই দেশাচার ও কুলাচারের অজুহাতে পশুবলিদানের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু স্কন্দ পুরাণ তাহাদের সে ভ্রমটী বিদূরিত করিতেছেন। যথা—

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।

দেশাচার-কুলাচারেস্তত্র ধর্মো নিক্রপ্যতে ॥

অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বেদে বা স্মৃতিতে সাক্ষাৎ সমন্ধে কোনও বিধি বা নিষেধ নাই, সেই সকল বিষয়েই দেশাচার বা কুলাচার অনুসারে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান নিক্রপিত হইয়া থাকে। প্রয়োগ-পারিজাত-ধৃত স্মৃতিতেও দেখা যায়—

স্মৃতেবেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।

তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিরোধে পরিত্যজেৎ ॥

স্মৃতিবাক্য ও বেদবাক্যের বিরোধস্থলে যেমন স্মৃতি বাক্য পরিত্যাগ করিয়া

বেদবাক্যই গ্রাহ্য হয়, সেইরূপ লৌকিক বাক্য বা আচার স্মৃতিবিরুদ্ধ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। আরও দেখা যায়—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ত তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতিবরা ॥ (ব্যাসস্মৃতি— ১।৪)

অর্থাৎ—শ্রুতি (বেদবাক্য) স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যেরই তথ্য প্রামাণ্য, এবং স্মৃতিবাক্য ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতির বাক্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়।

অতএব, কালিকা, দেবী বা ভবিষ্যপুরাণাদি সাধারণ তামস-রাজস পুরাণে “অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেঘাণাঞ্চ তথা বধাং”—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিদানের বিধি থাকিলেও বেদে ও স্মৃতিতে তৎপরিবর্তে অনুকল্পরূপে পুরোডাশাদি গ্রহণের বিধান থাকায়, সামান্ত পুরাণ মত সর্বোত্তোভাবে পরিত্যাজ্য। এতরের ব্রাহ্মণের মন্তব্যেরা বেদমতে অনুকল্প বিধান সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সর্বস্মার্ত্তবরেন্য মহর্ষি মনু নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় বাহ্য বর্ণন করিয়াছেন তাহাতেও দেখা যায়—যজ্ঞাদিতে দেবতোদ্যেশে পশুবধ করিয়া সেই মাংস ভোজনের বিধি থাকিলেও, তাহা মাংসভোজন প্রবৃত্তিহীন জনগণের যথেষ্ট প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য সামান্ত অভ্যুজ্ঞা (আদেশ) মাত্র। যথা—

ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মন্তে ন চ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ॥ (মনু সং ৫।৫৬)

মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদিতে মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব তাহাতে দোষের কারণ নাই। কিন্তু ঐ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া মহাপুণ্যের কারণ। বস্তুতঃ এসকল বিষয় বর্জন করাই সর্বোত্তম জানিবে। যথা—

যো বন্ধন-বধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি ।

স সর্বশ্চ হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥

যদ্যায়তি যৎকুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ ।

তদবাপ্নোত্যত্নেন যোহিনন্তি ন কিঞ্চন ॥ (মনু সং ৫।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাণীদিগকে বধ-বন্ধনাদি-ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, সকলের হিতাভিলাষী সেই মানব চিরকাল অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দংশ-মশকাদি যেকোনও জীবকে বিনাশ না করেন তিনি বাহ্য ধ্যান করেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধানেন মন দেন,

তাঁহার সে সমুদয়ই অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে ।

পদ্মপুরাণ সাত্ত্বিক মহাপুরাণের অন্ততম গ্রন্থ বলিয়াই অভিহিত । তাহাতে দেখা যায়—

এবং নানাবিধং কৰ্ম পশোরাণভনাদিকম্ ।

কামাশয়ঃ ফলাকাজ্জী কৃত্বাজ্ঞানেন মানবঃ ॥

পশ্চাজ্জ্ঞানাসিন্ধু ছিদ্ধা ভ্রান্ত্যাশাং তামসীং সদা ।

যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ ॥ (পঃ পুঃ উঃ ১০৫ অঃ)

অর্থাৎ—যজ্ঞে ও দেবতार्চনে পশুবধাদি নানাবিধ অকার্য্য, কামনাশীল মানবগণ ফলাকাজ্জী হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ প্রথমে আচরণ করত পরে যদি কোনও সংসঙ্গে সৌভাগ্যোদয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা তামসী আশাকে ছেদনপূর্ব্বক সর্বদা যমভয় নিবারক শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ভক্তির সহিত আশ্রয় করে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইয়া থাকে ।

বিশেষতঃ দেবী, কালিকা ও ভবিষ্য পুরাণাদিতে মহিষ বলিদানের বিধি পরিদৃষ্ট হয় । তৎসম্বন্ধে তিথিতত্ত্বের টীকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাশিরাম বাচস্পতিধ্বত তিথিবিবেক নামক গ্রন্থের বচনে দেখা যায়—

ন দণ্ডাৎ মাহিষং মাসং সরজং সাধকঃ কচিৎ ।

দদদিষ্টফলং তস্মৈ কৃষ্টা হন্তি চ কালিকা ॥

সাধক কদাচ দেবীকে সরধির মাহিষমাংস বলিরূপে দিবে না । তাহা দিলে ভগবতী কালিকা কুপিতা হইয়া তাহার ইষ্টফল নষ্ট করেন অর্থাৎ সে পূজাফল প্রাপ্ত হয় না । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে মহিষ, শূকর, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মাংস কালিকালে অভক্ষ্য বলিয়াই কথিত হইয়াছে । কালিকালে পরাশর-স্মৃতি শ্রেষ্ঠ স্মৃতির অন্ততম । তাহাতেও দেখা যায়—

গজগবয়তুরঙ্গানাং মাহিষোষ্ট্রনিপাতনে ।

শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ ॥ (পরাশর সং ৬।১২)

হস্তী, গবয়, অশ্ব, মাহিষ, উষ্ট্র বধ করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক বিপ্রকে দানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে । এই সব বচন পর্যালোচনার দেখা যায় অন্ততঃ ভদ্র সমাজে মাহিষ বলি অতীব বিগর্হিত কার্য্য । তাঁহারা ঐ মাহিষ-মাংস ভোজন করেন না ; বৃথা মোহবশে দেশাচার বা কুলাচার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় ও বহু প্রচেষ্টা করিয়া বলিষ্ঠ কৃষিকার্য্যোপযোগী ও পরম উপকারী একটি জীবকে হত্যা করিয়া নিজেদের আত্মরিক প্রবৃত্তিরই পরিচয় দেন মাত্র ।

যোগসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ব্যাসদেবও দেবোদ্দেশে বলিদান কার্য্যটী মোহজনিত হিংসা (মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি) বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ।
অর্থাৎ—পশুহিংসা (দেবতৌদ্দেশে বলিদান) করিলে আমার পুণ্য হইবে—এরূপ ধারণা ঘোর তমোগুণের মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে । (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-বাসরে দীনের প্রার্থনা

(১)

যুগধর্ম্ম সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
যাঁর অবতারে আজ কলি হইল ধন্য ॥
তাঁহার চরণ যুগে করিয়া প্রণতি ।
বন্দি আজি গুরুদেব-তিরোভাব-তিথি ॥

(২)

কালচক্রে ভ্রমি' স্বপ্রকাশ-দিনমণি—
অহোরাত্র উদয়াস্তে করিয়া গমন
আবির্ভাব তিরোভাব নাম মাত্র ভেদে
অষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি করিছে রক্ষণ ॥

(৩)

অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সারাটী ধরনী
হয় যবে ভারাক্রান্ত অধর্মাচরণে ।
(প্রভু) ভূভার হরণ লীলা করেন প্রকট
ধর্ম্ম-সংরক্ষণে আর সাধু-পরিভ্রাণে ॥

(৪)

সূর্য্যোদয়ে যথা “তমঃ” করিয়া প্রণাম
ক'রে থাকে উদ্ভাসিত অখিল জগৎ ।
অস্তাচলে দিনমণি করিলে গমন
ঘনতমসাবৃত যথা ত্রিভুবন ॥

(৫)

(তেমতি) গোঁড়রবি অস্তাচলে করিলে গমন
কুসিদ্ধান্তধ্বান্তে যবে ভরেছিল ধরা ।
রূপানুগাচার্য্যগণ আসিয়া তখন
বর্ষেছিল সূসিদ্ধান্ত মন্দাকিনী ধারা ॥

(৬)

(যবে) ভোগোন্মত্তে মুগ্ধ সদা মানবের মন
কালচক্রে ভ্রমি পুনঃ প্রসিত হইল,
অমন্দ উদয়া দয়া জগতে দানিতে
যুগ-বিপর্য্যয়ে প্রভু তব আগমন ॥

(৭)

‘পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম’ ।
নিজপ্রেষ্ঠ যতিগণে দ্বারে পাঠাইয়া
ভবিষ্য এ গৌরবাণী ক'রেছ প্রচার ॥

(৮)

মূর্ত্তিমতী গৌরবাণী রূপে অবতরি'
প্রতিঘরে ইষ্টবার্ত্তা করি' পরচার ।
শোকে সমাচ্ছন্ন করি' সমগ্র মেদিনী
নিশান্ত লীলায় প্রভু ক'রেছ গমন ॥

(৯)

(১০)

হে মোর করুণামিশ্র শ্রীল প্রভুপাদ !
কোথা গেলে তুর্ণ পাব তব পরসাদ ।
তব পদযুগে মোর এই নিবেদন
প্রতিজ্ঞে পাই যেন অভয় চরণ ॥

নিজ-কর্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই
জন্মে জন্মে কৃপাদৃষ্টি সদা তব চাই ।
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে
তব ভক্তি রহ দীন সেবক হৃদয়ে ॥

দীন সেবক

—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

বর্তমান জগৎ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু

কলির তাণ্ডবলীলায় আজ সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত হইতেছে । বিজ্ঞানের দানবীয় অত্যাচারের কবলে সমগ্র বিশ্ব গ্রাহি গ্রাহি ডাক ছাড়িতেছে । নাস্তিকতা, অনাচার, অত্যাচার এবং ব্যভিচারের শ্রোত আজ দিকে দিকে প্রবাহিত হইতেছে । ইহা কি প্রলয়ের সূচনা ? যুগে যুগে শ্রীভগবান্ সুরদের রক্ষা এবং অসুরদের ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া অপ্রাকৃত নরলীলা করিয়া থাকেন । কাজেই স্তম্ভবৃক্সিম্পন্ন মানুষ জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, এই বহুবিধসমশ্রাকর্ষিত অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন স্লেচ্ছ কলিযুগে জীবগণের উদ্ধারের উপায় কি ? উদ্ধারকর্তাই বা কে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া মোটেই কঠিন নয় ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল হইতেই কলি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে । কারণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দনের আগমনের পর হইতেই আমাদের এই ধূলার ধরণীতে অতি-মর্ত্য গোলোক নামিয়া আসিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে সেই ভক্তবৎসল ভগবানের আগমনের পর হইতেই সত্যযুগ অপেক্ষাও একটা মহত্তর যুগের সূচনা হইয়াছে । কারণ তিনি মহাবদান্ত এবং তাঁহার দয়া 'অমন্দোদয়া দয়া' । তাই শ্রীগৌরপাদপদ্য আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়া মানব অতি সহজেই এযুগে উদ্ধার হইতে পারে । এখন আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে কি উপায়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ ও উপদেশাবলী অনুসরণ করিয়া আমরা বর্তমান জগতের অনতিক্রম্য লকটসমূহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি ।

আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাস্তিকতার শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । শ্রীভগবান্কে

ভুলিয়া মানুষ তুচ্ছ কাম-কাকনে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মানুষকে আজ সর্বপ্রকারে প্রেমকে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে আশ্রয় করিতে হইবে। কামই আজ মানুষের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে, কারণ কামের অর্থ হইল ভোগ। এই ভোগে শক্তি অর্জিত না হইয়া শক্তিক্ষয় হয় মাত্র। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মানুষকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। এই শ্রীকৃষ্ণ-নাম পরিত্যাগ করিয়া জীব আজ সংসারতাপদগ্ন হইয়া মরিতেছে। তাই কৃষ্ণদাস জীবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছিলেন—কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

অর্থাৎ— ‘বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।

কৃষ্ণ বিদ্যু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥

যদি আশা’ প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।

তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥

কি শরনে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।

অহনিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥’ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৬—২৮)

নিরপরাধে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাদ্বারাই মানুষ ভক্তিদেবীর করুণা-লাভে ধন্য এবং কৃতার্থ হইতে পারে। এই প্রকারে মানুষ আর জড় বুদ্ধিদম্পন না হইয়া প্রকৃত মানুষের মতই আচরণ করিতে পারে। বর্তমান জগতের কলিহত জীবের পক্ষে তারকব্রহ্মনামই একমাত্র মহৌষধ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুই প্রকৃত ভবরোগবৈদ্য।

এই নামসাধনের অধিকারী হইতে গেলে আমাদের ‘তৃণাদপি স্তনীচেন,’ ‘তরোরিব সহিষ্ণুনা,’ এবং ‘অগ্নিনিলা মানদেন’ এই কয়টি উপদেশের বাস্তব রূপায়ণ আমাদের জীবনে ঘটাইতে হইবে। জড়বাদী পাশ্চাত্যে এবং মোহাচ্ছন্ন প্রাচ্যে এত দুঃসংঘাত কিসের জন্ম? ‘আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা’ এবং ইহার অনিবার্য ফল জড় অহঙ্কারই এত বুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতের মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণনামসকীর্তনরূপ মহামন্ত্রের দ্বারা সমস্ত হিংসা, ঘেব ও লোভের মূলোচ্ছেদন করিয়া চলিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই প্রেমরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট— তিনিই মহাবদান্ত রাজরাজেশ্বর। সৈনিকেরা যেক্রপ বিনীতভাবে সেনাপতির আদেশ মানিয়া চলে, সেইরূপ আমাদেরও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ মানিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সংসার সমরাজ্যে বুদ্ধ চালাইতে হইবে। যাঁহারা আজ জগতে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁহারাই আজ জগতে প্রকৃত সম্মান পান না। আজ মানীর শিরচ্ছেদ করিতে সমগ্র পণ্ডিতই তৎপর। সিংহের

সিংহাসনে আজ শৃগাল উপবেশন করিয়াছে। এই মহদ্ ব্যক্তিদিগের অবমাননার জন্যই জগতের এত দুঃখ-দুর্দশা। কিন্তু প্রকৃত মহদ্ ব্যক্তি কে? প্রাকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অ.জ মহদ্ ব্যক্তি বলা হয়। কিন্তু শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন—

‘কৃষ্ণ জ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে
মনুষ্যে না ভঁজে কৃষ্ণ—‘পশু’ বলি তারে।’

কাজেই শ্রীগৌরনিজজনেরাই প্রকৃত মহদ্ ব্যক্তি। যে দেশে বৈষ্ণবের পূজা অর্চনা দি হয় সেই দেশই স্বর্গ। বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে ব্রহ্মাদি দেবতাও বিনষ্ট হন। কাজেই জগতে শান্তি আনিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার ভক্ত এবং পার্শ্বদেবের সহিত নিত্য পূজা করিতে হইবে। বড়রিপুর তাড়নায় আজ সমগ্র জগৎ জর্জরিত। তাই চারিদিকে অসাম্য, হিংসা, ক্রোধ এবং শ্লানির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই অহৈতুকী কৃপায় পরিপূর্ণ এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে কলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সদর্পে বলিতে হইবে :—‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥’

আজ জাতিভেদ তুলিবার জন্য পাল আমের্টে কত ভর্ক-বিতর্কই না চলিতেছে। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা এই জাতিভেদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হইবে না। জাতিভেদেরহীন সংস্কারও মহদ্ ব্যক্তিকে অপমান করিবার জন্য হাতিয়ার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি দ্বারাই জাতিভেদ উঠিতে পারে। তাই তথাকথিত জাতিভেদ বুঝিতে মহাপ্রভু কি বুঝিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা দরকার :—

“নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।

সংকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।

কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬—৬৮)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিব্যক্ত শূদ্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—“চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণঃ।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্ত বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥”

তাই বর্তমান যুগের মানুষকে সর্বদা সাবধানে আপনার হিতচিন্তা করিতে হইবে এবং শ্রীমন্নুহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে—

নমো মহাবদাত্মায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরস্থিষে নমঃ ॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

হুগলী মহসীন কলেজ,

৪র্থ বর্ষ, কলাবিভাগ ।

জ্ঞানকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৮০ পৃষ্ঠার পর)

[ব্যক্তিগত নিবেদন :—ন্যূনাধিক প্রায় দুই বৎসর কাল উত্তর প্রদেশে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাঁসি নগরে শ্রীশ্রীমন্নুহাপ্রভু গৌরসুন্দরের বাণী প্রচারকল্পে League of Devotees নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বহু সময় নিযুক্ত হওয়ার শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক বর্গের নিয়মিত সেবা হইতে কিছু অন্তরে ছিলাম । অবশ্য ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য—সমস্তই অদয় জ্ঞানতত্ত্ব সম্বৃত্ত হওয়ার ভগবৎ সম্বন্ধে একটি কার্য আর একটি কার্য হইতে পৃথক হইলেও, কিছুদিনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মিত সেবা করিতে অসমর্থ ছিলাম । সেজন্য আমি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহদয় পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । উক্ত League of Devotees প্রতিষ্ঠানের যেটুকু অস্ববিধা ছিল, তাহা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদান কেশব মহারাজ কৃপা করিয়া দূর করিয়া আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন । তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব স্বীকার করায় আমি নিজেকে অনেকটা স্তব্ধ মনে করিতেছি এবং আশা করি অতঃপর নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিতে আর কোন বাধা হইবে না ।]

“সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ পূরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীবিষ্ণু-পুরাণে এক বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে । স্বধা—(১ম অঃ ২২ অঃ ৫৬ শ্লোক)

একদেশস্থিতশ্রাণ্ণেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরশু ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥

‘একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি

সকল সেইরূপ অখিল জগদ্রূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' এই সকল বিবিধ শক্তি হইতে পরব্রহ্মকে বঞ্চিত করিয়া মায়াবাদী সম্প্রদায় যে জ্ঞানালোচনার অভিনয় করেন তাহা জ্ঞানকথার শিশুবোধ পাঠ্য পুস্তক মাত্র। মায়াবাদিগণের জ্ঞান, শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় poor fund of knowledge, অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ প্রযুক্ত পরমব্রহ্মের ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণতার অনুভব হয় না। সেইজন্য সেই অসম্যক জ্ঞানিগণকে বা নির্বিশেষবাদী দার্শনিকগণকে, তাঁহাদের অসম্যকতা হইতে উদ্ধার করিয়া কৃপা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা স্তুত্বভঃ ॥ (গীঃ ৭।১৯)

মোল্লার দৌড় মস্জিদ পর্য্যন্ত ; জ্ঞান লইয়া যে জ্ঞানকথার (৭) আলোচনা অর্থাৎ নেতি নেতি বিচার দ্বারা স্বং পদার্থ জ্ঞানের যে বিকাশ তাহা তৎ পদার্থের জ্ঞান হইতে অনেক দূরে। সেইপ্রকার সম্যক জ্ঞানলাভ আশ্রয়িত বৃত্তিতে কখনই সম্ভবপর হয় না। আশ্রয়িত বৃত্তিতে অর্থাৎ ভগবানকে নির্বিশেষ করিবার অভিপ্রায়ে যে জ্ঞানকথার বিকাশ হয় তদ্বারা কোন পূর্ণজ্ঞান বা অদ্বয় জ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না। সেইপ্রকার অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বৈষ্ণবগণই পাইতে পারেন। তাহার কারণ নির্বিশেষবাদিগণ যখনই ভগবানের চিদগুণের সন্ধান পাইবে তখনই তাঁহাদের ভগবৎ সেবার সুযোগ লাভ হইবে।

আত্মারামাশ্চ যুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে ।

কুব্ধত্বহৈতুকীং ভক্তিমিথস্তৃতগুণো हरिः ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

সেই প্রকার চিদগুণাক্রষ্ট জ্ঞানী মহাত্মা খুবই বিরল। যিনি বাসুদেবকে নির্বিশেষ করিবার চেষ্টা না করিয়া অখিল জগৎ তাঁহারই বিবিধ শক্তির পরিণাম বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ভগবানের চরণে প্রপত্তি করেন। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ কখনও মহাত্মা শব্দে পরিচিত হইতে পারেন না। নির্বিশেষবাদিগণ যখন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ চিংসবিশেষ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন তখনই তাঁহারা মহাত্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারিবেন। মহাত্মা বৈষ্ণব আচার্য্যগণ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'যাকো যাহা বুঝাইবার প্রয়াস করেন তাহা এইরূপ ; যথা—

বিশিষ্টা দ্বৈত দর্শনে জৈশ্বর্য, চিং ও অচিং ত্রিবিধ বিভাগে নিজশক্তি দ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না

করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত শক্তিমান্ সর্বিশেষ বস্তু। স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-বিশেষত্বে তিনি নিত্য বিরাজমান। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় বা শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমহাআগণ বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত শ্লোকের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভগবান্ একদেশস্থিত অগ্নিস্বরূপ। চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিবিধ শক্তিগণের সমন্বয় মাত্র এবং সেই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ ভগবানের শক্তির পরিচয় মাত্র। সমস্ত শক্তির আধার ও নিয়ন্তৃ-স্বরূপ ভগবান্ নিত্য সর্বিশেষ তত্ত্ব পুরুষোত্তম—ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। সেইপ্রকার পরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট মহাআগণই চিৎশক্তির আশ্রয়ে নিত্যকালই ভগবৎ সেবা কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্তমনসো জ্ঞান্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্ত্যন্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ (গীঃ ৯।১৩-১৪)

পরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ যে পদবী লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে নিত্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন তাহাই ঘটপটিয়া নেতি নেতি বিচার-সম্পন্ন কনিষ্ঠাধিকারী জ্ঞানিগণের মৃগ্যবস্তু হওয়া আবশ্যক।

গতসঙ্গস্ত মুক্তস্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিনীরতে ॥ (গীঃ ৪।২৩)

‘যজ্ঞায়াচরতঃ’ কৰ্ম্ম-ই ভগবদ্ভজন। যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণু সেবার আনুকূল্যে সমস্ত কৰ্ম্মই জড়ধৰ্ম্ম-মুক্ত সম্পূর্ণজ্ঞানাবস্থিত চেতনবিশিষ্টগণের পক্ষেই সম্ভব।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (গীঃ ৭।১৭)

একমাত্র ভক্তিপরায়ণ জ্ঞানী ভক্তগণ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন মুক্ত পুরুষ মহাআগণ যারা সদাসর্বদাই ভগবৎ সেবা কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদেরও সেইপ্রকার চিল্লীলাবিশিষ্ট ভগবান্ অত্যন্ত প্রিয়।

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী যদি কোন প্রকার স্বকৃতিদ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তবেই তিনি ভগবানের প্রিয় হন। কিন্তু নির্বিশেষবাদী যত-ক্ষণ ভগবানকে নিঃশক্তিক করিবার চেষ্টা করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হওয়া ত দূরের কথা, মহাত্মা নামে পরিচিত হওয়া ত দূরের কথা, মায়া-

দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া আসুর ভাবাশ্রিত অজ্ঞান মূঢ় দুরাচারগণের মধ্যে পরিগণিত হয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ মহাত্মা নহেন, এবং ভগবানের প্রিয়ও নহেন। তাঁহারা ভগবদপরাধী সাধারণ জীব মাত্র। ‘জ্ঞান’ এই কথাটি প্রযুক্ত হইয়া বেদাদিশাস্ত্রে যেখানেই যাহা আলোচিত হউক না কেন, তাহার অর্থ ‘সম্বন্ধ’-জ্ঞান, নির্বিশেষ জ্ঞান নহে। ‘সম্বন্ধ’-জ্ঞানের পর যে অভিধেয়-জ্ঞান তাহাই মুক্তগণের পরিচর্য্যার বিষয় এবং অভিধেয় জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থাই কৃষ্ণপ্রেমা,—তাহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।

আধুনিক নব্য আচার্য্যগণ (৭) যাহারা নিজ-চেষ্টায় ভগবানকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ কিছু লাভ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। তাহার কারণ এই যে, শ্রীঅরবিন্দের মৃগ্য-বস্তু নাকি এই জড় জ্ঞান নহে! মায়াবাদিগণ জড় জ্ঞানের সাম্য অবস্থায় পৌছিবার চেষ্টা করেন মাত্র; কিন্তু তাহার পর তাঁদের নির্বিশেষ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ব্যতীত আর কিছু পূঁজী নাই। তাহাদের জানা নাই যে, রোগ মুক্তিটাই সবচেয়ে বড় কথা নহে। পরন্তু রোগ-মুক্তির পর যে সুস্থ জীবন এবং তাহার সবিশেষত্বই যে লক্ষ্য বস্তু, তাহা তাহাদের অগম্য বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ এইপ্রকার সীমাবদ্ধ বিচার কিছুটা অতিক্রম করিয়া Supramental consciousness এর কথা তাঁর Life Divine আদি গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মতে ভগবানের চিহ্নিত্তি-বিকাশের একটা ছায়া চেষ্টা মাত্র। তিনি ভগবানের চিহ্নিত্তির বিষয় স্বীকার করিয়াছেন এইজন্যই আমরা তাঁহাকে কতকটা আদর করি। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থে এই চিহ্নিত্তির বিষয় যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা আজকাল বহুলোকেই বোধগম্য হয় না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষা (ইংরাজি) খুব সরল হইলেও সকলে তাঁহার গম্ভীর ভাব বুঝিতে পারে না। যাহারা বৈষ্ণবদর্শন, যথা—বিশিষ্টাষ্টৈত দর্শন, শুদ্ধাষ্টৈত দর্শন, তৈতাষ্টৈত দর্শন, শুদ্ধাষ্টৈত দর্শন এবং সর্বপরিশেষে শ্রীশ্রীগৌরমুন্দরের অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শন সম্বন্ধে সামান্ত্রমাত্রও আলোচনা করেন নাই এবং বিশেষতঃ যাহারা কেবলমাত্র মায়াবাদাশ্রিত ব্রহ্মানুসন্ধানপর মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত, তাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দের অনেক চিন্তাশ্রোতাই বৈষ্ণবদর্শন হইতে গৃহীত, যদিও তিনি যোগী ছিলেন,—সুতরাং দ্বৈতবাদী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Light on Yoga-গ্রন্থে ‘The Goal’ প্রবন্ধের

একস্থানে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—“In order to get dynamic realisation it is not enough to rescue the Purusha from the subjection to Prakriti. One must transfer the allegiance of the Purusha from the lower Prakriti with its play of ignorant forces to the supreme Divine Shakti—the mother.”

“It is a mistake to identify the mother with the lower Prakriti and its mechanism of forces. Prakriti here is a mechanism only which has been put forth for the evolutionary Ignorance. As the ignorant mental, vital, or Physical being is not itself the Divine, although it comes from the Divine—so the mechanism of Prakriti is not the Divine mother. No doubt something of her is there in and behind this mechanism maintaining it for the evolutionary purpose but what she is in herself is not a Shakti of Avidya, but the Divine Consciousness, Power, Light, Para-Prakriti to whom we turn for the release and divine fulfilment.” * * * *

“If the supermind were not to give us a greater and completer truth than any of the lower planes, it would not be worth while trying to reach it. Each plane has its own truths. Some of them are no longer true on higher plane: e. g. desire and ego were truths of the mental, vital and physical Ignorance—as man there without ego or desire would be a masic automation. As we rise higher, ego and desire appear no longer as truths, they are falsehoods disfiguring true person and the true will. The Struggle between the powers of Light and the powers of Darkness is a truth here as measured above—it becomes less and less of a truth and in the supermired it has no truth at all. Other truths remain but change their character, importance, place in the whole. The difference or contrast between the Personal and Impersonal is a truth of the overmired—there is no separate truth of them in the supermired, they are inseparably one. But one who has not mastered cannot reach the supramental truth. The incompetent pride of mans' mind makes a sharp distintcion and wants to call all else untruth and leap atonce to the highest truth whatever it may be—but that is an

ambitious and arrogant error. One has to climb the stairs and rest one's feet firmly on each step in order to reach the summit."

অর্থাৎ—যদি আমরা প্রকৃত জীবন চাই তাহা হইলে আমাদেরকে কেবল-মাত্র মায়ার কবল হইতেই মুক্ত করাই একমাত্র কার্য্য নহে। আমাদের অপরা বা অচিৎ শক্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরা বা চিৎ শক্তির অধীন করিয়া দেওয়াই আমাদের লক্ষ্যবস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন শিক্ষায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উপদেশ করিয়াছেন যে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠার কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে মায়া যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র রূপাতে যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে রূপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ ॥

—শ্রীঅভয়চরণ দে ভক্তিবাদান্ত (ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ

কংসটীলা, গণেশপুরা, পোঃ মথুরা, জেলা মথুরা, ইউ পি

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫৪, বাং ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৬১ সাল, সোমবার, জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ দিবসে মথুরা সহরের অন্তর্গত ড্যান্সিংয়ার পার্ক ও বড় হাসপাতালের সম্মুখে প্রসিদ্ধ কংসটীলার দক্ষিণ পার্শ্বে (২ খানি বাড়ীর পরে) হোলি গেট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বড় পোষ্ট অফিস, ষ্টেটবাস-ষ্ট্যাণ্ড ও বাজার প্রভৃতির সন্নিহিতে এবং মথুরা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনের অনতিদূরে দোতলা ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত একখান বৃহৎ হল সমেত ৩৬টি কক্ষ সম্বলিত একটি বিরাট অট্টালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মথুরা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে ১ ফাল্গু এর মধ্যে, বড় রাস্তার পূর্বপার্শ্বে এই বিরাট মঠ ভবন অবস্থিত। ইহা মথুরা সহরের সর্বপ্রসিদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।

এই স্থান হইতে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি সমগ্র পশ্চিম প্রদেশে ধর্মের অসদাচার নিরোধ ও শ্রীমদ্ভাগবতের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিদর্ম প্রচার করিতে সক্ষম করিয়াছেন এবং শীঘ্রই এই স্থান হইতে শ্রীগোড়ীয় পত্রিকার হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

পরম গুরুদেবে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ৩ বিষ্ণুপাদ পরমহংস চূড়ামণি

১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোহামী ঠাকুরের

অষ্টাদশ বিরহ-বাসরে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে

আতি-কুসুম

—::—

নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীন-তারিণে ।

রূপাঙ্ঘ্র-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বাস্ত-হারিণে ॥

দিনমণি অস্ত গেলে যেমতি ধরায়,
নিশাচর পিশাচাদি আবির্ভূত হয়,
তেমতি হে সুপ্রথর সিদ্ধান্ত ভাস্কর,
তোমার প্রয়াণে আজি নাচে কলিচর ॥

সিদ্ধান্ত-রবির তেজঃ সহিতে না পেরে,
মুকায়িত ছিল যা'রা পর্বত-কন্দরে,
তোমার গমনে আজি সেই দুরাচার,
আসে ছুটি' প্রসিবারে শুদ্ধ অবিচার ॥

ছলধর্ম্য অপধর্ম্য কুধর্ম্যাদি মত,
সহজিয়া গুরুদ্রোহী ইঁচড়েপাকা যত,
সখাভেকী সখিভেকী জগৎ-জঞ্জাল,
ছড়াগানে মত্ত হ'য়ে নাচে মাতোয়াল ॥

পারগুতা, সর্বসাম্য, দীন-নারায়ণ,
চিৎজড়-সমন্বয়, জগৎ-মোহন-
মায়াবাদ, শূন্যবাদ বুদ্ধের-ভাবণ,
পুনঃ আজি আরঙিল তাণ্ডব-নর্তন ॥

তুমি মূর্ত গৌরবাণী সরস্বতী-রূপা,
ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিময়ী, কৃষ্ণপ্রেমময়ী,
বেদময়ী, নিত্যরাধ্যা চিৎস্বরূপিণী,
সমুজ্জল হেম-কান্তি অজ্ঞান-হারিণী ॥

তব পাদস্পর্শে ধরা লভেছিল শাস্তি,
জীবকুল লভেছিল ভবনাশ সুখ,
সজ্জনের ঘটেছিল প্রেমানন্দ সঙ্গ,
সবে আজি বর্ষে অশ্রু হ'য়ে সঙ্গ ভঙ্গ

কি অভাব ঘটিয়াছে কা'রে বা জানাব,
মর্যী বিনা এ বেদন কা'রে বা কহিব,
জ্ঞান-কর্ম্মে মত্ত যা'রা তা'রা না বুঝিবে,
ভকতিসিদ্ধান্ত তথা কছু না স্মরিবে ॥

ভকতিবিনোদপ্রাণ ভকতিসিদ্ধান্ত,
তাতে রতিহীন যারা হয় মায়াবন্ত,
তারা না বুঝিবে কছু সিদ্ধান্ত-মহিমা,
নয়নমণিবিহীনে সবে বলে কাণা ॥

তুমিত স্মরিছ সদা নিজপ্রার্থ মাঝে,
রূপ-কান্তি-তেজোহিত্তিম মনোহর সাজে,
ভকতিপ্রজ্ঞানকেশব তদভিন্ন জানি,
রোষিবারে অপধর্ম্য কুধর্ম্মের গ্লানি ॥

সদা নত থাকি যেন সে-পদ যুগলে,
অমায়ায় কর কৃপা এদীন পামরে,
সেবি যেন রাজ্যপদ দিয়া মন প্রাণ,
আতি-কুসুমের মোর হয় এই দ্রাণ ॥

দাসাঙ্ঘ্রদাসাঙ্ঘ্রদাস—শ্রীভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও উর্জ্জব্রত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেরই চাতুর্মাশ্রব্রত একান্ত পালনীয়—শ্রীমন্নহাপ্রভু স্বয়ং এই ব্রতের বিশেষ সম্মান করিয়া জগতে ইহাই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ চাতুর্মাশ্রের শেষ মাস অর্থাৎ কার্তিক মাস সর্বসাধারণের সবিশেষ আদরণীয়। কারণ এই কার্তিক-ব্রত বা উর্জ্জব্রত পালন দ্বারা শ্রীরাধাধারীণীর বিশেষ কৃপা লভ্যা হয়। এই ব্রত গৃহে থাকিয়া পালন করা কর্তব্য নহে; কোন না কোন তীর্থে পালন করিবার জগুই শাস্ত্রে অনুশাসন আছে। যথা—

ন গৃহে কার্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্তিকম্।

তীর্থে তু কার্তিকীং কুর্য্যৎ সর্বযত্নেন ভাবিনি ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

তদনুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ষে বর্ষে এই ব্রতপালন কালে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কানী, কান্ধী, অবন্তিকা, দ্বারাবতী প্রভৃতি কোননা কোন তীর্থে বাস ও শ্রীবিষ্ণুর পূজা, শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণ, শ্রীবৈষ্ণব সেবন ও দর্শন এবং শ্রীবিষ্ণু মন্দির ও বিষ্ণুধামাদি পরিক্রমণ করিয়া থাকেন এবং জগদ্বাসীকেও এই পারমার্থিক মঙ্গল ক্রান্তির সহায়তা করিয়া তাহাদের পরম স্বাক্ষরের পরিচয় দিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও অপস্বার্থাক ব্যক্তিগণ পরমার্থ কি তাহা জানে না। অনর্থকে পরমার্থ ভ্রম করত কেবলমাত্র দন্ধোদর পৃষ্ঠি এবং আপাতঃ সুখকর ইন্দ্রিয়-তর্পণের বহুমানন করিয়া তাহারা অদূরদর্শিতা ও মূঢ়তারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে মাত্র। ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-কর্ম্মময় শত শত চেষ্টার দ্বারা তাহারা পক্ষে নিপতিত হস্তীর স্থায় উত্তরোত্তর দুঃখপঙ্কেই প্রোথিত হইতেছে, ইহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না।

বর্তমান বর্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, আচার্য্যদেব ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচালনায় গয়া, কানী ও প্রয়াগ তীর্থ দর্শন করত শ্রীমথুরা মণ্ডলে তথা শ্রীব্রজমণ্ডলে উর্জ্জব্রত পালন ও বাসযোগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। যাত্রীগণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী প্রমুখ সাধু মুখ-নিঃসৃত সঙ্কীর্্তন শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এবংসর শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা করায় ইহা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে। তদুপরি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আরাধ্য শ্রীমন্নহাপ্রভুর বিজয় বিগ্রহের স্নেহমাখা হস্তযুক্ত বদনকমলের অঙ্গপদ দর্শন লাভ

ও অভয় পাদপদ্মের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাত্রীগণ সর্বদা বৈকুণ্ঠ পরিবেশে অবস্থান করিয়াছেন।

২২শে আশ্বিন, ৯ অক্টোবর, শনিবার রাত্র ১০ টায় দিল্লী এক্সপ্রেসে ৫৬৩৭ নং রিজার্ভ বগী গাড়ীতে সমিতি হাওড়া হইতে যাত্রা করেন। গাড়ীখানিতে বৈভ্যতিক পাখা ও আলোর সুবন্দোবস্ত এবং যাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত যায়গা থাকায় সকলেই অতীব আরামে পথভ্রমণ করিয়াছেন। পরদিবস ২৩ আশ্বিন অপরাহ্নে শ্রীমন্নহাশ্রমের স্মৃতিবিজ্জরিত গয়াতীর্থে উপস্থিত হইয়া ফল্গুনদীতে স্নান, শ্রীশ্রীগদাধরের পাদপদ্ম বন্দনাদি এবং শ্রীল শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গোড়ীয় মঠ দর্শন করেন। গয়া হইতে ভোরে রওনা হইয়া যাত্রীগণ পরদিবস ২৪শে আশ্বিন কাশীতে অবতরণ করেন। তথায় শ্রীচৈতন্যবট, তপনমিশ্র ভবন, বিন্দুমাধব ও বিশ্বনাথ দর্শন ও পূজা এবং দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নানাদি কৃত্য সমাপন করেন। দর্শনাদি সমাপনান্তে যাত্রীগণ রিজার্ভ গাড়ীতেই প্রসাদ সেবা এবং রাত্রিযাপন করিয়া পরদিবস ২৫শে আশ্বিন প্রাতে এলাহাবাদভিমুখে যাত্রা করেন ও বেলা ১০টায় প্রয়াগ ষ্টেশনে পৌঁছেন। তথায় ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান ও মস্তক মুণ্ডনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া বিন্দুমাধব ও শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী দর্শনীন্তে সকলে এলাহাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং পূর্ববৎ রিজার্ভ গাড়ীতে রাত্রিযাপন করত পরদিবস ২৬শে আশ্বিন ভোরে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া রাত্র ১০ টায় আগ্রা ছাওনী ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ২৭শে আশ্বিন যাত্রীগণ আগ্রার ইতিহাস বিখ্যাত তাজমহল ও কেল্লা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যায় আগ্রা হইতে যাত্রা করেন এবং রাত্রে মথুরা জংশন ষ্টেশনে উপস্থিত হন। পরদিবস ২৮ আশ্বিন প্রাতে তাঁহারা উক্ত রিজার্ভ বগী পরিত্যাগ করত মথুরা সহরস্থিত হালনগঞ্জে ছিপিওয়ালা ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী ও যাত্রীগণ সমক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনরূপে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে ১৥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৯শে আশ্বিন যাত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান—আদিকেশ মন্দির, দীর্ঘবিষ্ণু, অনন্তপদ্মনাভ, বরাহদেব, বিশ্রামঘাট ও দ্বারকেশ মন্দিরাদিতে দর্শনাদি করেন।

৩০ আশ্বিন যাত্রীগণ ধ্রুবঘাট, ধ্রুবটীলা, সপ্তর্ষিটীলা, পিপ্পলেশ্বর মহাদেব, রত্নেশ্বর মহাদেব, কংসটীলা (কংসবধস্থান), ভূতেশ্বর মহাদেব, সরস্বতীকুণ্ড, চামুণ্ডামন্দির ও গোকর্ণেশ্বর মহাদেব দর্শন করেন।

১লা কার্ত্তিক প্রাতে মধুবন পরিক্রমাকালে ধ্রুবটীলা, মধুকুণ্ড ও শ্রীদাউজী

বিগ্রহ দর্শন করেন। অপরাহ্নে বাসযোগে লৌহবন, মহাবনস্থিত গোকুলের ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যমলার্জুন-ভঞ্জনস্থলী, যোগমায়াদেবী ও প্রাচীন নন্দালয় দর্শন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন পথে রাওল গ্রামে শ্রীরাধাধারী জন্মস্থান দর্শন করেন। যাত্রীগণ রাওল হইতে বরাবর শ্রীবৃন্দাবনে পরমহংস আশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। যাত্রীগণ এখানে ১৪ই কার্তিক পর্যন্ত অবস্থান করিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্তন শ্রবণ ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন করেন। তাঁহারা এখানে শ্রীশ্রীমদনমোহন, শ্রীসনাতনগোস্বামীর সমাধি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, নিকুঞ্জবন, ঈশলিতলা, শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীল ভগবৎ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল জীবগোস্বামীর সমাধি, শ্রীল রূপগোস্বামীর সমাধি ও ভজনকুটীর, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সমাধি, শ্রীবিষ্ণুনাথ ঠাকুরের সমাধি, বংশীবট, গোপেশ্বর শিব প্রভৃতি দর্শন করেন। গোবিন্দ ও গোপীনাথ মন্দিরে ভেট চাওয়ার সমিতির পক্ষ হইতে ভাহার প্রতিবাদ করা হয় এবং দর্শনার্থ মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া সকলেই দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করত প্রত্যাবর্তন করেন। এই স্থানে অবস্থান কালে ৭ই কার্তিক তারিখে ভাতরোল (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যাজ্ঞিকপত্নীগণ আনিত অন্ন ভোজনের স্থল) ও অকুর ঘাট দর্শন করেন। পরদিবস ৮ই কার্তিক সকলে পঞ্চকোশী বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন। ৯ই কার্তিক যাত্রীগণ কেশীঘাটে যমুনা অতিক্রম করিয়া বেলবনস্থ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির দর্শন করেন এবং তথা হইতে তাঁহারা মান-সরোবর দর্শন করিয়া বাসাস্থলে প্রত্যাবর্তন করেন। কেহ কেহ বেলবন হইতে ঝাঠবন ও ভাণ্ডীর বন পরিক্রমা করিয়া মান-সরোবরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১০ই কার্তিক উক্ত পরমহংস আশ্রমে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আহুত ও রবাহুত সকলকেই নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

১৫ই কার্তিক ভক্তগণ বাসযোগেবৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনে আসেন ও দান-ঘাটী ধর্মশালায় বাসা গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে তাঁহারা চাকলেশ্বর শিব, সনাতন প্রভুর ভজনকুটীর, শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ, শ্রীহরিদেব, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা প্রভৃতি দর্শন করেন। পরিক্রমাকালে যাত্রীগণ মুখারবিন্দে শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্ধ্যা-রতি দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করেন। ১৬ই কার্তিক সকলে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালে গোবিন্দকুণ্ড ও তীরবর্তী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিশ্রামস্থল, স্নেচ্ছতরে ভীত সেবককর্তৃক গোপালদেবকে লুকায়িত রাখার কুঞ্জ, অরভিকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনাদি করেন।

১৭ই কার্তিক যাত্রীগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের উত্তরার্দ্ধ পরিক্রমাকালে উদ্বকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও তৎ-তীরবর্তী সমস্ত দর্শনীয় স্থান দর্শন ও পরিক্রমা করেন। সর্বপ্রথমে সকলে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিগিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠে উপস্থিত হন তৎপর শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর

সমাধি, স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ, ললিতাকুণ্ড, অষ্টমথিকুণ্ড, শ্রীমন্নহাপ্রভুর উপবেশন স্থল, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত রচনার স্থল, শ্রীজীব গোস্বামীর ভজনকুটীর, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজনকুটীর, বৃক্ষরূপী পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি দর্শন ও শ্রীকুণ্ড স্নান-স্পর্শনাদি করেন। পরিক্রমাকারী মহারাজগণ শ্রীকুণ্ড ও তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্য কীর্তন ও বক্তৃতামুখে সমবেত সকলের নিকট অনুবর্ণন করেন। তথা হইতে কুসুম সরোবর দর্শন করিয়া তাঁহারা দানঘাটী ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করেন ও গোবর্দ্ধন পরিক্রমা সমাপ্ত করেন।

১৮ই কার্তিক যাত্রীগণ বাসযোগে শ্রীনন্দগ্রামে উপস্থিত হন। অপরাহ্নে তদ্রূপ চরণ চিহ্ন, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, পাবন সরোবর, উদ্ধব কেয়ারী ও শ্রীশ্রীনন্দালয় প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমা করেন।

১৯শে কার্তিক যাত্রীগণ শ্রীবৃষভানুপুরে শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির, শ্রীবৃষভানুরাজভবন, শ্রীকুণ্ড দর্শন ও পরিক্রমা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপথে সঙ্কেতে উপস্থিত হন এবং তথায় রাসস্থলী প্রভৃতি দর্শনাদি করিয়া নন্দগ্রামের ধর্মশালায় আগমন করেন। পরদিবস সকলে শ্রীকাম্যবন পরিক্রমা করেন।

২১শে কার্তিক প্রাতে যাত্রীগণ খদিরবন পরিক্রমা করেন। তথায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সেবাদর্শের বিষয় আলোচিত হয়। তথা হইতে সকলে যাবটে আশ্রান ঘোষের ভবনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীবিগ্রহের পূজা বিধান করত সকলে কোম্পী ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীএকাদশীর অনুকল্প গ্রহণ করেন এবং ট্রেনযোগে শ্রীমথুরার হেলনগঞ্জ ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া ২৪শে কার্তিক ১০ নভেম্বর বুধবার শ্রীদামোদর-ব্রত, নিরমসেবা বা উর্জব্রত এবং শ্রীচাতুর্মাশ্র ব্রত সমাপ্তির উৎসব করত বেলা ১—৩২ মিঃ এ তুফান একত্রেসে রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রীগণ শ্রীমথুরা তথা শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পরদিবস ১১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫—১৫ মিনিটে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। অধিকাংশ যাত্রী ব্যাংগোল ষ্টেশনে নামিয়া স্ব-স্ব গৃহে গমন করেন।

মথুরা এবং বাঁসিতে মঠ স্থাপনের জন্য নিয়ামক মহারাজ এবং পত্রিকার সম্পাদক মহারাজ প্রভৃতি ৭৮ মূর্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পরিক্রমা দলের সহিত প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩ই ডিসেম্বর জগদগুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিকান্ত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে মথুরা কংস-টীলায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৬ই ডিসেম্বর ঋজুপুর্বাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, বাৎসরিক ২১০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ১০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি দ্রুত তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নামের উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমদ্ব্যাকরণ প্রভুর আচারিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সংসমালোচনা আদরণীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক্ পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অমর ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অমর, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। মূল্য ৯৮ নয় টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত-সীধু-মধুরাস্বাদঃ সদা যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥২॥

প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি-যুগং নভিস্থিতি-জয়ং কর্তুং মনোহৃত্যম্মুকং
সায়ং গোষ্ঠমুপাগতং বনভুবো দ্রষ্টুং নিজ-স্বামিনং ।
প্রেমানন্দ-ভরেণ নেত্র-পুটয়োধায়া চিরাৎ যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৩॥

রাত্রৌ শ্রীজয়দেব-পত্ন-পঠনং তদগীত-গানং রসা-
স্বাদো ভক্ত-জনৈঃ কদাচিদভিতঃ সংকীৰ্তনে নর্তনং ।
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-কেল্যানুভবাদ্ উন্মিত্তা যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৪॥

নিদেত্যক্ষরয়োদ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্তং ন যৎকর্ণয়োঃ
সাধুনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যবহং ।
বিশ্বাস্তং জগদেব যস্য ন পুনঃ কুত্রাপি দোষগ্রহঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৫॥

যঃ কোহপ্যস্ত পদাঙ্কয়োনিপতিতো যঃ স্বীকরোত্যেব তং
শীঘ্রং স্বীয়-কৃপা-বলেন কুরুতে ভক্তৌ তু মহাস্পদং ।
নিত্যং ভক্তিরহস্য-শিক্ষণ-বিধিষ্যন্ত্য স্বভূতেষু তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৬॥

সর্ববান্ধৈন'ত-ভৃত্য-মুর্খি কৃপয়া যস্য স্বপাদার্পণং
স্মিত্বা চাকু কৃপাবলোক-সুধয়া তন্মানসোদাসনং ।
তৎপ্রেমোদয়-হেতবে স্বপদয়োঃ সেবোপদেশঃ স্বয়ং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৭॥

রাধে ! কৃষ্ণ ! ইতি প্লুত-স্বর-যুতং নামামৃতং নাথয়ো-
জিহ্বাগ্রে নটয়নিরন্তরমহৌ ! নো বেত্তি বস্তু কচিৎ ।
যৎকিঞ্চিদ্ ব্যবহার-সাধকমপি প্রেমৈব মগ্নোহস্তু যঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যা বনৌ ॥৮॥

ত্বংপদান্বজ-সীধু-সূচকতয়া পট্যাক্টকং সর্ববথা

যাতং যৎপরমাণুতং প্রভুবর ! প্রোচৎ-কৃপা-বারিধে । ।

মচেতোভ্রমরোহবনস্য তদিদং প্রাপ্যাবিলম্বং ভবৎ-

সঙ্গং মঞ্জু-নিকুঞ্জ-ধান্নি যুষতাং তৎস্বামিনোঃ সৌরভম্ ॥৯॥

শ্রীরাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি প্রতিদিন শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করেন এবং স্বহস্তে সেই তুলসীদেবীর পিণ্ডিকা [অর্থাৎ বেদি] লেপন করেন, অনন্তর তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলকে স্মরণ করেন এবং স্বয়ংই ইষ্টসেবা নিমিত্ত বহুবিধ পুষ্পচয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥১॥

যিনি মধ্যাহ্নে প্রতিদিন অভীষ্ট-যুগলের চরণ-কমল-ধ্যান ও অর্চন, অন্ন-নিবেদন, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তবপাঠ, প্রণয়-প্রকাশ, নৃত্য, সাধুসঙ্গ ও শ্রীমদ্ ভাগবতার্থের মাধুর্য্য আশ্বাদন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে হর্ষভরে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥২॥

সায়ংকালে স্বামী গোচারণ করিয়া বনভূমি হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া প্রণাম, স্তবপাঠ ও জয়-ঘোষণা করিবার জন্ত যাহার মন অত্যন্ত উৎসুক হয় এবং প্রেমানন্দভরে নেত্রযুগলে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ভুলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥৩॥

রাত্রিকালে যিনি শ্রীজয়দেবরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং তদ্রচিত গীত গান করেন ও ভক্তসমূহের সহিত রসাস্বাদ করেন, কোন সময়ে সঙ্গীতনে চতুর্দিকে নৃত্য করেন এবং উন্মিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-কেলি অনুভব করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥৪॥

“নিন্দা” এই অক্ষরযুগই যাহার কাণ্দিয় সহ পরিচয় করে নাই, যিনি প্রতিদিন আপন জিহ্বাকে সাধুসকলের স্তুতি আশ্বাদন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগৎকেই বিশ্বাস করেন, কোন স্থানেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দের সহিত বন্দনা করিতেছি ॥৫॥

যে কেহ পাদপদ্মে নিপতিত হইলেই যিনি তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, অপাত্ৰ জ্ঞানে শীঘ্রই তাঁহাকে ভক্তি-মার্গে প্রবর্তিত করেন, নিত্যই নিজ সেবক সকলকে ভক্তি-রহস্য, বিধি-ক্রমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে বন্দনা করিতেছি ॥৬॥

কোন ভূত্য সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে যিনি কৃপা করিয়া আপন চরণ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করেন এবং ননোহর ঈবং হাস্য করিতে করিতে কৃপাদৃষ্টি রূপ স্নান সঞ্চার করিয়া তাঁহার মানসকে বিষয়-বিরক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম সঞ্চারার্থ স্বয়ংই স্বপদের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া হর্ষভরে প্রণাম করিতেছি ॥৭॥

যিনি প্লুত স্বরে স্বামি-সুগলের “হে রাধে ! হে কৃষ্ণ !” এই নামামৃত নিরন্তর জিহ্বাগ্রে নর্ত্তন করাইয়া থাকেন এবং সংসার নিকাহোপযোগী কোন বস্তুই অবগত হইতে পারেন না, কারণ সর্বদা প্রেমেই মগ্ন থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুপ্তিত হইয়া আনন্দসহকারে বন্দনা করিতেছি ॥৮॥

হে প্রভুবর ! হে প্রোবেলিত-কৃপাসমুদ্র ! এই পদ্মাষ্টক সর্বপ্রকারে আপনার পাদরূপ কমলের মধু সূচনা করিতেছে । আমি প্রার্থনা করি আমার চিত্ত-ভ্রমর সেই কমলকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে ভবং-সঙ্গুণে মনোজ্ঞ-নিকুঞ্জ-রঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৌরভ লাভ করুক ॥৯॥

ভোমণীর কথা

মঙ্গলাচরণ

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাদিনী ।

জীয়াদেয়া পরা পত্নী সর্ব-সজ্জন-ভোষণী ॥

যিনি সজ্জনবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ সজ্জন-ভোষণীর আবির্ভাব করাইয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার ।

নমো মহাবদাশ্রয় কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদায় তে ।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নায়ে গৌর-ত্বিষে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।

গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে ॥

সজ্জন শব্দের অর্থ

সজ্জন বলিলে অম্বাভিগাষী, কন্মী, জ্ঞানী ও শৈথিল্যবাদী নিজ নিজ বিচার-

হুকূলে সংজ্ঞা করণা করিবেন সত্য, কিন্তু তা হাতে সম্পূর্ণতার অভাব থাকিবে। 'সজ্জন'-শব্দে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায়, অর্থাৎ যে-বস্তু নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অনুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিদ্বারা নিত্য অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুণ্ঠতা জনিত অবস্থান্তর লক্ষিত হয় না—তাহাই সজ্জন। সজ্জন বস্তু—বৈকুণ্ঠ বলিয়া, তাহার প্রতি মায়ায় কোন অধিকার নাই।

‘সজ্জন-তোষণী’র নিত্যত্ব

সজ্জন-তোষণী মহাপ্রভুর নিজ বস্তু, সুতরাং প্রপঞ্চ প্রকট হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত-বিষয়-বাহিনী পত্রিকা মাত্র নহেন। বিষয়িগণ বিষয় জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ-দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইহার অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ নির্যাস শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রসময় ভগবানের নিত্য উপাদানের অন্ততম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীপত্রিকার দুঃসঙ্গ বর্জন

সজ্জন-তোষণী রূপানুগ-স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে তাঁহারাও তোষণীর শুদ্ধ নিরপেক্ষ শিবদ নির্যাসের প্রোজ্জ্বিত-কৈতব সাধুগণের পরম ধর্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য এই গুণ-বটকের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যকতা নাই সুতরাং তোষণী কখনই এইগুলির সঙ্গ করেন না, বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

রাগানুগ প্রচারকের বৈধীভক্তি প্রচারই কর্তব্য

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি-পথই সর্বতোভাবে প্রশস্ত। ভক্তি-পথের প্রারম্ভে দুইটি মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বিচার প্রধান ও অপরটি রুচি প্রধান। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। তাঁহাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রথম মুখে রুচি দেখা যায় না, তাঁহাদের এই ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধা-গুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধাগুলির নাম অবিচার বা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব। সম্বন্ধজ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষের লক্ষিত হইলে তিনি নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ অনুশীলন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন।

রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের চরণে সহজিয়ার অপরাধ

যিনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্শদ, মহাপ্রেমময় হইয়া জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগ ভক্তিমার্গের আচার্য্যস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গৌর

সংসারে উদয় হইয়াছিলেন ; তাঁহার শ্রীচরণকমলে অপরাধরূপ বৃত্তি যেন কোন শ্রীকৃপানুগ-মার্গের পথিককে স্পর্শ না করে। শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণা-বলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীকৃপানুগ-ভক্তি ধর্ম-জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ হইতেই রূপানুগ পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিদ্বর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীকৃপানুগ-গণের মূল গুরু শ্রীপাদ জীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদয়। রুচিপ্ৰধানমার্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন মার্গের সুগমপথে স্মৃকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস-গোস্বামীর আনুগত্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও ক্রটি করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন যে-স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হাস দেখিতে পাওয়া যায়, সে-স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে রুচিপ্ৰধান-মার্গজীবী তাদৃশ পথিক ও বিপদগামী।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যবহার

রূপানুগা রাগানুগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

রুচিপ্ৰধান-মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন কোন অর্কাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্যপাদের অনুষ্ঠান শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে—জানাইয়া গুরুপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজাতরুচি-গণের মঙ্গলের জন্য রূপাময় রসিক শেখর অপ্রাকৃত জীবপাদ ঐ বৈধ মার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায় বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। রূপানুগ শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত জীব প্রভুকে গুরু ব্যতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মর্ত্য বুদ্ধি করেন না। রূপানুগগণও বলেন—‘আচার্য্য গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাঁহাকে অবমাননা করিতে নাই।’

রুচিপ্ৰধানমার্গেও ক্রমবিচার না করিয়া সহজিয়াগণ

গোস্বামিচরণে অপরাধী

রুচি প্ৰধানমার্গেও শাস্ত্রার্থ বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভজন-ক্রিয়া প্রভৃতি ক্রম-পদ্ধতি অনাদৃত হয় নাই। আবার যেখানে ক্রম-পদ্ধতির অনাদর সেখানে যে রুচিপ্ৰধান-মার্গে গমনশীল পথিকের আত্মজুরিতা তাহা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে

বিচ্যুত করিয়া পথভ্রান্তি উৎপন্ন করাইয়াছে। বর্তমান কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেকে আপনাদিগকে জাতকুচি অভিমান করিয়া জীবপ্রভুর গুরুত্ব শৈথিল্য-ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা স্বকীয় পারকীয়াদি বিচার উত্থাপন করিয়া জীবপাদের চরণে অপরাধী পর্য্যন্ত হন। সজ্জন-তোষণী তাদৃশ গুরুবমাননা করিবার প্রেরণা দেন না। যে স্থলে বৈষ্ণবাভিমাত্রীর জাতকুচি ধর্ম প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই সে স্থলে রূপানুগ ক্রমধর্মের বিপর্যায় অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে পাপী ও মূঢ় বলিয়া পরিচিত

ভক্তি, জ্ঞান-কর্মাণুনাযুক্ত বস্তু—তিনিয়াই অনেক অভক্ত সম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্মে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়, আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ করেন, তাহাতে অভক্ত সম্প্রদায়গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে থাক, সিদ্ধান্ত-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়া তুলিকে মানব সমাজের অভ্যন্তরীণ নিম্ন স্তরে পাপী, মূঢ় জানিয়া সেই-রূপ আসন প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতকুচিগণের বৃত্তি, তাহা কখনই নহে—সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের কুচি, তজ্জগুই তাঁহারা জাতকুচি। সিদ্ধান্ত-বিরোধী কুচি কখনই কৃষ্ণপ্রেমরস প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্তী ঠাকুরের ‘যদশ্মসারং’ শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজ নিজ প্রাকৃত চতুরতার নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

সহজিয়ার প্রতি ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলাগ-কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাজন-পথে দোষ,	দেখিয়া তোমার রোষ,	পথ প্রতি ছাড় অহুরাগ।
ফোঁটা-দীক্ষা মালা ধরি’,	ধৃত্ত করে সূচাতুরী,	তাই তাহে তোমার বিরাগ ॥
	কি আর বলিব তোরে মন!	
মুখে বল প্রেম প্রেম,	বস্তৃতঃ ত্যজিয়া হেম,	শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত,	লক্ষ বাষ্প অকস্মাৎ,	মূচ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিত রঙ্গ,	প্রচারিয়া, অসংসঙ্গ,	কামিনী কাকন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন-ভক্তি,	তা’তে নৈল আনুরক্তি,	গুরুপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি’,	নিরন্তর নাম ভজি’,	রূপা হ’লে স্প্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সু-ভজন,	সাধুসঙ্গে সাকীর্জন,	না করিলে নির্জনে স্মরণ।

মা উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টাঙ্গাটানি ফল ধরি',
 দুষ্টফল করিলে অর্জন ॥
 ভূমিত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,
 আরোপিলে কিসে শুভ হয় ।
 কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
 তবু কাম প্রেম নাহি হয় ॥
 কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায় !

চর্মমাংসময় কাম, জড়-সুখ অবিরাম, জড়-বিষয়েতে সদা ধায় ॥
 শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা রতি আসক্তি উদয় ।
 আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাতুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
 নাটকাতিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।
 ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ ॥
 —জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যপ্রিয় ভগবান্ আচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা ও পূর্বজীবন
 অনন্ত-সংহিতায়াং :—

“আচার্য্য শ্রীল ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়াংশতাক্ ।”

শ্রীশ্রীমৈত্রেয়দেবের প্রিয়াংশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীকর
 বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন । তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নান্তর জ্যৈষ্ঠশাস্ত্র পাঠ
 করিয়া ‘জ্যৈষ্ঠাচার্য্য’ নামে বিখ্যাত হন । বাল্যকালে তাঁহার শ্রীচন্দ্রশেখর
 আচার্য্যের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয় । সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
 অবতীর্ণ হইয়া বিষয়েতে ও কদর্যা বামাচরাदिতে বিষম বিমুখ জীব-সকলকে,
 শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিম্নল প্রেমভক্তিদ্বারা কৃতার্থ করিতে লাগিলেন । এবং জীব-
 শিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-পথাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ।

আচার্য্যের বিবাহ, বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বঞ্চনা

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দেখিয়া আচার্য্যের কিঞ্চিদ বৈরাগ্যোদয় হইতে
 লাগিল । তিনি পূর্বের জ্ঞান আর সংসারে মনোনিবেশ করেন না । সর্বদাই
 মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে উৎসুক । এই সমস্ত দেখিয়া গুনিয়া ঘোর

বিষয়ী-পিতা শ্রীশতানন্দ খান নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীমধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ইতিমধ্যেই গঙ্গার প্রবাহে তাঁহার, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও মধুসূদন ঘটকের বাটী ভগ্ন হইয়া জলসাগ্র হইলে, সৰ্ব্বাগ্রে মধুসূদন 'দ্বারবাসিনী'-নিবাসী দ্বারপাল নামক শূদ্র রাজার মালক (যাহার নাম এক্ষণে শ্রীপাট মালিপাড়া) গ্রামে কেদার-মতী নদীর দ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ভগবানের বৈরাগ্য ও চৈতন্য-দর্শনেচ্ছা বলবতী হওয়াতে তিনি স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রশেখরের নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যপত্নীর 'জুলকুলে' আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরলাভ

যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপাট কুলীন গ্রামে আগমন করেন, সেই সময় তিনি জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 'জুলকুলে' আসিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহ ও ভগবান্ আচার্য্যের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আচার্য্যের পত্নী প্রভুকে প্রণাম করিলেন; প্রভু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন—“তুমি পুত্রবতী হও”। ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের পত্নী বলিলেন,—“প্রভো! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? আমার পতি একপ্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে আছেন।” প্রভু কহিলেন,—“আমার” বাক্য মিথ্যা হইবে না। আমি পুরুষোত্তমে যাইয়া আচার্য্যকে পাঠাইয়া দিব; আর তোমার পুত্র হইলে, জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য করিয়া দিবে।”—এইরূপ আদেশ করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্তন

এবং মালকে অবস্থান

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে যাইয়া নিজ প্রিয় আচার্য্যকে নানা-প্রকার প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রভুর আদেশানুসারে “জুলকুলে” আসিয়া পৌঁছিলেন। পরন্তু তাঁহাদিগের বাসের অসুবিধা হওয়াতে, তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরের শিষ্য দ্বারবাসিনী-নিবাসী 'দ্বারপাল' নামক শূদ্র-রাজার পুৰ্ব্বোক্ত মালকে আসিয়া বাস করিলেন। ঐ গ্রামের নাম সেই হইতে মালীপল্লী অর্থাৎ মালীপাড়া হইল। প্রথমে তাঁহার যে-পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, অত্যাপি সেই পাড়া 'আচার্য্য-পাড়া' নামে বিখ্যাত। কিছুদিন পরে ভগবান্ আচার্য্যের দুই পুত্র হয়। একের নাম রঘুনাথ, অপরের নাম রমানাথ আচার্য্য। দুই জনেই জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

আচার্য্যের গৃহ-ত্যাগ ও পুরীতে প্রভুর সহিত সখ্যতাবে স্থিতি

তদনন্তর ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার শিষ্য মধুসূদন ঘটকের পুত্রের নিকটে পুত্রদ্বয়ের সহিত পত্নীকে রাখিয়া পুনর্বার পুরুষোত্তমে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।

পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আচার্য্যে॥

সখ্যতা আক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার।

স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার ॥

একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।

মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তিঁহ করে নিমন্ত্রণ ॥ (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

আচার্য্যের বংশাবলী

তাঁহার যে দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে রমানাথ আচার্য্য অপুত্রক। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের “শ্রীপাট যশোড়া” নামক স্থানের গদি প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ আচার্য্য পৈত্রিক ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ কেশব-রায় জীউকে লইয়া মালিপাড়ায় বাস করিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। একের নাম—শ্রীগোপীজনবল্লভ, অপরের নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম পত্নী বিয়োগ হইলে রঘুনাথ আচার্য্য পুনর্বার দার-পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর গর্ভে রাম-দাস, শ্রামদাস ও কৃষ্ণদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। কেবল কৃষ্ণদাসই মালীপাড়ায় রহিলেন। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামক শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভের পরিচয়

রঘুনাথ আচার্য্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের শ্রীবল্লভ নামক এক সন্তান হয়। কালে শ্রীবল্লভ অত্যন্ত সাধক হইয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীশ্রী-রাধাবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। পরে কোন পরমহংস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন-গোপাল নামক শ্রীমূর্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তদ্বিবরণ বাহুল্য-বিধায় লিখিলাম না। শ্রীবল্লভের তিরোভাব উপলক্ষে মালী-পাড়ার ক্রমান্বয়ে চৈত্রমাসে তিনটি মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমটি শ্রীরামনবমীতে, দ্বিতীয়টি শ্রীরামনবমীর পর শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ-কাল হয়। তৃতীয়টি কোন্ তিথিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গুরু-শিষ্য-কাহিনী

(শ্রীনাম-মাহাত্ম্য)

শিষ্য একজন বেজায় পণ্ডিত, গুরুটী অল্প-জ্ঞানী,
 দীক্ষা নিয়াছে শুধুই গুরুর ভক্তি-মহিমা জানি'।
 গুরুকে শিষ্য দিল খাতা এক লিখিতে আঙ্গিক-রীতি,
 সাত দিনে গুরু কি-জানি? লিখিলা প্রেমাশ্রুতে তিতি'।
 পুনঃ পুনঃ তাগিদে শিষ্য গুরুকে করেন ব্যস্ত,
 গুরুদেব শুধু লিখিয়া চলেন খাতাখানি তাঁ'র মস্ত।
 এহেন পণ্ডিত-শিষ্য গুরু—আর কেহ নাই,
 সদাই জাগে শিষ্যের মনেতে—এই ভাবনাই।
 তাই বুঝি গুরুর আঙ্গিক-রীতি লিখিতে এমন চেষ্টা,
 উপযুক্ত শিষ্যের লাগিয়া তাই উপযুক্ত উপদেষ্টা।
 গুরু কহিলা শিষ্যে ডাকিয়া খাতা দিয়া তা'র হাতে,
 “আঙ্গিক-পূজার তত্ত্ব-সার লিখেছি কাগজ-পাতে।
 সম্মুখে মোর সব লেখাটুকু পড়িতে হইবে তব,
 গাহিয়া এর মাধুরী জানিলে চিরকাল কেনা রব।”
 শিষ্য তখন পড়িতে লাগিল সেই লেখা অনুপম—
 ছত্রে ছত্রে বিরাজ করিছে তারক-ব্রহ্ম নাম।
 তিন দিনে শিষ্য শ্রীগুরু-আদেশে পড়িল সকল লেখা,
 হেরিল খাতার শেষ ভাগে ‘গোল’-আকার রয়েছে আঁকা।
 গুরুদেবে তবে পুছিলা শিষ্য গোলক-চিত্রের অর্থ,
 কহিলা শ্রীগুরু—“হরিনাম বিনা জীবনে সকলি ব্যর্থ।
 হরিনাম ছাড়ি’ আঙ্গিক-পূজার অতি অল্পই দাম,
 সার্থক তাঁ'র তত্ত্ব-মন্ত্র কেন্দ্রে যাঁহার নাম।
 এঁকেছি তাই নামের শেষে নীরস আমড়ার আঁটি,
 সাধন-ভজন সব প্রকরণে হরিনাম শুধু খাঁটি।”

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

জ্ঞানকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৯৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই কয়েকটা পদে যে-সমস্ত গূঢ় ভক্তপূর্ণ কথা শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিলেন তাহারই আংশিক কিছু কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁহার উপরোক্ত বিবিধ পুস্তকে বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। আচার্য্য-পরম্পরায় বিধিভক্তির ক্রিয়ায়ক নিয়মানুসারে যাজ্ঞন করিলে যে বস্তু সহজে লভ্য হয়, শ্রীঅরবিন্দ সেই বস্তুই বিবিধ বাক্যবিন্যাসে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ফলে 'বাঘ' মানে 'শাদ্দুল' অর্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে শ্রীঅরবিন্দ-সাহিত্য সাধারণের পক্ষে দূরাবগম্য হইয়া বিশেষ কলপ্রদ হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জীবের নিত্য-কৃষ্ণ-দাসত্ব-স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। জীবের নিত্য-দাসত্বই তাহার স্বরূপ এবং তাহার নিত্য বা সাময়িক ভোক্তৃত্ব অভিমানই মায়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন, জীব নিজ কৃষ্ণ-দাসত্ব তুলিয়া অনাদি-বহির্নুখ হইয়াছে; সুতরাং মায়া তাহাকে সংসারাদি দুঃখ দিতেছেন। জীবের দুঃখের মূলীভূত কারণই তাহার এই মায়িক ভোক্তৃত্ব অভিমান। যে ব্যক্তি যাহা নহে সে যদি কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা তাহা হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেইপ্রকার কার্যের দ্বারা তাহার দুঃখ ভিন্ন সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। 'কাক ও ময়ূরপুচ্ছ' নামক একটি গল্প আমরা পড়িয়াছি। যিনি জগদীশ্বর, যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জগতের একমাত্র মালিক এবং ভোক্তা হইতে পারেন। কিন্তু যিনি জগতের বহুবস্তুর মধ্যে অপর একটি সৃষ্ট বস্তু মাত্র সে যদি ভোক্তা বা মালিকের অভিনয় করে বা তাঁহার আসনে বসিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে দুঃখ ও ক্লেশ ভিন্ন আর কি লাভ হইতে পারে?

জনলোকে ব্রহ্মসত্ত্বজ্ঞে অবগেচ্ছু মুনিগণের নিকট কুমারগণের অন্ততম ব্রহ্মবি সনন্দন শ্রুতিগণ-কৃত ভগবৎ স্তব বর্ণন করিতেছেন—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তুভূতো যদি সর্বগতা

স্তুহি ন শাস্ততেতি নিয়মোঃধ্রুব নেতরথা।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ

সমমজ্জানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ (জাঃ ১০।৮৭।৩০)

“হে ধ্রুব, যদি তনুভূজীবগণ অপরিমিত ও সর্বগত অর্থাৎ ভগবানই হইত,

তাহা হইলে ঐ জীবসকল তোমার শাসনাধীন বা নিয়ন্ত্রিত থাকিতে পারে না। যদি অগ্নিরূপ আপনা হইতে ফুলিঙ্গের তায় জাত জীব সকলকে (অণু ও নিত্য) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এবং তাহারা আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আপনি তাহাদের অপরিত্যাজ্য কারণ ও নিয়ন্ত্ৰ হইতে পারেন। অতএব যে-সকল জীব তোমাকে তাহাদের সহিত এক করিয়া জানে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।”

অতএব জীবের আত্মানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি-জ্ঞানই জ্ঞানের চরম কথা নহে; তাহার পরেও কথা আছে। এবং সেই পরের কথা কৃষ্ণের ‘নিত্য-দাসত্ব’ অনুভূতি। সেই নিত্যদাসত্ব-অনুভূতিই Supramental consciousness. সেই Supramental consciousness এ যে কার্য্য আরম্ভ হয় তাহাই জীবের নিত্য জীবন। সেই জীবনে পরাপ্রকৃতি বা চিচ্ছক্তির অধীনে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিলে ‘আনন্দ চিন্ময়রসের নিত্যানন্দ’ লাভ হয় এবং তাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কোটি পরাধিক গুণ অধিক। সমুদ্রের তুলনায় যেমন গোম্পদ-জল, সেই প্রকার ‘আনন্দ চিন্ময়রস নিত্যানন্দের’ তুলনায় ব্রহ্মানন্দ।

এই আনন্দচিন্ময়রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিচ্ছক্তিকেই বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দ ‘mother’ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এবং সেই চিচ্ছক্তির কার্য্যসমূহকে অচিচ্ছক্তির কার্য্যকলাপের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। মাদ্রাজের নামজাদা মায়াবাদী সন্ন্যাসী স্বধামগত মহর্ষি রমণকে কোন ইংরাজ ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ভগবান্ আর জীবে কি বিষয়ে তফাৎ? তিনি তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে,—God plus desire is equal to man and man minus desire is equal to God. অর্থাৎ ভগবানে বাসনা যোগ করিলে তিনি মানুষ হন এবং মানুষ বাসনা শূন্য হইলে তিনি ভগবান্ হন। আমরা বলি যে জীব কখনই বাসনা শূন্য হয় না। বদ্ধ ভূমিকায় তাহার ভোগবাসনা এবং মুক্ত ভূমিকায় তাহার ভগবৎ সেবা-বাসনা নিত্যকালই থাকে। অতএব সে কখনই ভগবান্ হইতে পারে না এবং সেইজন্য মানুষকে ভগবান্ সাজাইবার যে বাতুলতা তাহা মতবাদে দূষিত একটা মত মাত্র; উহা কোন কার্য্যকরী কথা নহে। মায়াবাদিগণের কৃত্রিম চেষ্টাধারা জীবের যে নিজ নিজ চেতনবৃত্তিগুলি নষ্ট করিবার বাসনা, সেই বাসনাটাই (বা desire টাই) মায়াবাদীকে কোনদিনই মুক্ত করিয়া দেয় না। সুতরাং মায়া-

বাদীর যে মুক্তি অভিমান তাহা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধির পরিচয় । বদ্ধ অবস্থাতেই যে-সকল বাসনা বা desire আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখে তাহা বহু প্রকারে দৃষ্ট হইলেও সেগুলি গুছাইয়া একত্রিত করিলে চতুর্কর্গ নামে অভিহিত হয় । কিন্তু ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত,—বাসনা বোনদিনই নষ্ট হয় না, মুক্তাবস্থায় বাসনার সিদ্ধ-স্বরূপ প্রকাশিত হয় । শ্রীঅরবিন্দও এই বিষয় কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেইজন্য আমরা তাঁহাকে মহর্ষি রমণ অপেক্ষা অধিক আদর করি । মহর্ষি রমণ ‘বাসনা’ বেচারীকে জোর-জবরদস্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । জোর-জবরদস্তি করিয়া গলা টিপিয়া desire কে নষ্ট করিবার যে চেষ্টা, তাহা suicidal policy. রোগ নষ্ট না করিয়া রোগী নষ্ট করাতে কোন বাহাদুরী নাই । রোগীকে বাঁচাইয়া রোগ নষ্ট করাই ডাক্তারের বাহাদুরী । চতুর্কর্গীয় জেলখানার আসামীগণ উত্তরোত্তর বাসনারই দাস হইয়া যায় এবং তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে ক্রমের নিত্যদাসত্ব দূরে চলিয়া যায় । জীবের নিত্যদাসত্বের আমরা বহুপ্রকারে পরিচয় পাই । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ গীতায় বলিয়াছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ (গীঃ ৯।৪)

[অর্থাৎ, এই সমগ্র জগৎ অতীন্দ্রিয়মূর্তি আমাকর্তৃক ব্যাপ্ত, সমুদয় ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি ।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণতি এই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অব্যক্ত মূর্তিতে বিরাটরূপে অবস্থান করেন । অতএব জগতের সমস্ত চরাচর বস্তু ভূতাদি তাঁহারই শক্তির আধারে অবস্থান করে । শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তির কোন অবস্থান নাই এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে একতত্ত্ব হইলেও শক্তিমান্ স্বয়ং শক্তির বিকাশ হইতে অনেক অন্তরে অবস্থান করেন । সেইজন্য জীব তার বাসনার দ্বারা হয় এই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—মাটি, জল, বায়ু ইত্যাদি Physical world এর সেবা করে ; না হয়, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ বৈকুণ্ঠ বস্তুর—Spiritual world এর সেবা করে । অতএব তাহার দাসত্ব নিত্যকালই বিভিন্নাকারে বজায় থাকে । মায়িক দাসত্বের দ্বারা যে কিছু অনুভূত হয়, তাহার ঐকান্তিক নিবৃত্তি করার উপায়—জোর করিয়া ‘বাসনা’ ত্যাগ নহে । চাকুরে বা নিত্যদাস জীব তাহার দাসত্বের বাসনা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না । কিন্তু মন্দ চাকুরী ত্যাগ করিয়া ভাল চাকুরীর বাসনা করিলে তাহা সে পাইতে পারে । ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্কর্গের

দামত্ব-বাসনা না করিয়া বা সেই প্রকার বাসনার গলা টিপিয়া ধবংস করিবার চেষ্টা না করিয়া বাসনার স্বরূপ প্রকাশে যতুবান্ হইলেই চরম মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীঅরবিন্দ উপরিভাগে ইংরাজী ভাষায় বাহ্য আলোচনা করিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ। যথা—“অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন যদি আমাদের পরম সত্য না দিতে পারে তাহা হইলে সেই বিগত সত্ত্বার জন্ত চেষ্টা করিয়া লাভ কি? *

* * * * * মানুষ যদি অহংকার এবং ইচ্ছাদেব শূন্য হইয়া বাস করে তাহা হইলে সে একটা তামসিক জঙ্গম বস্তু হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কথা তাহা নহে। আমরা যদি প্রাকৃত অনুভূতি হইতে ক্রমশঃ অপ্রাকৃত অনুভূতির দিকে অগ্রসর হই, তবে আমাদের অবিদ্যাদূষিত প্রাকৃত ইচ্ছাদেবগুলির জড়তা এবং হেয়ত্ব বেশ বুঝা যায়। অপ্রাকৃত অনুভূতিতে অবিদ্যা নষ্ট হইলে প্রাকৃত ইচ্ছাদেবের যে কোন মূল্য নাই, তাহাই উপলব্ধি হয়। ইচ্ছাদেবাদি বৃত্তিগুলি সমস্ত বজায় থাকে কিন্তু তাহাদের প্রাকৃত স্বভাব (character) পরিবর্তিত হইয়া অপ্রাকৃত স্বভাব লাভ করে। তখন ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান্ একই তত্ত্ববস্তু উপলব্ধি হয়। যাহারা সেই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই বা সেই প্রকার অধিকারে বাস করেন নাই তাহাদের পক্ষে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা মন লাভ করা দুর্লভ ব্যাপার। এই অপ্রাকৃত অনুভূতি পর্য্যায় লাভ করাও একলক্ষ্যে হয় না। যাহারা এক লক্ষ্যে সেই অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহারা অসম উচ্চাভিলাষী। প্রত্যেককেই ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপরের সিঁড়ি উঠিবার সময় একটি পা ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া অপর পা-টি উঠাইতে হইবে। এইভাবে আমাদের সর্বোচ্চ স্থানটি লাভ করিতে হইবে।”

সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের ‘যোগে’ ইচ্ছা, বাসনা বা desire কে ধবংস করিবার কথা নাই—কেবলমাত্র তাহার character পরিবর্তন করিবার কথা আছে। ‘জীবের স্বরূপ হয় নিত্য-কৃষ্ণদাস’—ইহা সর্বদাই সত্য। বদ্ধ জীবের পক্ষে এবং মুক্ত জীবের পক্ষে সর্বদাই কৃষ্ণদাসত্ব ছাড়া গত্যন্তর নাই। যেমন প্রজা-সকল কারারুদ্ধ অবস্থায় এবং কারামুক্ত অবস্থায় সর্বদাই রাজার অধীন ভক্ত। কারারুদ্ধ অবস্থায় তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-চালনা কার্য্যটিই ক্লেশকর—কিন্তু কারামুক্ত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনাই আনন্দদায়ক। দুই অবস্থার মধ্যে কেবল স্বভাব পরিবর্তনের কথা আমরা দেখিতে পাই। সেই প্রকার নিত্য কৃষ্ণদাস জীব যখন শক্তিমান্ কৃষ্ণকে সেবা না করিয়া কৃষ্ণের মায়া-শক্তির সেবা করিয়া থাকে তখনও তাহার কৃষ্ণদাসত্ব নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু সেই সেবার আহ্লাদ তাহার নিঃসৃত

অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু মাসিকগুণ খবিত হইলে কৃষ্ণসেবার সেই হলাদিনী শক্তির যথাযথ উপলব্ধি হয়। উভয় অবস্থাতেই সে কৃষ্ণদাস থাকে বলিয়া, জীবকে নিত্য-কৃষ্ণদাস ও তটস্থা শক্তিস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত

মায়াবাদেব জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিত- ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ৩১১ পৃষ্ঠার পর)

উপসংহারে অধিক কথা লিখিয়া আমি পাঠকবর্গকে ব্যস্ত করিতে চাহি না। আমি প্রতি খণ্ড-বিষয়ের শেষ অংশে অল্প-বিস্তর মন্তব্যসমূহ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আত্মোপাস্ত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন—কোন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী মহাপুরুষই মায়াবাদীর সহিত সম্মুখ-বিচারে পরাস্ত হইয়া—গুরুভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া মায়াবাদেব গুরু জ্ঞান-পথ গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাও গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত সম্মুখ-বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহাদের সম্মত ভাগ করত বিষ্ণুর পরতমত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তি-ধর্মো দীক্ষিত হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের দ্বিধিজয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন—তিনি যাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মণ্ডন মিশ্রই সর্ব প্রধান। তিনি জৈমিনী-মতের কন্মি ও স্মার্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ও শঙ্করকর্তৃক পরাজিত অন্যান্য (?) মহাজনগণ সম্বন্ধে আমি পূর্বেই “শঙ্কর বিজয়” প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। তৎপরে অত্যাধিক কেবলমাত্র আচার্য্য নৃসিংহআশ্রমের জীবনী হইতে জানা যায়, তিনি শৈব পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের জ্ঞান-বাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্য অপ্যয় দীক্ষিতের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব হইতে পঞ্চোপাসনা জাগরুক ছিল। আচার্য্য শঙ্কর অজ্ঞ জীবের জন্ম পঞ্চোপাসনার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাস্করের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে ইহাকে প্রকৃত শৈব বলিয়াও মনে হয় না। যাহাহউক, তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন না এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈত নাই। অবৈষ্ণব অপ্যয় দীক্ষিত অবৈষ্ণবের অন্ত কোনও জ্ঞানবাদ-মত গ্রহণ করিলে তাহাতে বৈষ্ণবগণের কোনও হানি নাই এবং জ্ঞানবাদেবও তাহাতে প্রাধান্য স্থাপিত হয় না।

সত্যযুগের চতুঃসন হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত পঞ্চসহস্র ৫০০০ বৎসরের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদেব ইতিহাস হইতে মায়াবাদিগণেব জন্মভঙ্গী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”—মন্ত্রে আমাদেব উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণেব মধ্যে প্রধান প্রধান পুরুষগণেব উৎপত্তিৰ অস্বাভাবিকতা হইতেই বোধ হয় তাঁহারা ‘শক্তি শক্তি-মানে’ব বিচার ত্যাগ করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃহেব সমূলে উৎপাটন করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বেব সংস্থাপক হইয়াছেন।

মায়াবাদেব যুক্তিসমূহ কি ভাবে বৈষ্ণবগণেব যুক্তি দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশ করার সুবিধা না থাকায় তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এতৎ সম্পর্কে আমরা শ্রীল জীবপাদেব ‘ষট্‌সন্দর্ভ’, ‘ক্রমসন্দর্ভ’, ‘সর্বসম্বাদিনী’ ও শ্রীল বলদেব প্রভুর “গোবিন্দ-ভাষ্য”, “সিদ্ধান্ত রত্ন”, “প্রেমেব রত্নাবলী”, “বিষ্ণু-সহস্রনাম-ভাষ্য”, “উপনিষদ্-ভাষ্য”সমূহ এবং গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলে একমাত্র নিয়ামক, যতিরাজকুল-সম্রাট্-মুকুটমণি পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজেব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ‘অনুভাষ্য’ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেব বিবৃতি-সম্বলিত “গোড়ীয় ভাষ্য” প্রভৃতি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

ঐতিহ্য দ্বারা ফলনিরোধ

মায়াবাদেব জীবনী আলোচনা মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবাদেব আত্মোপাস্ত ইতিহাস ও তত্ত্বসমুদয় ঐতিহাসিক ভাবেই অর্থাৎ “ঐতিহ্য”-প্রমাণেব দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ অত্যন্ত দুর্বল যুক্তিৰ উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মুখ বিচারে চিরদিনই, অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে অষ্ট পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। তথাপি প্রাচীন কালেও এই মতেব অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেস্থলে আমাদেব বক্তব্য এই যে—মায়াবাদ-কথিত নির্বাণ-মুক্তি মিথ্যা এবং কল্পনা-প্রসূত শ্লোকবাক্য মাত্র। ইহা কেবল ঐতিহ্য প্রমাণেব দ্বারাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করিয়া দিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ‘নির্বাণ’ বলিয়া কোন অবস্থাই জীব লাভ করিতে পারেনা এবং তাহা লভ্যও নহে। অদ্বৈতবাদিগণেব মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ঐরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত একটীও নাই। কারণ গোড়পাদ,

গোবিন্দপাদ, শঙ্কর ও মাধবের জীবনী আলোচনা করিলে, আমরা উক্ত সত্য উপনীত হইতে পারি এবং উঁহারা কেহই যে উঁহাদের কথিত নির্বাণ-মুক্তি লাভ করেন নাই বা করিতে পারিবেন না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আচার্য্য শঙ্করের জীবনীতে প্রকাশ যে, তিনি একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা কালে তাঁহার পরম গুরুদেব শ্রীগৌড়পাদ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—“শঙ্কর, তোমার গুরুদেব আচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট তোমার প্রভূত প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়াছি এবং তুমি আমার মাণ্ডুক্য কারিকার যে ভাষ্য রচনা করিয়াছ তাহা দেখাও”। আচার্য্য শঙ্কর তাহা প্রদর্শন করাইলে গৌড়পাদ তাহা হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শঙ্কর জীবনের উক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়, গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই বিদেহমুক্তির পরে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। নির্বাণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকিলে, গৌড়পাদ শঙ্করের সম্বন্ধে কোনও কথা গোবিন্দপাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রুত বিষয় পুনরায় গৌড়পাদ শঙ্করকে আসিয়া জ্ঞাপন করা কখনই সত্য বা সম্ভবপর হইতে পারে না। শঙ্করও তাঁহাকে ‘মাণ্ডুক্য কারিকার’ ভাষ্য দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমোদন পাইয়াছেন ইহাও অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে গৌড় ও গোবিন্দের নির্বাণ-মুক্তি হয় নাই—ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে বাধ্য। নির্বাণ মুক্তির যাহা লক্ষণ তাহাতে কি উক্ত ঘটনা সম্ভবপর হয়? আমার মতে ঘটনা কতক সত্য ধরিয়া লইলেও নির্বাণ-প্রাপ্তি সর্বতোভাবে মিথ্যা। তাঁহাদের কা কথা স্বয়ং শঙ্কর পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাই কি নির্বাণ মুক্তির পরিণতি? উক্ত আচার্য্য-বর্গের নির্বাণ-মুক্তির অত্যাধিকারক একরূপ কোন সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় না, যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, নির্বাণের পরেও পরস্পর কথোপকথন ও পুনরাবির্ভাব সম্ভব হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ‘নির্বাণ-মুক্তি’ একটি মিথ্যা শ্লোকবাক্য মাত্র বা লোক সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র; যেহেতু ‘নির্বাণ-মুক্তি’ প্রধান প্রচারকগণ, এমন কি, যাহারা ঐ মতের সৃষ্টিকর্তা বলিলেও চলে, তাঁহারাও ঐ মুক্তি পান নাই—অন্তের কা কথা।

আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শঙ্কর স্বপ্নতত্ত্বকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া ‘জগন্মিথ্যাস্ববাদ’ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী

প্রকাশক মায়াবাদিগণ স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা বলিতে চাহি, শঙ্করের মাতা কুল-কলঙ্কিনী হওয়ার লোক লাঞ্ছনাভয়ে আত্মহত্যা করিতে গেলেন, মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে— এই বিশিষ্টার গর্ভে ‘শঙ্কর’ অবস্থান করিতছেন। সুতরাং তিনি যেন আত্মহত্যা করিয়া জীবন নাশ না করেন। কিছুদিন পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। শঙ্কর আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে কি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল? বিশিষ্টার গর্ভে ‘শঙ্কর’ বলিয়া কি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই? এসমস্ত কথাই কি “স্বপ্নোপম” “মায়োপম” মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে? এই সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বিদ্যমান থাকিতে মায়াবাদের “স্বপ্ন”-দৃষ্টান্ত অনুসারে জগৎকে কি মিথ্যা বলা চলে?

আর একটি কথায় পাঠকবর্গের আপত্তি হইতে পারে যে, শঙ্কর প্রচুর বৌদ্ধ প্রতিপন্ন হইলেও শূন্য ও ব্রহ্ম এক নহে। ইহাতে আমার উত্তর,—শঙ্কর-কথিত “ব্রহ্ম”—“শূন্য” ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মই, অর্থাৎ তাহা পূর্ণ ও সার্বব্যব। তাহা স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় বৃহত্ত্বযুক্ত এবং যাহা হইতে ইহ জগতের জন্মাদি হইয়াছে—“জন্মান্তর্য যতঃ”—(বেদান্ত-১।১।২)। আচার্য্য রামানুজ বলেন—“সর্বত্রবৃহত্ত্বগুণযোগেন ... মুক্ষবৃত্তঃ (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। সুতরাং পরমেশ্বরই শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণের আদৃত ব্রহ্ম এবং এই ‘ব্রহ্ম’ আচার্য্য শঙ্কর-কথিত ‘ব্রহ্ম’ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।—

বেদান্তবেত্তং পুরুষং পুরাণং

চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।

তমেব বিদিত্বাহুতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পশু বিজ্ঞতেহয়নায় ॥ ইতি

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

দেবতার্চনে পশুবলিদান অপূর্ব-বিধি নহে

মহর্ষি মনু নিজ সংহিতায় ব্রাহ্মণগণের ভক্ষ্যভক্ষ্য সাধারণ বস্তুর নির্ণয় করিয়া মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া প্রথমেই বলিলেন—

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানঞ্চ কাম্যয়া।

যথাবিধি নিবৃত্তস্তু প্রাণানামেব চাত্মনো ॥ (মনু ১০।২৭)

যাহারা নিত্যন্ত মাংসভোজনেচ্ছু তাহারা যজ্ঞের অঙ্গীভূত দেবভোদ্যে
মন্ত্রদ্বারা সংস্কারপূর্বক নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিবে। ব্রাহ্মণের কামনায়
একবার মাত্র মাংস ভক্ষণ করিবে। আদ্যে ও মধুপর্কপানে নিযুক্ত হইলে মাংস
ভক্ষণ করিবে এবং অশ্রু খাত্তব্যের অভাবে জীবন সঙ্কট উপস্থিত হইলে মাংস
ভক্ষণ করিতে পারে।—

মন্ত্র এই বাক্যে ‘প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ’ এইরূপে বিধিনিষ্ঠা, বিভক্তি তাহা
‘অপূর্ব’-বিধির জ্ঞাপক নহে—‘পরিসংখ্যা’-বিধি। অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ যদি
একান্তই করণীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রোক্ষিত পশুর মাংস
ভিন্ন অন্য মাংস কখনও ভক্ষণ করিবে না। কারণ কাহারও মতে যজ্ঞার্থে
পশুবধ—অবধ, যজ্ঞার্থে হিংসা—অহিংসা। সুতরাং কেবল উদরপূতির জন্য বা
অন্য যেকোনও কারণে ‘বধ’ মহাপাপ ও নরকাদি দুঃখজনক।—ইত্যাদি অনেক
বলার পর উপসংহারে মন্ত্র নিজেই বলিলেন—“নিবৃত্তিস্তু মহাফলা” (৫।৫৬)।
প্রাণীমাত্রেরই মাংসে, মতে ও মৈথুনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তজ্জন্তু বিধির
কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিসংখ্যারূপ বিধিদানের তাৎপর্য্য, বৈধ-
আচরণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে অধিকার জন্মায়। নিবৃত্তিমার্গই
মুক্তির একমাত্র সোপান। মুক্তিকামীর পক্ষে কখনই ঐ প্রকার প্রবৃত্তির প্রশ্রয়
দেওয়া কর্তব্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন
যে ভগবদ্ভক্তজনবিমুখ অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ মানবগণের কিরূপ গতি হইয়া
থাকে—আপনারা তাহা বর্ণন করুন। তদন্তরে চমস মুনি বলিলেন—ভগবান্
হইতেই চারিটি আশ্রমসহ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা
অন্ততাবশতঃ নিজের উৎপত্তির কারণস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করে না, অথবা
জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্য চ্যুত হইয়া নরকাদিতেই পতিত হয়।
তাহার কারণ ব্রাহ্মণাদি জাতি উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন
করত শ্রীহরিপাদপদ্ম-স্নাতের যোগ্যতা সত্ত্বেও বেদের অর্থবাদে মোহিত হইয়া
স্বর্গাদি কামনায় কর্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া থাকে এবং যথার্থ কর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ,
অবিনীত, মুখ অথচ পণ্ডিতাভিমानी মূঢ়গণ শ্রুতিমধুর বেদবাক্যে মোহিত হইয়া
ভুচ্ছ কর্মফলপ্রদ নানা দেবতাগণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে।

এই সকল অবোধগণ নিজ নিজ মনোরথ-জাত গ্রাম্য বিষয়সুখ-ভোগ
হইয়া ‘প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং’, ‘সৌভ্রামণ্যাং সুরাশ্রুতান্ পিত্তাতি’, ‘ঋতৌ

ভাষ্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য অবগত না হইয়া মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদি বিষয়ে বেদোক্ত বিধি রহিয়াছে—এরূপ মনে করেন এবং ইহাতে কোনও দোষ নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা যথেষ্টভাবে ঐসব আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ সকল কার্য যথেষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। ঐ সকল কার্য বেদোক্ত 'অপূর্ব' বিধি নহে। যথা—লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোন'হি তত্র চোদনম্।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরানু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ চমস ঋষি বলিলেন—জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণীমাত্রেয়ই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অতএব ঐ সকল বিষয়ে শাস্ত্র-বিধির আবশ্যক নাই। তবে ঐ সকল কার্যে যথেষ্টাচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি অনিষ্টকর বলিয়া তাহা নিবারণের জন্ত নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজনবিধায় (এই সকল বিষয়লিপ্সুগণের নিমিত্ত) বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশুহত্যা দ্বারা আমিষ-ভক্ষণ ও সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের প্রকৃতি প্রশমিত করিবার জন্ত নিয়ম বিহিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল নিয়ম-বিধির আচরণে অভ্যাসক্রমে (সামান্য আদেশ) দ্বারা তাহা হইতে সকলকে ক্রমে ক্রমে সর্বতোভাবে নিবৃত্তির দিকে লওয়াই বেদের উদ্দেশ্য জানিবে।

স্মার্তগণ বেদের এই মহদুদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত না হইয়া জিহ্বার লোলুপতা বশতঃ দেবতোদ্দেশে পশুহত্যাকে 'বৈধ-বলি' আখ্যা দিয়া বৈধ হিংসার দোষ নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিধি কাহাকে বলে? তাহা কত প্রকার? কোন্ বিধির কি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তি রহিয়াছে। তজ্জন্তু ঐ বিষয়টা বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

অপূর্বাদি ত্রিবিধ বিধির বিচার

যে শাস্ত্রবাক্যদৃষ্টে কোন একটা কার্যের প্রেরণা বা নিবৃত্তি জন্মে তাহাকে বিধি কহে। ঐ বিধি তিন প্রকার। যথা—

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চাত্তত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে ॥ (ধর্মদীপিকা)

(১) অত্র শাস্ত্রবাক্যদ্বারা বা স্বাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ) কোন প্রকারেই যে কার্যের প্রাপ্তি নাই তদর্থ আদেশকে অপূর্ব বিধি কহে। (২) শাস্ত্রের দ্বারা অপ্রাপ্তি ও রাগবশতঃ বিকল্পে প্রাপ্তিস্থলে নিয়ম বিধি হইয়া থাকে। (৩) নিয়ম বিধির দ্বারা প্রাপ্ত এবং রাগতঃ তদতিরিক্ত বিষয়েও

প্রাপ্তিস্থলে তাহার সঙ্কোচার্থ যে বিধি করা হয় তাহাকে পরিসংখ্যা বিধি
কহে ।

১। অপূর্ববিধি—যে বিষয়ে লোকের একেবারেই প্রবৃত্তি নাই। একপ-
স্থলে একমাত্র শাস্ত্রাদেশদৃষ্টে এবং ঐ শাস্ত্রাদেশের অনাচরণে পাপভয়ে প্রবৃত্তি
জন্মে তাহাকে অপূর্ববিধি বা ফলজনক বিধি কহে । যথা—‘অহবহঃ সঙ্ক্যা-
মুপাসীত’, ‘মাতঙ্গানং প্রকুর্বাণীত’, ‘চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে স্নানং’ ইত্যাদি বিধিবাক্যদ্বারা
প্রাপ্ত কার্য্যসকল অন্য প্রকারে বা রাগাদি জন্ম প্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ সকলই
‘বিধি’ শব্দবাচ্য অর্থাৎ বৈধ । এই সব বিধির অনাচরণে নিন্দা ও পাপাদির
ফলভোগ সম্বন্ধে শ্রুত্যাди বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণও রহিয়াছে । যথা—

(ক) এতৎ সঙ্ক্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং বদধিষ্ঠিতম্ ।

যন্তু নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

(একাদশীতত্ত্ব-ধৃত চন্দোগ-পরিশিষ্ট-বাক্য)

(খ) সর্বারম্ভোহপি যো বিপ্রঃ সঙ্ক্যোপাসনতৎপরঃ ।

ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়তে অস্ত্যজন্মগতোহপি সন্ ॥

(অহ্নিকতত্ত্বে যাজ্ঞবল্ক্য-বচন)

(গ) সঙ্ক্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপাস্তে যাস্তি ব্রহ্মলোকমনায়ম্ । (অহ্নিকতত্ত্বে যম-বচন)

(ঘ) তুল্যমকরমেবেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে ।

হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ (তিথিতত্ত্বে পদ্মপুরাণ)

(ঙ) মকরস্থে রবৌ যো হি ন স্নাত্যনুদিতো রবৌ ।

কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত কথং স ত্রিদিবং ব্রজেৎ ॥ (তিথিতত্ত্বে পদ্ম পুঃ)

(চ) সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াৎ যন্তু মানবঃ ।

সপ্তজন্মস্ব কুষ্ঠী স্ত্যং দুঃখভাগী চ সর্ব্বদা ॥ (তিথিতত্ত্বে বৃহদ্বশিষ্ঠ-বচন)

অর্থাৎ, (ক) এই যে ত্রৈকালিক সঙ্ক্যার কথা বর্ণন করিলাম উহাকে আশ্রয়
করিয়াই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জানিবে । যাহার ঐ সঙ্ক্যাত্রয়ে আদর নাই, তিনি
ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য নহেন । (খ) যথাবিধি শৌচাদির অসামর্থ্যেও যে ব্রাহ্মণ
ত্রিসঙ্ক্যাতৎপর তিনি নিন্দিত কার্য্য জন্ম নিন্দিত ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইলেও
তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না । (গ) যাহারা নিত্য দৃঢ়তার সহিত ত্রিসঙ্ক্যার
সঙ্ক্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্মল (দুঃখাদি-
রহিত) ব্রহ্মলোকে গমন করেন । (ঘ) কা্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিত্য

প্রাতঃস্নান করিবে। এবং ঐ সকল মাসে হবিষ্যভোজন ও ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা দি মহাপাতক পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। (ঙ) সৌর মাসে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রাতঃস্নান না করে সে মানব কিরূপে পাপমুক্ত হইবে এবং কিরূপেই বা স্বর্গে গমন করিবে? (চ) সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে মানব স্নান না করে সে সাত জন্মব্যাপী কুষ্ঠরোগী ও সর্বদা দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

২। নিয়ম বিধি—অপূর্ববিধির দ্বারা প্রাপ্ত নহে অথচ রাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশে) যে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, রাগাভাবে আবার না জন্মিতেও পারে—এইরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার নিবারণ জন্য যে বিধি বা নিয়ম করা হয়, তাহাকেই নিয়মবিধি কহে। যথা—

‘পশ্চাৎ স্বয়ং পত্নী চ শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’। (তিথিতত্ত্বশেষে দেবল-বচন)

অর্থাৎ—শ্রাদ্ধান্তর জ্ঞাতভোজন ও ভৃত্যগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পত্নী শ্রাদ্ধশেষ অন্নাদি ভোজন করিবে। তদনুযায় নিন্দা-শ্রুতিই রহিয়াছে। যথা—

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যঃ শেষং নান্নমশ্নাতি মন্দধীঃ।

লোভান্মৌহাদ্ ভন্নাদ্ বাপি তস্ম তদ্বিফলং ভবেৎ ॥

(তিথিতত্ত্বশেষে শিব রহস্য)

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনান্তর অজ্ঞান যে ব্যক্তি রসনা তৃপ্তিকর অন্য কোনও খাদ্য লোভে মোহবশতঃ অথবা স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি ভয়ে সেই শ্রাদ্ধশেষান্ন ভোজন না করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধই বিফল হইয়া থাকে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও এই সব রাগপ্রাপ্তস্থলে নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়াছেন—
যথা—‘এষ চ রাগপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধিঃ কিন্তু শ্রাদ্ধান্তত্বেন নিয়মবিধিঃ।
ইতি— অর্থাৎ ‘শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ’—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এই যে শেষ ভোজন-বিধি, উহা রাগপ্রাপ্তহেতু অপূর্ব-বিধি নহে; কিন্তু শ্রাদ্ধান্ত বলিয়া নিয়মবিধি। পূর্বোক্ত নিন্দাশ্রুতিদ্বারা এই নিয়মবিধিও অপূর্ব-বিধির দ্বারা অবশ্য পালনীয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিয়মবিধি দুই প্রকার—(ক) স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্রফলকঃ, (খ) অন্য-যোগব্যবচ্ছেদফলকঃ। প্রথম নিয়মবিধি নিজের অযোগমাত্রের জ্ঞাপক। তাহার আকার ‘শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীতৈব’। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্নাদির কিঞ্চিৎ-মাত্রও ভোজন করিতেই হইবে। তৎপর অন্য বস্তুও ভোজন করা যাইতে

পারে। ইহাই উক্ত নিয়মবিধির বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্বোক্ত নিন্দাপ্রতিদ্বারা এই নিয়মবিধি অপূর্ববিধির আশ্রয় অবশ্য করণীয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মবিধি তদতিরিক্ত অন্য বস্তু মাত্রেরই নিষেধক। তাহার আকার ‘মাংস-ভোজনেচ্ছায়াং সত্যাং প্রোক্ষিতং মাংসমেব ভক্ষয়েৎ নাশ্রুৎ।’ অর্থাৎ মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে দেবতোদ্দেশে সংস্কৃত পশুর মাংসই ভোজন করিবে। অন্য মাংস কখনও ভোজন করিবে না।

৩। পরিসংখ্যাবিধি—পূর্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মবিধিকেই পরিসংখ্যাবিধি কহে। যথা—অন্ত্যর্থশ্রয়মানা চ যান্ত্যর্থপ্রতিষেধিকা।

পরিসংখ্যা তু সা জ্ঞেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজনম্ ॥

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ভট্টপাদোক্তি)

যে বিধিবাক্য কোনও কার্যের প্রযোজক হইয়া তৎসঙ্গে অন্য কার্যান্তরের নিষেধক হয়, তাহাকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—‘প্রোক্ষিতং মাংস-মেব ভোক্ষয়েন্নাশ্রুৎ’, ‘সৌত্রামণ্যামেব সুরাগ্রহান্ গৃহ্নাতি নাশ্রুত্’, ‘ঋতৌ ভার্য্যা-মেবাভিগচ্ছেন্ন পরকীরাম্’, ‘ঋতাবেব ভার্য্যাং গচ্ছেন্নাশ্রুত্’, ‘ঋতৌ সন্ধুদেব ভার্য্যাং গচ্ছেন্নাশ্রুত্’ ইত্যাদি সমস্ত পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা এই সকল বিষয়-ভোগ-বর্জনে অসমর্থকে অভ্যুজ্জা (সামান্য আদেশ) মাত্র দান করা হইয়াছে। অবশ্য কর্তব্যরূপে বলা হয় নাই। অতএব ইহার তাৎপর্য—সর্বদা এই সব ভোগকরা নহে। ভোগেচ্ছুগণও আয়াসসাধ্য বলিয়া সর্বমাংস ভক্ষণ, সর্বপ্রকার মদ্যপান ও স্ত্রীমাত্রের অভিগমন প্রভৃতি সমস্ত কার্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিরত হইবে—ইহাই প্রকৃত শাস্ত্র-তাৎপর্য। ভাগবত-বাক্যেও ‘আত্মনিবৃত্তি-রিষ্টা’ বলাতে উহার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

স্মার্তের বৈধ-হিংসার সমালোচনা

স্মার্তগণ বলিদানকে যে বৈধহিংসা বলেন, তাহা কোন্ বিধির অন্তর্গত দেখা যাউক। বলিদান ও মাংস ভোজনাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য, তাহাতে অপূর্ব-বিধির প্রাপ্তি নাই। স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্র-ফলক নিয়মবিধি বলিলেও সকলকেই নিত্য বলিদান ও মাংস-ভোজনাদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অবশ্যই করিতে হইবে। তাহাতে যুক্তিকল্পতরু ও পদ্যপুরাণাদিতে যে বলির ভূয়োভূয়ো দোষকীর্তন করা হইয়াছে, তাহার অপ্রামাণ্য হয়। বেদে, তারাপ্রদীপে ও কালিকা পুরাণে যে অমুকল্পবিধি রহিয়াছে তাহারও নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। সেইরূপ মদ্যপান এবং মৈথুন বিষয়েও উক্ত নিয়ম-বিধি বলিলে মদ্যপানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও ঐ

বিধির দ্বারা বাধ্য হইয়া মদ্যপান করিতে হয়। এবং মৈথুনে অনাসক্ত অথবা পিতৃধনমুক্ত ব্যক্তিকেও প্রতি ঋতুতে অভিগমন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সুতরাং বলিদানাদি রাগপ্রাপ্ত কার্যমাত্রই ত্রিদোষদুষ্ট পরিসংখ্যা-বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

পরিসংখ্যাবিধির ত্রিদোষ যথা—

শ্রুতার্থশ্চ পরিত্যাগাদশ্রুতার্থশ্চকল্পনাং।

প্রাপ্তশ্চ বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা ॥

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ (স্বার্থহানি), অশ্রুতার্থের কল্পনা (অর্থান্তরকল্পন), এবং রাগপ্রাপ্তের নিষেধরূপ তিনটি দোষই পরিসংখ্যাবিধিতে বর্তমান রহিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার ও ব্যতিচারাদির সর্বতোভাবে নিবারণ করাই এই বিধির তাৎপর্য, আবশ্যকত্ব জ্ঞাপন নহে। সুতরাং যদি কেহ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া ঐ কার্য করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্যটুকুই আচরণ করিবে, তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। এবং অনিচ্ছায় অনাচরণে কোনও প্রত্যাবার হইবে না। বরং এই সকলের পরিত্যাগে বিশেষ ফললাভই হইয়া থাকে। যেহেতু পরিসংখ্যাবিধিপ্রাপ্ত কার্যের কোথাও অবশ্যকর্তব্যতারূপে উক্তি নাই। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের ভোজন পরিসংখ্যা কখনে রঘুনন্দনও তাহা স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।

মহাভারতেও পশুবলির অবৈধত্ব

সর্বপুণ্যসার পঞ্চমবেদস্থানীয় মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ১১৫ অধ্যায়ে মহামতি ভীষ্মদেব যজ্ঞাদিতে পশুবলি ও সর্বপ্রকার মাংসভক্ষণ-বর্জন সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও ফলশ্রুতি সমগ্র অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাহা হইতে মাত্র দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিলাম। যথা—

(১) সর্বে বেদা ন তৎ কুর্যুঃ সর্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত।

যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ততে ॥ (মহাঃ অনুঃ ১১৫।১৮)

হে যুধিষ্ঠির! কোনও মানব প্রথমে অজ্ঞতাবশে মাংস-ভক্ষণ করিয়াও যদি পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করে, তবে তাহার সেরূপ ধর্মলাভ হয়, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্মলাভ হয় না।

উক্ত বাক্যের টীকায় শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—“ন হি কৃৎস্নোবেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংস্যাং প্রবর্তয়ন্তু, কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ”।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞসকল মানুষকে কখনও হিংসাকার্যে (বলিদান বিষয়ে) প্রেরণা দান করেন না। কিন্তু পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

(২) ইজ্যায়জ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যোমার্গৈরবুধোহধমঃ।

ইজ্যাজ্ঞন্তুমাংসগৃধুঃ স বৈ নরকভাঙ্নরঃ ॥

(মহা: অনু: ১১৫।৪৭)

শ্রীমল্লীকর্ণটীকা—“ইজ্যা দেবপূজা, যজ্ঞোহশ্বমেধাদিসুদর্থাঃ শ্রুতিকৃতৈ-
মার্গৈরুপায়ৈরবুধো যজ্ঞোপনিষদমজানমাংসগৃধুঃ কেবলং যজ্ঞব্যাজেন মাংস-
ভোক্তুকামঃ” ইতি।

অর্থাৎ, বেদোক্তবিধির মতে দেবপূজা ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যে অজ্ঞানাধম মানব দেবপূজা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যথার্থ অভিमत সর্বতোভাবে না জানিয়া কেবল দেবপূজা বা যজ্ঞের অজুহাতে মাংস-ভোজনেচ্ছু হইয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি এই পশুহত্যাপাপে নরক-ভাগীই হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বচন ও প্রবন্ধসকলে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা দ্বারা তটস্থ, সারগ্রাহী ও সহৃদয় জনগণ আশা করি এখন হইতে এই বলিদানকে আর বৈধবলি আখ্যা দিবেন না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীন চন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্য

বর্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রমোত্তর-
চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর
অভিনব আকারে অপূর্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫/- মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

শ্রীবাসপূজা-স্মরণে

ভক্ত্যুপহৃত নব-দুর্বাদল

(১)

বাসপূজাদিনে অভিনাষ মনে তোমার চরণ-তলে ।

“ব্যথিত প্রাণের আকুল অর্ঘ্য, চরণে সঁপিব ব'লে ॥১॥

পৃথিবীতে যত গ্রাম ও নগরে, পড়ে গেছে সাদা প্রতি ঘরে ঘরে,
(সবে) পূজিছে চরণ ষোড়শোপচারে, সিত-সিক্ত শতদলে ॥২॥

(২)

বন্ধজীবগণে করিয়া করুণা, যুগ-যুগান্তের যত আবর্জনা,
যুক্তি-পবনে দূরে উড়াইয়া, (হৃদে) ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিলে ॥৩॥
হে প্রভু দয়াল ! করুণা করিয়া, করম-কারার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া,
জড়ীয় জ্ঞানের তামস-বর্ষ, ভক্তি-খড়্গে ছেদিলে ॥৪॥

(৩)

দুরতিক্রম্য মায়ার পেষণে, নিপীড়িত সদা বন্ধ জীবগণে,
আজ তাঁরা তব করুণার গুণে, মায়ী-মুক্ত অবহেলে ॥৫॥
ভক্তি-বিরোধী পলাইল দূরে, শান্তি রাজিল প্রতি ঘরে ঘরে,
ভক্তি-রবির প্রখর প্রভার (জীবের) মোহ-তিমির নাশিলে ॥৬॥

(৪)

পাতকীর পাপ মোচনের তরে, নরক হইতে টানিয়া তাহারে,
অনাবিল করি' হৃদয় তাহার কৃষ্ণ-সেবায় স্থাপিলে ॥৭॥

(মোর) দূরিত-প্রভাবে আয়ু রবি ক্ষীণ,

তা'তে আমি শুদ্ধা ভক্তি-রতি হীন,

করিয়া আমারে সেবক সুদীন,

রেখো তব পদমূলে ॥৮॥

দীন সেবক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নারমা (মেদিনীপুর)

চৈতন্য-চরিত শ্রীধাম-ভক্ত

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।
চক্ষুরন্মূলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বরং রূপং কদা মহং দদাতি স্বপদাভিকম্ ॥
বাণ্যকল্পতরুভাশ্চ কৃপাসিকুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
নমো মহাবদাত্মায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরদ্বিষে নমঃ ॥
যেনে তেনে মতে গায় চৈতন্য-মহিমা ।
নিত্যানন্দের প্রীতি করে নাই তার সীমা ॥
তোমার প্রীতির অর্থে চৈতন্য-চরিত ।
গাই, কর গুরু তুমি জগতের হিত ॥

“ব্রজভূমি-চিষ্টামণি,

চিদানন্দ রত্নধনি,

যথা নিত্যরসের বিলাস ।

জীবে দিব গুঢ় ধন,

চিস্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,

ভূমে আনি করিল প্রকাশ ॥”

শ্রীধামের সেবা ধামেশ্বর বিষ্ণুর সেবা হইতে একটি পৃথক্ ভক্ত নয় ।
বিষ্ণুর নাম, ধাম, গুণ, লীলাদি সকলই চিন্ময় । জড়-বিভূতিরূপে এই
সকলের ভিতরে যে প্রকার—পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, চিদ্বিভূতিরূপে সেই
সমস্তের ভিতরে সে প্রকার কোন পার্থক্য নাই । এই তত্ত্বজ্ঞানের উপরেই
ভক্তির বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত । ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ । এই
জ্ঞানে চিদ্বিলাসের উপকরণ স্বরূপে ধামাদির নিত্য অবস্থান অস্বীকৃত হয়
নাই । নির্বিলাস কৃষ্ণের পরিকল্পনা বাস্তব বিজ্ঞান-রাজ্যের কথা নয় । সূতরাং
ধামকে উপেক্ষা করিয়া ধামেশ্বরের ধর্ম সেবা-প্রবৃত্তি, সে নিত্য খণ্ড-জ্ঞান
হইতেই অভ্যুত্থিত । বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-ধামের যুগপৎ সেবাই অখণ্ড-জ্ঞানের
সেবা । “রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন, এই মোর জীবন

উপায়”—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই বাক্যতে এই অখণ্ড সেবারই অনু-
সন্ধান পাওয়া যায় । আমরাও মহাজনের আদর্শ সম্মুখে লইয়া, বিষ্ণুর কথা
কীর্তন করার পূর্বে, তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ শ্রীধামের কথা কিঞ্চিৎ কীর্তন
করিতে অগ্রসর হইলাম ।

শ্রীবৈকুণ্ঠ তত্ত্ব

বিষ্ণুধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । প্রাকৃত তত্ত্বসকল দেশ,
কাল এবং ভাবের দ্বারাই খণ্ড খণ্ড হইলেও অপ্রাকৃত পরতত্ত্বে তদ্রূপ দোষ ও
খণ্ড-ভাব থাকিতে পারে না ।

বৈকুণ্ঠ তত্ত্বের বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গেলে, পূর্বে শক্তি ও শক্তিমান
তত্ত্বের বিচার করিতে হয় । ব্রহ্ম শক্তিমান তত্ত্ব । ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-শক্তির
সত্তা ভেদ নাই । অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক করিতে পারা
যায় না । শক্তিই শক্তিমানকে প্রকাশ করেন । দাহিকা শক্তির অভাব হইলে
অগ্নির সত্তা-প্রকাশের কোন সম্ভাবনা থাকে না । সেই প্রকারে নিঃশক্তিক
ব্রহ্মেরও সত্তা থাকিতে পারে না । কৃষ্ণই শক্তিমান ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্ম ।

কৃষ্ণের অচিন্ত্যভাব-সম্পন্ন পরাশক্তির সন্ধিনী, সন্ধিৎ ও হ্লাদিনী নামে
তিনটি ভাব আছে । সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই সদৃ অংশে সন্ধিৎভাব এবং আনন্দ
অংশে হ্লাদিনী ভাবযুক্ত । সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তার উদ্ভব হইয়াছে ।
পীঠসত্তা, অভিধা-সত্তা, রূপ-সত্তা, সন্ধিনী-সত্তা, সঙ্কল্প-সত্তা, আধার এবং আকার
প্রভৃতি সকলই সন্ধিনী সত্ত্বতা । পরাশক্তির তিন প্রকার প্রভাব আছে;
যথা চিৎ-প্রভাব, জীব-প্রভাব ও অচিৎ-প্রভাব । চিৎ প্রভাবটি স্বগত এবং
জীব ও অচিৎ প্রভাব দুইটি বিভিন্নতত্ত্বগত । চিৎ-প্রভাবগত পরাশক্তির
সন্ধিনী ভাবগত পীঠসত্তাই শ্রীবৈকুণ্ঠ । জীব প্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনী-
ভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন সত্ত্বরূপী হয়, তখন তিনি স্বর্গাদি উচ্চলোকসকল
এবং নরকাদি নিম্ন লোক সকল সৃজন করেন । অচিৎ বা মায়া প্রভাবগত
শক্তি সন্ধিনীর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া জড় সৃষ্টি করেন । চৌদভুবনাত্মক এই
ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত; ইহাতে মায়ার বিক্রম পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে ।
ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া যে এক জলনিধি আছে, তাহার নাম বিরজা ।
বিরজার অপর পারে শ্রীবৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের জ্যোতিরূপে বিद्यমান ব্রহ্মলোক
বিরাজ করিতেছেন । বিরজাই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত
মধ্যবর্তি-তত্ত্ব ।

বৈকুণ্ঠের উপরার্ক গোলোক নামে অভিহিত । ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য হিসাবে বিষ্ণু-তত্ত্বের দুইটি প্রকাশ আছে । ঐশ্বর্য্যপর বিচারের স্থান শ্রীনারায়ণধাম বৈকুণ্ঠ, এবং মাধুর্য্যপর বিচারের স্থান শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোক । দ্বারকা, মথুরা, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন—গোলোকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ । গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য হিসাবে পুনঃ দুইপ্রকাশ প্রকটিত আছে । শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্য প্রকাশে শ্রীগৌরজন্মদর । এই দুই প্রকাশের স্থানও পৃথক্ । ঔদার্য্য এবং মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ দুইটি শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবনে অবস্থিত আছেন । গৌর-পীঠের প্রতীতিতেই নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণপীঠের প্রতীতিতেই বৃন্দাবন । সমগ্র অপ্রাকৃত ভূগতই বৈকুণ্ঠ আখ্যায় পরিচিত ।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম

এই শ্বেতদ্বীপেই অপ্রাকৃত শ্রীনবদ্বীপধাম অবস্থিত । এই ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় বদ্ধজীবের ধারণায় প্রাকৃতের মত দেখা গেলেও বস্তুতঃ সে ধাম প্রাকৃত নয় । চিন্ময় গোলোকাদি ধামই কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হয় । সেই সমস্তই অপ্রাকৃত ও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব । এই সকল স্থানের বৃক্ষ-লতাাদি সকলই চিন্ময় ।

সাধারণ মানব নবদ্বীপকে নূতন দ্বীপ মনে করিয়া সীমাবদ্ধ গ্রাম বলিয়া ধারণা করেন । কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা একখানা গ্রাম নহে—নয়খানা গ্রামের সমষ্টিগত গ্রাম বলিয়া নবদ্বীপ নাম হইয়াছে । ভাগীরথী নদী এই ধামের মধ্য দিয়া বিভিন্নরূপে প্রবাহিতা আছেন । এই নদীর পূর্বপারে পাঁচটি দ্বীপ এবং পশ্চিমপারে চারিটি দ্বীপ অবস্থিত আছে । (১) অন্তদ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ—পূর্বপারে এবং (৬) কোলদ্বীপ (বর্তমান নবদ্বীপ সহর), (৭) ঋতুদ্বীপ, (৮) জহ্নুদ্বীপ এবং (৯) মোদ্রুমদ্বীপ—পশ্চিমপারে । সমস্ত ধামটি একটি অষ্টদল পদ্মফুলের মত । অন্তদ্বীপ সেই ফুলের কেশররূপে অবস্থিত । এই নয়টি দ্বীপ নববিধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ । সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্যা ভক্তির, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্তনাখ্যা ভক্তির, মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্যা ভক্তির, রুদ্রদ্বীপ—সখ্যাখ্যা ভক্তির, কোলদ্বীপ—পাদ-সেবনাখ্যা ভক্তির ঋতুদ্বীপ—অর্চনাখ্যা ভক্তির, জহ্নুদ্বীপ—বন্দনাখ্যা ভক্তির, মোদ্রুমদ্বীপ—দাস্তাখ্যা—ভক্তির ও অন্তদ্বীপ—আত্মনিবেদনাখ্যা ভক্তির স্থান । অন্তদ্বীপের অন্তর্গত যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে কলিযুগ-পাবনাবতারা শ্রীগৌর-জন্মদর প্রাকট্য লাভ করেন । এই প্রাকট্য সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে উল্লেখ

পাওয়া যায়। এখানে দুই একটি শাস্ত্র-বাক্যের উল্লেখ করা' গেল।

“বর্ত্তন্ত্যেহ নবদ্বীপে নিত্য-ধারি মহেশ্বর।

ভাগীরথী-তটে পূর্বে মায়াপুরস্ত গোকুলম্ ॥” (উদ্ধারায় মহাতন্ত্র)

অর্থাৎ :—নবদ্বীপে ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত মায়াপুরই নিত্যধাম গোকুল। আবার ব্রহ্মসামল-বাক্যে বলিয়াছেন :—

“অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মন্তুভক্লপধ্বক।

মায়াশাক্ত ভবিষ্যামি কোলৌ সংকীৰ্ত্তনাগমে ॥”

অর্থাৎ :—কলিযুগে সংকীৰ্ত্তনারম্ভে আমি (কৃষ্ণ) ভক্তিভাব আঙ্গীকার করিয়া ধরাধামে মায়াপুরে অবতীর্ণ হইব। কপিল-তন্ত্র-বাক্যে বলিয়াছেন :—

জম্বুদ্বীপে কোলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।

জনিভ্বা পার্শদৈঃ সার্কঃ কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥”

অর্থাৎ :—ঘোর কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পার্শদসহ জম্বুদ্বীপে মায়াপুরে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন-ধর্ম প্রকট করাইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু প্রমাণ বহু শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীনবদ্বীপধামের বৈকুণ্ঠ পরিধি ষোলকোশ। অপরাধ-ক্ষয় ও প্রেমলাভ, এই দুইটিই এই ধামের বৈশিষ্ট্য—ইজাদি বহু ভগবদপরাধী এই ধামের সেবার ফলে সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। মহাবদান্ত প্রেমাবতার শ্রীগৌর জন্মের প্রেমদান-লীলার নিত্য প্রকট-ক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সমস্ত তীর্থের রাজা। এই ধামের চিন্ময়ত্ব সম্বন্ধে সন্দ্বিগ্ধচিত্ত লোকসকল ব্রজবাসের অধিকার হইতে চিরকালই বঞ্চিত থাকেন। আমরা কোটি কোটিবার এই ধামের এবং ধামবাসীর চরণ বন্দনা করিতেছি।

—শ্রীল নিমানন্দ সেবাভীর্থ-গোস্বামি-

ঠাকুরের আসামীভাষায় লিখিত প্রবন্ধ আদামবাসী
শ্রীবুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত।

প্রাকৃত শব্দ ও অপ্রাকৃত নাম

অপার করুণাসিদ্ধ লীলাময় পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলা-পুষ্টির জন্য অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে জীবসমূহের ও স্থাবর-জঙ্গম, কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণী ও বস্তু-সমূহের প্রত্যেকটিকে নির্দেশ করিবার শব্দ-সমূহ রহিয়াছে—তাহাদিগকে ‘নাম’ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ভগবদিতর প্রাকৃত

বস্তুসমূহের সংজ্ঞাসূচক নামের নিরর্থক জল্পনা বা শব্দালোচনাদ্বারা জীবের পার্থিব অনিত্য পরিবর্তনশীল ও ক্লেশদায়ক ফললাভ ব্যতীত কোনও প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু ভগবান্নাম সেপ্রকার নহে—তাহা কোনও দৃষ্ট-জগতের বস্তু নহে; অতরাং অপ্রাকৃত। একমাত্র সেই শ্রীভগবান্নাম গ্রহণ দ্বারাই জীবের অপ্রাকৃত মঙ্গল লাভ হইতে পারে। এইজন্য সর্বশাস্ত্রেই শ্রীহরির নাম-গ্রহণের কথা সর্বত্রই নির্দেশ দিয়াছেন। বৃথা প্রজ্ঞাদ্বারা প্রাকৃত শব্দের আলোচনার সময় নষ্ট করার আবশ্যক নাই। শাস্ত্র বলেন—

বেদে, রামায়ণে চৈব, পুরাণে, ভারতে তথা।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীৰতে ॥ (হরিবংশ)

অর্থাৎ, বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে প্রভৃতি ষাবতীয় শাস্ত্রের আদিতে, মধ্যে ও শেষে সর্বত্রই কেবলমাত্র হরিই কীর্তিত হইয়াছেন। তাই বড়গোস্বামীর অন্ততম পূজ্যপাদ শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু তাঁহার রচিত শ্রীহরিনামামৃতব্যাकरणের প্রথমেই মঙ্গলাচরণমুখে লিখিয়াছেন—

আহত-জলিত-জটিতং দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসন-স্তোমস্।

হরি-নামাবলি-বলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিন্ত্য ॥২॥

অর্থাৎ, কলাপাদি অন্যান্য ব্যাকরণশাস্ত্র সকলে নিরর্থক জল্পনাবৃত্ত শব্দরাশি দেখিয়া বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রীহরির নামাবলী-সম্বলিত ব্যাকরণ রচনা করিতেছি।

পরদুঃখকাতর পরম দয়াল শ্রীমজ্জীবগোস্বামি-প্রভু জীব-কুলের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া, তাহাদের উদ্ধার-মানসে এবং শ্রীহরিনামের বৈশিষ্ট্য জগতে প্রচার করার জন্য অন্যান্য সংজ্ঞা বা নামসমূহকে নিরর্থক জল্পনাবৃত্ত বলিয়া শ্রীহরিনাম সম্বলিত ব্যাকরণ বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত হরিনামামৃতব্যাकरण প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু সমূহ জীবকুলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের সকলের জন্যই এই শ্রীহরিনামাবলিবলিত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এবং তিনি উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

ব্যাকরণে মরু-নীৰুতি জীবন-লুপ্তাঃ সদাব-সংবিদ্যাঃ।

হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্ত শতদাবগাহন্তাম্ ॥৩॥

অর্থাৎ, যাহারা কেবলমাত্র শব্দজ্ঞানলাভেচ্ছু, তাহারা নিরর্থক জল্পনাবৃত্ত অন্যান্য ব্যাকরণরূপ মরুদেশে জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া সর্বদাই পাপে লিপ্ত হইতেছেন, তাহারা মৎকৃত শ্রীহরিনামামৃতব্যাकरणশাস্ত্র আলোচনা বা শিক্ষা

করুন ; ইহা দ্বারা এককার্য্যে দুই কার্য্য সাধিত হইবে। অর্থাৎ শব্দজ্ঞান ও ভগবান্নামগ্রহণ এই দুই কার্য্য একসঙ্গে হইয়া যাইবে এবং অশেষ মঙ্গলও সাধিত হইবে। পদ্মপুরাণ বলেন যে—যে-তে প্রকারে নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে। যথা—

সাক্ষেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।

বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ঐ ধৃত ৪॥

“সাক্ষেত্যং স্ত্রীপুত্রাদৌ সঙ্কেতিভং” অর্থাৎ স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, পুত্রের নাম নারায়ণ—ইত্যাদিরূপে ; পারিহাস্যং (পরিহাসেন কৃতং পঞ্চাদ্যুপচারণেণ শ্রীশালকাদৌ ভং হরিস্বং হরিরিতি)” অর্থাৎ—হরি শব্দে পশু বুঝায়, শ্রীশালককে ‘তুমি হরি’ ‘তুমি হরি’ বলিয়া উপহাস করিয়া ; “স্তোভং (গীতালাপপূরণার্থং কৃতং)” অর্থাৎ—বাচ্য-যন্ত্রাদি সহযোগে গীতালাপপূরণ করত ; “হেলনং (সাবজ্ঞং কিং বিষ্ণুনা)” অর্থাৎ বিষ্ণু কি করিতে পারে ? এরূপ অবহেলা পূর্বক বাক্য কখন—ইত্যাদি প্রকারে নামাভাসদ্বারা মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপকত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

নামৈকং যন্ত বাচি স্বরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥

(পদ্ম পুঃ স্বঃ খঃ ৪৮ অঃ)

‘কৃষ্ণ’ এই একটা নাম যাহার মুখে উদ্ভূত হন, শ্রবণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হউক, অথবা ব্যবধান যুক্তই হউক বা রহিতই হউক, কিম্বা খণ্ডোচ্চারিত হউক, শ্রীনাম অবশ্যই সেই নামগ্রহীকে উদ্ধার করিবেন। এই বাক্যদ্বারা শিক্ষা পাওয়া যায়,—অপরাধ শূন্য হইয়া যে-কোনও প্রকারে নাম গৃহীত হইলে পর, তাহার একটা ক্রিয়া হইবেই হইবে।

অসংসঙ্গ প্রভাবে জীবের রসনাতে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয় না ; যাহা হইয়া থাকে, তাহা কেবল নামাপরাধ। নামাভাস দ্বারা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির সুযোগ হয় ; কিন্তু পরম প্রয়োজন-স্বরূপ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর নিত্য-প্রেমসেবালভ করা যায় না।

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয় ॥

কভু নামাভাস হয় সদাই নাম অপরাধ।

এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥ (প্রেমবিবর্ত)

প্রথমে নামের গুণ বা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া, তদনন্তর নিত্য চিন্ময় নাম অসাধুসঙ্গে কৃত হইলেও যে তাহার একটা বাহ্যিক ফল আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীনাম চিন্তামণি বস্তু ; অসাধুসঙ্গে কৃত হইলেও কচিং ভাগ্যক্রমে নামাভাসও হইতে পারে ; কিন্তু বেশীভাগই নামাপরাধ হইয়া যায়। নামাভাসের দ্বারা বৈকুণ্ঠগতিরূপ মুক্তিফল প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু নামাপরাধ দ্বারা নিত্যবদ্ধ দশার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। যথা—“নামাভাসেনাজামিলো ছুরাচারোহপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞাহপি বহুশো নামগ্রাহিণোহপ্যর্থবাদ-কল্পনাदि-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে।” যেহেতু—

‘কৃষ্ণ-নাম’ করে অপরাধের বিচার।

‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ চাঃ ৮২৪)

একবার নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিতে পারিলে, নামকারীর সর্বপাপ নাশ হইয়া, শুদ্ধ নামবলে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এহেন কৃষ্ণনাম কোটি কোটিবার গ্রহণ করিয়াও যদি গ্রহণকারীর অশ্রু, কল্প, পুলকাदि অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, এইরূপ নাম গ্রহণফলে জীবের হৃদয়ে প্রচুর নামাপরাধ সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। উষর ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে যেরূপ ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ প্রচুর অপরাধময় কঙ্কর-বালি প্রভৃতি দ্বারা শুপীকৃত জীব-হৃদয়ে নামবীজ আরোপণ করায় অক্ষুরিত না হইয়া ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে।

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥

অর্থাৎ, সাধুসঙ্গ-বলে অপরাধের স্বরূপ অবগত হইয়া, অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম লইলেই শুদ্ধনামের উদয় হইবে। অজামিল বলিয়াছিলেন—

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্ব মিথ্যার্থধীমতিম্।

ধাশ্চে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্তনাদিভিঃ ॥

ইতি জাতশ্চনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।

গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ ॥ (ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন,—হে রাজন্ ! “অজামিলের ক্ষণকাল মাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল ; তাহাতেই তাঁহার নির্বেদ জন্মিল। তিনি বলিলেন—‘ভগবান-কীর্তনে ও তদীয়জন-সঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ নহি ; সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি

স্থির হইয়াছে। এইবার আমি দেহাদিতে ‘আমি’-‘আমার’ বোধ ত্যাগ করিয়া
তাহারই চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব।’ তিনি পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত
করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) গমন করিয়াছিলেন।’ শ্রীল কৃষ্ণদাস
কবিরাজ গোস্বামী নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উপদেশ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ
করিয়াছেন—

হরিদাস কহেন—“যেছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হইতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥
চোর-শ্রেষ্ঠ-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ান্তে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮২-৮৪)

কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্য-
মুক্ত। অতএব নাম-নামী এক বস্তু—ভিন্ন নহে। এই সচ্চিদানন্দ রসময়—
বিভিন্ন রসের বিষয়বিগ্রহতত্ত্ব এক অদ্বয় বস্তু। সেই অদ্বয়তত্ত্ববস্তুই নাম ও
বিগ্রহ—এই দুইরূপে আবিভূত হইয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী
লিখিয়াছেন—

একমেব সচ্চিদানন্দরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতং। (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ টীকা)
শ্রীভগবন্মাম গ্রহণই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম—

এতাবানেব লোকেহ্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম-সঙ্কীর্ণাদিদ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে
জীবসমূহের “পরম ধর্ম্ম” বলিয়া কথিত হয়। এই ভুবনমঙ্গল হরিনাম সকলের
জিহ্বায় ক্ষুধা প্রাপ্ত হয় না; যিনি শত শত বৎসর পূর্ব্ব বাসুদেবের অর্চনা
করিয়াছেন, তাহারই মুখে শ্রীনাম নিত্যকাল ক্ষুধা পাইয়া থাকেন। এই নাম
গ্রহণে বা কীর্ত্তনে কোন দেশ, কাল, পাত্রাপাত্র বিচার নাই; ইহা সেবোন্মুখ
জিহ্বা ব্যতীত, প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যবস্তু নহেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিन्द्रিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মরত্যদঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২য় লঃ ১০৯)

শ্রীমুদ্ভাগবত বলেন,—শ্রীনাম সকলেরই পক্ষে অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ও
যোগিগণের পক্ষেও সেবোন্মুখ অবস্থাতে সাধন ও সাধ্য।

—শ্রীরাজবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর।

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—তোমার শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেও আমার মন হইতে সন্দেহ কিছুতেই দূরিত হইতেছে না। তুমি কৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ আকারবিশিষ্ট এবং সর্বশক্তিমান্ বলিতেছ কিন্তু অন্যান্য ঋষিগণ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; কপিল, পতঞ্জলি, গোতম কণভুক, জৈমিনী, বুদ্ধ প্রভৃতি সকলেই পৃথক পৃথক মত প্রচার করিয়াছেন। পরবর্তী কালেও অনেক সাধক অনেক প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন এবং জগতে তত্তৎ মতের অনুবর্তী যন্থকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। “নাসাবুবির্য়শ্চ মতং ন ভিন্নম্” বাক্যানুসারে তাঁহাদের মত ভিন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ঋষি বলিয়া দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলেও ভগবানকে পাওয়া যায়। অথচ তোমার শাস্ত্র-প্রমাণ-মূলক যুক্তি দ্বারা সেগুলির শ্রেষ্ঠত্ব খণ্ডিত হইতেছে। এক্ষণে আমি কি মনে করিব,—তোমার বিচারই একমাত্র-সত্য?

দেবেন্দ্র—ভাই, ভগবান্ কোন সান্ত বস্তু নহেন। তিনি অনন্ত রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাঁহাকে জানিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকারেই তাঁহাকে বুঝিয়াছে। তজ্জন্ত তিনি এক হইলেও সাধকগণ তাঁহার অনন্ত প্রকার প্রতীতি লাভ করে। সাধক মাত্রেরই সিদ্ধিতে একই প্রকার বস্তু লাভ হইবে, ইহা কখনই সত্য নহে এবং সাধকগণের মধ্যেও উচ্চাভিলাষ অবস্থা বর্তমান। কতকগুলি জীব সাধনাদ্বারা মায়িক রাড়ের সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে এবং তথা হইতে মায়াভীত বস্তুর নির্দেশ করিতে গিয়া তাহান্ন অসম্যক্ অনুভূতির পরিচয় প্রদান করে। কেহ বা মুক্ত ভূমিকায় উন্নত হইয়া আংশিক স্বরূপের বর্ণনা করেন। যত প্রকার মতই থাকুক না কেন, উহার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। একটী আরোহ পন্থা এবং অপরটী অবরোহ পন্থা। বেদান্ত দর্শন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দর্শনগুলিকে বিচার করিলে উহার আরোহপন্থী বলিয়াই বিবেচিত হয়। আরোহপন্থায় ব্রহ্ম বস্তুর সম্যক উপলব্ধি নাই। কিন্তু বেদান্তদর্শন বা অবরোহ পন্থাতেই উহার সম্যক অনুভূতি লাভ করা সম্ভবপর। এই বেদান্ত দর্শনের অনুশীলন করিতে গিয়া অনেকেই ইহার প্রকৃত অভিপ্রায়কে ধরিয়া উঠিতে না পারিয়া কন্ম

ও নির্বিশেষ জ্ঞানী হইয়া বিপথগামী হইয়াছেন । তজ্জন্ত বেদান্তবেদ-
পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগস্থ
কলির প্রথম সন্ধ্যায় অষ্টদল পদ্মাকৃতি ত্রীনবদ্বীপ ধামের কর্ণিকাস্থল ত্রীধাম
মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তের প্রকৃত অর্থ যে ভক্তি, তাহা পুনরায় প্রকাশ
করেন । ব্রহ্মকে সম্যক্রূপে জানিতে হইলে সেই ব্রহ্মের রূপাই তাঁহাকে
জানিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ । আবার একমাত্র সেবার দ্বারাই তাঁহার রূপ
লাভ করা যায় । স্মরণ্য সেবা বা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ—ইহাই বেদ, বেদান্ত
ও উপনিষদাদির সারমর্ম । যথা :—

“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব
ভূয়সী” (মাঠরশ্রুতি) । অর্থাৎ—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান,
ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান । সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির
বশ । ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা ।

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাম্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ (গীঃ ১৮।৫৫)

(শ্রেষ্ঠা ভক্তিদ্বারা যথার্থরূপে আমাকে জানিতে পারা যায় অর্থাৎ, আমি যে রূপ
সর্বব্যাপী ও সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিবিশিষ্ট, তাহা ভক্তিদ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায় ।
আমাকে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অবগত হইয়া তৎপরে আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ
করে ।)

শ্রীমন্নহাপ্রভু সেই ভক্তির তর-তম অবস্থার আলোচনা করত উত্তমা ভক্তির
স্বরূপ কি, তাহা স্বীয় শ্রেষ্ঠ পার্শ্বদ শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু কর্তৃক জানাইয়াছেন—

অত্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাণ্যনাবৃতম্ ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥” (ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ১।৯)

(অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি । তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-
সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই ; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম,
নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্মদ্বারা আবৃত নহে ।)

ভক্তির সর্বোচ্চতম বিকাশ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনেই সম্ভবপর । কৃষ্ণবিগ্রহই
সর্বপ্রকার রসের সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন । তাঁহার অত্যাশ্রয় রূপে তিনি
সমস্ত রসের পরিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করেন না । যেমন—শ্রীরামচন্দ্র ; তিনি সেই
ভগবদন্ত হইলেও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া যখন তাঁহাকে
পতিরূপে ভজিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

“আমার এ মূর্তিতে উক্ত প্রকার সেবা আমি গ্রহণ করি না। ইহা কৃষ্ণরূপেই একমাত্র গৃহীত হইয়া থাকে। তজ্জন্ত তোমরা ব্রজে গোপীজন্য লাভ কর।” পরবর্ত্তিকালে ঐ ঋষিগণ গোপীদেহ লাভ করিয়া কৃষ্ণ ভজনদ্বারা তাঁহাদের অভিলাষমত মধুর রসের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণেই অনন্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পরিপূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হয়। তজ্জন্তই ভগবত্তত্ত্ববিদগণ এবং বেদান্তশাস্ত্র কৃষ্ণকেই অনাদি, আদি, সর্বকারণ ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-বিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (ব্রহ্ম-সংহিতা)

ভগবান্ রামচন্দ্র কৃষ্ণেরই অংশরূপে প্রকাশিত বলিয়া তিনি অংশী অর্থাৎ যাহার অংশ সেই কৃষ্ণরূপে ঋষিগণ সমক্ষে প্রকটিত হইতে না পারিয়া কৃষ্ণেরই অংশীত্ব বা সকলের আদিত্ব ও মূলত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ঐরূপ কৃষ্ণশক্তি—চিৎশক্তি, জীবশক্তি বা জড়শক্তি যাহাই হউন না কেন তাঁহারাও কৃষ্ণেরই অধীনত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতেও কৃষ্ণের সমতুল্য ঐশ্বর্য ও মাধুর্যাদির আশা করা বিফল। অনেকের ধারণা মহামায়াই ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণভক্তের মনোবাসনা পূরণ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাঁহারা অতদ্বজ্ঞ সমাজে প্রচলিত কয়েকটি গীতি উল্লেখ করিয়া থাকেন। যথা—“তুমি কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।”

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত আয়ান ঘোষকে শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনা কালীন তদীয় কালী মূর্তি-ধারণ-ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকার গীতি রচনা করিয়া বলিতে চাহেন যে, যে-হেতু কৃষ্ণই তথায় কালীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব কালী ও কৃষ্ণ এক এবং কালীও কৃষ্ণ-মূর্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা যে সিদ্ধান্ত-সম্মত নহে, তাহা তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না। কৃষ্ণ বস্তু “সর্বকারণ কারণম্” এবং “মতঃ সর্ব প্রবর্ত্ততে” প্রভৃতি প্রমাণানুসারে সমস্ত রূপেই প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইতে প্রকাশিত বস্তুগুলি কৃষ্ণের জ্ঞায় সমস্ত বস্তুর প্রকাশক হইতে পারে না; যেহেতু তাহারা মূল বস্তু নহে। মহামায়া ত দূরের কথা, কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি—শ্রীযোগমায়া দেবীও কখন শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্য সেবা গ্রহণের যোগ্যতা প্রকাশ করেন না। শক্তি নিত্যকালই শক্তিমানের অধীন-তত্ত্ব। সুতরাং অতদ্বজ্ঞ ও প্রকৃত শাস্ত্রার্থানুধাবনে অপারক ব্যক্তির মতের উপরই নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া চলে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই শুদ্ধ—ইহা কখনও বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। Vote এর দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নির্ণয় করা চলিবে না। জগতের অধিকাংশ লোকই যেহেতু বলিতেছে সেইহেতু তাহাই সত্য, ইহা বিবেচনা করা ঠিক নহে। কারণ বহু লোকই অতদ্বন্দ্ব; তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা অল্পই হইয়া থাকে। তজ্জন্ত Vox Populi Vox Dei (The voice of people is the voice of God)—এই উক্তি হইতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তিই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ, কিন্তু মুর্থ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বহু মূর্খের ভোটের উপর যেমন নির্ভর না করিয়া অল্প সংখ্যক পণ্ডিতের ভোটকেই সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তদ্রূপ পরমার্থও সংখ্যাগরিষ্ঠ মারাবদজীবের ভোটদ্বারা নির্ণীত হইতে পারিবে না। এইজন্ত পরমার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। গীতা বর্তমান জগতেও সর্ববাদী-সম্মত গ্রন্থ। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—“তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ” (১৬।২৪)। সুতরাং যাহারা এই শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ব-কপোল-কল্লিত মতবাদ প্রচার করিতে চাহে, সাধু-সমাজ তাহাদের ঐ সকল বিচারের কোনই মূল্য দেন না।

ভাই, বিষ্ণুই পরদেবতা এবং সেই বিষ্ণুভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম। কিন্তু এই কলিকালে কলির প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই এই বিচারের বিপর্যয় হইবে। কলিচুষ্ট জীবগণ পাবগুগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া সকলের পিতা, প্রভু ও জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি সেবা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে এবং যাহার মুখ হইতে যাহা কিছু বাহির হইবে উহাকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে। যথা:—

১। কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্বপ্রণামীশ্বরম্।

নার্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় পাবগোপহতাঃ জনাঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬।৫০)

(হে মৈত্রেয় কলিযুগে লোকসমূহ পাবগুগণ বশীভূত হইয়া সকলের প্রণাম ও প্রভু জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে না।)

২। সর্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য বদ্বচনং দ্বিজ।

দেবতা চ কলৌ সর্বস্ সর্বশ্চ চাশ্রমঃ ॥ (ঐ ১।৬।১৪)

[কলিযুগে যাহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে উহাই ‘শাস্ত্র’ বলিয়া গৃহীত হইবে; কলিতে সকলেই দেবতা (অর্থাৎ জীব-জন্তু, ভূত-প্রেতাди সকলেই আরাধ্য হইবে) আর সকলেরই সকল আশ্রম হইবে।] (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগ্ভিঙ্গামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাস্ত্র ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
২৪শে পৌষ, ১৩৬১ সাল

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ২৯শে মাঘ ১৩৬১, ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫, শনিবার, ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোঙ্গামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ২৬শে মাঘ, ৯ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার হইতে ২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গুর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দৃষ্টব্য :—বুধবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, বৃহস্পতি ও শুক্রবার অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। শনিবার পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সহকে আলোচনা।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সড়াক বার্ষিক ভিক্ষা ৪২ টাকা, বাণাসিক ২৥০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ৥০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সমালোচনা আদরণীয়।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা “প্রকাশক”, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (লুগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলত, কার্ত্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেয়ই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ৥০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদিগ্ভিষ্মামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ এদত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯২ নয় টাকা।

গন্ধর্ব-গর্ব-কপণ-স্বলাস্ত-
বিস্মাপিতাশেষ-কৃতিব্রজায় ।
স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৪॥

আনন্দ-মূর্ছাবনিপাত-ভাত-
ধূলিভরালকৃত-বিগ্রহায় ।
যদর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৫॥

স্থলে স্থলে যস্য কৃপা-প্রপাতিঃ
কৃষ্ণাশ্রুতৃষ্ণা জনসংহতীনাম্ ।
নির্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৬॥

যদভক্তি-নিষ্ঠোপল-রেখিকেব
স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য ।
প্রাণাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং
তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৭॥

মূর্ত্তেব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তুনুমান্ লোকে ।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৮॥

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিক্কৌ
নিমজ্জতঃ শ্রীল-নরোত্তমস্য ।
পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ-
রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ॥৯॥

কারুণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তুকোটি-
রম্যাধরোচ্ছদতিসুন্দর-দন্তুকান্তিঃ ।
শ্রীমন্নরোত্তম-মুখাম্বুজ-মন্দহাস্যং
লাস্ত্যং তনোতু হৃদি মে বিতরং-স্বদাস্তম্ ॥১০॥

রাজমৃদঙ্গ-করতালু-কলাভিরামং
গৌরাজ্জগান-মধুপান-ভরাভিরামম্ ।
শ্রীমন্নরোত্তম-পদাম্বুজ-মঞ্জুনৃত্যং
ভূত্যং কৃতার্থমতু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি শ্রীকৃষ্ণনামামৃত উদগীরণকারী মুখচন্দ্রদ্বারা সকলের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকেন, সেই গৌরাজ্জদেবানুচর শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীহরিসংকীর্ণনে মন্দ মন্দ আনন্দ হাস্য করিলে দন্তকিরণে দিগ্‌বধু-গণের মুখমণ্ডল প্রোক্তাসিত হইতে থাকে এবং তৎকালে ঘর্ম ও নরন-নীর-ধারায় যিনি স্নান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র চকল পাদপদ্ম দ্বারা সকলের মনোহরণ

করেন, শ্রীহরিসংকীর্ণনে প্রবেশ করিবামাত্রই যাহার গাত্রে পুলক সঞ্চার হয়, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যিনি নৃত্য-নৈপুণ্যে গন্ধর্বগণের গর্ব খর্ব করিয়া অশেষ সুধীবর্গের বিশ্বাসোৎপাদন করিয়াছেন এবং স্বরচিত মধুর গীতসকলদ্বারা সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

প্রেমানন্দভরে মুচ্ছিত হইয়া ভুলুপ্তিত হইলে ধূলিরাশিতে যাহার সর্বদা অলঙ্কৃত হয় এবং বহুপুণ্যবলে যাহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটে, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যিনি স্থানে স্থানে কুপারূপ জলসত্তা স্থাপন করিয়া লোকসমূহের শ্রীকৃষ্ণ জিন্ন অপরাধ-ত্যাগ অর্থাৎ বিষয়বাসনা সমূলে নির্মূল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যাহার ভক্তিনিষ্ঠা পাবাগরেখার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যাহার পাদস্পর্শ স্পর্শ-মণির দ্বারা অভীষ্টপ্রদ এবং যাহার বাক্য বেদবৎপ্রামাণ্য, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

এই মনুষ্যলোকে যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিচক্ষণগণ সর্বদা ‘এই পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যের সারাংশ?’—এইরূপ জল্পনা করেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসসাগরে যিনি সর্বদা নিমগ্ন থাকেন, সেই ঠাকুর শ্রীল-নরোত্তমের এই অষ্টক যিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই তৎপদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

রম্য অধর হইতে নিঃসৃত অতিসুন্দর দশনকান্তিযুক্ত, আশ্রিতজনের কোটি-অপরাধ নাশকারী ও কুপাদৃষ্টিবিশিষ্ট সেই শ্রীমন্ নরোত্তম-মুখপদের স্মিতহাস্ত আমাকে স্ব-দাস্ত্র প্রদান করিয়া হৃদয়ে নৃত্য করুন ॥ ১০ ॥

সুমধুর মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনিতে অতিশয় উন্নত শ্রীগৌরঙ্গ-গুণগানের মধুপান-ভরে অতি মনোরম শ্রীমন্ নরোত্তম-পাদপদের মনোহর নৃত্য, এই ভূতাকে ইষ্টফল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১১ ॥

শ্রীবিষ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

ঠাকুর নরোত্তমের পারম্পর্য্যে চক্রবর্তী ঠাকুরের স্থান

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্বামিগণের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের অগ্রকটের পরে শুদ্ধভক্তিশ্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ প্রভৃত্যকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীবিষ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন।

ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিন্তের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্তী ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে যে বিষদত্তী আছে, তাহা এই—“কিরণবিন্দুকণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা”। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিষ্বনাথনাথরূপোহসৌ ভক্তিবল্লপ্রদর্শনাৎ ।

ভক্তচক্রে বর্তিতত্বাং চক্রবর্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥

অর্থাৎ এই বিষ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিষ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম চক্রবর্তী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুররসে পারঙ্গত রসিকচুড়ামণি ভক্তরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শক্তির সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়রসকূপে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার পারমার্থিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া অনেক ‘প্রাকৃত সহজিয়া’ তাঁহাকে ‘সহজিয়া-কুলভুষণ’ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

ঠাকুরের কুলের ও গুরুদেবের পরিচয়

শ্রীল বিষ্বনাথ, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন।

ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্বক মুরশিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরু-গৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

ব্রজধামের বিভিন্ন স্থানে বাস ও গ্রন্থ রচনা

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুদেবের স্তোত্র, পরমগুরুদেবের স্তোত্র, পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম পরাংপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচিত করিয়াছেন। এইগুলি তাঁহার শুভামৃতলহরী নামী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্রসমূহের সহিত গুচ্ছিত আছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থগুলি বর্তমান সময়ে দুপ্রাপ্য; দুই-চারিখানি ব্যতীত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতে, কোন সময়ে শ্রীষাবটে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্ট উদাহৃত আছে।

ঠাকুরের স্থিতিকাল ৭০ বৎসর

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দের মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৬০ শকাব্দায় ধরিলে এবং অপরকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সপ্ততি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

ঠাকুরের পারম্পর্য্য-পরিচয়

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বালুচর গাভিলা নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন শুল্কসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই

শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের পরম গুরু। সারার্থদর্শিনীতে শ্রীরামকৃষ্ণাধ্যায়ের প্রামাণ্য-
টীকায় আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নম্রা গুরুভুক্তপ্রেমঃ

শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরান্ধ্রপ্রভুং নোমি ॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম, শ্রীকৃষ্ণ, নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ বুঝাইতেছে।

ঠাকুর কর্তৃক বিশৃঙ্খল রাগমার্গে অন্ত্যায় স্মরণাদির প্রতিবাদ

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের জ্ঞায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক গোড়ীয়াচার্য-
গণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য
লিখিবার পরও গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুইটি হিতকর কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।
সেই দুইটিই প্রচারমূলে কীর্তনের কার্য। শ্রীনিবাস আচার্য-কন্ঠা শ্রীল হেমলতা
ঠাকুরানী, শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একটি উদাসীন শিষ্যকে গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ
হইতে বর্জন করেন। সেই রূপকবিরাজ গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতিবাড়ী
নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে
এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্যের কার্য করিতে সমর্থ।
গৃহস্থগণের মধ্যে ভক্তাচার্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর
করিয়া বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্তনের
অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর এই গোস্বামিপ্রতিকূলপন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার
করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনী-
তেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা শ্রীজীব গোস্বামিলিখিত ভক্তিসন্দর্ভের
অনুগত পথমাত্র।

ঠাকুরের প্রচার—“গোস্বামী” উপাধি গুণের পরিচয় বংশের নহে

শ্রীরূপকবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের
শিষ্যবংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাজ্য পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া “গোস্বামী”
উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল
চক্রবর্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন
গৃহস্থ সন্তানের আচার্য্যের কার্য করা অসম্মত নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ-
পারম্পর্য্যক্রমে ধনশিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ
নিজ নামের পশ্চাত্তাপে গোস্বামী-শব্দ সংযোজন করা নিতান্ত অবৈধ বলেন।
তজ্জহু তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য করিলেও নিজ নামের সহিত স্বয়ং গোস্বামী

শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা মূর্থ বিচারহীন আচার্য্যসন্তানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যেকালে আচার্য্যসন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে “গোস্বামী” শব্দ লিখিয়া স্ব-স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্রবিমুখ হইয়া বংশপারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন সেইকালে জয়পুরের গলুতা গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্ত আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্র-প্রতিম গোড়ীয় বৈষ্ণব বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচারসভায় গমন করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিরাকৃত পারম্পর্য্যের অনুমোদন

জাতি-গোস্বামিগণ, আপনাদিগের শ্রীমদ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করার যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহার নিরাকরণ জন্ত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গোড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশৌক-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজল্যমান দৃষ্টান্ত।

চক্রবর্তীঠাকুরের রচিত পরিচিত গ্রন্থরাজির তালিকা

শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম।

- ১। ব্রজরীতিচিন্তামণি ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পূর্টঃ (খণ্ডকাব্যঃ) ৪। গীতাবলী ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জলনীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং, (২) মন্ত্রদাতৃ গুরোরষ্টকং, (৩) পরমগুরোরষ্টকং, (৪) পরাংপরগুরোরষ্টকং (৫) পরমরপাংপরগুরোরষ্টকং,

(৬) শ্রীলোকনাথষ্টকং, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং, (৮) স্বরূপচরিতামৃত, (৯) স্বপ্নবিলাসামৃতং, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকং, (১১) শ্রীমদনমোহনাষ্টকং, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং, (১৩) শ্রীগোপীনাথষ্টকং, (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকং, (১৫) স্বয়ং ভগবতাষ্টকং, (১৬) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং, (১৭) জগন্মোহনাষ্টকং, (১৮) অমৃতরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেবাষ্টকং, (২০) শ্রীরাধিকাখ্যানামৃতং, (২১) শ্রীরূপ-চিন্তামণি, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকং, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং, (২৪) গোবর্দ্ধনাষ্টকং, (২৫) সঙ্করকল্পদ্রুম (শতকং), (২৬) শ্রীনিকুঞ্জবিরূদাবলী (বিরূদকাব্য), (২৭) সুরতকথামৃত (অর্ঘ্যশতকং), (২৮) শ্রীশ্রামকুণ্ডাষ্টকং—

১। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যং, ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ১১। উজ্জল-নীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধোবিন্দুঃ ১৩। রাগবতচন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্যাকাংশিনী (দুস্ত্রাপ্য) ১৫। মাধুর্য্যাকাংশিনী ১৬। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুটীকা ১৭। শ্রীউজ্জলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেনিকৌমুদীটীকা ১৯। শ্রীললিতমাধব নাটকটীকা ২০। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকটীকা ২১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত টীকা অসম্পূর্ণ ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সারার্থবর্ষিনী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

—জগদগুরু শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ—

আচার ও প্রচার

আচারসম্পন্ন প্রচার-প্রধান ভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ

ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীহরিদাসঠাকুরকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীসনাতন গোস্বামী এইপ্রকার কহিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

“আগনি আচারে কেহ না করে প্রচার।

প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥

আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।

তুমি সর্ব গুরু তুমি জগতের আর্ঘ্য ॥”

সাধু পাঠক ! শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তিটী ভাল করিয়া বিচার করুন। কৃতি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ আচার প্রধান ভক্ত, প্রচার প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচারসম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচারসম্পন্নই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেবল-আচার-প্রধান ভক্ত মধ্যম। কেবল

প্রচার-প্রধান ভক্ত কনিষ্ঠ । সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার । সেই ধর্ম্ম জগতে অতী জীবের নিকট প্রচার করার নাম প্রচার । আচার বা প্রচারকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যিক । শিক্ষা করিতে কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্বেই প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন । তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না । তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

“উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ ।

অপরীক্ষোপদিষ্টং যং লোকনাশায় তদ্ববেং ॥”

ভজনানন্দী অপেক্ষা প্রচারক ভক্তই জগতের অধিক উপকার করেন

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয় । ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে । গৃহস্থ-ভক্তগণ যেস্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও মস্ত্রাদি প্রদান করেন, সেস্থলে সন্ন্যাস-গ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়—তাহা সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে । যাহারা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ই ভিক্ষাশ্রমের প্রকৃত গুরু । গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারা ই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য । কোন কোন লোক স্বয়ং গুরুভক্তির আচরণ করেন না, বরং কল্মসাদৃত আর্জসম্মত আচার করিয়া থাকেন ; তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ । প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যিক । ক্রটিক্রমে যে সকল ভক্তগণ সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন । যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য,—

“জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ-সঙ্কীৰ্ত্তনকারী ।

শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি ॥

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ ।

জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥

উচ্চ করি’ করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীৰ্ত্তন ।

জন্তুমাত্র শুনিয়া, পায় বিমোচন ॥”

অতএব আচার-প্রচারসম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটা কোটা দণ্ডবৎ প্রণাম ।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরিব্রাজকাচার্য্যব্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের বন্দনা-গান

—:~:—

(১)

জয় জয় - কেশব-সেবক কেশব

প্রভুপাদ-প্রচারিত উপদেশ যে-সব,

পতিত কান্ডালে জীবে বিতরিয়া সে সব ;

অতুলিত ভক্তি-বলে সেবিতেন্তে কেশব ॥

(২)

অগণিত নর-নারী সংসারে মজিয়া,

শ্রীহরি-ভজন ভুলি' মায়াতে ভজিয়া,

কলুষের স্রোতে যবে যেতেছিল ভাসিয়া,

সেই কালে কৃপাকরে এলে তুমি ছুটিয়া ॥

(৩)

(যবে) কুজনিয়া পাখী বন মুখরিত করেছিল

(যবে) বসন্তের সুরভিত ফুলে বন ভরেছিল,

(যবে) শ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথি নদীয়ায় উদেছিল,

(যবে) হরিনামে নদীয়ার নর-নারী মেতেছিল,—

(৪)

(তবে) হ'য়েছিল বহু পুণ্যে তব পদ দরশন

(তবে) আখি মোর করেছিল সুখনীর বরষণ,

কতসুখ পে'য়েছিনু করি পদ পরশন,

(হয়ে) কোথা গেল সেই সুখ-নীরধির গরজন?

(৫)

মহারাজ !

প্রশস্ত ললাট তব সুশোভিত তিলকে,

মধুর আনন্দ-ভাতি নয়নের পলকে,

অধরে হাসির বৃদ্ধ তরঙ্গ বলকে

কুন্দ দশনে সদা দামিনী দলকে ॥

(৬)

তাজিয়া সংসার-সুখ আর মান-অভিমান,

বিমলিন জীবে হরি-নাম করিতেছ দান,

জীবগণ সেই হরিনাম-সুখা করি'পান,

হাসি' হাসি' চলে যায় যথা নিত্যানন্দ ধাম ॥

(৭)

(যবে) মায়াবাদী কুসিদ্ধান্তে আচ্ছাদিতা নাম-রবি,

(যবে) অমুরে হরিতা আসি' হরিজন-যজ্ঞহবি,

সেকালে উদিত হ'য়ে তোমার মোহন ছবি

তঁাদেরে পরাজি' পুনঃ প্রকাশিতা নাম-রবি ॥

(৮)

(মহারাজ !) তোমার যুগল চরণ কমলে,

এ' দানজনের এই নিবেদন—

(তোমার) করুণা যেন গো প্রদানে আমারে,

সুদুর্লভ কৃষ্ণ ভকতি রতন ॥

আমি দীন-হীন ভজন বিহীন,

কেমনে বর্ণিব মহিমা তোমার।

তুমি ত শ্রীগৌর-সেবক-প্রধান,

তব-পদে মুঞি নমি বার বার ॥

দীন সেবক— শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় পুরাণ রত্ন,

নারায়ণ (মেদিনীপুর)

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

‘তন্ত্রমত’ নামে—আর একটি মতের প্রচলন দেখা যায়। তাঁহাদিগকে তান্ত্রিক মত বলা হয়। তান্ত্রিক বলিলে সাধারণতঃ তামসিক তন্ত্রেরই অঙ্গগত সাধকগণকে বুঝায়। সেই মতাবলম্বীগণ বলেন—‘কলাবাগম-সম্মতম্’। অর্থাৎ কলিকালে আগমোক্ত মতে (তন্ত্রমতে) সমস্ত পূজাদি না করিলে তাহার সম্যক ফল লাভ হয় না। সেই তন্ত্রমতের বীরাচার পদ্ধতিক্রমে পূজায় পঞ্চ ‘ম’-কারের উল্লেখ আছে। অতএব শক্তিপূজায় মত্ত ও মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।” বহুস্থানে ঐ তন্ত্রমতে কালিকাদেবীর পূজাদিও হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গাদেবীর পূজা বৈদিক বিধানে ও বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারাই সর্বত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পূজায় তন্ত্রোক্ত কোনও বিশেষ বিধি পরিদৃষ্ট হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকার ভাবে সাধনার (পূজার) বিধি দেখা যায়। যথা—(১) দিব্যভাব, (২) বীরভাব ও (৩) পশুভাব। ব্রহ্মজ্ঞানে সাধনাকারীর সাধনাকে দিব্যভাব কহে। মত্ত-মাংসাদি দ্বারা সাধনাকারীর সাধনাকে বীরভাব (ইহাকে বামাচারী বা কোনও) কহে। এবং বেদমতে মত্তমাংসাদি-বর্জনপূর্বক সাধনাকারীর সাধনাকে পশুভাব অর্থাৎ বৈদিক ভাব কহে। কখন কোন্ ভাবে পূজাদি করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কালীবিলাস-তন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

সত্য-ত্রেতার্ক-পর্যন্তঃ দিব্যভাব-বিনির্গমঃ ।

ত্রেতা-দ্বাপর-পর্যন্তঃ বীরভাব ইতীরিতম্ ।

দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিকালে জ্ঞানোচনে ॥

অর্থাৎ—সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্বার্দ্ধ পর্যন্ত দিব্যভাবে, ত্রেতার শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাপরযুগ পর্যন্ত বীরভাবে এবং কলিকালে দিব্য ও বীরমতে সাধনা নাই। অতএব হে জ্ঞানোচনে পার্শ্বতি! এই কলিকালে শুধু পশুভাবেই সাধনা করিতে হয়। রুদ্রবামনোও দেখা যায়—

দিব্য-বীরময়ো-ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন ।

কেবলং পশুভাবেন * মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ (রুদ্র বাঃ ২৬ পটল)

দিব্য ও বীরভাব কলিকালে কখনও আচরণীয় নহে। কলিযুগে মানবের কেবল পশুভাবেই * মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

* ‘পশুভাব’ অর্থাৎ বৈদিক ভাব বা দেব-ভাব। যথা—‘পশুপতি’

তন্ত্রের এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে কলিযুগে দুর্বল মানবগণের পক্ষে দিব্যাচার বা বীরাচার-মতে সাধনা অসম্ভব। এই বীরাচার বা কুলাচারের সাধন অতীব কঠিন। মহা-জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন অতের এই বীচারে অধিকার নাই। নিরুত্তরতন্ত্রের ১০ম পটলে দেখা যায়—

‘সিদ্ধমস্তা ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্য-পানতঃ।’

অর্থাৎ—যিনি মস্ত্র সিদ্ধি করিতে পারেন, তাহাকেই বীর (বীরাচারী) বলা যায়। শুধু মদ্যপান করিয়াই বীর হওয়া যায় না। বীরভাবে সাধকের (কৌলের) লক্ষণ নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীশিবের এইরূপ উক্তি আছে—

ত্বং সমা চ ভবেনারী মংসমঃ পুরুষো যদি।

শুদ্ধচিত্তস্তদাহমৌ তু সমর্থঃ কুলসাধনে ॥

হে পার্শ্বতি ! তোমার ছায় শুদ্ধচিত্তা নারী এবং আমার ছায় শুদ্ধচিত্ত পুরুষ হইলে সেই নারী ও সেই পুরুষ কুলসাধনে (কৌলাচারে সাধনায়) সমর্থ হয়। কুলানব তন্ত্রের দ্বিতীয়োল্লাসে বিশদভাবে উল্লেখ আছে—

কুপাণ-ধারা-গমনাদ্ ব্যাঘ্র-কর্ণাবলম্বনাং।

ভুজঙ্গ-ধারণানুনমশক্যাং কুল-সেবনম্ ॥

অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অসীধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কর্ণমর্দন ও হস্তধারা বিষধর সর্পধারণ যেরূপ দুষ্কর, প্রকৃত কুলধর্ম্মাচরণ (কৌলাচার) তদপেক্ষাও অধিকতর দুষ্কর কার্য্য জানিবে। নির্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়—

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে ত্বে।

ন ভেদো যশ্চ চার্কজি স কোলঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

হে দেবি ! হে স্তম্ভরি ! শ্মশানে ও গৃহে, জুবর্ণে ও ত্বে যাহার ভেদ-জ্ঞান নাই তাহাকেই প্রকৃত কোল বলিয়া জানিবে।

উক্ত সমস্ত বচন-ভাষ্যপৰ্য্যেই কলিহত দুর্বল জীবগণের পক্ষে কুলাচার নিষিদ্ধ হইয়া পঞ্চাচারে পূজার ব্যবস্থা তত্তৎ অধিকারীপক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

যথা— ‘পশুভাব-স্থিতোন্নর্ত্যে মহাসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্।’

(রুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্র ২য় পটল)

মানবগণ পশুভাবে অর্থাৎ পঞ্চাচারে (মদ্য-মাংস ব্যতীত স্বাত্তিকী) সাধনা

অর্থে ‘দেবেশ’ বা ‘জীবেশ’ শ্রীশিবকেই বুঝায়। পঞ্চাচার বলিলে বৈদিক আচারকেই লক্ষ্য করে—পরে এই প্রবন্ধের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় প্রমাণ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

(পূজাদি) করিলেই মহাসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। কলিকালে অল্পভাবে তাহা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পশ্চাচার যথা—

বেদোক্তেন যজ্ঞেদেবীং কাম-সংকল্প-পূর্বকম্।

স এব বৈদিকাচারঃ পশ্চাচারঃ স উচ্যতে ॥

(শব্দকল্পদ্রুমমুত—আচারভেদতন্ত্র)

অর্থঃ—নিজের অভীষ্টানুরূপ সংকল্পবাক্য উচ্চারণপূর্বক বেদোক্ত বিধানে দেবী ভগবতীর আর্চনাকেই বৈদিকাচার কহে এবং ঐ বৈদিকাচারই পশ্চাচার নামে কথিত হয়।

সুতরাং তন্ত্রমতের অজুহাতেও বলিদান বা মাংসাদি ভোজন অবাধগতিতে চলিতে পারে না। তন্ত্রমতের যাহা—পশ্চাচার, বেদাচারও যখন—তাহাই নিশ্চিত হইল, তখন বেদে রাগপ্রাপ্ত বলিদান ও মাংস ভোজনাতির সাক্ষাৎ কোনও বিধি না থাকায় মদ্য-মাংস-ব্যবহার বিষয়ে তন্ত্রমতেও বৈধ বলা চলে না। রাগ-প্রাপ্ত কার্যে বিধি না থাকিলেও ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ যথেষ্টভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া, তাহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জগুই ‘পরিসংখ্যা’ বিধি বা ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা পূর্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কাশীধাম শাক্ত ও শৈবগণের সর্বোত্তম স্থান বলিয়া মান্য করা হয়। এবং পণ্ডিতপ্রধান বলিয়াও সুপরিচিত। বিশ্বনাথের এই পুণ্যপুরী কাশীধামে অন্নপূর্ণা-পূজায় পশুঘাতের নিয়ম না থাকায়, তাহার কোনও পূজাতেই ছাগাদি পশু-বলি দেওয়া হয় না। বঙ্গের বহু রাজা মহারাজা কাশীতে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাহার বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং প্রতি বৎসর শত শত শ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; কিন্তু বাংলা-দেশের জায় পশুবলির প্রথা কোথাও দেখা যায় না;—সর্বত্রই নিরামিষ ভোগ হইয়া থাকে। কাশীস্থ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিশালক্ষী দেবীর নিকটও নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পণ্ডিতপ্রধান কাশীধামের এই সমস্ত শক্তিপূজা অঙ্গহীন বা অশাস্ত্রীয় হয় বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু বহু বিশিষ্ট শক্তি-মন্দিরেই সাত্ত্বিকভাবে বিনা বলিতে পূজার প্রচলন রহিয়াছে। তাহার দুই-চারিটি স্থানের বিবরণ সবিশেষ-ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া সকলের সন্দেহ-নিরসার্থ এইস্থলে প্রদত্ত হইল।—

১। কলিকাতার সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূর্বে বলিবিধান ছিল। স্বর্গীয় রাণীরাসমণির দোহিত্র কলিকাতা ইটালীর ভূমিদার স্বধর্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বলরাম দাস মহাশয় ঐ মন্দিরের সেবার প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বলিবিধান জন্ম অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি কাশীধাম, নবদ্বীপ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভট্টপল্লী ও হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের স্নানামখ্যাত বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মী নির্বিশেষে সকলের নিকট শক্তিপূজার বলিদান একান্ত কর্তব্য কি না, এবং ঐ বলিদান বন্ধ করিলেই বা শাস্ত্রীয় দোষ কি? তাহার ব্যবস্থাপত্র জন্ম প্রার্থনা জানান। তদুত্তরে ঐ সকল পণ্ডিতগণের অনেকেই একত্রে মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহারা সকলেই স্বাক্ষরিত করেন, এবং পরে অনুপস্থিত পণ্ডিতগণেরও স্বাক্ষর করান হয়। ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারাও প্রবন্ধে-দর্শিত পদ্মপুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয়া “বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক ও শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারী সকলেরই পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বলিদান সহ কালিকাপূজা বলিদান ব্যতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, বরং সাত্ত্বিকবিধানে পূজা করাই প্রকৃত শাস্ত্রাভিমত”—এই মর্মে বিধান প্রকাশ করেন। এইরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মহাত্মা তদবধি ঐ মন্দিরে বলিদান বন্ধ করেন। সকলের কুসংস্কার দূর করার জন্ম উক্ত ব্যবস্থাপত্র ও স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের নাম ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ঞায়রত্ন প্রভৃতি সতেরজন, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্বভৌম, শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি দশজন, কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঞায়রত্ন, ভাগবতাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি নয়জন, হরিদ্বারের শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বশাস্ত্রী, শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নয়জন, মোট পয়তাল্লিশ জন পণ্ডিত ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২। বীরভূম জেলার সিউড়ী সদরে স্নানাম প্রসিদ্ধ মৃত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালিকামন্দিরে দেবীর নিকট ছাগ বলি বা মংস্ত্র-মাংসাদি ভোগের ব্যবস্থা নাই। ঐ মহাত্মা দেবীর প্রতিষ্ঠাকালেই ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দতীর্থ স্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমবেত সকলের বিচার এবং ব্যবস্থাক্রমে সাত্ত্বিকভাবে পূজার

অনুষ্ঠান করাই স্থিরীকৃত হয়। তদবধি প্রত্যহ দেবীর নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পশুবলি সর্বতোভাবে নিবারিত আছে। পীঠস্থান বহুল বীরভূম জেলার সদরে শ্রীশ্রীকালীমাতার এইরূপ সাত্ত্বিকী পূজা পুণ্যাত্মার স্মৃতিকে গৌরবান্বিত করিতেছে।

২। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর স্মরণ্য বংশধর মহারাজ জগদ্বিনোদ রায় বাহাদুর বার্ষিক শ্রীদুর্গাপূজাকালে পূর্বপুরুষ প্রচলিত পশু বলিদান বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্য্যে অনেকেরই ভ্রান্তি, বিদূষিত হইবে।

৪। কলিকাতা বাঁধা বটতলার স্বধর্ম্মপরায়ণ জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে বহুকাল যাবৎ শ্রাদ্ধপূজা উপলক্ষে ১০৮টি বলিদান হইত। তন্মধ্যে ছয়টি মহিষ, দুইটি মেঘ, আটান্নকইটি ছাগ, একটি কুম্ভাণ্ড ও একটি ইক্ষুদণ্ড এই সমস্তে মোট একশত আটটি বলিদানের প্রথা ছিল। কিন্তু তাঁহার স্মরণ্য পৌত্রগণ এই বলিদান রহিত করিয়াছেন। ভৎপরিবর্তে শাস্ত্রীয় বিধানমতে বলি প্রতিনিধিরূপে ক্ষীরের পুতুল উৎসর্গ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। এই মিত্র মহাশয়ের শ্রীশ্রীকালীধামে প্রতিষ্ঠিত যে কালীমূর্তি আছেন, সেখানেও কোন বলির ব্যবস্থা নাই, নিত্য নিরামিষ ভোগ সহ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি-ব্যাকরণভাষ্য

জ্ঞানকথা

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ৪১৬ পৃষ্ঠার পর)

‘সর্বং যন্নিদং ব্রহ্ম’—এই শ্রুতিবাক্যের উপলব্ধি করিতে হইলে desire কে ধ্বংস করার কথা মোটেই নাই। কিন্তু desire এর স্বভাব পরিবর্তনের কথাই উল্লেখযোগ্য। বাসনা দ্বারাই সমস্ত জগতের কার্য্যকলাপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বাসনার বহুমুখী কার্য্যকলাপ ভগবদগীতার এইভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

যথা—

বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সূত্র্যং দমঃ শমঃ ।

জুখং ছুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথক্বিধাঃ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তুথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সৌহৃদিকল্পেন যোগন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অহং সর্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুদ্ধা ভাব-সমষ্টিভাঃ ॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যনুভাবস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥ (গীঃ ১০।৪-১১)

[অর্থাৎ, বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতার অভাব, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ—এই সকল প্রাণিগণের নানাপ্রকার ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে (৪-৫)। মরীচ্যাদি সপ্তধর্ম, তাঁহাদের পূর্বজাত জনকাদি ব্রহ্মবিগণ, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে সঙ্কল্পমাত্র উৎপন্ন, সংসারে ব্রাহ্মণাদি এই সকল তাঁহাদেরই পুত্র-পৌত্র বা শিষ্য-প্রশিষ্যরূপে পরিপূরিত আছে (৬)। যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও ভক্তিযোগ বিষয় সম্যকরূপে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চল মনসীয তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণের দ্বারা যুক্ত থাকেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই (৭)। আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তিসহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাহারা করেন না, তাহারা অপণ্ডিত (৮)। আমাতে সমর্পিত চিত্ত ও সমর্পিত প্রাণ ব্যক্তিগণ নিত্য পরস্পর আমার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে, সাধন অবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় রমণ-সুখ লাভ করেন (৯)। সততযুক্ত, প্রীতিপূর্বক ভজনকারী তাঁহাদিগকে আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন (১০)। তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই, আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিসহ হইয়া প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকাররূপ সংসার নাশ করি (১১)।]

সুতরাং বাসনা বা desire এর বহুমুখী ভাব সমূহ পরম ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাবরূপে যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা সেই সমস্ত ভগবদ্ভাব ত্যাগ না করিয়া সেই সকল ভাবের দ্বারা ভগবৎ সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব-পূর্ব সপ্ত মহর্ষি এবং মহাদি সকলেই ভগবানের এই ভাবকে ভগবানের সেবার নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রজা বা বংশধরগণ সেই সকল মহার্জনের পথ অনুসরণ করিলে আর desire বেচারীকে অব্রহ্ম দর্শন করিতে পারিবেন না। মহর্ষি (৭) রমণ যদি desireকে ধ্বংস করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁর 'সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যের যথাযথ উপযোগ করিবার ক্ষমতার অভাব বুঝিতে হইবে। যাঁহারা জগতের সমস্ত ভাবকে ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করিয়া পরব্রহ্মের সেবার লাগাইতে সমর্থ হইলেন, তাঁহারাই প্রকৃত 'বুধ'-ভাব-সম্বিত মহাত্মা। তাঁহাদের কোনপ্রকার অজ্ঞান থাকে না। এবং সেই প্রীতি-পূর্বক ভজনশীল সেবাপরায়ণ মহাত্মগণের বাসনাদি এমনভাবে পরিমার্জিত হয় যে তাঁহাদের অজ্ঞানতা থাকিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের অজ্ঞানতা নষ্ট করিয়া দেন। নিজের চেষ্টায় অজ্ঞান নাশ করিবার যে ইচ্ছা, আর ভগবান্ কৃপা করিয়া যে অজ্ঞানতা নষ্ট করিয়া দেন, এই দুই প্রকার কার্য-কলাপের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাও মায়াবাদীদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। মায়াবাদিগণ চিরদিনই শক্তিমান্ ভগবানকে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় করিবার জন্ত ব্যস্ত। রাবণাদি অশুরগণ ভগবানকে শক্তিহীন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কংসাদি অশুরগণ ভগবানকে নিরাকার নির্বিশেষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার নির্বিশেষ করিবার প্রয়াস অশুরগণই করিয়া থাকে। আশুরী ভাবাশ্রিত নরাধমগণ তাহাদের ভগবানের সেবা পরিত্যাগহেতু দুষ্কার্যের ফলস্বরূপ সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। "মায়াপহৃত জ্ঞানাঃ" (গীঃ ৭।১৫)—একথা আমরা ভগবদ্ গীতায় পাইয়াছি। বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় বাহাদুর ভগবানকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার নির্বিশেষ করিবার চেষ্টা করিয়া মহা বিচার দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদের জ্ঞানালোচনা কেবলমাত্র ক্লেশ স্বীকারই হইয়াছে।

“শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদয়ং তে বিত্তো ক্রিয়ন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নাতুদ্ যথা স্থল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥”

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

[অর্থাৎ, হে বিত্তো ! যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথস্বরূপ ভগবদভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল (অর্থাৎ ভক্তিশূন্য) জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের অন্তঃসার-শূন্য স্থল তুর্বার্হাতীর স্থায় ক্লেশ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে ; তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ।]

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশ এ সমস্তগুলি কোথায় দেখা যায় ? যেখানে চেতনের কার্য আছে, সেখানেই এই সকল চেতন লক্ষণগুলিও বর্তমান । ভগবান্ বলিতেছেন যে এগুলি সবই—তঁারই ভাব বা তাহা হইতে উদ্ভূত । তিনি নিত্যদের মধ্যে নিত্য, এবং চেতনদের মধ্যে চেতন—‘নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্’ (কঠ ৫:১৩) । অতএব চেতনের এইসব চেতনবৃত্তিগুলি নষ্ট করিয়া ভগবানকে এবং জীবকে মিলিয়ে দিয়ে একটা জগাখিচুরী করা বা কাঠ-পাথর করিয়া দেওয়া খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে । অচেতন করিয়া দিলে সুখ, না চেতনতা বজায় রাখিলে সুখ—তাহা মায়াবাদিগণ বুঝিতে পারে না । চেতনবস্তুর চিরদিনই অচেতনের উপর দখল করিয়া থাকে । আমরা দেখিতে পাঠি একজন মহাসমহারখীর অচেতন মন্মথর প্রতিকৃতির (Statue) উপর কাকরূপ একটি সামান্য চেতন বস্তুও বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া থাকে । কলিকাতার গড়েয়-মাঠে এইপ্রকার বহু বহু কৃতি ব্যক্তির statueর উপর সামান্য কাকরূপ চেতন বস্তুই এইপ্রকার আধিপত্য আমরা অনেক দেখিয়াছি । সুতরাং নিম্নের নিঃশক্তিক প্রস্তরবৎ হ’য়ে বাওয়া এবং পরম বস্তুকেও সেইপ্রকার নির্বিশেষ করিয়া দেওয়া মহা অজ্ঞানেরই পরিচয় । সেই প্রকার কার্য্যে কোনও জ্ঞানকথা আছে—ইহা আমরা স্বীকার করি না ।

শ্রীঅরবিন্দকে বরণ আমি আদর করি এইজন্য যে, তিনি বিদ্বৎসমাজে একটা নুতন সংবাদ দিয়াছেন যে—বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি চেতন বৃত্তিগুলির নাশ না করিয়া তাহাদের character বা স্বভাব পরিবর্তন করিয়া অপ্রাকৃত অনুভূতিতে (supermental consciousness) অপ্রাকৃত চিহ্নিতর আনুগত্যে ভগবানের সেবার লাগাইতে হইবে । অবশ্য যাহারা আমাদের পূর্বপূর্ব মহাজনগণের পথ অনুসরণ না করিয়া আধুনিক নব্য ঋষিগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে ভাল-বাসে, তাহাদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের এইসব কথা নূতন বলিয়া মনে হতে পারে ; কিন্তু যাহারা মহাত্মা ভগবতগণের আনুগত্যে শ্রৌত-পরম্পরায় ভগবৎ-সেবার নিযুক্ত, তাহাদের কাছে এসব কথা মোটেই নূতন নহে—পরন্তু ইহা ধার করা

জ্ঞান মাত্র বলিয়া মনে হইবে। সমস্ত বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যই এই প্রকার এবং শ্রীগোষামিপাদগণ এই চিহ্নিত্তি বিলাসের যে অপূর্ব সন্ধান দিয়াছেন তাহা আর কোন যুগেই কোন আচার্য্যের দ্বারা প্রচার করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীল রূপগোষামী প্রভু তাঁর 'বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে জগতের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এইভাবে আশীর্বাদ করিয়াছেন।

যথা—

অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুরতোজ্জল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।

হরিঃ পূরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়-কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ (বিঃ মাঃ ১।২)

[অর্থাৎ, সুবর্ণকাস্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে, ক্ষুণ্ণিতলাভ করুন। তিনি যে সর্বোৎকৃষ্ট উজ্জল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার উদ্ভূত কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।]

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Surrender and opening' নামক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যথা—

“The whole principle of this Yoga is to give oneself entirely to the Divine alone and to nobody and nothing else, and to bring down to ourselves by union with the Divine mother, all transcendent light, power, wideness, place, purity, truth, consciousness and Ananda of the supermental Divine.

“Radha is the personification of the absolute-love for the Divine, total and Integral in all parts of the being from the highest spiritual to the physical, bringing the absolute self-going and total consecration of all the being and calling down into the body and the most material nature the supreme Ananda.” এই প্রকার বিবৃতিতে সিদ্ধান্তগতঃ

বহুধা অসামঞ্জস্য থাকিলেও ত্রৈলোক্যে যতটা সম্ভব বস্তুর নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শরণাগতি ভিন্ন সেই উন্নত উজ্জল রসের কথা বুঝিবার উপায় নাই। মায়াবাদিগণের শরণাগতিরই অভাব এবং সেইজন্য নিজ-চেষ্টায় অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বকে বুঝিতে গিয়া নির্বিশেষবাদী হইয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রকার শরণাগতি বিবর্জিত মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদিগণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ ; যথা—

“To seek after the Impersonal is the way of those who want to withdraw from life, and usually they try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior Power or by the way of surrender; for the Impersonal is not something that guides or helps, but something to be attended and it leaves each man to attain it according to the way and capacity of his nature. On the other hand, by an opening and surrender to the mother, one can realise the Impersonal and every other aspect of truth also.”

মায়াবাদিগণের নিজ চেষ্টায় মুক্তি পাইবার চেষ্টা তাহা কোনদিনই কার্যকরী হয় না। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানে শরণাগতি ভিন্ন জড়-মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই।—

“মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” (গীঃ ৭।৪৪)

অর্থাৎ, একমাত্র আমাতেই যাহারা শরণাগত হয়, তাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন—অন্তে নহে।

সেই শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকটই প্রথম শরণাগতি স্বীকার করিতে হইবে।

“সাধুশাস্ত্রকুপায় যদি কৃষ্ণেণুথ হয়।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।

জীবেরে কুপায় কৈলা কৃষ্ণবেদ-পুরাণ ॥” (চৈঃ চঃমঃ ২০।১২০, ১২২)

সমস্ত বেদ পুরাণেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ-তত্ত্ব। “বেদৈশ্চ সর্বৈ অহমেব বেদঃ” এবং সমস্ত বেদ পুরাণের নির্যাস-স্বরূপ ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানেই মুখপদ্ম বিনিহিত ভক্তিবাদান্ত।

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবাদান্ত

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত

বিশুদ্ধ সান্ন্যাসত

শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষাণ্মাসিক দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

জিহ্বাবেগ

“জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।

শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।

পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥”

(চৈঃ চঃ অঃ ৬-২২৭ ও ২২৫)

পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে জিহ্বা মনুষ্যের প্রধান শত্রু । বিবিধ প্রকারের টক, মিষ্ট, ঝাল, কটু, অম্ল, কষায়, অম্লমধুর বিবিধ স্বাদযুক্ত দ্রব্য সমূহের স্বাদ গ্রহণ করাই ইহার ধর্ম । এই দুর্দান্ত অরি বিভিন্ন প্রকারে চর্ক্যা, চোষ্য, লেহ্য, পেয়-রূপে বিবিধ রস সমন্বিত দ্রব্যে প্রলোভিত করিয়া উদর-উপস্থ-বেগকে বিক্ষোভিত করিয়া সাধক ভক্তদিগকে অধঃপাতিত করায় । এই রিপুপতি কামরূপ ইন্দ্রিয়ের বন্ধু ও ইহার ইন্ধন সরবরাহকারী । শাস্ত্র বলেন, যাহারা ভজন-প্রয়াসী, তাহারা সর্বাগ্রে ঐ ইন্দ্রিয়টিকে সংযত করিতে না পারিলে, কোন মতে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না । যে-প্রকার মৎস্ত জিহ্বা-বেগের বশবর্তী হইয়া বড়শীর চোপ খাইতে গিয়া একেবারেই প্রাণত্যাগী হারাইয়া ফেলে, সেইপ্রকার এই জিহ্বরূপ ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইতে গেলে, ঘোর অন্ধকারময় স্থানে আত্ম-বিলোপ সাধন করিতে হইবে ।

অস্বাদু ভোজন-শীল জিহ্বা বেগদাস ।

অতিরিক্ত ভোক্তা সেই উদরেতে আশ ॥

যোষিতের ভৃত্য ত্বেন কামের কিস্কর ।

উপস্থবেগের বশে কন্দর্প ভৎপর ॥ (উপদেশামৃত-ভাষা)

অতরাং যাহারা লোভের বশবর্তী হইয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করিবেন, তাঁহাদের বিষ ভক্ষণের দ্বারা ক্রিয়া হইবে । ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অস্বাদু দ্রব্যাদি ও অত্যধিক দুগ্ধ সূতাди সেবন করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ করিয়া তোলা সাধুশাস্ত্র বিরুদ্ধ । যাহারা ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা কখনও রাজসিক খাদ্য বা ঐপ্রকার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিবেন না । শাস্ত্রে আহার-গুদ্বি বা আহার-সংযম বলিয়া ১টি কথা আছে, ইহা সর্বত্র বিশেষতঃ ত্যাগী সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন । আহার গুদ্বি না হইলে চিত্ত নির্মল হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ভগবদ্ভক্তনের অযোগ কোথায় ?

যে সব দ্রব্য উগ্র, তাহা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ; সে-সব ভোজ্য কখনও গ্রহণ করা উচিত নহে । নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া বাহ্যিক যতটুকু দরকার, তাহার সেইপ্রকার গ্রহণ করার নাম যুক্তাহার । তদ্ অতিরিক্ত গ্রহণের নাম অত্যাহার । যে-সব দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত নিৰ্ম্মলীকৃত হইয়া ভগবদ্ উপাসনার সাহায্য করিবে, সেইপ্রকার স্নিগ্ধ, সাত্ত্বিক, নিৰ্ম্মল আহার্য গ্রহণ করা বিধেয় । সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—তিন প্রকার আহারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । যিনি যে-প্রকার গুণজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, তাঁর চিত্তবৃত্তি সেইপ্রকার হইয়া থাকে । বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ নিগুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত । শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাই শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সেই স্নিগ্ধ, সাত্ত্বিক উপকরণগুলি প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়া থাকেন ।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক স্থানের নির্দেশ এইরূপ দেখা যায়—

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।

তামসং দ্যুত-সদনং নরিকৈতন্ত নিগুণম্ ॥

ভগবানের নিকেতন অর্থাৎ শ্রীমন্দির নিগুণ—ত্রিগুণাতীত । ভগবান্ যে-প্রকার নিগুণ তাঁহার প্রসাদও সেইপ্রকার নিগুণ । সেই প্রসাদ আদরের সহিত গ্রহণ করা করেন, তাঁহারাও নিগুণ-সেবা লাভ করেন । এই নিগুণ ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, জিহ্বা জ্বর করা যায় না । আবার এই প্রসাদের মধ্যে কে, কোন্ প্রসাদের অধিকারী, তাহা খুব ধীরভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করা দরকার । প্রসাদ গ্রহণের অভিনয় করিয়া উত্তম উত্তম ভোগের দ্রব্যাদি নিজ-ভোগে লাগাইয়া ভোগবৃত্তির ইন্ধন যোগাইলে জিহ্বা, উদর, উপস্থ বেগ-গুলি বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে । কুতরাং মনে করিতে হইবে—এ সব উত্তম ভোগ-গুলি আমার জন্ত নহে । উহা প্রসাদে নিগুণ বুদ্ধিকারী ভগবন্তের জন্ত । মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন—“আমাকে দাও লাফরা ব্যঞ্জন এবং উত্তম দ্রব্যে করাও বৈষ্ণব ভোজন ।”

এই রিপুগুলিকে দমন করিবার জন্ত, সাধু মহাজনগণ নানা প্রকার জলন্ত আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন । যদিও এই রিপুগুলি প্রশমিত করা দুঃসাধ্য এবং ভগবৎ-কৃপা সাপেক্ষ, তথাপি যুক্ত আহার-বিহার ও যুক্ত বৈরাগ্য দ্বারা, চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে ভগবন্তজনে সাহায্য করিয়া থাকে ।

শ্রীধাম নবদ্বীপের সর্বজন পরিচিত, সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ গৌরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সর্বত্র সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া

পরিচিতি ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের রাণীর চড়ায়, একটি খড়ের চালায় বাস করিতেন। হাজার হাজার লোক ঐ মহাত্মাকে দর্শন করিবার জন্য নানাপ্রকার উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন ও ফলাদি দ্রব্য লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। কিন্তু বাবাজী মহারাজ ঐ সব উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। তিনি প্রায়ই রন্ধন করিতেন না। কদাচিৎ রন্ধন করিলে দেখা যাইত—বেগুনপোড়া বা সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, অথবা কোনও বস্তু রন্ধন করিয়া দেখা যাইত না। তিনি অধিক দিন চাউল, ছোলা ভিজাইয়া জুধু বা নবণ সহযোগে তাহা গ্রহণ করিতেন, কখনও নিমপাতা ভক্ষণ করিতেন। এবং অনেক সময় লোকশিক্ষার জন্য কাচা লক্ষা ও নিমপাতা মুখে চিবাইয়া আপন মনে বলিতেন—খাও রসগোল্লা এই বলিয়া উহা ভক্ষণ করিতেন। প্রায়ই বলিতেন—এমন খাওয়া খাইবে যাহাতে কুকুরেরও লোভ না হয়। এই প্রকারের নানারূপ বৈরাগ্যের আচরণ দ্বারা ঐ সিদ্ধ মহাত্মা সকলকে শিক্ষা দিতেন। তিনি এইভাবে লাড্ডু খাওয়া লোভী বাবাজী-দিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের আচারই প্রচার। আচার বিহীন প্রচারের দ্বারা কোন কালেই নিজের বা অপরের মঙ্গল হইতে পারে না। তাই বাবাজী মহারাজ জীব দুঃখে দুঃখী হইয়া এইরূপ কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। হে কলির জীব! তোমাদের যদি কৃষ্ণ পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ বৈরাগ্য আচরণ করিয়া, দুর্দান্ত কালসর্প সদৃশ ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রশমিত করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীম রঘুনাথ গোস্বামীর শিক্ষায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি রাজার হায অতুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কিরূপ বৈরাগ্য আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া ছিলেন। তাঁহার আদর্শে দেখা যায়—তিনি ভ্যাগী বৈরাগী সম্প্রদায়কে জিহ্বা-লাম্পটা হইতে কিরূপে সংযত হওয়া যায় তাহার শিক্ষা দিবার জন্য, বহুকালের পর্য্যসিত ভ্রুণে পতিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিতেন। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের উক্ত এক আদর্শের অন্তরালে আমরা বহু শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকি। তাঁহার জীব দুঃখে দুঃখী, জীবের দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। কলিহত জীব সমূহকে উদ্ধার মানসে, নানাপ্রকার লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা ঐ আদর্শ আগ্রহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে চাহি না বলিয়াই নানাপ্রকার অশুবিধার মধ্যে পতিত হইয়া থাকি। নিত্য সিদ্ধ ভগবৎ পার্শদগণের কোন দিনই ঐ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হয় না। তবে ঐরূপ বৈরাগ্য আচরণ করার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—

আমাদের তায় ভবরোগীর জিহ্বা চাহে—বিষুভোগের উত্তম উত্তম রসনা-ভৃগু কর
খাচ্চ ভোগ করিতে, ভোগী সেজে ভগৎ ভোগ করিতে। তাই এই চিকিৎসক
মহোদয়-দ্বয় আমার ব্যাধির অনুরূপ সুন্দর খাচ্চ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন—
দ্রুণে পতিত গলিত অন্ন-প্রসাদ, জলে ভিজান চাল, ছোলা ভিজান, নিমপাতা,
লক্ষা প্রভৃতি কঠিন খাচ্চ। কেমন সুন্দর ব্যবস্থা! যেমনি রোগ তেমনি ব্যবস্থা।
মর্কট বৈরাগী আমি, আমার ঐ সব খাচ্চ পছন্দ হয় না। বুদ্ধ বৈরাগ্যের চল
করিয়া আমার মনে হচ্ছে ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, দধী, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, সরভাজা,
সরপুরী, রাবড়ি, সন্দেশাদি বহুবিধ ভগবৎ ভোগ্য দ্রব্যগুলি ভোগ করি;—যেন
আমরাই ভোক্তা, ভগবানের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছি। আর ঘৃত সিদ্ধ
অন্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, ছানার ডালনা, ছানার ধোকা, উত্তম উত্তম তরকারী
প্রভৃতি বিভিন্ন মিষ্ট সন্দেশ, পিঠা পানা, ছানার বড়া, চাটনি প্রভৃতি বিষুভোগ্য
দ্রব্য সমূহ ভোগ করিয়া, শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য ক্রিমি-বিষ্টাপূর্ণ পুতি-গন্ধময় দেহ
খানাকে বলশালী করিয়া আমার মন রাজা যযাতির তায় যাবজ্জীবন ভোগ
করিতে চাহে।—এইরূপ যে আমি, আমার মঙ্গল কোথায়?

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নিক্ষেতেত যাবত।

মংকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (ভাঃ ১১।২০।২)

যেকাল পর্য্যন্ত কৰ্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার
ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।
ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ কাহারও কৰ্ম্ম-
ফল ভোগে বিরক্তি এবং ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মান পর্য্যন্ত ত্যাগীর বেশ
বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহারা ঐপ্রকার অপক অবস্থায়
বৈরাগ্য-লিঙ্গাদি গ্রহণ করেন, তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই ঐ স্থান (সন্ন্যাস) হইতে
অষ্ট হইয়া মর্কট-বৈরাগী, লম্পট বা বাস্তাণী ইত্যাদি হইয়া পড়ে। সুতরাং খুব
ধীর চিন্তে নিজের ঐ আশ্রমে অধিকার আছে কিনা, বিচার করিয়া আশ্রম চিহ্ন
ধারণ করা দরকার। উপজীবিকা, ইন্দ্রিয় তোষণাদি অপসার্থ সিদ্ধি মানসে,
রাবণের মত বৈরাগ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। রাবণ শ্রীরামশক্তি সীতাদেবীকে
হরণ করিয়া নিঃশক্তিক বস্তু রাখার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী সাজিয়া ছিলেন। আজ-
কাল কোথাও রাবণের অভাব নাই, প্রায় সর্বত্র বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার
কপটতা চলিতেছে। “তপোবেশোপজীবিনঃ”। বৈরাগ্যবান্ পূর্ব্ব ঐকান্তিকভাবে
ভগবদ্ভজনের জন্ত সন্ন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ করিবেন। জীবিকা অর্জনের জন্ত

বা রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য গ্রহণ করার জ্ঞান নহে । এই প্রবৃত্তির লোকগুলি বৈরাগী না সাজিয়া, গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়া যদি ক্রমপন্থায় ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহ'লে জগতের ও নিজের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে । অপর বৈরাগ্যের পরিণামে আমরা অনেককে বাস্তাবী হইয়া পড়িতে দেখিতে পাই । তাহারা যদি সংসার-ক্ষেত্রে থাকিয়া চাষাবাদ করিয়া ফসল উৎপাদন করিত, তাহা হইলে জগতের অনেক মঙ্গল হইত ।

“ক্ষুদ্র-জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিষা ।

ইন্দ্রিয় চড়াঞা বুলে ‘প্রকৃতি’ সন্তাষিষা ॥

বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সন্তামন ।

দেখিতে না পারি আমি তাঁহার বদন ॥”

—শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভুর এই শিক্ষা । বৈরাগী হইয়া যাহারা জিহ্বার লালসে অত্যধিক স্নানাদি আহার্য সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি প্রবল করিয়া পরদার গ্রহণের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কোন কালেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা পাইবার সম্ভাবনা নাই । দৈনিক পাঁচসের দুধের ছানা ও রসনার তৃপ্তিকর পরম মাধুর্য্যময় ফল-মূলের রস আহরণ করিয়া, দধি উদরের পূরণ করিতে গেলে, বাধ্য হইয়া বাস্তাবী হইতে হয় । ইহা কোনও আচার্য্যের শিক্ষা নয় ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত পণ্ডিতব্রজক মহারাজ

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৯ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—পূর্বে তুমি বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যদ্বারা জানাইয়াছ যে, কলিছুষ্ট জীবগণ পাষাণগণের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া সকলের পিতা, প্রভু ও জগৎপতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি সেবা-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে এবং যাহার মুখ হইতে যাহা কিছু বাহির হইবে উহাকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে । এবিষয়ে এবং কলির অগ্রাণু অবস্থা সম্বন্ধে আরও অন্য কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি ।

দেবেন্দ্র—সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এবিষয়ে বলেন :—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং

ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।

প্রায়েণ যন্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতঃ

যস্যন্তি পাপগুণবিভিন্নচেতসঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

অর্থাৎ—হে রাজন্ ! কলিযুগে মানবগণ প্রমথঃ পাপগুণগর্ভক বিকৃত-
চিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি ত্রিলোকেশ্বরগণ কর্তৃক বন্দিতপাদকমলশালী, অগতের
পরম গুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না ।

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ

পতন্ যানন্ বা বিবশো গুণন্ পুমান্ ।

বিমুক্তকর্মাগাঃ উত্তমাং গতিং

প্রাপ্নোতি যস্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

অর্থাৎ—ম্রিয়মাণ আতুর পুরুষ শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্থলিতকণ্ঠ-
স্বরে ঘাহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্মরূপ অর্গলবন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ
করিয়া থাকে, কলিযুগে মানবগণ সেই শ্রীহরির আরাধনা করিবে না ।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই ! শাস্ত্রে কলির মানবের ও ধর্মের বেক্রপ অবস্থা
হইবে, তাহার ন্যাকি বর্ণনা আছে ? তুমি যদি উহা একটু কীর্তন কর, তবে
আমরা শুনিতে পাইতাম ।

দেবেন্দ্র—ভাই তোমার শাস্ত্রের প্রতি অমুরাগ ও বিশ্বাস দেখিয়া আমি
অতিশয় আনন্দিত হইলাম । আমি তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ
হইতে কিছু শুনাইতেছি । শ্লোকগুলি শুনাইয়া তোমাকে বিরক্ত করিতে চাই
না ; কারণ তুমি সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝিতে পার না । আবশ্যক হইলে
তোমাকে সমস্ত শ্লোকগুলিই দেখাইয়া দিব । প্রথমতঃ কলি কাহাকে বলে
এবং তাহাতে ধর্মের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর—

যে-কালে প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, তজ্জা, নিদ্ৰা, হিংসা, বিবাদ, শোক, মোহ, ভয়,
দৈন্ত ৫ ভীতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে তমোগুণপ্রধান কলিযুগ জানিবে । কলিযুগে
মানবগণের প্রবৃত্তি বর্ণাশ্রম ধর্মের অমুকূল এবং ঋক্-সাম-যজুর্বেদামুসারে
ধর্মামুষ্ঠানপরা থাকিবে না । যখনই ধর্মের হানি, পাপগুণের বৃদ্ধি এবং বেদমার্গ
অনুসরণকারী সজ্জনের অভাব হইবে, তখনই বিচক্ষণগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান
করিবে । মহাবল কলিকালের প্রভাববশতঃ প্রতিদিন মানবগণের ধর্ম, সত্য,
শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ুঃ, বল ও স্মৃতি বিনষ্ট হইবে । তৎকালে মানবগণ লুপ্ত,
দুঃখাচার, গুরুকলহশীল, দুর্ভাগ্যযুক্ত, অতিশয়-বিষয়তৃষ্ণাগ্রস্ত এবং শূদ্রকৈবর্ত
প্রাণাত্যুক্ত হইবে । কলিযুগবশতঃ মানবগণ মন্দমতি, মন্দভাগ্য, প্রচুরভোজী,
দরিদ্র ও কামুক হইবে । ঐ সময় ধর্মবিবাহ, গুরুশিষ্যসম্বন্ধ, দাম্পত্যক্রম এবং

অগ্নিতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াও থাকিবে না। তৎকালে বিজ্ঞাতিগণ যে কোন উপায়েই (অর্থাৎ নিষিদ্ধ দ্রব্যাদিদ্বারা) দীক্ষিত হইবে, আর যে কোন ক্রিয়াকেই প্রায়শ্চিত্ত (অসংকল্পের ফল নিরোধক) বলিয়া মান্ত করিবে। কলিযুগে সাধু সজ্জায় সজ্জিত) যে-কোন ব্যক্তির মুখ হইতে (কথামৃতস্বরূপ) যাহা কিছু বাহির হইবে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইবে। ঐ সময় সকলেই (ভূত-প্রেতাदि.) দেবতা হইবে আর সকলেই সকল আশ্রমী হইবে। উপবাস, ভীর্থপর্যটন-কার্যক্ৰেপ, দান ও তপস্তাদি নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাল আসিলে লোক স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে; অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং পিতৃদাদক-ক্রিয়াও করিবে না। কলিকালে কেবল গৃহ-নির্মাণের জন্তই দ্রব্য সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইবে (দান পুণ্যাদির জন্ত নহে)। বুদ্ধি কেবল ধন সঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকিবে (আত্মজ্ঞানে থাকিবে না) এবং সমস্ত ধন নিজ উপভোগে ব্যয়িত হইবে (অতিথি সংকারাদি পরমার্থানুশীলনে ব্যয়িত হইবে না)। ধর্মাত্মা পুরুষের আরক্কে কল্পে যখন অসফলতা হইবে, তখনই পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্ত বুঝিবেন। যখনই লোকে যজ্ঞের দ্বারা পুরুষের পূজা করিবে না, তখনই কলি প্রবেশ করিয়াছে—বুঝিবে। যখন বেদবাদে প্রীতির অভাব হইয়া পাষণ্ডে রতি হইবে, বিচক্ষণ প্রাজ্ঞগণ তখন কলির বুদ্ধি বলিয়া জানিবেন। কলিযুগে সেবকসমূহ পাষণ্ডের বশীভূত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎপতি বিষ্ণুর পূজা করিবেন না, এবং বলিবে—দেবতা দ্বিজ, বেদ ও অনাত্মক শোচাদিতে কি হইবে?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নরেন্দ্র—কলির অবস্থা বুঝিলাম। এক্ষণে আশ্রমধর্ম সম্বন্ধে উন্নিতে ইচ্ছা করি। আমরা জানি মানবের চারিটি আশ্রম। ইহাও কি পরিবর্তিত হইয়াছে? এবিষয় শাস্ত্রীয় বক্তব্য কি জানাইবে?

দেবেন্দ্র—এক্ষণে কলিকালে চারি আশ্রমের কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা শাস্ত্রে ভবিষ্যৎবাণীরূপে যেক্রপ কীর্তন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর।—

ব্রহ্মচারিগণ শোচাচার বৈদিক চাতুর্ন্যাস্তাদি-ব্রতহীন হইয়াই বেদ অধ্যয়ন করিবে। আজকাল স্কুল, কলেজ, আখড়া, মঠ, মন্দির এবং আশ্রমাদিতে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত ও পুরাণাদি শাস্ত্রের শিক্ষা (?) প্রদত্ত হইতেছে; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শাস্ত্রের অন্তকূল ব্রহ্মচর্য্য, তপস্তা ও আহার-বিহারাদি বিষয়ে কোন প্রকার (শাস্ত্রানুমোদিত) নিয়ম-পালনের আবশ্যকতার ধার ধারেন না। তাহার মৎস্য, মাংস, পোষাজ

প্রভৃতি অমেধ্য তামসিক উত্তেজক আহার এবং বিড়ি, সিগারেট, চা-পান প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদি সেবা করেন এবং একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান ও উপবাসাদির ক্রেশ স্বীকারে নিতান্ত পরাজুখ। ব্রহ্মচর্যাди আশ্রমের পরিচর্য-বিষয়ে এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড-অজ্ঞান প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ হইয়াছে। এই কলিকালে গৃহস্থগণও যজ্ঞাদিহীন হইবেন এবং সংপাত্রে উচিত দান দিবেন না এবং তাঁহারা ভিক্ষাপুরায়ণ হইবেন। বানপ্রস্থ ধর্ম্মগণ গ্রামবাসী হইবেন এবং সন্ন্যাসিগণ নিজ স্ত্রী-পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি মিত্রাদির স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন ও অতিশয় অর্থলোলুপ হইবেন। শূদ্রগণ তপস্বীর বেঘে দানগ্রহণশীল হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠপদ অধিকার পূর্বক ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবে। আশ্রমাদি চিহ্নরহিত শূদ্রগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করত ভিক্ষাবৃত্তিতে তৎপর হইবে এবং লোকের দ্বারা সম্মানিত হইয়া পাষণ্ডবৃত্তির আশ্রয় লইবে। দ্বিজ-ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসে অধিকার নাই। উক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়া অন্য লোকও কোপীনাদি গ্রহণ করা কলির ধর্ম্ম। আজকাল বৃন্দাবন, মথুরা, রাধাকুণ্ড, নবদ্বীপ প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানে অযোগ্যবর্ণের লোকও কোপীন গ্রহণ করিয়া ভেকধারণ অর্থাৎ ভিক্ষুআশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাও কলির প্রভাব বলিয়া জানিবে। যাহারা সংস্কৃত হইয়া উপনয়নাদি গ্রহণ করে নাই—তাহারাই শূদ্র। তাহাদের কোপীনাদিতে অধিকার হয় না, যেহেতু তাহারা সকলেই শূদ্র বা অন্য নিম্নবর্ণে আবিভূত। ‘জন্মনা যায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাং দ্বিজোচ্যতে।’ স্মরণ্য উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ না হইয়া কোপীন গ্রহণ করা কেবল কলিরই ধর্ম্ম। ইহা শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম নহে। এবং মহাপ্রভু ইহার অনুমোদন করেন নাই। পরমহংস মহাপুরুষগণের কথা স্মরণ। তাঁহারা “স্বলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যজ্জ্বা চরেদ বিধিগোচরম্”। তাঁহারা বেদ-বিধির অন্তর্গত নহেন। কলিযুগে লোক মন্দ-বুদ্ধি, বাগ-চিহ্নধারী এবং দুষ্টিচিত্ত-নিশিষ্ট থাকিবে। এজন্ত উহার অল্পকাল মধ্যেই নাশপ্রাপ্ত হইবে। ঐ সময় জগৎ স্বাধ্যায় ও বসট্কারহীন এবং স্বাধা-স্বধাবর্জিত হইলে ধর্ম্ম কোথাও কোথাও অতি বিরলভাবে অবস্থান করিবে।

নরেন্দ্র—কলির বর্ণন শুনিয়া আমার শাস্ত্রকারদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বদ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা এত সঠিক ভবিষ্যৎ বিবরণ কি প্রকারে প্রদান করিলেন! ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার এ-সম্বন্ধে আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। দেবেন্দ্র! তুমি এবিষয় আরও আমাকে বল। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদিগুস্বামী শ্রীমন্তুজ্জিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

একের প্রকাশ

সত্ত্ব রজঃ তমো গুণে একের প্রকাশ,
 সত্ত্বে রক্ষা, রজে সৃষ্টি, তমে হয় নাশ । ১ ॥
 তমোগুণে করে নাশ শিব শূলপানি,
 নিরাগী, জীবের লাগি' মহাযোবী ধ্যানী । ২ ॥
 মহাবিশু সত্ত্বগুণে পালে জগ-জ্ঞান ;
 জগৎ সৃজনে রত ব্রহ্মা বজ্রোত্তরে । ৩ ॥
 এই তিন তত্ত্ব মহা-বিশুের বিলাস,
 বিশুতে সব তত্ত্বের আছে প্রকাশ । ৪ ॥
 ব্রহ্মা, বিশু, রুদ্র তিন কৃষ্ণ-শক্তি-বলে,
 সৃজন, পালন, নাশ করে পলে পলে । ৫ ॥
 সেই কৃষ্ণরূপ হন শ্রীগুরু চয়ন,
 শ্রীগুরু ঈশ্বর-প্রেষ্ঠ কোবিদ-বচন । ৬ ॥
 কায়মনে লয় যেই গুরুতে আশ্রয়,
 ভাগবত তত্ত্ব তায় হৃদে বিলসয় ।
 বিস্ময়ে হেরয়ে ভক্ত মরমের কোণে,
 শম, দম, দয়া, ক্ষমা তিতিক্ষাদিগুণে ।
 অনুভব হয় তার গুরুর ব্রাহ্মশক্তি,
 গুরুব্রহ্মা মন্ত্রে সে করয়ে প্রণতি । ৭ ॥
 ভাগবত গুণ আর ভাগবত ভাব,
 রক্ষিবারে বিশু-শক্তির হয় আবির্ভাব ।
 গুরুদেব বিশু-শক্তি পেয়ে পরিচয়,
 গুরুবিশু মন্ত্রে গুরু-পদে প্রণময় । ৮ ॥
 এদিকে অনর্থ হৃদে জাগে অনিবার,
 ভাগবত গুণ তার রক্ষা করা ভার,
 কৃষ্ণভক্তি লাভে বাধা অনন্ত অনর্থ
 ভজনের মূল নয় তমু করে ব্যর্থ ।

গুরুদেবে শিব-শক্তি অন্তরে জাগিল,
 ত্রিভাণ অনর্থ যত প্রজ্ঞানে নাশিল।
 অন্তরে জানিল ভক্ত মহেশ্বর-লীলা,
 গুরুদেব মহেশ্বর বলি' প্রণমিলা।
 সকল অনর্থের যবে হল অবসান ;
 আশ্রমে ভুল তার দেহ, মন, প্রাণ। ৯ ॥
 তিনশ্রী-কোভ নহে হল মহাবীর,
 সুখে দুঃখে সম জ্ঞান ভক্ত মহাবীর।
 দশাংশি নেহারিয়া পরব্রহ্ম-লীলা,
 গুরুদেব পরং ব্রহ্ম বলি' প্রণমিলা। ১০ ॥
 নিখিলোতে তিন তত্ত্ব জেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান ;
 সৃষ্টিকর্তৃ, সৃষ্ট আর সৃষ্টি অভিধান।
 জ্ঞাতা হ'ল ভক্ত তত্ত্ব জেয় ভগবান্
 ঐশী-জ্ঞানের অনুভব ভক্তির আখ্যান। ১১ ॥
 ভক্ত ভক্তি ভগবান্ ধরে যবে রূপ
 ত্রী—কৃষ্ণ—চৈতন্যরূপে মহাভাবকূপ। ১২ ॥

—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবিতুষণ

অন্তহীন বর্ষ

আমরা পূর্ব পূর্ব বর্ষে দ্বাদশ সংখ্যায় পাঠকগণের নিকট আমাদের বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছি। তাহাতে বর্ষ-শেষের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষ-বর্ষের এই শেষ সংখ্যা। এই বর্ষের সাধু্য এই যে পরহিত-ব্রত পালন করাই এই বর্ষের আদ্যন্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। শব্দের সাংস্কৃতিকতা থাকা হেতু পরহিত শব্দ প্রয়োগ করিলে পর অহিত কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। কলির প্রাবল্যহেতু ধর্মের অধঃপতনের অভিব্যক্তি সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে, বিশেষতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সহিত আমরা বিশেষ সংশ্লিষ্ট ; তাহাতে যেমন প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকার বর্তমান বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সমাধান করিলে আমরা বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের কথা পত্রিকায়

আলোচনা করিয়াছি। এই সমালোচনার দুই-এক বৎসরে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহা আগামী বর্ষেও জনহিত ব্রত চালাইবে। তজ্জন্মই এই ৬ষ্ঠ বর্ষকে আমরা অন্তহীন বর্ষ এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াই আমাদের অন্তহীন ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রগতি লক্ষিত হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এই বর্তমান বর্ষের ১ম সংখ্যায় ১০ম পৃষ্ঠায় জানাইয়াছেন—“আমাদের পবিত্র ভক্ত-সমাজে যে সকল অনর্থ স্বার্থ-পরতাকে আশ্রয় করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধন করিবার বিশেষ যত্ন পাইব। শ্রীমন্মুখাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র-ধর্ম্মপুষ্পে যে সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে—এই সকল অনিষ্টকারী কীট দিগকে ঐ ধর্ম্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করিতে আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল সৌগন্ধ হরণ করিতেছে এমন নয়, উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃস্পেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে”। শ্রীল ঠাকুরের এই শিক্ষাই আমাদের গৌড়ীয় পত্রিকার আদর্শ। এই আদর্শ হৃদয়ে ও মস্তকে লইয়া পত্রিকার লেখনী দুকূতের প্রতি অন্তিমকাল পর্য্যন্ত প্রধারিতা হইবে তজ্জন্মই আমাদের অন্তহীন ৬ষ্ঠ বর্ষ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ছয় গোস্বামীর একান্ত আনুগত্যে কীর্তনামা ভক্তির প্রচার করিয়াছে। কীর্তনামা ভক্তিই ষড়্গোস্বামীর অভিমত। গুপ্ত অর্চনার অছিলায় স্বরণ-পন্থীর সেবা প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলক। উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণের অর্থাৎ ষড়্গোস্বামীর আদর্শ শিক্ষা নহে। মাধুর্য্য বসের তাম্বাদনহলে যে প্রাকৃত কামভূষণ প্রচলিত হইতে চলিয়াছে তাহা সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে যে রাসলীলায় পঠন ও পাঠন প্রচলিত হইতেছে, ইহা সর্বতোভাবে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

কলি প্রাবল্যেহেতু আজকাল আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই অপ্রিয় সত্যের আদর নাই। শ্রীপত্রিকা এই অপ্রিয় সত্যেরই প্রচারক। অপ্রিয় সত্য প্রচারিত না হইলে অবিমিশ্র সত্যিকথা এই জগৎ হইতে চিরতরে উৎসাদিত হইয়া যাইবে। এই সত্যকথা প্রচারকে সর্বতোভাবে বাধা দিবার জন্য অসং প্রকৃতির লোক সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা হইয়া পড়িয়াছে। আইন আদালতের আশ্রয় লইলেও সত্য প্রচার কখনও বন্ধ হইতে পারে না। আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা কোনও প্রকারেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। “সাচ্চা কহে, তবু মনের লায়্যা”

পরিশেষে আমরা আমাদের পত্রিকার পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি, তাহারা আগামী বর্ষেও এই নিরপেক্ষ ধর্ম্ম ও সত্য প্রচারক সেই গৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক থাকিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিবেন এবং যাহারা এবৎসর গ্রাহক ছিলেন আমরা তাহাদের সর্বতোভাবে ধর্ম্মোন্নতির কামনা করিয়া আগামী বর্ষে প্রবেশ করিব।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোয়ান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সন্তোষপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবিতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ, বৃহস্পতিবার হইতে ২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ, বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইচ্চগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে যোন-ক্ৰোশ পরিক্রমা করা হইবে। গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, টাঙ্গা-হাটী, মামগাছি এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাশ্রব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইবে।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪

শুদ্ধভক্ত-রূপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাই ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)— ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

- ১। ১৯শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—(১) শ্রীগোবিন্দদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—গঙ্গা-স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইরা স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, নৃসিংহদেব-পল্লী (শিবির রাত্রি-যাপন)।
- ২। ২০শে ফাল্গুন, শুক্রবার—(২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)—মাজিরা, হাটভাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা ও হংসবাহন।
(৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, টাঁপাহাটি (শিবিরে রাত্রি যাপন) এবং
(৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর।
- ৩। ২১শে ফাল্গুন, শনিবার—(৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)—জাহ্নগর (জহ্নু মুনিস্থান), বিষ্ণানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট)।
(৬) শ্রীমোদকম-দ্বীপ (দাস্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে শিবিরে রাত্রি-যাপন), অর্কটীয়া বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।
- ৪। ২২শে ফাল্গুন, রবিবার—(৭) শ্রীকুন্ডদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—কুন্ডপাড়া, শরপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা। এবং
(৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন।
- ৫। ২৩শে ফাল্গুন, সোমবার—(৯) শ্রীঅমৃতদ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট। তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, ষোড়ামাতলা দর্শনাতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৬। ২৪শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব।
- ৭। ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার—সাধারণ মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৮ টাকা, বাৎসরিক ২৯০ টাকা ও প্রতি সংখ্যা ১০ আনা। ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নাম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।
- ৫। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-সুমালোচনা আদরণীয়া।
- ৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (ভগলী)” এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।
- ৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রী দামোদর ঠাকুর

শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে উজ্জ্বলত, কার্তিকব্রত বা দামোদরব্রতে এই গ্রন্থখানি প্রত্যহ আলোচনীয়। ইহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকা ও সেই টীকার সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্বয় ও অনুবাদ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। মূল্য ১০ আনা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত)
মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত। এই বিরাট-সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে চক্রবর্তী-টীকার সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ৯৮ নয়া টাকা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রক

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বনাথ কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বনাথ বাসুদেব মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সত্ত্ব

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবিশ্বনাথ (সত্ত্বসত্ত্ব)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত রাগবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন

—(*)—

কার্য্যাদ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বনাথ ত্রিবিজ্ঞান মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিশ্বনাথ বাসুদেব মহারাজ-কর্তৃক শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়
মঠ, চৌমাথা, 'পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)' হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসজ্জনসেবক
ব্রহ্মচারী কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রকাশিত।